দুলীন।

বা

দুলীনের আশ্চর্য্য জীবন

বা

মহারাজা রণজিৎসিংহ-সংক্রান্ত ঐতিহাসিক নবন্যাস।

শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক,

কলিকাতা, ২০৩।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

মনোমোহন লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

১৩১০ সাল। শকাব্দাঃ ১৮২৫।

কলিকাতা।

নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট

ইণ্ডিয়ান প্রেস

শ্রীনবীনচন্দ্র পাল দ্বারা মুদ্রিত।

সিংহাসন যে অল্পে অল্পে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আত্মসাৎ করিতেছে; অথবা "চোরের উপর বাট্‌পাড়ি" স্বরূপ ...য়কে ক্রমে অপসারিত করিয়া ইহাদের লুণ্ঠিত ধন আবার তাহারা লুটিতেছে, জিমান খাঁ সে তত্ত্ব বড় রাখেন, নাই বা শুনিয়াও বিদেশী দল বলিয়া গ্রাহ্য করেন নাই!

এদিকে সেই কোম্পানির প্রতিনিধি লর্ড ওয়েলেস্‌লি বাহাদুর পূর্ব্ব হইতেই জিমান খাঁর দুরাকাঙ্ক্ষা বিষয়ে সতর্ক ছিলেন; রাজ্যের নানা দিক্ হইতে সৈন্যাকর্ষণপূর্ব্বক উত্তর পশ্চিমের স্থানে স্থানে প্রেরণ—বিশেষতঃ অযোধ্যার অপর প্রান্তে অধিক পরিমাণে স্থাপন করিলেন।

কিন্তু যুদ্ধ হইল না। জিমান পঞ্জাবের পার্শ্বিকদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া, স্বরাজ্যে তাঁহার অনুপস্থিতি-সুযোগে বিপক্ষদল প্রবল বিদ্রোহানল জ্বালিয়াছে শুনিতে পাইয়া, আপনা হইতেই ফিরিয়া গেলেন, বিশেষতঃ সেই সময় মন্ত্রীপ্রবর স্যার্ জন্ ম্যাল্‌কম্ সাহেব পারস্য রাজসভায় গিয়া যে সন্ধি নির্ণয় করিলেন, তদনুসারে পারস্যরাজ জিমান খাঁর অধীন খোরাসান রাজ্য আক্রমণ করাতে জিমানকে সেই যুদ্ধে এত ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইল যে, তৎকর্ত্তৃক ভারত রাজ্যে কোন উপদ্রবের সম্ভাবনা আর রহিল না। সুতরাং তত সৈন্য পশ্চিমে রাখা আর আবশ্যক কি? তজ্জন্য কর্ণেল ঢৌলীনের (Dowlin) অধিনায়কত্বে বহুসংখ্যক পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজাদি সমন্বিত এক বৃহৎ বাহিনী কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেছিল। তাহাদেরই অগ্রণী (Vanguard) অশ্বারোহী দল, সওয়ারি-যোগ্য ঐ হিন্দুস্থানী বয়েল গাড়ী দুখানি প্রথমে দেখিতে পাইয়া পরস্পরের প্রতি ঐ প্রশ্নটী উত্থাপন করিল।

পল্টনের কুচের সময় পথের মধ্যস্থলে বাধা দেখিয়া তাহারা রোষ-গর্ব্বভরে শকটচালককে ডাকিয়া বলিল "পাশে যা, ফৌজ আসিতেছে।" উত্তর না পাইয়া, বিশেষতঃ শকটদ্বয়কে নিশ্চল দেখিয়া ভাবিল, সম্মুখের চালক বুঝি নিদ্রিত; তাহাকে জাগ্রত করিবার উদ্দেশে অসিকোষের অগ্রভাগ দ্বারা তাহার গাত্রে লঘু আঘাত করিয়া "হুঁসিয়ার" বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

কিন্তু গাড়ী দুখানি তথাপি সেই অচলাবস্থায় সেই স্থানেই ...!—কেহ জাগিল না, কেহ উঠিল না, গাড়ীও পার্শ্বে সরিয়া গেল না!

কিয়ৎকালান্তে যখন কর্ণেল ঢৌলীন সাহেব সমগ্র সৈন্যদল লইয়া তথায়

দুগ্ধবতী গোরা রমণীর অভাব ছিল না, শিশুকে তদ্রূপ এক পোয়াতীর হস্তে সযত্নে সমর্পণ করিয়া শকটের পশ্চাদ্ভাগে যে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ ছিল, তাহাতে প্রবেশ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! সেখানেও হত্যা! গতযৌবনা এক রমণীর মৃতদেহ শয্যায় পতিত—আকার প্রকারে ও বেশভূষায় তাহাকে পরিচারিকা বলিয়াই বোধ হইল। আর একটী শূন্য বিছানা ও তাহাতে স্ত্রীলোকের একটা অঙ্গরাখা দেখিয়া বোধ হইল, সে শয্যায় অপর পরিচারিকা ছিল, তাহার কি হইয়াছে, বুঝা গেল না।

দয়াশীল দৌলীন মহাশয় শোকার্দ্র হৃদয়ে দ্বিতীয় শকটে গিয়া দেখেন, তথায়ও মৃতদেহ! এক দ্বারবান ও দুই ভৃত্য হত হইয়া শায়িতাবস্থায় পড়িয়া আছে—নিদ্রিতাবস্থাতেই হত্যা হইয়াছে, বিলক্ষণ বুঝা গেল। আরো খালি বিছানা দেখিয়া বোধ হইল আরো লোক ছিল, অদৃশ্য হইয়াছে। বিস্ময়ের বিষয়, এত গুলি হত ব্যক্তির মধ্যে কাহারো শরীরে অস্ত্রাঘাত বা কোনরূপ অত্যাচারের কিছুমাত্র চিহ্নও নাই! যেন আরব্য উপন্যাস-বর্ণিত যাদুবিদ্যার প্রভাবে নরনারীগণ শ্বাসহীন হইয়া পড়িয়া আছে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সন্ধান।

আদেশ হইল, অধিকাংশ সৈন্য অগ্রবর্ত্তী হইয়া উপযুক্ত স্থানে ছাউনি করুক; যাহারা সন্ধানে গিয়াছে, তাহারা কর্ণেলের সহিত পশ্চাৎ যাইবে। সেই আদেশানুসারে প্রায় সকলেই চলিয়া গেল। সেই স্থলেই পথ-পার্শ্বস্থ একখণ্ড মুক্ত-ভূমিতে কর্ণেলের একটা শিবির স্থাপিত হইল।

অশ্বারোহিগণের প্রত্যাগমনের সাবকাশে দয়ালু সাহেব বালকটীকে ভালরূপে দেখিলেন। স্তন্যপানে শীতল; তথাপি মধ্যে মধ্যে রোদন করিতেছে। নব-নিযুক্তা ধাত্রী বিধিমতে ভুলাইবার চেষ্টা পাইতেছে। কর্ণেল দৌলীনও ধাত্রীর সঙ্গে যোগ দিলেন—কতক সফলও হইলেন।

দেখিলেন, শিশুর বর্ণ ও বদন যেমন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গও তেমনি চমৎকার। কেশ বিরল; কেশের বর্ণ কৃষ্ণ নয়; ঈষৎ স্বর্ণাভ-শ্বেত—অভিন্ন ইউরোপীয়

শিশুর ন্যায়। বিশাল নয়নযুগলের সভয় দৃষ্টি অতিশয় স্নিগ্ধ ও মুগ্ধকর। দেখিয়া কৌলীনের হৃদয় অসীম স্নেহে—অভাবনীয় বাৎসল্য রসে আপ্লুত হইল। স্বর্গীয়া দেবীতুল্যা জননী জন্মের মত ছাড়িয়া গিয়াছেন। অনুদ্দিষ্ট জনকও হয় তো হত হইয়াছেন। তিনিও যে এই অসামান্যা রমণীর অনুরূপ পতি অর্থাৎ অসামান্য রূপ-গুণ-সম্পন্ন উচ্চ পদস্থ পুরুষ—হয় তো রাজারাজড়াইবা হইবেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। পুরাতন দাস দাসা সঙ্গিগণ হয় তো সকলেই হত হইয়াছে—কেবল অনুমানে দুই একজন অনুদ্দিষ্ট—তাহারা জীবিত কি মৃত তাহারও ঠিক নাই। শিশুর পৈতৃক বাসভূমিরও নির্ণয় হইতে পারে না। সুতরাং সংবাদ পাঠাইবেন কি তত্ত্ব লইবেন, তাহারও সম্ভাবনা নাই।

হায়! গিরিকানন-বেষ্টিত ভয়ানক স্থানে এক মুহূর্ত্তেই পিতৃ-মাতৃ-সহায়-হীন হইয়া এই সুকুমার শিশু নিতান্তই নিরাশ্রয় হইল! হায়, সে আবার যেমন তেমন শিশু নয়, সাক্ষাৎ দেবকুমার! এমন শ্রীমান শিশু সচরাচর দৃষ্ট হয় না—এমন শিশুকে অপত্যরূপে প্রাপ্ত হইলে পৃথিবীর বড় বড় সম্রাট্ রাজারাও ধন্য হন! ফলতঃ যেরূপ শিশুকে দেখিলে উদাসীনেরও সাধ করে কোলে লইয়া বদন-বিধু-মণ্ডলে একবার চুম্বন করিয়া যায়—যেরূপ শিশুকে দেখিলে পাষাণ-প্রাণ পাষণ্ডেরও হৃদয় গলে—যেরূপ শিশুকে তাহার পিতৃবংশের চিরশত্রুজনও ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া যাইতে পারে, এ সেইরূপ সর্ব্ব-মুগ্ধকর শিশু! তেমন মনোমোহন শিশুকে তেমন নিদারুণ নিরাশ্রয় অবস্থায় পাইয়া পরম স্নেহ-প্রবণ দয়াশীল কৌলীনের অন্তঃকরণ যে এককালে গভীর মায়ার্ণবে মগ্ন হইবে, বিচিত্র কি? ফলতঃ চিরদিনের যত্নলব্ধ রত্নলাভে, অথবা বিনা যত্নে কোন বহুমূল্য নিধি করতলস্থ হইলে লোকের যে ভাব হয়, তাঁহার যেন তাহাই হইল। নিঃসন্তানের সন্তান জন্মিলে অথবা সূতিকা হইতে অপহৃত পুত্রকে বহুবিলম্বে সহসা পুনঃপ্রাপ্ত হইলে, পিতার যেরূপ অনির্ব্বচনীয় বিপুলানন্দ হয়, তাহার যেন তাহাই

ত্রুটি করে নাই; [illegible]

[illegible] লইয়া সুধাসিঞ্চিত বাৎসল্যমাখা বাক্যে

না—তাহারা পাতালে কি আকাশে [illegible]

[illegible] চাহিয়া নানা

হইল না। সাহেবেরা শেষেরটাই সিদ্ধান্ত করিয়া পুনর্ব্বার [illegible]

সুবাদার হাওদারগণের অধীনে বহুদল সিপাহি উভয় পার্শ্বের জঙ্গলে

পাঠাইলেন, তাহাতে কেবল দিবসদ্বয় তাহাদের পণ্ডশ্রম ও বৃথা কষ্ট মাত্র সার হইল।

যাহারা মৃত রাজপুত্রকে (আকৃতি প্রকৃতি নানা লক্ষণ দেখিয়া সিপাহিরা মৃত যুবককে রাজপুত্র বলিয়া নিশ্চয় করিল) লইয়া আসিয়াছিল, তাহারা যেরূপ কহিল, এবং পূর্ব্বাপর তাবৎ পর্য্যালোচনা করিয়া সাহেবদের বিচারে এই অনুমানই ধার্য্য হইল যে, যদিও নিঃশব্দে চালকদ্বয় ও অন্যান্যের বধ কার্য্য সাধন করাই হত্যাকারীদের অভিপ্রায় ছিল, তথাপি কোন সূত্রে তাহাদের আবির্ভাব জানিতে পারিয়া, রাজপুত্র শস্ত্রপাণি হইয়া ছুটিয়া গিয়া কাহারো কাহারো অনুসরণ করিতেছিলেন, এমত কালে পশ্চাৎ হইতে গুপ্ত শত্রু তাঁহার গলায় ফাঁস লাগায়। রাজপুত্রের তদ্রূপ গমনে ঘোর চিন্তাকুল হইয়া তাঁহার সুন্দরী মহিষী যেমন যবনিকা হইতে গলা বাড়াইয়া দেখিতেছিলেন, কি কাতর স্বরে চেঁচাইয়া দয়িতকে যাইতে নিষেধ করিতেছিলেন, অমনি এক রাক্ষস তাঁহার গ্রীবায় গামছার মোড়া দিয়া হত্যা করিয়াছে। (আহা! নির্দ্দয়েরা মানব-চক্ষু ধরিয়া কোন্ প্রাণে তেমন কম্বুকণ্ঠে মোড়া দিল, ইহাই আশ্চর্য্য—অর্থ! তোরে ধিক!) ওদিকে দলস্থ অপর দস্যুগণ দৌবারিক ও দাসদাসীগণকে নিদ্রিতাবস্থাতেই মহানিদ্রায় পাঠাইল। বালককে বিস্মৃতই হউক, কি দেখিতে না পাউক, কি অগ্রাহ্যই করুক; যে কারণেই হউক, সৌভাগ্যক্রমে পিতৃ-প্রতিনিধি সেই ক্ষুদ্র প্রাণনিধিটী দনুজ হস্তে রক্ষা পাইয়াছে।

শকটস্থ দ্রব্য সম্ভার বাঁধিতে বাঁধিতে ফেলিয়া গিয়াছে এবং রাজকন্যার আভরণ অতি ত্রস্তভাবে লইয়াছে, ইহাতেই বিলক্ষণ বোধ হইল যে, তস্করদিগের কুকার্য্য শেষ না হইতেই অগ্রণী সৈনিকগণের অশ্ব-পদশব্দ শুনিয়া দুর্বৃত্তদল সহসা ব্যাঘাত পাইয়া পলায়ন করিয়াছে। আহা! একটু আগে যদি অশ্বারোহীদল আসিত, তবে হয় তো অমূল্য প্রাণগুলি রক্ষা পাইত। তাহা হইবার নয়, সুতরাং যাহা হইবার তাহাই হইল!

তাহা তো হইলই। কিন্তু যদি অগ্রগামী সৈনিকেরা উপেক্ষা না করিয়া পথের মধ্যস্থল হইতে (যেমন কর্ণেল আসিয়া করিলেন) শকট সরাইতে [illegible] করিত বা যথোপযুক্ত চেষ্টা পাইত, তবে হয়তো চোর ধরা পড়িত—তখনও দুষ্টদল অদূরে। কর্ণেল বাহাদুর এইরূপ সিদ্ধান্ত

করিয়া সৈনিকগণকে তাহাদের অসাবধানতা দোষের দণ্ড দিতে সঙ্কল্প করিলেন।

আর একটী তর্ক উঠিল। শকটগামীদের মধ্যে যাহারা অদৃশ্য হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল, তাহারা যদি যথার্থই অদৃশ্য হইয়া থাকে, তবে তাহারা কোথায় গেল? চতুর্দ্দিকে সন্ধানের তো ত্রুটি হয় নাই—আতি আতি পাতি পাতি সন্ধান হইয়াছে। যদি হত হইত, অবশ্যই মৃতদেহ পাওয়া যাইত। যদি লুকাইয়া থাকিত, তবে পরক্ষণেই দেখা দিত। তবে ইহারা কোথায় গেল?

তাহাদের প্রতিও জনৈক বিজ্ঞ হাওলদারের সন্দেহ হইল। গামছা-মোড়ার দলভুক্ত লোক দাস দাসী সাজিয়া বড়লোকের সঙ্গী হয়, সুযোগ পাইলেই সর্ব্বনাশ ঘটায়। অথবা পূর্ব্বে ভাল ভৃত্য ছিল, পরে পাপাত্মাদের প্রলোভনে পড়িয়া তাহাদের দুষ্কার্য্যের সহায় হয়, এমন দৃষ্টান্তও অনেক দেখা গিয়াছে; এই কথা রঘুবর হাওলদার স্বীয় প্রভু দৌলীন সাহেবকে বলাতে তাহারই পরামর্শক্রমে তাঁহারা সকলেই পশ্চাদ্বর্ত্তী চটীর দিকে পুনর্ব্বার ফিরিয়া চলিলেন। শবগুলিও শকটে পুরিয়া সঙ্গে লওয়া হইল।

চটিতে গিয়া তাবৎ দোকানদারকে ডাকাইয়া শবগুলি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কাহার গৃহে এই মৃত ব্যক্তিরা গত রাত্রে বাসা লইয়াছিল?" সকলেই ভয়াকুল চিত্তে যথার্থ ব্যক্তিকে নির্দ্দেশ করিয়া দিল। সে দোকান-দার খুনের দায়িত্ব শঙ্কায় কম্পান্বিত কলেবরে যোড়করে কাঁদিয়া কহিল "দোহাই হুজুর! আমি কিছুই জানিনা—পথিক লোক আসিলে দোকানঘরে বাসা দিই, তাহারা আপনারা পাক শাক করিয়া খায়, আমার অন্ন কি মিষ্টান্ন কিছুই খায় না যে, আমি তাহাদিগকে বিষাক্ত খাদ্য দিব! এ কর্ম্মে বুড়া হইলাম, জিজ্ঞাসা করুন, কখনই আমার মন্দ রীতিচরিত্র কেহই দেখে নাই।" ইত্যাদি।

কর্ণেল সাহেব অভয় দিয়া বলিলেন "তুমি শুদ্ধ এই জানাও, এই রাজ-পুত্রের সঙ্গে কত পুরুষ কত স্ত্রী—কয়জন বা দ্বারবান, কয়জন বা দাস ও কয়জন বা দাসী প্রভৃতি ছিল?"

[illegible]দার ও প্রতিবাসী অন্য সব লোকের বিস্তারিত সাক্ষ্য [illegible] যে, মৃত দ্বারবান ও দাস দাসীগণ ব্যতীত আর একজন

বেহারা, একজন খুব চালাক পরিচারক এবং আর একটী অল্পবয়স্কা উচ্চ-শ্রেণীর পরিচারিকা ছিল। গত দিবস মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে রাজপুত্র সদলে ঐ দুখানি দীর্ঘ শকট যোগে চটিতে আইসেন। সমস্ত দিবাভাগ ও প্রায় সমস্ত রাত্রি চটিতেই অবস্থান করেন। রাত্রি সঙ্গে যাইতে তাঁহার মন ছিল না, কেবল সেই চালাক পরিজন, বিস্তর সাহস দিয়া মতান্তর ঘটাইয়াছিল। সেই লোকটীই যেন প্রভুর অধিকতর প্রিয় ভৃত্য, এমন বোধ হইয়াছিল।

আরও প্রকাশ পাইল, ঐ পরিচারক ও ঐ বেহারা বিপণীর অল্প দূরে একটা ক্ষুদ্র আম্রবন মধ্যে সন্ধ্যার পর বিরলে নানা পরামর্শ করিয়াছিল। তথায় তাহারা দুই জন মাত্র নয়, উদাসীন সন্ন্যাসীর ন্যায় আরো তিন চারি জন তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। সেই উদাসীনদল ঐ দিন মধ্যাহ্ন সময়ে চটিতে আসিয়া উক্ত আম্রবনের পার্শ্বে এক বটবৃক্ষ মূলে আড্ডা করিয়াছিল।

এই অনুসন্ধানের ফল আর কিছুই হইল না, কেবল এইটী ভাল-রূপে বুঝা গেল যে, "গামছামোড়া" দল-সংক্রান্ত ধূর্ত্ত তস্করেরাই কর্ম্মচারক ও বেহারা ও দাসী সাজিয়া হয়তো বহুদিন হইতে রাজপুত্রের বিশ্বাস জন্মাইয়া আসিতেছিল—তাঁহার উদার প্রকৃতি ও সদাশয়তাই তাহাদের পরম সহায় হইয়াছিল—কপট পরিচর্য্যায় তাহারা প্রিয় হইতে পারিয়াছিল। কোন রূপ প্রতিহিংসা কি কেবল মাত্র অপহরণই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, তাহা জানিবার উপায় হইল না। ইনি কোন্ দেশের কোন্ জাতীয় বীরপুরুষ, সে তথ্য পাইবারও উপায়াভাব। ভাবগতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই বুঝা গেল। বলদ, চালক, শকট ও দাস দাসী প্রভৃতি হিন্দুস্থানী, এই পর্য্যন্ত। তাঁহাদের দেহ বা বেশভূষাদিতে এমন বিশেষ লক্ষণ কিছুই নাই, যাহাতে সুবিস্তৃত হিন্দুস্থানের কোন্ ভাগ বা কোন্ রাজ্য তাহাদের জন্মভূমি, তাহার নির্দ্দেশ হয়। পেটিকা তোরঙ্গ ও বস্ত্রাদি সমুদয় খুলিয়া খুলিয়া তন্ন তন্ন রূপে দেখা হইল, পরিচয় দিতে পারে এমন কিছুই পাওয়া গেল না। কেবল একখানি পত্রের নিম্নার্দ্ধ অংশে দুই তিন খানি হীরা ও চুণী ও একটী বড় মুক্তা জড়ানো ছিল, সেই লিপিখণ্ড ব্যগ্রভাবে পড়ানো হইল। সে পত্র পারসীতে লেখা। ভাগ্যক্রমে সে ভাষা পড়িতে জানে, এমন লোক চটিতে ছিল। পঠিত ও অনুবাদিত হইলে, তাহার মর্ম্মার্থ এই ;—

"দরবারের চেহারা বড় ভয়ানক। এই বেলা সাবধান হউন। অন্য সাবধান আর কি, পত্র পাঠ মাত্রই ইংরাজ রাজ্যে পলায়ন করুন। যত গোপনে, যত অল্প লোক লইয়া, যত সামান্য ভাবে যাইতে পারেন, ততই মঙ্গল। কদাচ অগ্রাহ্য—কদাচ বিলম্ব করিবেন না। বল প্রকাশের সময় আছে। অধিক লিখিতে পারি না।" (স্বাক্ষর নাই)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সঙ্কল্প।

সর্ব্বপাতা বিধাতা যদি দয়া মায়ার সৃষ্টি না করিতেন, তবে তাঁহার জীব-সৃষ্টি একান্তই ব্যর্থ হইত। দয়া অপেক্ষা মায়ার কার্য্য আরো আশ্চর্য্য। দয়া যাহার জন্য "আহা!" বলে, মায়া তাহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত! দয়া, সরোবরের জলের ন্যায় প্রায় সর্ব্বত্র প্রাপ্য; মায়া, অমৃত প্রস্রবণের ন্যায় কেবল পিতৃ-মাতৃ হৃদয়-রূপ পবিত্র স্থানেই প্রবাহিত!

"দয়া, মায়া; দুটী ব'ন্,
একঠাঁই থান্ শো'ন্।
* * * *
মায়া বলে, 'বল ভাই,
কোন্‌খানে আগে যাই?'
দয়া বলে, 'আছে ঠাঁই,
তার মত আর নাই—
কচি ছেলে কোলে যার,
বুক জুড়ে, ব'সো তার।
* * * *

মা বাপে স্নেহ শিখায়ে,
সন্তানে প্রাণে বাঁচায়ে,
তুমি থাক হ'য়ে ধাই,
জগতে আমি বেড়াই !"

পদ্যমালা। ১ম ভাগ, ১ম মুঃ।

অনাথ শিশু দেখিলে কাহার না দয়া হয় ? দয়ালু দ্বৌলীনের মনে আগে-দয়াই হইয়াছিল। কিন্তু দয়াময় ঈশ্বর দেখিলেন, ঈদৃশ অবস্থায় ঈদৃশ অসামান্য শিশুকে সুমানুষ করিয়া তোলা শুদ্ধ দয়ার কাজ নয় ! অতএব অনপত্য দ্বৌলীনের হৃদয়াভ্যন্তরে এমন মায়ার সঞ্চার করিয়া দিলেন যে, সেটী সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন বিশুদ্ধ অপত্য-স্নেহই হইয়া উঠিল !

নিঃস্বার্থ ভাব জগতে কৈ ? কেউবা যশের—কেউবা পরকালের উদ্দেশে দয়া মায়া করে। নিদান পক্ষে নিজের তৃপ্তি-সুখের আকাঙ্খাও থাকে। দ্বৌলীনের অন্তস্তলে হয় তো এভাবও ছিল যে, "আমার তো সন্তান হইল না, অপত্য-মুখাবলোকনের চির-সাধ নিষ্ফল দেখিয়া প্রবল দুঃখানল ভোগ করিতেছিলাম। প্রাত্যহিক ভজনাকালে কতই কামনা করিয়াছি ! ঔরস-পুত্র-দান পরমপিতার বিধান নয়। বুঝি ভক্তবৎসল ভগবান সেই প্রার্থনার উত্তরে যত্ন ব্যতীত আ'জ্ এই কুমার রত্ন আমায় পুরস্কার দিলেন। এ যেন এক প্রকার তাঁহার সাক্ষাৎ আজ্ঞা ! নচেৎ প্রাণই বা এত উৎসুক, এত উৎফুল্ল, এত আসক্ত, এত স্নেহার্দ্র হইবে কেন ? তবে তো অণুমাত্র অবহেলা করা অকর্ত্তব্য !"

ক্ষণপরে আবার ভাবিলেন, "এই অপোগণ্ডের নিমিত্ত আমার অন্তরে যে মহামায়ার উদ্রেক দেখিতেছি, ঔরস-পুত্রে কি ইহার অপেক্ষা বেশী হয় ? বোধ করি নয়। অন্যের ভাব বুঝিব কিসে, কিন্তু আমার তো আর কাহারো প্রতি কোন সময়ে কোন অবস্থায় এত দূর হয় নাই। আহা ! মুখখানি যত দেখি, মধুর বোল যত শুনি, হৃদয়ে যত রাখি, ততই অজ্ঞাত-পূর্ব্ব অননুভূত অনির্ব্বচনীয় কি যেন কেমন ভাব উদয় হয়।"

প্রত্যহ শিবিরস্থ শয্যায় বসিয়া বা শুইয়া আবার চিন্তা। শেষ মীমাংসা এবং শেষ সঙ্কল্প এই ;—"আমার তো পুত্র নাই, ইহারও পিতা-মাতা নাই,

আমার স্বদেশস্থ ও স্বশ্রেণীস্থ জ্ঞাতি কুটুম্বও নিকটে নাই—যে কাপ্তেন ও যে লেফ্‌টেনাণ্ট সাহেব সঙ্গে আছেন, নিষেধ করিয়া দিলেই হইবে, তাঁহারা এই কুড়াইয়া পাওয়া ছেলের কথা প্রচার না করেন। বিবী ডোলীনকে লইয়া এই পুত্র সঙ্গে কিছুকাল অন্য দেশে ভ্রমণ করিতে পারিলেই আত্মজ অপত্য কি না কেহ জানিতেও পারিবে না—বড় হইয়া পুত্রেরও জানিবার সম্ভাবনা রাখিব না—পুরাতন ভৃত্যাদিকে পেন্সন ব্যবস্থায় বিদায় দিব। অথবা তাহারা তো এদেশের লোক—সে দেশে তো যাইবে না।—হিন্দু-সন্তান হইয়াও আমার সৌভাগ্য বা জগদীশ্বরের দুর্ভেদ্য লীলাবশে আকারে ইহাকে ইউরোপীয় শিশু হইতে বিশেষ করিবার লেশমাত্র উপায় নাই। পৈতৃক বিষয় এবং অবিশ্রান্ত শ্রান্তিজনিত স্বোপার্জ্জিত এত যে ধন, এসব ভোগ করিবে কে? দূরতর সম্পর্কের কোথাকার কে—তদপেক্ষা ইহাই শ্রেয়!”

এই বলিয়া অতিশয় চাঞ্চল্য বশতঃ শয্যা ত্যাগপূর্ব্বক প্রায় দিগম্বর বেশেই বাহিরে যাইতে উদ্যত! পুরাতন ভৃত্য প্রকারান্তরে স্মৃতিকে জাগরূক করিয়া দিল—তাহাতেই নিস্তার—লজ্জা মান রক্ষা পাইল!

সৈন্য-শিরে যাইতে যাইতে পথিমধ্যেই এই মহা সঙ্কল্পকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আরো দৃঢ়ীভূত করিয়া দ্রুতকুচে কলিকাতায় চলিলেন। পলায়ন-পরায়ণ বিপক্ষ চমূর পশ্চাদনুসরণ কার্য্যে যেরূপ প্রখরগতি আবশ্যক, অনর্থক তদ্রূপ খরকুচ দেখিয়া সামরিকগণ বিস্ময়াভিভূত হইল। কিন্তু তিনি তাহাদের পরীক্ষিত প্রভু—সাবধানী, বিবেচক, স্নেহশীল পরিচালক, সুতরাং তাহারা দ্বিধা না ভাবিয়া, দ্বিরুক্তি না করিয়া, তাঁহার ইচ্ছামত গমন-বেগের কষ্ট স্বীকার করিল।

বিশেষ কারণে আমাদের বর্ণনার বেগও এক্ষণে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত খরতর হওয়া আবশ্যক হইতেছে। অতএব এই প্রথম কাণ্ডের পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ কয়টীতে পাঠক যাহা পড়িবেন, তাহা এই আখ্যায়িকার প্রয়োজনে অবশ্য-জ্ঞাতব্য, কিন্তু দৌড়কুচের বর্ণনা, সেটী যেন না ভুলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুখের আদ্য জীবন।

শিশু অতি রমণীয় পদার্থ; শৈশব অতি মধুর রসাল কাল; তাৎকালিক হাব ভাব, ক্রীড়া কৌতুক, আধ আধ ভাষা নিতান্তই মনোরঞ্জক। পড়া শুকপাখীর ন্যায় অর্দ্ধস্ফুট অল্প কথাতেই শিশু যেন বহুভাষী; মৃগশাবকের ন্যায় মনোহর চঞ্চল; অর্দ্ধসুপ্ত অদ্ধজাগ্রতের ন্যায় সর্ব্বদাই সরল; আংশিক জড়ভরত আংশিক তত্ত্বদর্শী পরমহংসের ন্যায় নিতান্তই অকপট। কিন্তু তাই বলিয়া শিশুর জীবন-ব্যাপারে এমন কি আছে যে, বহুবর্ণনার বিষয় হইতে পারে? যত শিশু, যত বালক, ইতরপ্রাণীর ন্যায় প্রায় সকলেরই সম লক্ষণ—দুই একটার স্বভাবাদি পর্য্যবেক্ষণ করিলেই প্রায় সকলেরি জীবন-ব্যাপার দেখা সিদ্ধ হয়। অতএব দৌলীন সাহেবের পালিত পুত্র ক্ষুদ্র দৌলীনের বাল্যকাল আর কি বর্ণনা করিব? কেবল তাঁহার পালক পিতা ও পালিকা মাতা তাঁহার লালন পালন ও ভাবী জীবন গঠনের জন্য যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তাহারই স্থূল স্থূল মূল বৃত্তান্ত মাত্র সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে, কর্ণেল সাহেব প্রাপ্ত শিশুকে আত্মজ-রূপে লালন পালন ও সমাজে তাহার তদ্রূপ পরিচয় প্রচলন করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু ফৌজের সঙ্গে তিনি যদি কলিকাতা পর্য্যন্ত যান, তবে সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। কলিকাতায় বিবী দৌলীন স্বজাতীয় বহু আত্মীয় ও বান্ধব মণ্ডলীতে বেষ্টিত আছেন; তথায় তিনি সহসা পুত্রের প্রসূতী সাজিতে পারেন না—তথায় এ গুপ্ত রহস্য কদাচ অপ্রকাশ্য থাকিবার নয়। অতএব পুত্র লইয়া আপনাকে যাহাতে কলিকাতায় যাইতে না হয়, অথচ তাঁহার পত্নী আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিতা হইতে পারেন, কর্ণেল দৌলীন সেইরূপ উপায় স্থির করিলেন।

প্রথমতঃ তাহার নিম্ন পদস্থ প্রধান কর্ম্মচারীর অধ্যক্ষতায় সৈন্যগণকে রাজধানী [illegible] পাঠাইয়া দিয়া আপনি অপ্রকাশ্য ভাবে নব-প্রাপ্ত পুত্রের সহিত স্থানান্তরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কোন প্রকৃষ্ট হেতুবাদ দর্শাইয়া

কলিকাতাস্থ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে দীর্ঘ বিদায়ের অনুমতি আনাইলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহার গোপনীয় পত্রের নিয়োগানুসারে কাহাকে বিশেষ কিছু না কহিয়া চিন্তা অথচ বিস্ময়ে ব্যথিত হৃদয়ে যত শীঘ্র সম্ভব, কলিকাতা হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিতা হইলেন। পতিমুখে আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত এবং পতির মনোগত ভাবাভিপ্রায়, অভিলাষ, ও যুক্তি পরম্পরা শুনিয়া আরো বিস্ময়ান্বিতা হইলেন। তিনি চিরদিন স্বামীর একান্ত বশবর্ত্তিনী; তথাপি এ প্রকার প্রস্তাবে সহসা সম্মতা হইতে বড় একটা মন বাঁধিতে পারিলেন না। অথচ সে ভাব তখন প্রকাশও করিলেন না। কোন কিছুই উত্তর না দিয়া অগ্রে শিশুটীকে দেখিতে চাহিলেন। কথাটা আর কিছুই না, হিন্দু-সন্তান বলিয়াই অনিচ্ছা। কিন্তু যেইমাত্র সেই হিন্দু-শিশুর মুখরাবিন্দ ও আকৃতি প্রকৃতি নয়নগোচর হইল, অমনি তাপ-প্রাপ্ত হিমশিলার ন্যায় সে অরুচি দ্রবীভূত হইয়া গেল!

সেই অবধি সেই অনাথ শিশু এই দম্পতিতে মৃত পিতা-মাতাকে যেন পুনর্জ্জীবিতবৎ প্রাপ্ত হইল। কর্ণেল সাহেব সুদীর্ঘ কালের নিমিত্তই বিদায় লইয়াছিলেন. এক্ষণে কালগৌণ না করিয়া স্ত্রী-পুত্র সমভিব্যাহারে আফ্রিকা, আসিয়া ও আমেরিকার যে সকল অংশে তাঁহাদিগকে কেহ চিনিত না বা কাহারো চিনিবার সম্ভাবনা ছিল না, সেই সমস্ত ভূভাগে সর্ব্বদাই স্থান পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক অবস্থান বা ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

কয়েক বৎসর পরে স্বদেশে—ইংলণ্ডে—গমন করিলেন। জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় বন্ধু তাঁহাদিগকে বহুদিনের পর পাইয়া, বিশেষ তাঁহাদের একটী সুসন্তান হইয়াছে দেখিয়া, মহা আনন্দিত হইলেন। পাছে কোন সূত্রে প্রকাশ পায়, সে সম্ভাবনা ঘুচাইবার নিমিত্ত কর্ণেল সাহেব ভৃত্যাদি পরিচারক বর্গকে নানাস্থানে বার বার পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। কেবল শিশুর স্নেহবতী ধাত্রী মাত্র পরিত্যক্ত হয় নাই—নানা সদ্ব্যবহারে সে দেখাইয়াছিল যে, তাহার দ্বারা বিশ্বাসভঙ্গের আশঙ্কা জন্মিতে পারে, এমত পাত্র সে নয়—বিশেষ বহু অর্থ, বহু মান, বহু পুরস্কার, বহু যত্নলাভে তাহার হৃদয় মধ্যে প্রভু দম্পতির প্রতি অবিচলিত ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা এবং বালকের প্রতি অসীম স্নেহ মমতা যথার্থই জন্মিয়াছিল—সে যথার্থই এই 'সব' বন্ধন-

পাশে নিতান্তই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং তাহার জন্য কিছুমাত্র আর ভয় ভাবনা হইত না।

প্রথমে বিবী ডোলীন নিজেই পুত্রের শিক্ষা দিতেন। তাহার বয়োবৃদ্ধি সহকারে বিদ্যালয়ে ও গৃহে উপযুক্ত অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক যথোপযুক্তরূপেই অধ্যাপনা চলিতে লাগিল। বালকের অধ্যবসায়, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, মেধা ও নানা সদ্গুণ দর্শনে শিক্ষক ও বান্ধবগণের সহিত ডোলীন-দম্পতি মহা সুখী হইলেন। কর্ণেলের প্রথম বিদায়কাল পূর্ব্বেই পূর্ণ হইয়াছিল, আবার তাহার বিস্তারের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া বৎসর পাইয়াছিলেন, অধুনা তাহারও অবসান হইয়া আসিল। কাজেই তাঁহাকে সস্ত্রীক আবার ভারতে প্রত্যাগমন করিতে হইল; যুবা ডোলীন ইংলণ্ডে বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত থাকিলেন। কালে, নিম্ন বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্তির পর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধ্যয়ন পূর্ব্বক পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া উচ্চশ্রেণীর উপাধিও পাইলেন। কিন্তু উপাধি তো সামান্য কথা, যদি হিতাহিত জ্ঞানলাভ ও সেই জ্ঞানানুযায়ী আচরণ অভ্যাস, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা যে উচ্চতম ধাতুর এবং পরিশ্রম যে সর্ব্বতোভাবে সার্থক হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই।

তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। ইউরোপীয় রীত্যনুসারে তাঁহার শৈশবাবস্থাতেই "ইংলণ্ডীয় চর্চ্চ" নামক ধর্ম্মসমাজে তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়। অর্থাৎ যাহাকে খৃষ্টানদিগের নামকরণ অনুষ্ঠান (Christening) বলে, তাহাই হইয়াছিল। "হেনেরি ডোলীন" তাঁহার তাৎকালিক নাম। তিনি বাল্যাবধি ঈশ্বরে প্রীতি-পরায়ণ—ধর্ম্মে ও ধর্ম্মনীতিতে বিশেষ আস্থাবান। কিন্তু কখনই অন্ধভাবে গোঁড়া খৃষ্টান ছিলেন না। তাহাতেই উপযুক্ত কালে যুক্তিবলে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের রূপান্তর সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন, অর্থাৎ পাঠদ্দশার শেষকালে এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগের পর বিভিন্ন ধর্ম্মমত-বিচারক গ্রন্থাবলী ও উচ্চ অঙ্গের দর্শন শাস্ত্রাদির আলোচনা দ্বারা তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি কুসংস্কারের জড়তাজাল হইতে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা লাভ করিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে কোন কোন সুপ্রসিদ্ধ একেশ্বর-বাদী, দার্শনিক মহাশয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ [illegible]। তাঁহাদের সমাজে সর্ব্বদা গতিবিধি, উপদেশ শ্রবণ ও

প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা করিবার সম্পূর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত হন। তৎফল স্বরূপ তদবধি তিনি অবতার-বাদ ও অভিব্যক্তি-বাদের সংস্কার ত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃত প্রস্তাবে একেশ্বরবাদ অর্থাৎ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিই বিশ্বাস স্থাপন করিলেন।

তিনি তখন অষ্টাদশ বর্ষীয়। কিন্তু শ্রীমান্, দীর্ঘবপু ও বলীয়ান দেহের তেজস্বিতা বশতঃ তাঁহাকে যেন বিংশতি বৎসরের সুস্থ যুবা পুরুষ বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার পিতা তখন ভারতবর্ষে আরো উচ্চপদস্থ—আরো সম্ভ্রান্ত—আরো ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার পঠদ্দশার মধ্যে তাহার পিতা মাতা আর দুই একবার ইংলণ্ডে গিয়া তাঁহার সহিত পরম সুখে কিছুকাল যাপন করিয়া আসিয়াছেন। এখন আবার তাঁহাকে কোনরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা তৃতীয়বার স্বদেশ গমন করিলেন।

পিতৃ-প্রভাবে এই অষ্টাদশ বর্ষ বয়সেই তিনি ইংলণ্ডীয় সৈনিক কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত হইলেন। ভারতবর্ষে প্রেরিতব্য সৈন্য শ্রেণীতেই তাঁহার নিয়োগ হইল। কিন্তু একেবারেই তাঁহার ভারত-যাত্রা ঘটিল না। অদ্বিতীয় প্রতাপান্বিত দিগ্বিজয়ী ফ্রেঞ্চসম্রাট্ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ইউরোপে তখন কালান্তক মহাকালের ন্যায় সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন; সেই দুর্দ্দম্য দিগ্বিজয়ীর দমনার্থ ইউরোপীয় রাজগণ দলবদ্ধ হইয়া নানা দিকে অসংখ্য সংগ্রাম করিতেছিলেন, ফ্রেঞ্চ সম্রাটের প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে ইংলণ্ড সর্ব্বপ্রধান। সুতরাং ব্রিটিস সাম্রাজ্য মধ্যে যেখানে যত সৈন্য সমাবেশিত হওয়া সম্ভব, সে সমস্তই এবং ইংলণ্ডদ্বীপ হইতে বহু চমূ ইউরোপ মহাদ্বীপে প্রেরিত হইতেছিল। জর্ম্মনীতে যাঁহাদের পাঠান হয়, যুবা দ্বৌলীনের রেজিমেণ্টও তন্মধ্যে সন্নিবিষ্ট ছিল। এই ঘটনায় নব নায়কের পরমাহ্লাদ হইল; যেহেতু তাঁহার সৈনিক জীবনের প্রারম্ভেই তিনি মহা সংগ্রামের রঙ্গভূমির জনৈক অভিনেতা হইতে পারিলেন। যে জগদ্বিখ্যাত "ওয়াটারলু" যুদ্ধক্ষেত্রের ন্যায় মহাযুদ্ধ ভূমণ্ডলে অল্পই হইয়াছে—যে প্রসিদ্ধ সমরাঙ্গনে বীরেন্দ্র বোনাপার্টের ইন্দ্রত্বের অবসান ঘটে—যে ভীষণ আহবে জয়ী হইয়া ইংলণ্ডের ও ইংলণ্ডের অতুল্য অধিনায়ক ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন বীরপ্রবরের খ্যাতি প্রতিপত্তি অসাধারণ[illegible] চতুর্দ্দিকে

পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠে—সেই চির-প্রসিদ্ধ ওয়াটারলুর মহাযুদ্ধে আমাদের যুবা ধৌলীন আশাতিরিক্ত রণনৈপুণ্য ও অসীম সাহস প্রকাশ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং তত অল্প বয়সে তত অল্প দিন মাত্র কাজ করিয়াই এক ধাপ উচ্চপদে আরূঢ় হইতে পারিলেন—এন্‌সাইন ছিলেন, লেফ্‌টন্যাণ্ট হইলেন।

নেপোলিয়ান হতবল হইলে লেঃ দ্বৌলীনের রেজিমেণ্ট ভারতে প্রেরিত হইল। সুতরাং সেই সঙ্গে তিনিও আইলেন—সপ্তদশ বর্ষ পরে পুনর্ব্বার স্বীয় জন্মভূমিতে আইলেন—তাঁহার অজ্ঞাতসারেই তাঁহার স্বীয় মাতৃভূমিকে কর্ম্মভূমি রূপে প্রাপ্ত হইলেন! ভারতে আসিয়াই সত্বর বড় বড় যুদ্ধে লিপ্ত হইতে পারিলেন। তখন মহারাষ্ট্রভূমে মহা রণ চলিতেছিল। বাঙ্গালা ১২২৪।২৫।২৬ (খৃঃ ১৮১৭, ১৮ ও ১৯) সালে মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ-সমূহে তিনি অত্যন্ত সাহসিকতা ও দক্ষতা প্রকাশ করাতে পদোন্নতি পাইয়া কাপ্তেন হন। পরে কতিপয় বৎসর তদ্রূপ যশের সহিত বহুবিধ কর্ত্তব্য পালন এবং ১২৩৩ সালে সুপ্রসিদ্ধ ভরতপুরের দুর্ভেদ্য দুর্গাধিকার সময়েও বিশেষ রণ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করাতে ক্রমে (অধিক বয়স্ক না হইয়াও) মেজরের পদ পর্য্যন্ত পাইতে পারিয়াছিলেন।

পিতা মাতার প্রতি এক দিনের জন্যও তিনি শিথিলানুরাগ হয়েন নাই—যাঁহার শিরায় হিন্দু-শোণিত, সে ব্যক্তি কি প্রাণ থাকিতে তাহা হইতে পারে? এতাবৎকাল আপনার প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে পারেন নাই। ইঁহারা যে বাস্তব জনক জননী নহেন, তাহা তাঁহাদের ব্যবহারে, বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিবার মতন কোন লক্ষণও দৃষ্ট হইত না। কেবল তাঁহার বাল্যাবস্থায় ধাত্রীর বদনস্খলিত (বোধ হয়, তাহার, ভ্রান্তিজনিত) কোন কোন কথায় কিঞ্চিৎ যেন আভাস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তখন গ্রাহ্য করেন নাই—কেনই বা সহসা করিবেন? আমাদের নায়কের তখন কি সুখের আদ্যজীবন!

পঞ্চম অধ্যায়।

—:•:—

"সকলই পরিবর্ত্তন—কিছুই নিত্য নয়।"

মেজর দৌলীনের ক্রমশঃ অভ্যুদয় হইতে লাগিল। কর্ণেল দৌলীনের ক্রমশঃ পরিণত অবস্থা উপস্থিত হইল। তিনি সম্মানের সহিত বৃত্তি (পেন্সন লাভপূর্ব্বক কর্ম্মক্ষেত্র হইতে এককালে অবসর লইয়া সস্ত্রীক স্বদেশ যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে পুত্রকে বিস্তর হিতোপদেশ দিলেন; প্রধান পদস্থ কর্ম্মচারিগণকে তাঁহার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিলেন—স্বয়ং সেনাপতি মহাশয়ের হাতে হাতে তাঁহাকে সঁপিয়া দিয়া বিদায় কালে চক্ষুর জলে ভাসিয়া ও ভাসাইয়া চলিয়া গেলেন। যদি এই কয়টী পরিচ্ছেদে সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সংকল্প না থাকিত, তবে বিদায়ের প্রকৃত অবস্থা পাঠ করিয়া পাঠকও চক্ষুর জল না ফেলিয়া থাকিতে পারিতেন না। পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি, এই প্রথম কাণ্ডের এই কয়টী পরিচ্ছেদ কেবল ভূমিকা স্বরূপ, সুতরাং দ্বিতীয়ভাগ যতক্ষণ না দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে, ততক্ষণ পাঠক মহাশয়কে মূল বিষয়ের স্থূল বৃত্তান্ত পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

প্রাচীন কর্ণেল সস্ত্রীক পোতারোহণ করিলেন। পথে পোতমধ্যেই ঘোর বিপদ—বিবী দৌলীন একপ্রকার অপস্মার ব্যাধিতে অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া লোকান্তর গমন করিলেন!

এই আশাতিরিক্ত আকস্মিক দুর্ঘটনাতে কারুণ্য-প্রবণ কর্ণেলের হৃদয় মর্ম্মান্তিক ব্যথা প্রাপ্ত হইল। শেষ বয়সে গৃহশূন্য হওয়া, আর বাস্তবিক অর্দ্ধাঙ্গ বর্জ্জিত হওয়া, একই কথা—যাঁহাদের পোড়া কপালে তাহা ঘটিয়াছে, তাহারা ভিন্ন অন্য কেহ সে নিদারুণ মর্ম্ম-বেদনার অংশমাত্রও অনুভব করিতে পারিবেন না।

প্রাচীন বাঙ্গালীরা বলেন "স্ত্রীর মতন বৃদ্ধকালে তেমন সেবা ভক্তি আর কে করিবে? এই জন্যই বার্দ্ধক্যে স্ত্রী-বিয়োগ দুঃখ বুকে এত বাজে!" ইহা আংশিক সত্য হইলেও নিতান্ত স্বার্থমূলক ভাব!

প্রেমভক্ত মহাশয়েরা বলেন "বৃদ্ধকালে ইন্দ্রিয়াসক্তি-শূন্য পরম পবিত্র প্রেম—উচ্চদরের উদার প্রেম সঞ্চিত হয়—দুধ মরিয়া ক্ষীর হওয়ার

ন্যায় যৌবনের চঞ্চল প্রেম নিশ্চল ও নির্ম্মল ভাব ধারণ করে, এমন বিশুদ্ধ প্রেমাধার নষ্ট হওয়াতেই যৌবনাপেক্ষা অধিকতর অনর্থ ঘটায়।

কিন্তু ছলগ্রাহী খল জনেরা বলে "বুড়ী বৈ বুড়ার উপায় কৈ? কোন্ যুবতী তাঁহার প্রেম-পুষ্পের শুষ্ক দলের ঘ্রাণ লইতে আসিবে? কাজেকাজেই বৃদ্ধলোকের জায়ার প্রতি মায়া কিছু অতিরিক্ত হয়!"

যা সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হউক, প্রাচীন কর্ণেল সাহেব মর্ম্ম বেদনায় জর্জ্জরিত হইয়া দেশে গিয়া মহা যন্ত্রণায় বাস করিতে লাগিলেন। পুত্রও যথাকালে মাতৃবিয়োগের সংবাদ পাইয় মহা শোকাকুল হইলেন। পিতা পুত্র উভয়েই প্রতি মেইলে পত্র বিনিময় দ্বারা একজন স্নেহের, অপরে ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

কর্ণেলসাহেব পুত্রের বিবাহ জন্য সর্ব্বদাই চিন্তাকুল। ভ্রাতুষ্কন্যা সম্পর্কীয়া এক যুবতীকে মনে মনে পুত্রবধূত্বে বরণ করিলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার পুত্র ইংলণ্ডে অবস্থান কালে এই যুবতীকে সর্ব্বদা দেখিয়াছেন, যুবতীও মেজরকে বিলক্ষণ জানেন—কর্ণেলের নিজ বাটীতে ও যুবতীর পিতার ভবনে উভয়ের বহুবিধ আলাপ সম্ভাষণাদি হইয়াছে। কর্ণেল দ্বৌলীন এই জন্য ভাবিলেন, তাঁহারা উভয়েই অনায়াসে সম্মত হইতে পারিবেন। যুবতী তাঁহার পৈতৃক বিভবের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। এই একমাত্র প্রবল হেতুতেই তাঁহার নয়নে তরুণী অসামান্যা রূপ-গুণবতী!

উক্ত বিভব ও যৌতুকাদি লাভঘটিত নানা যুক্তিযুক্ত একখানি দীর্ঘ পত্র পুত্রকে লিখিয়া পাঠাইলেন। ভাবিলেন, এত আকর্ষণে পুত্র অবশ্যই আকৃষ্ট হইবে। তাঁহার নিজের সম্পত্তিও সামান্য নয়, হেনেরি দ্বৌলীন সে সমস্তের একমাত্র উত্তরাধিকারী, সুতরাং ভ্রাতুষ্কন্যার চিত্তাকৃষ্ট হইবার আকর্ষণও সামান্য নয়। অতএব আকার ইঙ্গিতে স্বীয় মনোগত অভিপ্রায় ভ্রাতুষ্কন্যাকেও জানাইতে ত্রুটি করিলেন না।

কিন্তু সরল সেনানায়কের পক্ষে মানব-হৃদয়-তত্ত্ব, বিশেষ নারীচরিত্র, জানা এবং সভ্য ইউরোপের "কোর্টসিপ" মূলক স্বেচ্ছাধীন বিবাহের পাকা ঘটক হওয়া যে একপ্রকার অসঙ্গত ব্যাপার, তাহা তিনি ভাবিলেন না। আপনার মনে যে যে কারণে এই পরিণয় উপযুক্ত ও উচিত বোধ হইয়াছিল,

অন্তেও সেইরূপ বুঝিবে, ইহাই তাঁহার ধারণা হইল। অতএব পুত্রের প্রত্যুত্তর প্রাপ্তি আশায় অধৈর্য্য হইয়া রহিলেন।

যথা কালে সে উত্তর পাইলেন। তাহার মর্ম্মার্থ "আপনি আমার শুভ কামনায় যাহা যোগ্য ও কর্ত্তব্য বিচার করিবেন, তাহাতে আমার অনিচ্ছা থাকিলেও বাধা দিতে পারি না—তাহাই আমার অবশ্য করণীয় জ্ঞান করিব।"

কর্ণেল যেরূপ প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তাহা হইল না—ইহাকে তো আহ্লাদপূর্ব্বক মত দেওয়া বলে না—যেন পিতৃভক্তি কর্ত্তৃক চালিত হইয়া পিতৃ-অনুরোধ-রক্ষা মাত্র হইতেছে। এ ভাব বুঝিতে পারিয়া পুত্র-হিতৈষী পিতা কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন। কিন্তু আগ্রহ টলিল না—আগ্রহ বলিল "যে একটুখানি অনিচ্ছা পত্রে প্রকাশ পাইতেছে, বিবাহের পর তাহা আর তিষ্ঠিতে পারিবে না।" অতএব শুভ সম্বন্ধ সুনিবন্ধ জন্য আর কালবিলম্ব বৈধ নয় ভাবিয়া কন্যার নিকট প্রস্তাব করিলেন। ইংলণ্ডে বরই প্রায় কন্যার নিকট প্রস্তাব করে—বরের পিতা নয়! কখন কখন বা বরের পিতা কন্যার পিতার নিকট তদ্রূপ প্রসঙ্গ তুলিয়া থাকে, কন্যার নিকট কদাচিৎ! কিন্তু ব্যগ্র-চিত্ত সরল কৌলীনের ধৈর্য্যশক্তি চিরকালই কিছু খর্ব্ব—সরল মাত্রই কিছু ব্যগ্র, কিছু অধৈর্য্য—তাহাতে এখন স্থবিরাবস্থায় সেই ছোট খাট ধৈর্য্যটাও স্থবিরবৎ আরো নিঃশক্তি হইয়াছে। সুতরাং ভাবী পুত্রবধূর নিকট পুত্রের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আপনিই করিলেন!

যুবতী সবিস্ময়ে সস্মিত বচনে সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন "ভাল, জ্যোঠা মহা-মহাশয়, আপনার পুত্র স্বদেশে আইলে যাহা হয় হইবে।"

কর্ণেল ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিবার লোক নহেন। তিনি জিদ করিতে লাগিলেন। তরুণী লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিতে বাধিতা হইলেন "ইংলণ্ডে পুত্রের হইয়া পিতা আসিয়া পূর্ব্বরাগ (Courtship) অনুষ্ঠানের প্রয়াস পান, তাহা পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই, আজ আপনিই দেখাইলেন।"

তথাপি স্থবির জ্যেষ্ঠতাত এই বলিয়া বুঝাইলেন "তুমি মত দিলে, আমি তাহাকে আসিতে বলি। ভাবিয়া দেখ, এই বিবাহ হইলে আমাদের অভিন্ন যুগল সংসার দৃশ্যতঃ আর কিছুমাত্র ভিন্ন থাকে না ও উভয় সংসারের সম্পত্তিও একীভূত হইয়া কি সুখেরই হয়!"

এইরূপে পুত্র-হিত-চিকীর্ষায় মহা ব্যস্ত আছেন—অবিলম্বে পুত্রবধূর

হইবে, অপর কাহারও কোনরূপ দাবি দাওয়া ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না, ইহাই সেই ক্রোড়পত্রের তাৎপর্য্য।

দ্বিতীয় পত্রে মেজর দৌলীনের আদ্যাবস্থামূলক ইতিহাস—যতদূর কর্ণেল দৌলীন জানিতেন।

তৃতীয় খানিতে নানা হিতোপদেশের সহিত পুত্রকে অনুরোধ যে, দ্বিতীয় লিপিখণ্ড পাঠ করিবার পরও তাঁহাকে যেন ঔরস-দাতা পিতা ভিন্ন কদাচ তিনি অন্য কিছু না ভাবেন এবং যে প্রচুর বিভব অর্পণ করিয়া যাইতেছেন, তাঁহার যেন সদ্ব্যবহার করেন।

পাঠান্তে খল-প্রকৃতি যুবক যুবতীর যেরূপ বিস্ময় ও আনন্দ হইল, পাঠক তাহা সহজেই বুঝিতেছেন। তৎক্ষণাৎ কুমন্ত্রণার বিশাল বিষচক্র একখানি নির্ম্মিত হইল। মেজরকে কর্ণেল দৌলীনের মৃত্যু সংবাদ সহিত কপট শোক-পত্র পাঠান হইল। কর্ণেল যে পুলিন্দাটী রাখিয়া গিয়াছিলেন, সে কথার বিন্দু বিসর্গও লেখা হইল না—সে গূঢ় কথা তৃতীয় কর্ণে গেল না!

সম্বাদ প্রাপ্তিমাত্র পিতৃভক্ত মেজর দৌলীন মহা শোকে আচ্ছন্ন হইলেন। অবিলম্বে সেনাপতির নিকট বিদায় লইয়া পোতারোহণ করিলেন। লণ্ডনে উপস্থিতির পর, অগ্রেই পরমাত্মীয়া পরম হিতৈষিণী খুল্লতাত-নন্দিনীর নিকট গিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমত অবস্থায় স্নেহবতী ভগ্নীর যাহা কর্ত্তব্য, তাহাতে ত্রুটি ঘটিল না। দৌলীন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বিদায় লইয়া স্বভবনে গমন করিলেন। অবিলম্বে পিতার স্মারণার্থিক কোনরূপ স্থায়ী দান বিধান ও সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ প্রভৃতি কর্ত্তব্য পালন করিয়া কিছু সুস্থ হইয়া প্রদেশ মধ্যে যেখানে পৈতৃক সম্পত্তি আছে, তথায় যাইবার মানস করিলেন। ইচ্ছা, স্বচক্ষে একবার সমুদয় দর্শন, প্রজাবর্গের সহিত আলাপ ও তাহাদের হিতজনক ব্যবস্থাদি করিয়া আসিবেন। এই মহদভিপ্রায়ে যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন, এমত সময় সেই ভূম্যধিকার হইতে তাঁহার পিতার বিশ্বাসী পুরাতন কর্ম্মাধ্যক্ষ সংবাদ পাঠাইলেন যে, কুমারী ইলাইজা দৌলীন, তাঁহার উকীলের দ্বারা ঐ কর্ম্মাধ্যক্ষকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, "মেজর দৌলীন নামে যে ব্যক্তি মদীয় জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র রূপে পরিচিত, তিনি তাহা নহেন। অতএব আমিই তাঁহার উত্তরাধিকারিণী। তাঁহার মৃত্যুকালাবধি

ভূ সম্পত্তি ও অর্থাদি সংক্রান্ত তাবদ্বিষয়ের হিসাবাদি তুমি আমাকে শীঘ্র বুঝাইয়া দিবে।" ইত্যাদি।

কর্ম্মাধ্যক্ষের লিখিত এই অদ্ভুত সংবাদ পাঠে দ্বোলীন আপনা আপনি হাস্য করিলেন। তিনি যে কর্ণেল দ্বোলীনের ঔরস-পুত্র ব্যতীত অন্য কিছু, একথা পাগলের কল্পনা ভিন্ন আর কি হইতে পারে, ইহা ভাবিয়াই হাসিলেন। ভাবিলেন, হিতাহিত-জ্ঞান-বর্জ্জিতা এই উন্মত্তার সহিত পিতা কি বলিয়া আমার সম্বন্ধ ঘটাইতেছিলেন?

তিনি আরও ত্বরা করিয়া জমীদারিতে গেলেন। কার্য্যাধ্যক্ষ, ভৃত্যবর্গ ও প্রজাগণ তাঁহাকে প্রভুপুত্র বলিয়াই ধ্রুব জানিত—অতি সচ্চরিত্র, সদাশয়, সদয় প্রভুপুত্র বলিয়া জানিত—তাঁহার অধীনতায় পরম সুখে থাকিতে পাইবে, এই উচ্চ আশাতেই তাহারা তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল, সুতরাং তাঁহাকে পাইয়া এবং তাঁহার উচ্চপ্রকৃতি দেখিয়া যারপর নাই আনন্দিত ও আশান্বিত হইল। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই নানা বিষয়ে সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্রজামণ্ডলীর করভার বহুলাংশে লাঘব করিয়া সকৃতজ্ঞ আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদের আস্পদ হইলেন। সৌজন্যে ও কারুণ্যে সকলেই সন্তুষ্ট—সকলেই নিতান্ত বশীভূত হইল।

সেখানে থাকিতে থাকিতেই ইলাইজার উকীলের এক পত্র তিনি পাইলেন। "আপনি কর্ণেলের পুত্র নন, তাহার প্রমাণ আমার নিকট আছে, অতএব বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করিবেন না, করিলে ভাল হইবে না।" ইহাই তাহার মর্ম্ম। দ্বোলীন উত্তর দিলেন "আপনাকে এমন কথা কে বলিয়াছে, তাহার মতিভ্রম হইয়াছে, সে বাতুল!"

লণ্ডনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শুনিলেন, বিচারালয়ে তাঁহার নামে অভিযোগ হইয়াছে। তিনি উকীল কৌন্সল নিয়োগ ও তাঁহাদের আনুকূল্যে উপযুক্ত উদ্যোগ করিয়া বিচারের দিন জয় প্রত্যাশায় ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইলেন।

কি সর্ব্বনাশ! মৃত মহাত্মা পিতার স্বহস্ত-লিখিত ইতিবৃত্ত বা স্বীকার-পত্রই তাঁহাকে পুত্রত্বে অস্বীকার করিতেছে! বিচারস্থলে ইহা যখন সপ্রমাণ হইল, তখন তাঁহার মস্তকে যেন অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল! তাঁহার পক্ষীয় ব্যবহারাজীবেরা তৎখণ্ডনের বিস্তর প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু ব্যর্থ—সব ব্যর্থ—যে অনর্থ ঘটিবার তাহা ঘটিল! দুরাত্মারা তাঁহার ধাত্রীর মুখ দিয়াও

প্রমাণ করাইল। মৃত কর্ণেল তাঁহার যে ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতেই ধাত্রীর কথা পড়িয়া কুচক্রী ধূর্ত্তদ্বয় তাহাকে সাক্ষী মানে। মেজর ডোলীনকে ধাত্রী প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসিত, তিনিও তাহাকে দ্বিতীয় জননীর ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রচুর অর্থ-সাহায্য করিতেন। ধাত্রী কি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার অনিষ্টকর সাক্ষ্য দিবার লোক? কিন্তু কি করে, বিপক্ষ কৌন্সিল যেন গলায় আঙল দিয়া প্রকৃত কথা বাহির করিয়া আনিল! শুদ্ধ তাহাই নহে, অবস্থানুযায়ী অন্য আনুষঙ্গিক প্রমাণেরও অভাব হইল না;—উক্ত বিবরণ পত্রিকায় লেখা ছিল যে, তাঁহার শৈশবের বসন ভূষণ ও তাঁহার পিতা মাতার বস্ত্রালঙ্কার হীরা চুণী প্রভৃতি তাঁহাদেরই তোরঙ্গ ও পেটিকাদি মধ্যে কর্ণেলের লণ্ডনস্থ বাসভবনের এক ক্ষুদ্র কুক্ষিতে চাবি বন্ধ রহিল, পুত্রের সন্তোষ ও স্মৃতি-সাহায্যার্থ তাহার এক বিন্দুও তিনি নষ্ট করেন নাই! এখন বিচারকের আজ্ঞাতে সেই কুঠারি খুলিয়া সেই সমস্ত দ্রব্য বিচারালয়ে আনা হইল। সকলে দেখিয়া নিঃসন্দেহ হইলেন—ডুলীনও নিঃসন্দেহ হইয়া, দস্যু কর্ত্তৃক হত পিতা মাতার উদ্দেশে অশ্রুবারি বর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না! এখন তিনি আপনি স্বেচ্ছাক্রমে পালক পিতার সমস্ত সম্পত্তি ইলাইজাব প্রাপ্য বলিয়া মুক্তকণ্ঠে সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করিলেন—বিচারকের আদেশে আপন ঔরসদাতা পিতা ও গর্ভধারিণী মাতার পরিত্যক্ত দ্রব্য ও রত্নাদি পাইলেন মাত্র! সুখের মধ্যে মোকদ্দমার খরচার নিমিত্ত আদালত তাঁহাকে দায়ী করিলেন না; যেহেতু তাঁহার বিশ্বাসানুসারেই তিনি মোকদ্দমা চালাইয়াছিলেন—যাঁহার দোষেই তাঁহার সেই ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল, তাঁহারই সম্পত্তি খরচার দায়ী হইল।

মনুষ্যের বুদ্ধিতে যতদূর সুবিচার হইবার, তাহা হইল; এবং লণ্ডন মহানগরের সকলেই বলিলেন "যথার্থ বিচার হইয়াছে!" কিন্তু আমরা তো জানিতে পারিতেছি যে, ধর্ম্মের দ্বারে এ বিচার বিচারই নয়—কেবল অধর্ম্মের কুহক চক্রে পড়িয়া ধার্ম্মিক বিচারক ও ধার্ম্মিক প্রতিবাদী প্রতারিত হইলেন! হায়, ভ্রান্ত মানবসমাজে এইরূপে অধর্ম্মের জয় নিত্য নিত্য কতই হয়—কত ধর্ম্মপরায়ণ সুজনগণ এইরূপে প্রতারিত হইয়া ধন, মান, প্রাণপর্য্যন্ত হারাইতেছেন, কে তাহার সংখ্যা করে? তবে এই একটু সুখ যে, অবশেষে ধর্ম্মের জয় প্রায়ই হয় এবং পাপের ফল প্রায়ই ফলে!

সে যাহাহউক, সহৃদয় পাঠক! আমাদের প্রিয় বন্ধু দোলীনের কি দশা ঘটিল, একবার ধ্যান করিয়া দেখুন;—সাক্ষাৎ পাপাবতার পাষণ্ড যুগলের নিদারুণ বিশ্বাস-ঘাতিতা ও দুর্ভেদ্য কুমন্ত্রণায় তিনি নিতান্তই পেষিত হইলেন—কোথায় ইংলণ্ডের একজন প্রধান ভূমাধিকারী এবং অতুল ঐশ্বর্য্যেশ্বর, না মুহূর্ত্তমধ্যেই এককালে পথের ভিকারী হইয়া পড়িলেন! যদি বলেন "পথের ভিকারী কেন?—চাকরী তো আছে?" এখনি ইহার উত্তর পাইবেন।

যদি কর্ণেল সাহেবের লিখিত বিবরণ-পত্রের সঙ্গে উইল ও তৎক্রোড়পত্র লোকের নয়নালোক প্রাপ্ত হইত, তবে হেনেরি দোলীন ঔরস-পুত্র না হইয়াও পালক পিতার ইচ্ছানুসারে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইতে পারিতেন—তবে আর ভণ্ড প্রবঞ্চকদ্বয়ের দুষ্টাভিসন্ধি কদাচ সিদ্ধ হইয়া উঠিত না। সে উইল ও ক্রোড়পত্র কি দুষ্টগণ বাহির করে? তাহা হয় তো নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে; সুতরাং বিচারক কি করিবেন? কর্ণেল কর্ত্তৃক তদ্রূপ উইল কি দানপত্র রাখিয়া যাওয়া সর্ব্বতোভাবে সম্ভব বটে এবং তাঁহার বাটীতে কুত্রাপি তাহা না পাওয়াতে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, সত্য; কিন্তু আইন তো সে বিস্ময়ের কথা শুনে না—আইনের যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করিল!

দুর্ভাগ্য দুলীন মনে মনে বুঝিলেন, "অবশ্যই ইহার মধ্যে কিছু নিগূঢ় আছে—আমাকে উত্তরাধিকারী না করিয়া পিতা যে এই স্বীকার পত্র মাত্র লিখিয়া দিয়া যাইবেন—ইহাতে যেন আমাকে বঞ্চিত করাই তাঁহার অভিপ্রায়; ইহা তো কখনই হইতে পারে না—স্বপ্নেও এ সন্দেহ আসিতে পারে না।" ফলতঃ তাঁহার হৃদয় প্রকৃত ঘটনার কাছাকাছি ভাব অনুভব করিতে অসমর্থ হইল না। কিন্তু লোকে সেরূপ অনুভব করিবে কেন? লোকে বরং ইহাই বুঝিল—ইহাই কল্পনা ও জল্পনা করিতে লাগিল যে, পরের ছেলের নিমিত্ত, বিশেষ ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন জাতীয় পুত্রের নিমিত্ত স্বীয় জ্ঞাতি-কন্যাকে বঞ্চিত করিতে কর্ণেলের ধর্ম্ম-বুদ্ধি শেষকালে স্বীকৃত হইল না, তাহাতেই কুমারী ইলাইজার নিকট সত্য ইতিহাস প্রকাশ ও তৎপ্রমাণমূলক স্বীকার-পত্র তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

যাহাই হউক, ভাগ্যহীন দোলীন নিরুপায়। কিন্তু তাঁহার মানসিক ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাদি বল অসামান্য ও অসীম—এই বাত্যাঘাতেও তাঁহার

সাহস মগ্ন হইবার নয়। তিনি ভাবিলেন, যদি যথার্থই আমি পালিত পুত্র বৈ আর কিছুই নই, তবে পালক পিতার সম্পত্তিতে আমার স্বত্বই বা কি? উত্তমই হইল—যাঁহার যথার্থ প্রাপ্য তাঁহার হইল, ভালই হইয়াছে, পরের দ্রব্যে লোভ করা অনুচিত—পর-ধনে ধনী হওয়া কাপুরুষত্ব! আপনার হস্ত আছে—বাহু আছে—প্রবল-প্রতাপ ব্রিটনেশ্বরের অধীন সম্ভ্রান্ত পদ আছে—কিছু নাম যশঃও আছে—উচ্চ পদস্থ রাজপ্রতিনিধি ও সেনাপতি প্রভৃতির অনুগ্রহ ও অনুরাগ এবং পরিচিত সম্ভ্রান্ত ইংরাজ বান্ধবগণের বন্ধুতা ও প্রণয় রূপ সহায়ও আছে—সর্ব্বোপরি, সর্ব্বপাতা দয়াময় পরম-পিতার অপার দয়া-রূপ অমূল্য রত্নও আছে, তবে এত চিন্তাই বা কি?

কিন্তু হা ক্ষীণচেতা মানব! হা ভ্রান্ত বন্ধু দৌলীন! যদি কল্পনাতে এত গুলি গণনা না করিয়া শুদ্ধ সর্ব্বশেষে যে মহারত্নের নাম করিলে—যাহা সকলেরই সুপ্রাপ্য—সকলেরই অদ্বিতীয় সহায়—যদি কেবল সেই নিত্য-নিধিকে মাত্র লক্ষ্য করিতে, আর সব নিতান্তই অসার ও গণনার অযোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিতে, তবেই সুবুদ্ধির কাজ হইত! তোমার ভ্রান্তি এখনই দেখ;—

ইংরাজ জাতি সভ্য ও সভ্যাভিমানী, এবং উদার ও কুসংস্কারহীন বটে, কিন্তু অপর জাতীয় লোককে নিকৃষ্ট জ্ঞান করা এবং একটু ঘৃণা করা তাঁহাদের যেন জাতি-সাধারণ-ধর্ম্ম! তদনুসারে, যখন সকলে জানিতে পারিলেন যে, মেজর দৌলীন, কর্ণেল দৌলীনের ঔরসপুত্র নহেন—স্বজাতীয় লোকেরও সন্তান নহেন—নিকৃষ্ট হিন্দুবংশের সন্তান, তখন তাঁহার প্রতি আর সেরূপ বন্ধুতা, সে প্রকার আত্মীয়তা, সে প্রকার প্রণয়-প্রবৃত্তি অনেকেরই থাকিল না। বিশেষ যে মহাপুরুষেরা ভারতবর্ষে সর্ব্বেসর্ব্বা প্রভু, তাঁহাদের প্রায় কেহই আর তাঁহাকে পূর্ব্ব দৃষ্টিতে দেখিলেন না। অধিক কি, সৈনিক পদ পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে রুদ্ধ হইল—তাঁহার সহিত কোন ইংরাজ কর্ম্মচারী আর এক "মেসে" খাইতে চাহিলেন না, পদ-ত্যাগিতার ইহাই প্রধান হেতু! কিবা করে তাঁহার বাহুবল—কিবা করে তাঁহার রণ-পাণ্ডিত্য—কিবা করে তাঁহার রাজভক্তি—কিবা করে তাঁহার সুচরিত্র—কিবা করে তাঁহার শত শত সামান্য ও দুই চারিটা অসামান্য গুণ—কিবা করে পূর্ব্ব বন্ধুতা—সব তাঁহার পৈতৃক বর্ণ-অপরাধে ভস্ম করিয়া উড়িয়া গেল—কিছুতেই কিছু হইল না!

পাঠক! এই দেশে স্বচক্ষে নিত্য যাহা দেখিতেছেন, স্বকর্ণে নিত্য যাহা শুনিতেছেন, আপনারা নিত্য যাহা ভুগিতেছেন, তাহার আর বর্ণনা করিব কি?

দুই চারিজন মহদাশয় মহদন্তঃকরণ ইংরাজ বন্ধু তাঁহার প্রতি যথোচিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী ক্ষমতা ছিল না; সুতরাং তাঁহারা চেষ্টা করিয়াও সিদ্ধ হইলেন না!

যাউক, সে কথা আর কেন? বিচারের পর তাঁহার সৈনিক পদের বেতনই তাঁহার তখনকার এক মাত্র জীবিকা-উপায়, তাহাও ঘুচিল! সুতরাং তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা আর "পথের ভিখারীর" দশা কি সমান হইয়া উঠিল না? তুলনাতে ভিখারী বরং ভাল—সে ভিক্ষা চাহিতে পারে—দ্রোলীন্ তাহাও পারেন না!

পিতামাতার রত্নাভরণাদি বিক্রয় করিবার ইচ্ছা ছিল না—শৈশবে পিতা মাতার সহিত জন্মের মত বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সেই শোকই অসহ! এখন সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের একমাত্র স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ যাহা কিছু পাইয়াছেন, তাহার সহিত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিচ্ছেদ ঘটাইতে কি প্রাণ মন সম্মত হইতে পারে? সুতরাং তিনি ভিখারী!

যাঁহার হৃদয় আছে—এই কঠোর সংসারে পিতা মাতা যে কি পবিত্র প্রার্থনীয় রত্ন, যাঁহার হৃদয় তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছে—শৈশবে সেই পরমারাধ্য মহা নিধিতে বঞ্চিত হইয়া যাঁহার হৃদয় চির-দগ্ধ হইতেছে, তিনি কদাচই হেনেরি দ্রোলীনকে ঐ পবিত্র ভাব জন্য ভিখারী হইতে দেখিয়া দোষী মনে করিবেন না—তিনি অবশ্যই তাহার পরম বিশুদ্ধ চিত্ত-তত্ত্বের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া বরং তাঁহাকে প্রশংসাই করিবেন!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আশায় নিরাশা।

পাঠক! আমরা বুঝিতেছি, হেনেরি দ্যোলীনের ভবিষ্যৎ জীবন ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিল। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি অসাধারণ চিত্ত-বলে বলীয়ান! তিনি নিতান্তই নির্ভীক বীর ও প্রকৃত প্রস্তাবেই উদ্যোগী পুরুষ। অধিকন্তু ধর্ম্মে ও ঈশ্বরে তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস। সাংসারিক কোন অবস্থাতেই তিনি নতজানু হইবার নন।

যেই মাত্র দেখিলেন, ইংলণ্ডীয় সমাজ নির্লজ্জ ভাবে তাঁহার প্রতি পূর্ব্বকার সদ্ভাব পরিত্যাগ করিল, তিনি অমনি তখনই ইংলণ্ড পরিত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন।

তাঁহার স্বোপার্জ্জিত পূর্ব্ব সঞ্চিত যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল, তাহা লইয়া—এমন কি, অঙ্গুরী ঘটিকা যন্ত্রাদি পর্য্যন্ত তাবদ্বস্তু বিক্রয় দ্বারা—অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক বিশ্বাসী ভৃত্য বন্নুর সহিত অবিলম্বে ফরাসী রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। পাঠক বলিতে পারেন "বন্নু" কে? বন্নুর সবিশেষ পরিচয় ক্রমেই অধিক পাইবেন, আপাততঃ এই পর্য্যন্ত বলিলেই হইবে যে, বন্নু একজন মান্দ্রাজী হিন্দু—অবশ্যই ইতর জাতীয় হিন্দু—কিন্তু তাই বলিয়া হাড়ী বাগ্‌দার ন্যায় অত নীচ নয়—বহুবৎসর হইতে হেনেরির অতি প্রিয় পরিচারক—শেষবার ভারত হইতে আসিবার সময়, তাঁহার সহিত আসিয়াছে—প্রভুর নিমিত্ত জাতি কুলও অগ্রাহ্য করিয়াছে। বন্নু লেখা পড়ায় যেমন হউক, অনর্গল ইংরাজী কহিতে পটু। সে ইংরাজীও যেমন হউক, কিন্তু মুখ-ভারতীতে আঁটে কে? মান্দ্রাজে এমন লোক বিস্তর।

দ্যোলীন ফরাসি রাজ্যে গিয়া অল্পকাল মধ্যেই আশাতিরিক্ত ফললাভ করিলেন। তদ্রাজ্যে বিপ্লবের পর বিপ্লব হইয়া গিয়াছে। অসীম-প্রতাপ নেপোলিয়ান সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন। ইংরাজ সিংহের সাহায্য-বলেই ক্ষুদ্র মৃগবৎ লুই বংশীয় মহীপাল বোনাপার্ট শার্দ্দূলের কবল হইতে স্বীয় পৈতৃক সিংহাসন খানি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার নিকট ইংরাজী পদার্থ মাত্রই তখন মহা গৌরবের বিষয়—তাঁহার দলের নিকটও ইংরাজ নামধারী মাত্রেরই মহা আদর!

সুতরাং দৌলীন অনায়াসেই রাজপুরুষগণের সহিত মিলিতে ও তাঁহাদের সুপ্রসন্নতা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। তৎফলস্বরূপ তাঁহার প্রার্থনা বা ইঙ্গিত মাত্রে একটা উচ্চ সামরিক পদ তাঁহার সহজলভ্য হইল; কিছু দিনে সমপদস্থ ও সমবয়স্ক তদ্দেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবকের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় প্রণয় হওয়াতে সর্ব্বদাই তাহার ভবনে যাতায়াত ও কখন কখন ভোজন শয়নাদিও করিতে লাগিলেন।

এই যুবকের এক পরমা সুন্দরী গুণবতী অনুজা ছিল। সে তরুণী অল্প কালেই দৌলীনের প্রেমজালে বদ্ধ হইয়া পড়িল। শুদ্ধ তাহার পক্ষেই প্রেম নহে, দৌলীনও আত্ম হৃদয় হারাইলেন। এই পূর্ব্বরাগ গোপনও রহিল না। যুবতীর ভ্রাতা বুঝিতে পারিয়া দৌলীনকে আকার ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন; দৌলীন লজ্জাবনত বদনে সত্য স্বীকার করিলেন, সহোদরাকে সুযোগ্য পাত্রে প্রীতি স্থাপন করিতে দেখিয়া মহানুভব সুজন ভ্রাতা রুষ্ট না হইয়া বরং তুষ্টই হইলেন। এবং পিতামাতার নিকট দৌলীনের রূপ গুণের প্রশংসা পূর্ব্বক এই সম্বন্ধ নির্ণয়ার্থ বিশেষ অনুরোধ করিলেন।

জনক জননীও দৌলীনের গুণে মুগ্ধ ছিলেন, সুতরাং অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। কেবল পিতা সম্মতি দানের পূর্ব্বে "বর পাত্রটী কোন্ বংশীয়—কাহার পুত্র—পৈতৃক বিষয়াদি কিরূপ" ইত্যাদি জানিতে চাহিলেন। কাজেই দৌলানকে আত্ম-বৃত্তান্তের আনুপূর্ব্বিক পরিচয় দিতে হইল।

সে কি পরিচয়—সর্ব্বনেশে পরিচয়! "তিনি ইউরোপীয় ঔরস-জাত নহেন, গোড়া হিন্দুগর্ভ-জাত, ইউরোপীয়ের পালিত পুত্র মাত্র!" যেই এই তত্বটী শ্রুতি-গোচর হইল, অমনি "গুণ-মুগ্ধ" বৃদ্ধ পিতার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল—ক্রোধে লোচনদ্বয় ও বদনমণ্ডল আরক্তিম হইল! বলিলেন "এত বড় স্পর্দ্ধা! শৃগাল হইয়া সিংহশাবকের সহিত সমকক্ষতার প্রয়াস—বামন হইয়া চাঁদে হাত!"

ভগবান জানেন, শৃগাল সিংহীকে চাহিতেছে, কি সিংহপুত্র শৃগালের কন্যার প্রতি প্রীতি-নেত্র নিক্ষেপ করিতেছে! তবে অভাগা হিন্দুজাতি সিংহ হইয়াও এখন কালবশে শৃগালাপেক্ষাও অধম—নেড়ি কুকুর হইয়াছে! কাজেই পথিক মাত্রেই যাহার ইচ্ছা হয়, সেই একটা লাথি মারিয়া যায়—কর্দ্দমে পতিত হস্তীর পৃষ্ঠে ভেকের পদাঘাত চিরকালই প্রসিদ্ধ! কিন্তু মনের সে আক্ষেপ মনেই থাকুক—এক্ষণে প্রকৃত যাহা ঘটিয়াছিল, বলা যাউক।

সুশীল সুবোধ পুত্র পিতাকে শান্ত ও প্রবুদ্ধ করিতে বিস্তর যত্ন করিলেন। কয়েকটী বলবৎ যুক্তির দ্বারা বুঝাইলেন, "যদিও হিন্দুপুত্র, কিন্তু ঘটনাবলীর পর্য্যালোচনায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তিনি সামান্য হিন্দু-সন্তান নহেন—অবশ্যই কোন রাজা বা তদ্রূপ উচ্চ পদস্থ বড় লোকের ঘরে জন্মিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি যাঁহারই পুত্র হউন—যে দেশে, যে বংশেই জন্মগ্রহণ করুন, তিনি যখন উচ্চতম ইউরোপীয়-যোগ্য রূপগুণে ভূষিত আছেন এবং আমাদের সহিত যত ঘনিষ্ঠতা বাড়িতেছে, ততই দেখিতেছি, তাঁহার চরিত্র, চিত্ত ও মস্তিষ্ক অতি নির্ম্মল—অতি তেজস্বী, তখন তিনি, মনুষ্য পূজিত রাজার পুত্র নাই যদি হন, তথাপি তিনি যে প্রকৃতি কৃত মহারাজ, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। নীচকুলে কি এমন পুরুষরত্ন সম্ভবে? বিশেষ আমি জানি, ভগ্নী তাঁহাকে যে সানুরাগ নয়নে দেখিয়াছেন, তাহাতে এই পাত্রের উপরেই তাঁহার চিরজীবনের সুখ নির্ভর করিতেছে। অতএব পিতঃ! আপন তনয়াকে এককালে নৈরাশ্য সাগরে নিক্ষেপ করিবেন না।"

এ সব যুক্তি বংশাভিমানের কাছে কোথায় লাগে! পুত্রের এই সকল সদর্থ বাক্য বৃদ্ধের গর্ব্বাগ্নিতে ঘৃত স্বরূপ হইল—বৃদ্ধ প্রশান্ত না হইয়া আরো কুপিত হইয়া উঠিলেন—

"পয়ঃ পানাং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনং।
উপদেশোহি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।"

পুত্রকে যার পর নাই কটু বাক্যে তিরস্কার পূর্ব্বক দুর্ভাগ্য দৌলীনকে এককালে পুরী প্রবেশে নিষেধ করিয়া দিলেন।

ফল কি হইল?

কুম্ভকারের পণের অগ্নিতুল্য প্রণয়ীযুগলের হৃদয় অপ্রকাশ্যে দুঃসহ বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিল। নায়কের অবস্থা কালিদাসের মেঘদূত-বর্ণিত যক্ষের দশা হইতে অধিক ভিন্ন নহে! নায়িকার যন্ত্রণা জুলিএটের চিত্রকর মহাকবি সেক্সপীয়র ভিন্ন অন্যের সাধ্য কি স্বরূপ বর্ণনা করে! বিশেষ যখন সংক্ষিপ্ত স্থূল বর্ণনাই এ পরিচ্ছেদ কয়টীর উদ্দেশ্য, তখন তদ্রূপ কোন চিত্রের চেষ্টা পাওয়াও অসম্ভব।

ভগ্নীকে নিরন্তর নিদারুণ যন্ত্রণানলে দগ্ধা ও দিন দিন দীনা ক্ষীণা মলিনা দেখিয়া ভ্রাতা পিতৃভর্ৎসনাকেও উপেক্ষা করিয়া পিতৃসকাশে যখন তখন

সুযোগমতে নানা যুক্তি প্রয়োগ ও বিস্তর অনুনয় বিনয়—এমন কি পায় ধরিয়া রোদন করিতেও ক্ষান্ত হইলেন না। কিন্তু কিছুতেই অটল অচলকে সূচ্যগ্র পরিমাণেও সচল করিতে পারিলেন না! তাহার জননীও কন্যার অবস্থা দেখিয়া ভয় পাইলেন—পুত্রের শুভকরী চেষ্টায় যোগ দিলেন—স্বামীকে বিস্তর বুঝাইলেন, তথাপি মতান্তর ঘটাইতে সমর্থা হইলেন না।

তখন তাঁহারা কর্ত্তার অজ্ঞাতসারে শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করিবার পন্থা দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু দৌলীন সম্মত হইলেন না—বলিলেন "যদি এই বিয়োগ-ব্যথায় প্রাণও যায়, তথাপি চৌর্য্য অপরাধ স্বীকার করিব না।"

ঐ গুপ্ত বিবাহের চেষ্টার বার্ত্তা কর্ত্তার কর্ণগোচর হইল। তাহাতে লাভে হইতে তাঁহাদের সংসার মধ্যে মহা অসুখ জন্মিল এবং নায়ক নায়িকারও ঘোর যন্ত্রণা ঘটিল। পূর্ব্বে তবু তাঁহাদের পরস্পরের সন্নিকটে অবস্থান এবং দুঃখের দুঃখী সহৃদয় ভ্রাতার যোগে তাঁহারা প্রেম-লিপি প্রভৃতির বিনিময় উপায়ে কথঞ্চিৎ তৃপ্তি-সুখে কালহরণ করিতেছিলেন, এখন সে সুখেও ব্যাঘাত ঘটিয়া উঠিল। কর্ত্তা ভাবিলেন, বাটীতে থাকিলে নিস্তার নাই; অতএব স্ত্রী কন্যা লইয়া রাতারাতি লণ্ডনে গমন (এক প্রকার পলায়ন) করিলেন।

তথায় অবস্থান সময়ে থলগতি ইংরাইজা ও তাহার দলপতির সহিত কর্ত্তার আলাপ হইল। তাঁহাদের মুখে দৌলীনের চরিত্র-চিত্র যেরূপ হওয়া সম্ভব, তাহা শুনিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা আরও সুদৃঢ় হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ ঐ দুই অভিনব বন্ধুর সাহায্যে কন্যার জন্য সুযোগ্য পাত্র অন্বেষণ ব্যাপারটা চলিতে লাগিল। অধিক অন্বেষণ করিতে হইল না। যে ধাতুর ঘটক, তদনুরূপ পাত্রও অবিলম্বে জুটিল। বাহ্য সভ্যতা, বাহ্য সৌষ্ঠব, বাহ্য ঐশ্বর্য্যের চাক্‌চিক্যময় ছদ্মবেশী কত কুলীন নাগর দিবানিশি তাঁহার পুরী আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তন্মধ্য হইতেই একটী সুপাত্র বাছিয়া মনোনীত করিলেন এবং তাঁহার প্রতিই মন বসাইতে কন্যাকে দৃঢ় আজ্ঞা দিলেন। হায়! সুশীলা অবলার হৃদয়-তন্ত্র সেই নিদারুণ আঘাতেই ছিন্ন হইয়া গেল!

কন্যাকে পশ্চাদ্বর্ত্তিনী দেখিয়া পিতা ভাবিলেন, বলপূর্ব্বক বিবাহ দিয়া ফেলিলে আর এরূপ করিতে পারিবে না—তখন অদৃষ্টের নির্ব্বন্ধ ভাবিয়া প্রবুদ্ধ হইবে—ক্রমে হয়তো সুখিনী হইতেও পারিবে। অতএব শুভদিন, শুভক্ষণ, শুভলগ্ন সকল স্থির হইল—নানা আয়োজন চলিতে লাগিল।

যদি বাহুল্য-বর্ণনার সম্ভাবনা থাকিত, তবেই শুভ দিনের পূর্ব্বরাত্রের হৃদয়-বিদারক ভয়ানক ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বলিয়া হৃদয়ের সন্তাপ নির্ব্বাণ করিতাম। কিন্তু তাহা হইবার নয়; অতএব অল্প কথাতেই বলিতেছি—হায়! কি আর ছাই বলিব—লেখনী যে আর চলে না! কিরূপে লিখি যে, আমাদের হৃদয় বন্ধুর সেই একমাত্র হৃদয়-নিধি—বান্ধবশূন্য জগতের সেই একমাত্র বান্ধব-রূপিণী—নিরাশা মরীচিকার সেই একমাত্র আশাদায়িনী নির্ঝরিণী—তাঁহার প্রেম-মন্দিরের একমাত্র স্বর্ণপ্রতিমা-রূপিণী সেই তরুণী, ঐ কাল রজনীতে স্বহস্তে আত্ম-হত্যা নামা ভীষণ মৃত্যু-সাগরে আত্মবিসর্জ্জন করিল!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

স্বদেশ-যাত্রা।

এই অন্তর্দাহক কুসংবাদ যখন ফরাসী সেনা-নিবাসে আমাদের প্রিয় বন্ধুর নিকট আইসে, তখন সংবাদ আইল, কি শিরে সহসা বজ্রপাত হইল, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না! তাঁহার অন্তঃসারময়ী বুদ্ধি ও সহিষ্ণুতা-শক্তি যদি প্রবল না হইত, তবে সেই দারুণ আঘাতেই তাঁহার প্রাণাত্যয় ঘটিত! কিন্তু যদিও মনের বল ও ধর্ম্মের বল প্রবল ছিল বলিয়াই তাঁহার জীবন রক্ষা পাইল, তথাপি নিতান্ত হৃদয়-বিদারক মর্ম্মপীড়াতে মনুষ্যের যে সব দৈহিক পীড়া হয়, তদাক্রমণের হস্তে তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন না।

সেই ক্ষণ হইতে ভীষণ মস্তিষ্ক-জ্বরে তাঁহাকে অজ্ঞান অচৈতন্যাবস্থায় বহু দিবস শয্যাশায়ী থাকিতে হইল। এক সময় এমন বোধ হইয়াছিল, বাঁচিবার আশা নাই। নিতান্ত প্রভু-পরায়ণ সুচতুর বয়্ না থাকিলে হয়তো অত্যাহিতই ঘটিত। বয়ের অবিশ্রান্ত যত্নে এবং সুযোগ্য ডাক্তার ও শুশ্রূষা-কারিণী ধাত্রীর গুণেই তিনি বাঁচিয়া উঠিলেন। তথাপি দুটা মাস ভোগ।

যৎকালে বিকার বিপদ কাটিয়া ক্রমে স্বাস্থ্য লাভ করিতেছেন, অথচ শয্যা হইতে উঠিবার শক্তি নাই; অথবা যখন উঠিতে পারিয়া বড় জোর গবাক্ষে উপবেশন পূর্ব্বক বাহ্যভাগ ও রাজপথাদি নিরীক্ষণ ব্যতীত অন্যত্র গমনাগমন বা অন্য কর্ম্ম করিবার সাধ্য হয় নাই, সেই সময়ে তিনি

আত্ম-অবস্থাগত যত কিছু চিন্তা করিতেন, সে সমস্তই নৈরাশ্যের চিন্তা! ভাবিতেন "আমার ন্যায় দুর্ভাগা আর কে? যাঁহাদের হইতে ভূতলে অবতীর্ণ, সেই স্নেহের বিমল উৎস স্বরূপ জনক জননীকে দেখিতেও পাইলাম না! যদিও দেখিয়া থাকি, সে মিথ্যা—যখন বাল্যের প্রতিমা স্বরূপ তাঁহাদের আকৃতির আভাস পর্য্যন্তও স্মরণে আনিতে পারি না, তখন সে দেখা দেখাই নয়! তাহার পর, যে দেব দেবী আমাকে কুড়াইয়া আনিয়া আপন পিতা মাতার অপেক্ষাও অধিকতর মমতায় মানুষ করিলেন, তাঁহাদিগকেও অচিরে হারাইলাম! হারাইলাম তো এম্নি নিদারুণরূপে হারাইলাম যে, শেষ দশায় একটু সেবা শুশ্রূষা করিতে, কি একবার চক্ষে দেখিতেও পাইলাম না!.. নিকটে থাকিলে দুষ্টলোকে এত গোলও বাঁধাইতে পারিত না! সেই পালক পিতার যে প্রকার অসীম দয়া, মায়া, স্নেহ, কারুণ্য ছিল, তাহাতে তিনি যে আমাকে ভুলিয়া কি নিরাশ্রয় রাখিয়া যাইবেন, তাহা নিতান্তই অসম্ভব—অবশ্যই উইল দ্বারা আমাকেই উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছেন—অবশ্যই কেবল আমারই দৃষ্টির নিমিত্ত আমার শৈশবাখ্যায়িকা (যাহা আদালতে বাহির করিয়া ধূর্ত্ত বিপক্ষ আমাকে বঞ্চিত করিল) লিপির সঙ্গে নানা হিতোপদেশ ও অন্যান্য বিধিব্যবস্থা পত্রস্থ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভাগ্যহীনের দগ্ধ মৎস্যও জলে যায়! কোথা হইতে অভাবনীয় শত্রু যেন মাটি ফুঁড়িয়া উঠিয়া সে সকল উড়াইয়া দিল—দিয়া, উচিত প্রাপ্য বস্তুতে নৈরাশ করিয়া ধনে মানে মজাইল—সমাজের উচ্চপদ হইতে একবারে নিরাশ্রয় অবস্থায় অপমানের কূপে নিক্ষেপ করিল!

"যাউক, তাহাও যাউক—তাহাও সহ্য হইল—তাহাতেও অত কাতর হই নাই! কিন্তু হায়, সেই শতবিধ দুঃখার্ণবে ভাসিতে ভাসিতে অকূলের তরণী রূপিণী প্রাণতোষিণী তরুণীকে পাইলাম—অযত্নলভ্য রত্নরূপিণী যে হৃদয়-নিধিটাকে কুড়াইয়া পাইলাম, সে নিধিই বা কোথায় গেল!—দেখিতে দেখিতে সে সুখের স্বপ্নও ভাঙ্গিয়া গেল! হায়! সে আশা যথার্থই মরীচিকাবৎ দেখিতে দেখিতে বিলুপ্ত হইল! আমি দুর্ভাগা, অবশ্যই সর্ব্বসুখদাতা পরমপিতার নিকটে কোন বিশেষ অপরাধ করিয়া থাকিব, হয়তো তাহারই শাস্তি স্বরূপ কেবলই নৈরাশ্য ভোগ করিতেছি!

"কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন, নৈরাশ্যকে হৃদয়ে স্থান দিতে নাই—দিলে

প্রত্যবায়, অপরাধ, মহাপাপ! ঈশ্বর-প্রেরিত দুঃখ মাত্রই কেবল পরীক্ষা হেতু—সবই শুভ উদ্দেশে! আমরা ক্ষীণবুদ্ধি ভ্রান্ত মানব যাহাতে বিষাদ গরল দেখিয়া হতাশ হই, হয় তো তন্মধ্যেই করুণাময়ের করুণামৃত লুক্কায়িত আছে! অতএব নিরাশ হইব না—নিরাশ হইতে নাই—এত কালের শিক্ষা-জনিত হৃদয়-বল তবে কি? একমাত্র মঙ্গলালয় নিত্য পুরুষের দয়ার প্রতি যে এত বিশ্বাস—যে বিশ্বাসকে অচলাপেক্ষাও অচঞ্চল ও অটল বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি, তাহা কি তবে কথার কথা? তাহা কি তবে এতই লঘু যে, বিপদ বাত্যায় উড়াইতে পারিবে? কখনই না! দুর্ব্বিপাক চক্র যতই বিঘূর্ণিত হউক—যতই পেষণ করুক, সর্ব্ব কল্যাণকর হৃদয়নাথের প্রতি হৃদয়-চাঞ্চল্য কদাচই জন্মিতে দিব না! সেই দৃঢ়প্রত্যয়-রূপ অভেদ্য কবচে আবৃত হইয়া পুনর্ব্বার দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, শতগুণ বলে প্রতিকূল ভাগ্যের ব্যূহ ভেদ করিতে অগ্রসর হইব!

"কিন্তু আর এখানে নয়—এই ইউরোপ এখন আমার বৈরভূমি—পূর্ব্বে ভাবিতাম জন্মভূমি—এককালে সে ভ্রম ছিল বটে—এককালে তাহাকে ভক্তি করিতাম বটে—এককালে তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ ছিলাম বটে—কিন্তু এখন? এখন অশ্রদ্ধা আর অবজ্ঞা বৈ, কৈ, অন্য ভাব তো অনুভূত হয় না! এখন আর একটী পবিত্র দেশের পবিত্র নামে দেহ প্রাণ রোমাঞ্চ হইয়া উঠে! সে নাম 'ভারত!' স্বভাব-কবিরা বলিয়াছেন, অপরিচিতা প্রসূতীকে দেখিবামাত্র, প্রকৃতির গুপ্ত প্রত্যাদেশে, অজ্ঞাত সন্তানের মন যেন কেমন এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় ভাব ভক্তিতে সংপ্লুত হয়! হায়, একথা যে সত্য, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি—ভারতকে যখন কেবল কর্ম্মভূমি বলিয়াই জানিতাম, তখনও ইউরোপ অপেক্ষা তাহার প্রতি আত্ম হৃদয়ের অসম্ভব স্নেহাসক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতাম! এখন তো সেই পরমারাধ্যা ভারত মাতাকে জন্ম ও কর্ম্মভূমি, দুইই জানিয়া কত যে মমতার বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে পারি না! ইউরোপ আমার ধাত্রী জননী, সুতরাং সামান্য ভক্তি ভিন্ন তৎপ্রতি অন্য গাঢ়তর ভাবে মন কখনই চলে নাই—এখনতো তদ্বিপরীত!

"অতএব এই সভ্যাভিমানী ইউরোপ অপেক্ষা অৰ্দ্ধসভ্য সেই পবিত্র পুণ্যভূমি আমার পক্ষে সর্ব্বাংশেই গরীয়সী! হিন্দুজাতি সর্ব্বাপেক্ষা অতি প্রাচীন। তাহাদের যে সব দোষ আছে, তাহার বেশী দোষ শত বিধ প্রকারে

এই সভ্য সমাজে দেখিলাম। তাহাদের যা গুণ, তা অদ্যাপি ইহাদের সমাজে দুর্ল্লভ পদার্থ!* হিন্দুজাতি বর্ণ বিচার করে, শুচি অশুচি ব্রাহ্মণ মুচি প্রভেদ করে, কিন্তু যাহা করে, দোষ হউক বা গুণ হউক, প্রকাশ্য ভাবেই করে—মুখে যা বলে, শাস্ত্রেও তা, ব্যবহারেও তা। দাম্ভিক ইউরোপীয়েরা মুখে বলে জাতি-ভেদ মানি না, কিন্তু আচরণে দেখিলাম, সে কথা কপট। দেখিলাম, সে তারতম্য ইহারা যত মানে, এত আর এসিয়ার কোন সমাজ জানে না। ইহারা বলে, ইহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বলে—ইহাদের ধর্ম্মযাজকেরা উচ্চতর গলা বাজিতে প্রতিনিয়তই বলে, 'সকল মনুষ্যই ভাই ভাই—সকলেই সমান—কোন দেশীয় কোন বংশীয় কোন শ্রেণীর মনুষ্যের সহিত অন্যের প্রভেদ নাই—প্রভেদ করিতে নাই—করিলে প্রত্যবায় আছে, পাপ হয়, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়!' কিন্তু কার্য্যকালে—ব্যবহার সময়ে সেই বাহ্যাড়ম্বর—সেই জ্বলন্ত বাগাড়ম্বরের সম্পূর্ণ বিপরীত কাজই করে! অতএব এমন ছদ্মবেশী সভ্যতম প্রবঞ্চক অপেক্ষা সরল-স্বভাব সভ্য হিন্দু কেন, অসভ্য বন্য বর্ব্বরও ভাল!

"আবার ইহাদের ধর্ম্মভয়ও নাই, কৃতজ্ঞতাও নাই, ন্যায়বৃত্তিও নাই—যদিও কিছু থাকে, বড় নিস্তেজ—গর্ব্ব ও অভিমানের নিকট নিতান্তই নিস্তেজ! হায়, আমি যে দেশের জন্য স্বীয় প্রাণ উপেক্ষা পূর্ব্বক এত যুদ্ধ করিলাম—বার বার এত অসমসাহসিকতা দেখাইলাম, তাহাও স্মরণ করিতে ইহাদের প্রবৃত্তি হইল না। যেই মাত্র জানিল, আমি তাহাদের স্বজাতীয় নহি, অমনি আমাকে দূর করিয়া দিল, আর যেন চিনিতে পারিল না—আমাকে পথের ভিখারী হইতে দেখিয়াও দয়া করিল না! পালিত পশুকেও লোকে এমন করিয়া বিদায় দিতে পারে না!

"হায়! যাহাদের ধর্ম্মবোধ না থাকে, অন্ততঃ চক্ষু-লজ্জাটাও থাকে। ইহাদের তাহাও নাই! যে ইংরাজ জাতিকে ইউরোপ মধ্যে নর-দেবতা বলিয়া কখন কখন ভ্রম জন্মিত, যখন তাহাদের দ্বারাই এই নির্দ্দয়াচরণ ঘটিল, তখন অন্য ইউরোপীয়কে আর কি বিশ্বাস করিব? শুনিতে পাই, তাহাদের

* তৌলীনের দৈনিক জীবন-লিপিতে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত বিবৃত আছে, বাহুল্য ভয়ে দুই একটী মাত্র অনুবাদ করিলাম।

মধ্যে ফ্রেঞ্চজাতি সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, সেই ফ্রেঞ্চজাতীয় এই প্রবীণ পিতারই বা কি নৃশংস ব্যবহার! আমার আকৃতি, প্রকৃতি, বাক্য, কার্য্য, কিছুতেই ইউরোপীয় ভিন্ন অন্য কিছু বুঝিতে পারিল না—আমার স্বমুখের পরিচয় বৈ আর কিছুতেই হিন্দুবংশজ বলিয়া জানিতে পারিল না। যত দিন তাহা না জানিয়াছিল, তত দিন আমি জামাতার যোগ্য পাত্র ছিলাম, যে মুহূর্ত্তে তাহা জানিল—'পোড়া হিন্দু' শব্দটী শুনিল—সেই ক্ষণেই আমার সব গুণ—সব যোগ্যতা অপসৃত হইল—অমনি হীন মানব, ছোট লোক হইয়া পড়িলাম!

"অতএব আর না—যথেষ্ট দেখা হইল—এমন পাপ-রাজ্যে, এমন কৃত্রিম সমাজে আর না! ভিক্ষাবৃত্তি সার হয়, সেও শ্রেয়ঃ, তথাপি স্বীয় জন্মভূমি ছাড়িয়া আর কোথাও অবস্থান করিব না!"

পরামর্শের বন্ধু কেহ ছিল না—যাহারা ভালবাসিত, তাহাদের সমাজ-নিন্দা তাহাদের নিকট সম্ভবে না—তাহার প্রতি বিরাগও প্রবল—সুতরাং বন্নু বৈ ব্যথার ব্যথী আর কে? বন্নুও সম্পূর্ণভাবে অপণ্ডিত, কিন্তু সুচতুর সরলের যে ভাব, সেই ভাবে ঐ প্রতিজ্ঞার সম্পূর্ণ পোষকতা করিল। ক্রমে তাহাই স্থির হইল। সুস্থ, প্রকৃতিস্থ, সবল ও সমর্থ হইবা মাত্র ফরাসী সৈনিক পদ (তখন তিনি কর্ণেল) পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই কর্ম্মে যাহা কিছু সঞ্চয় হইয়াছিল, তাহা লইয়া প্রিয় ভৃত্য বন্নুর সহিত পোতারোহণে কর্ণেল দ্রৌলীন স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইউরোপ সম্বন্ধ নামা তদীয় জীবনের আদি কাণ্ডের সঙ্গে এই ইতিহাসেরও "প্রথম কাণ্ড" সমাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পঞ্চনদ যাত্রা।

ঢৌলীনের ইউরোপ-লীলার অবসান হইল। কোন কোন অংশে তাঁহার আর যতুকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণদেবের প্রথম জীবনে প্রচুর সাদৃশ্য আছে: উভয়েই একস্থানে জন্ম গ্রহণ, অন্যস্থানে বাল্য-লীলা সমাপন করেন। তবে কৃষ্ণ-চরিত্র-বেত্তা মহাত্মা কবিগণ ব্রজলীলার যেমন বাহুল্য ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার নায়কের ইউরোপ-লীলার সেরূপ বিস্তৃত বর্ণনা করিলাম না। ফলতঃ প্রথম কাণ্ডে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহা এই আখ্যায়িকার অবতারণা বা প্রস্তাবনা মাত্র। প্রকৃত ইতিহাস এখন এই দ্বিতীয় কাণ্ডে আরব্ধ হইল। ঢুলীনের প্রাথমিক (ইয়ুরোপ-সংক্রান্ত) জীবন ব্যাপার জানা না থাকিলে, প্রকৃত উপাখ্যানের মর্ম্মাবধারণে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে: কেবল তৎপ্রতিবিধানার্থই প্রথম কাণ্ড রূপ দীর্ঘ উপক্রমণিকা লিখিত হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন সৌরাষ্ট্র (সুরাট) বন্দরে তিনি পোত হইতে অবতরণ করিলেন। সঙ্গে প্রিয় পরিচারক বন্নু। ভারতের মৃত্তিকা স্পর্শে বোধ হইল, যেন নির্ব্বাসনের দণ্ড হইতে মুক্তি পাইয়া নিবাসে আইলেন!

কিন্তু হায়! তাঁহার কোথায় বা নিবাস, কোথায় বা নির্ব্বাস! সুরাট বাসের প্রথম রজনীতেই তাঁহার হৃদয়ে সে বোধের উদ্রেক হইল। "কোথায় যাই? কি করি?" এইটী দ্বিতীয় চিন্তা—অহর্নিশির চিন্তা হইয়া উঠিল। পথে আসিতে একবার মন হইয়াছিল, পারস্য উপকূলে অবতীর্ণ হইয়া তদ্রাজ্যাধিপের আশ্রয় লাভের চেষ্টা করিবেন; চেষ্টা সফল না হইলে ভারতে আসিবেন। কিন্তু জন্মভূমির আকর্ষণ অতি প্রবল; সুতরাং অনিশ্চিত আশার মুখ চাহিয়া অথবা কেবল কল্পনার কথা শুনিয়া এক দিনের নিমিত্তও

অন্যত্র থাকিতে তাঁহার তখন মন চাহিল না ! অতএব এখন তিনি এখানে—যে স্থানকে কবিরা বলেন—"স্বর্গাদপি গরীয়সী !"

সেই স্বর্গাধিক স্থানে আসিয়াও অবস্থার প্রভাবে চিন্তা উদিত হইল, "এখন উপায় কি ? কর্ত্তব্যই বা কি ? আবার কি ব্রিটিস সেনাপতির উপাসনা করা ? কদাচ নয় ! কদাচ নয় ! কদাচই নয় ! প্রাণ গেলেও নয় ! ফরাসী অধিকারে কোন কিছুর চেষ্টা করা ? উঁ হুঁ, তাহাও নয় ! আর ইউরোপীয়ের দ্বারস্থ না—পারতঃপক্ষে ইউরোপের সম্পর্ক আর রাখিব না ! তদপেক্ষা, অসভ্য বন্য ও পার্ব্বতীয় নরজাতিদের উপাসনাও ভাল !

"তবে কি ব্যবসায় বাণিজ্য করা আমার উচিত ? যে সঞ্চিত মূলধন আছে, তাহাতে কি কোন ব্যবসায় হইতে পারে না ? কিন্তু হইতে পারিলেই বা ব্যবসায়ের কি জানি ? জানিলেও বা তাহাতে প্রবৃত্তি হইবে কেন ? কবিরা বলেন 'যে কখনো শূরত্বের ও কবিত্বের সুধাস্বাদ পাইয়াছে, সে কি আর কেবল ধনেই তৃপ্ত থাকিতে পারে ?' এ কথা দেখ্‌ছি সম্পূর্ণ সত্য !

"তবে কি কোন জমীদার বা ধনীর দ্বারে চাকুরি করা ? ছা ধিক ! কপালে কি শেষ এই ছিল ? তেমন চাকুরি তো কুকুরি !

"তবে কি উদাসীন হইয়া পর্য্যটন করা ? সে প্রবৃত্তি হয় কৈ ! অথবা প্রবৃত্তির হাত এড়াইয়া তত নিবৃত্তি ঘটে কৈ ?

"তবে আর কি করিব ? (চিন্তার পর) আছে—কোন দেশীয় রাজার আশ্রয় লইয়া যে কাজে চির-শিক্ষিত সেই কাজ করা ! এ বরং ভাল—

"তবে কাহার নিকট ? সিন্ধিয়া, হোলকার, গুইকুঁয়ার প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় দল এখন হতবল ! প্রাচীনতম উদয়পুর, যোধপুর, জয়পুরাদিও প্রায় তাই ! বলিতে গেলে তাঁরা স্বাধীনতা হারাইয়া ইংরাজের অধীনতাই স্বীকার করিয়াছেন ! দুর্দ্দান্ত হায়দরালি ও টিপু কেবল ইতিহাসের পাতায় ঝুলিতেছে মাত্র ! লক্ষ্ণৌও তথৈবচ ! বিশেষতঃ মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি আমার তত অনুরাগ শ্রদ্ধা নাই !

"তবে কোথায় যাই ? কার কাছে যাই ? তেমন পুরুষ কে ? আছেন—এক পুরুষসিংহ আছেন—আজ্ কাল্ যাঁর পৌরুষের কথা পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র ঘোষিত হইতেছে—দূর ইউরোপে বসিয়াও যাঁহার অতুল পরাক্রমের সংবাদ শুনিতে পাইয়াছি—যাঁর ভুজদর্পে পঞ্জাবের পরাক্রান্ত

"মিসল্" সমূহ একীভূত এবং চতুঃপার্শ্বস্থ দুর্দ্দম্য হিন্দু মুসলমান ভূপালবর্গ নতমস্তক হইয়াছে, সেই বীর-সিংহ মহারাজ রণজিৎ সিংহের আশ্রয় গ্রহণই আশু কর্ত্তব্য ও শ্রেয়ঃ!

"কিন্তু এমন প্রার্থনীয় প্রভু আমার মনোনীত হইলে কি হইবে, অদৃষ্ট-বলে আমি তাঁহার মনোনীত হইলে তো হয়! শুনিয়াছি, তিনি গুণ-নির্ব্বাচক ও গুণ-গ্রাহক—সুযোগ্য ইউরোপীয় সেনানায়ক পাইলে নাকি তিনি বড় যত্নে ও বড় আদরে রাখেন এবং গৌরবমূলক পদেই স্থাপিত করেন। দেখি আমার পরম হিতৈষী সুবোধ বন্নুই বা কি বলে?"

বন্নুকে ডাকিয়া মনের অভিপ্রায় বলা হইল। বন্নু বিধিমতে এ সঙ্কল্পের বিশেষ গৌরব করিয়া পরিশেষে বলিল "শিখ রাজ্যে ইউরোপীয় সেনানায়কের বিশেষ আদর বটে; কিন্তু শুধু পঞ্জাবে কেন, এখন এ পোড়া হিন্দুস্থানের সকল খণ্ডেই হ্যাট-কোট ওয়ালার জয়—সাহেবের নামে সব ঠাঁই ধাঁ ধাঁ শব্দ! কিন্তু হুজুর, কেবলই হ্যাটকোট নিয়ে গেলে তেমন কাজ হবে না—আরো কিছু ভড়ং ভাড়ং জাঁক জমক চাই—"

দ্বোলীন হাসিয়া বলিলেন "কি রকমের ভড়ং ভাড়ং জাঁক জমক বন্নু?"

বন্নু। আজ্ঞে, কতকগুলি আসবাব—দু তিনটা তাঁবু—বোঝা বৈতে উট আর গাড়ি—জন কত চাকর—নিদেন আমি ছাড়া আরো দু তিন জন—আর কতকগুলি সঙ্গী তুড়ুক সওয়ার। ঠাউরে দেখুন, আমাকে নে আপনি একা গেলেই বা কি হয়, আর ঐ রকম রেসেলা সঙ্গে গেলেই বা কেমন দেখায়!

দ্বোলীন বলিলেন "কেন?"

বন্নু বিনীত ভাবে নিবেদন করিল "হুজুর! বিশেষ কারণ আছে; এক তো, এখন পথে বড় ডাকা চুরি গামছামোড়া—" (এই নামে দ্বোলীন শিহরিয়া উঠিলেন!) "বিশ্বাসী ভাল রেসেলা লোক সঙ্গে থাকলে সে ভয় বড় রয় না; আর সেরূপ রেসেলা নৈলে কেউ বড় গোচের সাহেব ব'লে বুঝবে না; আবার বড় গোচের সাহেব নৈলে পঞ্জাবের মহারাজার কাছে ঘেসাই ভার—সে সিঙ্গির চারি দিকে যে সব বড় বড় ডালকুত্তা ঘিরে আছে, তারা তা নইলে খবর নিতেই দেবে না!"

দ্বোলীন শুনিয়া বুঝিলেন, সুচতুর বন্নুর পরামর্শ সর্ব্বতোভাবেই উপযুক্ত।

বলিলেন, "ইহাই কর্ত্তব্য! অতএব, বন্নু, তদ্রূপ সহচর দল অবিলম্বে সংগ্রহ কর। কিন্তু সাবধান, যেন প্রতারক ও চোর ডা'কাত না হয়!"

বন্নু কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল "হুজুর! আপনার বন্নুকে কি এমন বেয়াকুব কখনো দেখিয়াছেন?"

দ্যোলীন অপ্রস্তুত হইয়া দুইটা প্রবোধের মিষ্ট বাক্যে বিদায় দিলেন।

কিয়দ্দিবস মধ্যে সংগ্রহ-কাজ সম্পন্ন হইল। বন্নু নানা উপায়ে নানা কৌশলে প্রত্যেক পদ-প্রার্থীর ইতিহাস ও চরিত্রাদির বহু সন্ধান ও পরীক্ষা লইয়া তবে নিযুক্ত করিল। সকলেই বাছা বাছা জোয়ান। প্রয়োজন-মত তাম্বু ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা তো তদপেক্ষা অতি সহজ কাজ, সে সবও হইল। ধন্নু নামে বন্নুর এক ভ্রাতা ছিল, তাহাকে প্রভুর আদেশে আনাইয়া স্বীয় সহকারী পদে নিযুক্ত করিল।

দ্যোলীন নিজেও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনিও বহু স্থানে বহু সন্ধানে ও বহু পরীক্ষায় বহুমূল্যে একটী আশ্চর্য্য আরবীয় অশ্ব ক্রয় করিলেন। সে অশ্বরাজ যেমন সুদৃশ্য, তেমনি শ্রমসহ, তেমনি রণ-কৌশলে সুশিক্ষিত— নিজেও তাহাকে আপন মনোমত শিক্ষা দিতে লাগিলেন—তাহার গতি রীতি দৃষ্টে মোহিত হইয়া তাহার নাম রাখিলেন "বেলুন!"

ক্রমে আরো অনেক ঘোটক ক্রয় করিলেন- তাহারা যদিও "বেলুন" কি তদ্রূপ কোন অসামান্য নাম পাইতে পারে না, তথাপি নিতান্ত সামান্য শ্রেণীর পশুও নহে। তাহারা উত্তম সজ্জায় সজ্জিত হইল। দ্যোলীন প্রতি অনুচরকে সেই অশ্বাবলীর এক একটী অর্পণ করিলেন। প্রত্যেক সহচরের শরীর চাকচিক্যময় মূল্যবান পরিচ্ছদ ও বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া দিলেন। সে সব সজ্জা, খুব বড় লোকের অশ্ব ও অশ্বারোহী না হইলে, কাহাকেও সচরাচর ব্যবহার করিতে দেখা যায় না।

সুরাট নগরে যত দিন ছিলেন এবং পথেও প্রতিদিন নিয়মিত রূপে— সম্পূর্ণ সুশাসনে ও সুপ্রণালীতে—সম্পূর্ণ ইউরোপীয় সৈনিক রীত্যনুসারে— সেই অনুচরগণকে অস্ত্রচালন, অশ্বচালন ও রণকার্য্যের সুশিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাহারা অল্প দিনেই তাঁহার অসাধারণ রণপাণ্ডিত্য ও নায়কত্ব উপলব্ধি করিতে পারিল। তাহারা দেখিল, প্রভুর নৈপুণ্য যেমন, কারুণ্যও তেমনি; অপক্ষপাতিতা যেমন, বদান্যতাও তেমনি; গুণগ্রাহিতা ও গুণের

পুরস্কার-দান-প্রবৃত্তি যেমন, ধৃষ্টতা ও অনবধানতার দণ্ড দানেও দৃঢ়তাও তেমনি! এই সব অদৃষ্ট-পূর্ব্ব অসামান্য গুণ দর্শনে তাহারা মনে প্রাণে নিতান্তই প্রভুভক্ত ও বশীভূত হইয়া উঠিল—ক্রমে এমন হইল, তাঁহার নিমিত্ত তাহারা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত এবং ক্রমে এমন সুশিক্ষিত হইল যে, ইংরাজ সৈনিকগণ প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও শঙ্কার সম্ভাবনা মাত্রই নাই।

যখন দেখিলেন সমুদয় প্রস্তুত—যখন বুঝিলেন, সহচর দলের বল, বীর্য্য, সাহস, ধৈর্য্য, কার্য্যকুশলতা ও প্রভুপরায়ণতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় —যখন বুঝিলেন, সদলবলে তাহাকে একজন যেমন তেমন লোক দেখাইবে না, বরং দর্শন মাত্র আমার ওমরা বড় লোকেরও ভয় ভক্তি জন্মাইবে, তখন তিনি মহা "সিন্ধুনদের" সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চ শাখার দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

লাহোর।

লাহোর নগরের অনতিদূরে একটি সুরম্য স্থানে শিবির স্থাপন পূর্ব্বক দ্বৌলীন দিবসত্রয় তথায় বিশ্রাম করিলেন। সে বিশ্রাম নিষ্প্রয়োজনে নয়—দীর্ঘকাল অশ্বপৃষ্ঠে পর্যটন এবং অন্যান্য বিবিধ পথ-কষ্ট জন্য। গম্য স্থানে গিয়াই অভীষ্ট সাধন পক্ষে প্রচুর আয়াস ও চেষ্টা প্রকাশ করিতে হইবে, সুতরাং পঁহুছিবার পূর্ব্বেই সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ পথশ্রান্তি জন্য দেহের কান্তি মলিন ও শ্রীহীন হইয়াছে—রাজধানীতে প্রবেশ মাত্র পাছে চটক দেখাইবার ও লোকের চমৎকারিত্ব জন্মাইবার ব্যাঘাত হয়, তৎপ্রতিবিধান পক্ষে শ্রান্তি দূর করা সুবুদ্ধির কাজ বটে। কেননা, এ সংসারে প্রথম দৃশ্যই লোকানুরাগ আকর্ষণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী! অতএব দুই তিন দিন বিশ্রামে যাপন করিয়া চতুর্থ দিবসের প্রত্যূষে উঠিয়া সসজ্জ হইলেন—পরম উৎসাহে বেলুন পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। বেলুন অতি অপূর্ব্ব চমৎকার অশ্ব! অন্যের হাতে অদম্য ও দুর্দ্দান্ত, কিন্তু স্বীয় প্রভুর কাছে সুবাধ্য, সুশান্ত, সুবোধ—বল্গা বা বাক্য বা পদদ্বয়ের স্পর্শ জনিত ইঙ্গিত মাত্রেই প্রভুর ইচ্ছাসাধক। দেখিতে অতি সুন্দর, স্বভাবে অতি তেজস্বী, গমনে

নামের অনুরূপ—তবে কিনা সে বেলুন আকাশে, এ বেলুন ভূমিতে, এই মাত্র প্রভেদ! একে জৌলানের মুখশ্রী অতি সুন্দর, বক্ষ সুবিশাল, বেশ ভূষা ভঙ্গী বীর-যোগ্য; তাহাতে ঐ অশ্ব, অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য—ঐরাবতে পুরন্দর!

অনুচরগণও সকলেই সম্পূর্ণরূপে তাহার উপযুক্ত—সশস্ত্র, পরিপাটি সজ্জায় সুসজ্জ, সহাস্য বদন, উৎসাহোৎফুল্ল নয়ন, প্রভুর পশ্চাতে স্ব স্ব সুভূষিত মনোহর অশ্বে আরূঢ়। বন্ধু ও ধন্নু সুবাদার ও হাওলদার বেশে প্রভুর উভয় পার্শ্বে (কিন্তু) কিঞ্চিদ্দূরে অবস্থিত। এই ভাবে সৈনিক প্রণালীর পদবিক্ষেপে সুশ্রেণীতে নগর তোরণাভিমুখে চলিলেন।

যে সুপ্রশস্ত বাদশাহী বর্ত্ম দ্বারা দিল্লীর সহিত লাহোর সংযুক্ত—পূর্ব্বাবধি যে পথে প্রতি ক্রোশান্তরে এক একটী পথ-পরিমাপক স্তম্ভ নির্ম্মিত আছে, শতদ্রু নদীর এপারে লুধিয়ানা এবং কর্ণালের মধ্যে যে সুদীর্ঘ স্তম্ভ শ্রেণী অদ্যাপি বহু দূর হইতে দৃষ্ট হইয়া পথিকের পথ ভ্রম নিবারণ করিতেছে; যে পথের উভয় পার্শ্বস্থ দীর্ঘ-শাখ মহা মহীরুহ সমূহ পান্থজনকে সুশীতল ছায়া প্রদান নিমিত্ত আশ্রয়দাতা বান্ধববৎ দণ্ডায়মান আছে; যে পথে "সরাই" নামা প্রচুরায়তন বহু বহু পান্থশালা নির্ম্মাণ-কৌশলে, রমণীয়তায় ও বাসের উপযোগিতায় পথিক মাত্রকেই যেন আহ্বান করিতেছে; যে পথে ঐ সরাই-মালার প্রত্যেকটীর সমীপে একটী করিয়া সুরম্য সরোবর যবন সম্রাট্গণের মহিমা ও পুণ্যের পরিচয় দিতেছে; যে পথের সেই সকল ও অন্যান্য গুণ-গৌরবের ভগ্নাবশেষ লুধিয়ানা এবং অম্বালার মধ্যবর্ত্তী দোরা, কুনা ও রাজঃপুরা জনপদে অদ্যাপি দেখিতে পাইয়া আমরা অতীতের গবেষণা করিয়া চমৎকৃত হই, জৌলীন সেই বিশাল বর্ত্ম অবলম্বনে জগদ্বিখ্যাত লাহোর নগরে প্রবেশ করিলেন!

তোরণ পার হইয়া যতই যান, ততই তাঁহাদের আকৃতি, প্রকৃতি, বেশ, ভূষা, গতি-রীতি, বাহন প্রভৃতির সুষমা ও তেজস্বিতা দেখিয়া লাহোরের রাজপথে চতুর্দ্দিক হইতে পুনঃ পুনঃ শব্দ উঠিতে লাগিল "সাবা'স্, সাবা'স্!" "বাহবা বাহবা জুম্মাণ্ডা" "ক্যা চাঙ্গা ঘোড়া!" "আচ্ছা জোয়ান!" ইত্যাদি বিবিধ। এই ধ্বনি জৌলীনের কর্ণে যেন জয়ধ্বনিবৎ—যেন অভ্যর্থনার মঙ্গলধ্বনি বৎ প্রবেশ করিতে লাগিল!

যাঁহার গন্তব্য স্থানের স্থিরতা নাই, উপযুক্ত বাস-স্থানেরও জ্ঞান নাই,

তাহার পর্য্যটনের শেষ সহজে ঘটে না। এ খানটী ভাল নয়, আরো দূরে দেখি; ও স্থানটা কদর্য্য, অন্যত্র সন্ধান করি; এখানে বাসগৃহ দুষ্প্রাপ্য, আগিয়ে জিজ্ঞাসা করি; এইরূপ বাছনিতে আর এইরূপ জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসায় কত স্থানেই যাইতে হয়। শেষে যখন নিতান্ত শ্রান্ত হয়, তখন যথায় তথায় বসিয়া না পড়িলে চলে না! অনেক বঙ্গীয় পিতা কন্যার জন্য যোগ্য বর বাছিয়া বাছিয়া কন্যার কন্যাকাল যায় দেখিয়া তখন যাহাকে পান, পাত্রস্থ করেন—কপাল ক্রমে হয় তো সু, নয় তো কু পাত্রই ঘটিয়া যায়!

দ্বোলীন সাহেবেরও (এখনো সাহেব বলা আবশ্যক) প্রায় সেই দশা উপস্থিত। বাসা খুঁজিতে খুঁজিতে নগরের প্রায় সকল অংশই দেখা হইল। সেই প্রথম দর্শনের আভাস তাঁহার দৈনিক পুস্তকে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এইরূপ ;—

"উত্তর-পশ্চিম হইতে লাহোর প্রবেশ করিলে বৈচিত্র্য দর্শনে হর্ষ হয়। গ্রীষ্ম প্রারম্ভে রাবী নদীর পুলিনদেশ হরিদ্বর্ণ শোভায় সজ্জিত হইয়া বৃহতী নগরীর সহিত বৈপরীত্য-ভাব প্রদর্শন করে। নগর মধ্যে নবীনত্ব অল্প—এত অল্প যে ভারতের অন্যান্য প্রাচীন নগর দেখিয়া আসিয়া এতদ্দর্শনে মোহিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। অথচ ঐশ্বর্য্য ও জাঁকজমকে লাহোর বড় সামান্য নহে। কিন্তু তথাপি যাহারা ইউরোপের পরিচ্ছন্ন নগরব্যূহ দর্শন করিয়াছে, তাহাদের চক্ষে এ স্থানের পারিপাট্য কোন কোন অংশে হীন বলিয়া বোধ হয়।

"সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ইহাকে একটা বৃহৎ রাজ্যের উপযুক্ত রাজধানী বলিয়া বোধ হইবার পরিবর্ত্তে যেন রণভূমির বিস্তারিত শিবির বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। ফলতঃ রণজিৎ সিংহের পূর্ব্বে স্বজাতীয় ও যবনজাতীয় আক্রমণে পঞ্জাব রাজ্য বার বার ছারখার হইয়াছিল। নগর, গ্রাম, চত্বর সকলই কত শত বার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভগ্ন হইয়া পড়ে। তখন শিখদিগের বাসস্থান এক স্থলে নিরূপিত হইতে পারিত না, তাহারা মুসলমান শত্রুর ঘোর উৎপাতে নানাস্থানী হইয়া শত্রু দমনের সুযোগ সন্ধান করিত।

"তাহাদের তিষ্ঠিবার প্রধান স্থান অমৃতসর, দ্বিতীয় লাহোর। বহু পুরা-কাল হইতে—এমন কি (প্রবাদ মতে) লব কুশের সময় হইতে,* অথবা

* কিম্বদন্তী আছে, লবের নামে লাহোর ও কুশের নামানুসারে কুশরী নগর স্থাপিত হইয়া তথায় তাঁহাদের বংশ পরম্পরা রাজত্ব করিতেন।

(সম্ভাব্য মতে) তাহারও পূর্ব্ব হইতে লাহোর অতি সমৃদ্ধিশালিনী নগরী হইলেও উপর্য্যুক্ত কারণে বহুলাংশে হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছিল। নাদির শাহ ও আহম্মদ শাহ আবদালির কোপাগ্নিতে যুগান্তর স্থায়ী মন্দির প্রাসাদাদি সহিত লাহোর দগ্ধাবশেষ ও ভগ্নাবশেষ হইয়াও তাহার যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ঘরাও উপদ্রবে বিনাশ-গ্রাসে পড়িয়াছিল। তিন তিন বার এই অতি প্রাচীন রাজধানীর সম্পূর্ণ উচ্ছেদ দশা ঘটে।

"যখন মহারাজা রণজিৎ এই লাহোরে স্বীয় 'সিংহাসন স্থাপন' করেন, তখন তাঁহাকে এক প্রকার নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়া লইতে হয়। তাঁহার বিপুল যত্নেও ইহার পূর্ব্বাবস্থা সম্যগ্‌ রূপে পুনরুদ্দীপিত হইতে পারে নাই। প্রমাণ স্বরূপ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পূর্ব্বকালে এই বিখ্যাত বিশাল নগরটী ষট্‌ত্রিংশৎ ভাগে বিভক্ত ছিল, তাঁহার সময়ে কেবল ষড়ংশে মাত্র। তথাপি রণজিতের লাহোর, আয়তনে কলিকাতা অপেক্ষা ন্যূন নয়। রণজিৎ চারি ক্রোশ ব্যাপী স্থান লইয়া চতুর্দ্দিকে অনুপম সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন সুদৃঢ় প্রাচীর পরিখাদি দ্বারা বেষ্টন করিয়াছেন। নগরের দ্বাদশটী তোরণ; প্রতি তোরণের ভিতর বাহিরে দুইটী করিয়া ফটক, বৈরী পক্ষ একটা লঙ্ঘন করিলেও অপরটী আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে ঘোর গোলা-বৃষ্টি সহ্য করিতে বাধিত হয়।

"আমার প্রথম-প্রবেশ-কালের দৃষ্টিজনিত বর্ণনা আর অধিক সম্ভবে না।"

সে যাহা হউক, প্রথম নিদাঘের তপনতাপ উপেক্ষা করিয়াও প্রায় সমস্ত সহর ঘুরিয়া বেড়াইলেন, তথাপি মনোমত বাসস্থান পাইলেন না!

যদিও তাঁহার এই দেশেই জন্ম, কিন্তু সাহেব সমাজে জীবন ক্ষেপণ বশতঃ এদেশীয় অপরিষ্কৃত পল্লী মধ্যে বাস করা সহসা তাঁহার রুচি-সম্মত হইতে পারা দুর্ঘট। বিশেষতঃ তিনি যদি তদ্রূপ পল্লীতে বাস করেন, তবে তাঁহার সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয়ত্ব ভাব লোকের চক্ষে, বিশেষতঃ রাজসভার নিকট, সমর্থিত হইত কিনা সন্দেহ।

এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া পুনর্ব্বার নগর বাহিরেই শিবির স্থাপন বা কোন উদ্যানাদির সন্ধান বা মহারাজার বড় বড় ইউরোপীয় কর্ম্মচারীরা কোথায় থাকেন, তন্নিরূপণ করা আবশ্যক, বুঝিয়া তাহারই চেষ্টা পাইতেছেন, এমত কালে ভাগ্য প্রসন্ন হইয়া "বাসার সহিত আশার সুসার" পক্ষে সুযোগ ঘটাইয়া দিল!

একজন সম্ভ্রান্ত বড় সাহেব দলে বলে আসিয়া বাসার জন্য কাতর হইয়া বেড়াইতেছেন, এই কথা শুনিতে পাইয়া কোন উচ্চপদস্থ নগরবাসী (তাঁহার পরিচয় পরে প্রকাশ্য) উপযুক্ত লোক দ্বারা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় ভবনে লইয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ আলাপে সন্তুষ্ট ও সদয় হইয়া নগরের একটী তোরণ-দ্বারের বাহিরেই স্বীয় সুরম্য উপবনে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সে অবস্থায় এ অনুগ্রহ সামান্য অনুগ্রহ নয়! অতি মিষ্ট বাক্যে বিশেষ শিষ্টাচারে দোলীনকে মহা প্রীত করিয়া সঙ্গে অনুচর দিয়া অবিলম্বে উদ্যানে পাঠাইয়া দিলেন। অকূলে কূল লাভের ন্যায় এই আশ্রয় পাইয়া গুণাকর দোলীন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে উর্দ্ধ নেত্রে মহোচ্চ পবিত্র নাম স্মরণ পূর্ব্বক সদলে গম্যস্থানে গমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নব নিবাস।

যে ব্যক্তি দোলীন সাহেবকে উদ্যান দেখাইতে ও উদ্যান রক্ষককে প্রভুর আদেশ জানাইতে তাঁহার সঙ্গে চলিলেন, তাঁহার নাম রতন সিং। তিনি নিম্নশ্রেণীর ভৃত্য নন, উচ্চ কর্ম্মচারী। লাহোরের সঙ্কীর্ণ রাজপথ সমূহ অতিবাহন পূর্ব্বক তিনি তাঁহাদিগকে “মচি-ফটক” দিয়া নগরের বাহিরে লইয়া গেলেন; বাহিরে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন। প্রাচীন মসিদ, প্রাচীন মন্দির, রাজপুরীর ন্যায় বড় বড় প্রাসাদ এবং বড় বড় সমাধি-নিকেতন প্রভৃতির রাশি রাশি ভগ্নাবশেষ, পথের উভয় পার্শ্বে, নিকটে ও দূরে দৃষ্ট হইল। রতন সিং বুঝাইলেন, পূর্ব্বে নগরের আয়তন আরো বহু বিস্তৃত এবং পর্য্যায়ক্রমে হিন্দু, মুসলমান ও শিখাধিকৃত ছিল, এ সব তাহারই নিদর্শন। ভগ্নস্তূপাদির মধ্যে মধ্যে দেশীয় ও ইউরোপীয় (মিশ্রিত) প্রণালীর আধুনিক উদ্যান ও বাটী কয়েকটীও বিলোকিত হইল। মহারাজার অধীনে যে সকল ইউরোপীয় কর্ম্মচারী নানা পদে নানা কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন, এই সব বাগিচা-বাটীতে তাঁহারাই বাস করেন।

দেখিয়া শুনিয়া দোলীনের হর্ষ হইল। ইউরোপীয় পল্লীতে অবশ্যই

প্রার্থনীয় ও অভিপ্রেত সৌভাগ্যবলে তাহাই ঘটিল। অযাচিত ও অভাবনীয়রূপে সে ঘটনার সংঘটন—সে বাসনার সংপূরণ হইল! ঠিক যেন করুণাময় পরম পিতার অপার করুণার বিকাশ, নিঃসন্দেহরূপে বোধগম্য হইয়া প্রচুর আশা ভরসা সাহস জন্মিল—আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা রসে হৃদয় আপ্লুত হইয়া একান্ত চিত্তে সেই বিভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করিলেন! কিন্তু যতই যান, ক্রমশঃ ধ্বংসাবলী দর্শনে মন হইতে স্বার্থ-ভাব বিদুরিত এবং সংসারের অনিত্যতা-ভাব সঞ্চারিত হইয়া বদনে বিষাদ ও গাম্ভীর্য্য-ভাব প্রকটিত হইল!

আপনা আপনিই বলিতে লাগিলেন "হায়! বহু শত বর্ষে, বহু পুরুষানুক্রমিক যত্নে, বহু অর্থ রাশি ব্যয়ে যে সব মনোহর পদার্থ রচিত হয়, উন্মত্ত মানব বিপ্লব-শাসনে অন্ধ হইয়া তাহা এক দণ্ডের মধ্যেই বিনষ্ট করিয়া ফেলে! এই মহানগরও সেই প্রকার মত্ততার কোপানলে এতদূর উৎসন্ন গিয়াছে যে, রণজিৎ সিংহের ন্যায় অদ্ভুত প্রভাবশালী মহৎ ভূপতিও মহোদ্যম করিয়া তাহার পুনর্জীবন দানে সমর্থ হইতেছেন না!"

এমত কালে সহসা একজন অশ্বারোহী পথপার্শ্বস্থ একটী গলিপথ হইতে তাঁহার পার্শ্বে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার উক্ত তত্ত্বালোচনার ব্যাঘাত জন্মাইল।

এ ব্যক্তি ক্ষুদ্রকায় ও চঞ্চল। আকার দর্শনে একবার বোধ হয় সরল ও সুচতুর ভদ্র, আবার বোধ হয় ধূর্ত্ত ইতর। জাতিতে মুসলমান। নিকটস্থ হইয়া সেলাম করিল। যে উক্তি সে শুনিয়াছিল, সেই উক্তির ব্যাঘাত জন্মাইয়া কহিল, "আঃ সাহেব! আপনার কথার ভাবেই বুঝেছি, আপনি আমির লোক! নইলে এই সব দেখে আপনার মন গ'লে যেতো না। কিন্তু আপনি যে রাজা রণজিৎকে 'মহৎ' ব'লে ব্যাখ্যা ক'ল্লেন, তা কেমন ক'রে বলেন? দীনদুঃখীর কুঁড়ে ভেঙে বড়মা'নুষের বাড়ী করা কি মহতের কাজ? এ সহরে যা কিছু দেখে এলেন, সকলই লুটতরাজ অত্যাচারের ফল! এই যে সহরের চৌগের্দ্দা আশ্চর্য্য প্রাচীর দেখ্‌ছেন, অমৃতসর সহরের এক ধনী সদাগরের ধনেই এ হ'য়েছে! তাই কি, তার টাকাগুলো দুঃখী রাজমিস্ত্রী মজুরেরা সব পেয়েছে? তাদের নাম ক'রে আনা হ'য়েছে, বটে, কিন্তু তদ্বরককারী সর্দ্দারগণেরই পেট পুরেছে!"

সে হয় তো আরো কত কি বলিত, কিন্তু দ্বৌলীন বলিতে দিলেন না। তিনি ভাবিলেন, অজ্ঞাত দেশে এমন অজ্ঞাত লোকের সহিত এরূপ আলাপ ভাল নয়—সাবধানে কথা কওয়া ও শুনা উচিত। এই ভাবিয়া বলিলেন, "যাই হ'ক্ ভাই, তুমি আমি কিছু মহারাজার বিচার-কর্ত্তা নই। তিনি এ রাজ্যের রাজা। যিনি তাঁকে রাজপদ দিয়েছেন, মহারাজা সেই ঈশ্বরের কাছে গিয়েই আপন কর্ম্মের জবাবদিহি ক'র্বেন!" ঐ ভাবের কথা একবারে উড়াইবার অভিলাষে আবার বলিলেন, "তোমাদের মহাকবি সাদি তো ব'লে গেছেন—

'দরিদ্রের হৃদয় ধূমাকারে স্বর্গে উঠে! পঞ্চাশ ষাইট বৎসরে যখন সব এক হবে, তখন বেসমের বালিস আর তুচ্ছ তুলার বালিসে কি আইসে যায়?'—সেখানে যে সব সমান!"

আগন্তুক হাসিয়া বলিল "সাহেব শুধুই আমির নন, কবি ও দার্শনিক, দুইই বটেন! যা হ'ক্ হুকুম হয় তো, সরকারে হাজির থাকি? গোলাম কাজেও লা'গ্‌তে পারে!" শেষের কথাটা একটু হস্ত ও নয়নের ভঙ্গী বিশেষ সহকারে বলা হইল।

তাহার চতুরতা, তৎপরতা ও আকার প্রকার দেখিয়া দ্বৌলীনের কৌতূহল ও কিঞ্চিৎ সন্তোষ জন্মিল। সুতরাং তাহাকে স্বীয় আবাস নির্দ্দেশ পূর্ব্বক "সময়ান্তরে দেখা হইবে" বলিয়া দিলেন। সেলাম করিয়া সে চলিয়া গেল। তাঁহারাও পরক্ষণেই উদ্যানে উপস্থিত হইলেন।

সাহেব অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ ও সঙ্গিগণের যথোপযুক্ত বাসস্থানাদি নির্দ্ধারণান্তে আপনার অবস্থান-গৃহে গমন করিলেন। বন্ধুর সাহায্যে সজ্জাদি পরিত্যাগ, স্নান মার্জ্জনাদি সমাপন, দ্রুত-প্রস্তুতীকৃত শুষ্ক চাপাটি ও সরস সুরুয়া বিশেষে ক্ষুন্নিবারণ করিয়া নিদাঘ-তাপজনিত শ্রান্তির শান্তি লাভার্থ সুরম্য বারাণ্ডায় অর্দ্ধ শয়ন, অর্দ্ধ উপবেশন ভাবে কিয়ৎকাল থাকিয়াই স্মরণ হইল, আশ্রয়দাতা পরমোপকারী উদ্যানাধিকারীর প্রতি পত্রদ্বারা সমুচিত অভিবাদন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আবশ্যক—তাহাতে কালবিলম্ব অনুচিত।

পূর্ব্বে বোধ হয় বলি নাই যে, যৎকালে তিনি কোম্পানির কাপ্তেনী ও মেজরী পদে অধিষ্ঠিত, সেই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে উর্দ্দু, হিন্দী ও বাঙ্গালা প্রভৃতি এ দেশীয় কয়টা ভাষা ন্যূনাতিরেকে শিক্ষা করিয়াছিলেন। এবার সুলতান

আসিয়া অবধিও এই কয়মাস আরো অসীম যত্নে সে সকলের বেশী অনুশীলন করিয়াছেন। এখন তাহা প্রচুর কার্য্যে লাগিল।

তৎক্ষণাৎ উর্দ্দু ভাষায় একখানি বিনয়গর্ভ সুন্দর পত্র লিখিয়া কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের চিহ্নস্বরূপ তৎসহ একটী সুবিচিত্র সুবর্ণ ঘটিকা প্রেরণ করিলেন। যাঁহার উদ্দেশে এই উপহার প্রেরিত হইল, রাজ্য মধ্যে তিনি সামান্য ব্যক্তি নহেন। তিনি মহারাজার অতি বিশ্বাসী প্রিয়তম মুখ্য পাত্র, তাঁহার ক্ষমতা ও প্রভুত্ব প্রচুর। তিনি আর কেহই নন—সুপ্রসিদ্ধ "ফকির আজিজুদ্দিন।" তাঁহার বিস্তারিত বিবরণ উপযুক্ত স্থলে লিখিত হইবে।

কিন্তু দৌলীন তৎকালে তাঁহার সেই আশ্রয়দাতা ভূস্বামীর নাম ব্যতীত অন্য মাহাত্ম্য তথ্য বিশেষ কিছুই শুনেন নাই। কেবল তাঁহার বাটীতে স্বল্পক্ষণ তিষ্ঠিয়া এবং তাঁহার সহিত যৎকিঞ্চিৎ আলাপ করিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যে একজন উচ্চ শ্রেণীস্থ মহানুভব বিজ্ঞ ব্যক্তি, এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

সেই অবশ্য-প্রতিপাল্য কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া পুনর্ব্বার বিশ্রামের চেষ্টায় আছেন, এমত সময় উদ্যানে ঘোটক-পদের খট্ খট্ শব্দ শ্রুত হইল। দৌলীন মুখ বাড়াইয়া দেখিতে পাইলেন, পথের সেই মুসলমান আগত! একটী উত্তম অশ্ব-পৃষ্ঠে আরূঢ়! দেখিতে অবিকল সৈনিক তুল্য নয়—অশ্বও না, আরোহীও না—আংশিক বটে। লোকটীকেও অর্দ্ধেক ভদ্র বলিয়া বোধ হয়। গৌর-বর্ণ; খর্ব্বও না, দীর্ঘও না; স্থূলও না, কৃশও না; কিন্তু সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ বটে। মাথায় লম্বা চুল, কপাল সঙ্কীর্ণ, চক্ষু ক্ষুদ্র দৃষ্টি প্রখর ও চঞ্চল, নাসিকা অল্প উন্নত, ঈষৎ বক্র, মুখখানি গোল, খুব ডাগর নয়—অল্প পরিমাণে সহাস্যও বটে—তাহাতে সাহস, ধৃষ্টতা, চতুরতা, অথচ সরলতা যেন খেলা করিতেছে। গোঁপ দাড়ি আছে, খুব লম্বা নয়। নিম্ন অঙ্গে মুলতানী কাল রেসমের শাদা ডোরাওয়ালা পাজামা; ঊর্দ্ধে শাদা ফুল-ওয়ালা মস্‌লিনের চাপকান; স্কন্ধে পীতবর্ণের রেসমী দোপাট্টা; মস্তকে শাদা মসলিনের উচ্চ পাগ্‌ড়ি।

বন্নু আসিয়া বলিল "চাঁদ খাঁ—"

"চাঁদ খাঁ কে?"

"হুজুর! সাবধান—পথে সেই মুসলমান—

বন্ধুর মুখ হইতে সকল কথা বহির্গত না হইতেই এবং সাহেবের মুখ হইতে অনুমতি বাহির না হইতেই, চাঁদ খাঁ স্বয়ং সমীপে আসিয়া উপস্থিত এবং "সেলাম আলেকম, সাহেবের মেজাজ সেরিফ!" ইত্যাকারের সৌজন্য-সূচক বাক্যে দণ্ডায়মান! ভাব খানা, ঠিক যেন কতকালের পুরাতন বন্ধু!

এই আশাতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া দ্বৌলীন মনে মনে কিছু বিরক্ত হইলেন—কি বলিবেন, কি করিবেন, স্থির করিতে পারিতেছেন না—চাঁদ খাঁ তুষার দ্রব করিয়া দিল! বলিল—

"আমার এরূপ আসাতে সাহেব আশ্চর্য্য বোধ করিতে পারেন, কিন্তু অনুগ্রহকারী প্রশ্রয়দাতা প্রভুর কাছে গোলামের শত অপরাধ মাপ হইতে পারে। অতএব হুজুর অসন্তুষ্ট হইবেন না!"

দ্বৌলীন। না, এমন বিশেষ অসন্তোষ নয়—তবে কিনা, আমরা যে দেশের লোক, সে দেশে দর্শন মাত্রেই কিম্বা মুহূর্ত্তেকের আলাপেই পরস্পরে ততটা বিশ্বাস করে না।

চাঁদ খাঁ। হুজুর যাহা বলিলেন, তাহা সত্য। কিন্তু কাবুলের লোকে এক কথায় যেমন বিশ্বাস করে ও বিশ্বাস জন্মায়, তেমনি এক কথাতেই আবার আঘাত দ্বারা মারিতে প্রস্তুত! তাহাদের নিজের স্ত্রীলোকের ন্যায় তাহাদের অন্তঃকরণ সহজেই ভাল মন্দতে শীঘ্র বশীভূত ও উত্তেজিত হয়।

দ্বৌলীন। আমি দেখ্‌ছি ভাই, তোমার ব্যবহার যেমন, তোমার বাক্যও তেমনি অদ্ভুত। প্রথমতঃ আমি জানিতে চাই, তুমি কে?

চাঁদ খাঁ। আমার পরিচয়, সাহেব, কি শুনিবেন? এক কথায় বলিতে গেলে, আমার বাস ও ব্যবসায়ের স্থিরতা নাই; আমি এখন দুনিয়ার ভ্রমণ-কারী; সংসারী লোকের বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমি জাতিতে পাঠান, কাবুল আমার পৈতৃক দেশ, কয় পুরুষ হইতে আমরা মুলতানের রাজসংসারে বড় বড় চাকরিই করিয়া আসিতেছি। এই এক-চ'কো * শিখ্‌ যখন মুলতান আক্রমণ করে, তখন মুলতানের দুর্গ রক্ষা জন্য মুজঃফর খাঁর পার্শ্বে যুদ্ধ করিতে করিতে আমার পিতা ধরাশায়ী হন। ছয় মাস কাল অবরোধে থাকিয়া ও প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও যখন আমরা দুর্গ রক্ষা করিতে

* মহারাজ রণজিতের এক চক্ষু কানা ছিল।

পারিলাম না, তখন মুলতান রাজা কাজেই এই কাফের রাজার হইল—আমাদের দেশ আর আমাদের রহিল না। আমাদের আমীর-পুত্রকে বন্দী করিয়া লাহোরে আনিল; সেই সঙ্গে আমাদের অনেকেই আইল, আমিও আইলাম। রণজিৎ সিং সরফরাজ খাঁকে যে ভাতা দিতেছে, তাহাতে তাঁহার নিজের পরিবারের ভরণ পোষণই হওয়া ভার, তিনি কিরূপে আর আমাদিগকে পুষিতে পারেন? তাঁহার পূর্ব্বকার মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারী দলের মধ্যে কেহ কেহ গোছে গাছে তাঁহার কাছে আছেন, আমরা আর সকলে (বহু জন) জানাইয়া বেড়াই যে তাঁহারি খাই পরি, কিন্তু বাস্তব তাহা নয়—তাঁহার নামের দোহাই না দিলে দুষ্ট শিখেরা আমাদের উপর সন্দেহ করিত—এতেও করে—

দোলীন। তবে তোমরা বাস্তবিক কি কাজে জীবিকা নির্ব্বাহ কর?

চাঁদ খাঁ। আমরা কেউ বা ব্যবসায়, কেউ বা পহল গ্রহণ * প্রভৃতি নানা ছল করিয়া ফিরি।

দোলীন। (সবিস্ময়ে) ছল করিয়া?

চাঁদ খাঁ। হাঁ সাহেব, ছল—কেবলই ছল—বাস্তব সে সব আমরা কিছুই করি না! (চতুর্দ্দিকে দেখিয়া মৃদুস্বরে) আপনি বড় উচ্চ দরের সাহেব, আপনার নিকট গোপন করিব না; আমরা এই সব ছদ্মবেশে আমাদের অপহারকদের অপহরণ করি! রাইয়ৎ, ভ্রমণকারী, অন্য জাতীয় সদাগর এবং মুসলমান মাত্রকেই আমরা স্পর্শ করি না; কিন্তু যো পাইলে পরস্বাপহারী দুষ্ট শিখ লোকের সম্পদ হরণ করি! ও কুত্তাদের উপর আবার দয়া কি? তাদের সম্পর্কে আবার ন্যায় অন্যায় বিচার কি? হুজুর অবশ্যই স্বীকার পাইবেন, যাহারা আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহাদের ধন মান, গোপনে হ'ক্, সদরে হ'ক্, হরণেই বা অধর্ম্ম কি?

এই বক্তৃতার শেষ সময় চাঁদ খাঁর ক্রোধোদ্রেক হওয়াতে, পূর্ব্ব সতর্কতা—চারিদিক্ দেখা, মৃদুস্বরে কথা কওয়া, কিছুই আর থাকিল না। ক্রমে স্বর উচ্চ, ওষ্ঠাধর কম্পিত, নয়ন আরক্ত, দক্ষিণ হস্ত কটিস্থিত তরবারি স্পৃষ্ট হইল—যেন বিপক্ষ শিখ সম্মুখে! তদ্দর্শনে দোলীন বলিলেন—

* শিখদিগের সম্প্রদায় বিশেষের প্রবর্ত্তক গোবিন্দের ব্যবস্থা মতে শিখধর্ম্মাবলম্বন।

"এই ব্যবহারে তোমাদের কি বিপদ ঘটে না? মহারাজ কি এতই অসাবধানে রাজত্ব করেন যে, ইহার কিছুই জানিতে ও শাসন করিতে পারেন না?"

চাঁদ খাঁ। আ, সাহেব, আমরাও কি এত অসাবধানে কাজ করি যে, কাফেররা খামকা ধরিতে পারিবে? জানে; তারা জানে; না জানে, তাও নয়—বিপদও ঘটে, কখন কখন কারো কারো যে না ঘটে, তাও নয়—সে অবস্থায় ঘুস ঘাস রকম সকমে কেটে যায়—কখনো বা নাও কাটে, প্রাণ দণ্ড পর্য্যন্তও ঘটে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত দু চারিটা বৈ বেশী হইতে পারে নাই। দরবারেও ছদ্মবেশে আমাদের লোক আছে, তাহাদের বুদ্ধি কৌশলেও অনেকটা বাঁচন। আর আমরা খুব হুঁসিয়ারিতে—যত দূর সম্ভব—খুব গোপনেই স্বকার্য্য সাধন করি। আবার নিতান্ত আত্মরক্ষা ভিন্ন রক্তপাত করি না। যথা;—দেখিলাম, একজন সাক্ষীর দ্বারা আমাদের গূঢ় রহস্য প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা, অমনি তাহাকে যে কোন উপায়ে—যে কোন সুযোগে হউক—পঞ্জাবে, এবং দরকার মতে (চুপি চুপি) ইহলোকেও থাকিতে দিই না—সে কিন্তু অপার্গ্যমানে! আরো হুজুর, এই ঘোর পাপিষ্ঠ ঘৃণিত জাতির বেশ ভূষা পরিয়া শিখ সাজিতেও বাধিত হই, তাহাতেও অনেক নিস্তার!

দৌলীন। (মনে ঘৃণা ও দেহে লোমাঞ্চ হইতেছে, তথাপি ধৈর্য্যাবলম্বনে) পোষাক যেন পরিলে, তবু ত পাঠান ও শিখের আচার ব্যবহার কথাতে যে এত প্রভেদ, তাতেও কি তোমাদিগকে তারা চিনিতে পারে না?

চাঁদ খাঁ। অনেকে চিনিতেও পারে—পোষাকাদি সমান হইলেও সন্দেহ করে, কিন্তু তবু গোলেমালে চলিয়া যায়—চলিয়া যাইবার সুবিধাও আছে। হুজুর এত বহুদর্শী বিজ্ঞ হইয়াও কি বুঝিতে পারেন না যে, নানাবিধ জাতির গুঁছা কুড়াইয়া যে জাতি হইয়াছে, সেই শিখ জাতির মধ্যে মিশিতে কঠিন কি—সে জাতির মধ্যে যে নানা রকমের লোক থাকিবে, তাহাই বা বিচিত্র কি? যে জাতীয় হউক, পহল গ্রহণেই যখন শিখ হইতে পারে, তখন ছদ্মবেশী শিখ সাজিবার ভাবনা কি? বাজারে যাউন, গিয়া যে সে একটা পাহাড়িয়া বুনোকে বা ইতর লোককে ধরিয়া একটা উচ্চ ধরণের জরদ কি নীল পাগড়ি, একটা পরিষ্কার চাপকান, একটা কোমরবন্দ পরাইয়া

দিউন ; তাঁহার দাড়িটা কোন মতে লম্বা করিয়া আঁচড়াইয়া, তাহার কোমরে যেমন তেমন একখান তলয়ার ঝুলাইয়া, তার হাতে এক গাছি লম্বা বল্লম ধরাইয়া, তাহাকে একটা চাঙ্গা ঘোড়ায় চড়াইয়া দিউন, তবেই সে পাকা শিখ বা সিং হইয়া উঠিবে—আর তাহার হাব ভাব আচার ব্যবহার ভাষার কথা কেউ জিজ্ঞাসাও করিবে না!

ঢোলীন। আচ্ছা, চাঁদ খাঁ, ঐ যে রক্তপাতের কথা—ঐ যে সাক্ষী সরাইবার কথা বলিলে, সে কাজ তোমার নিজের হাতে কয়টা হইয়াছে?

চাঁদ খাঁ। (স্বীয় শ্রুতি-রন্ধ্রদ্বয়ে অঙ্গুলিদ্বয় প্রদান পূর্ব্বক) হুজুর! খোদাবন্দ! গরিব-পরওয়াজ! মাপ করিবেন—বিনা সম্মুখ যুদ্ধে সে কাজ করি, এমন বংশে জন্ম নয়! সে রকমের লোক আলাদা আছে—যদি বিশ্বাস করেন—কেনই বা না করিবেন—যে আপন মুখে আপনাদের এত মর্ম্মান্তিক কথা বলিতে পারে, তাহার কথা কি বলিয়াই বা বিশ্বাস না করিবেন—আপনাকে যথার্থ বলিতেছি, যদি একা আমার মত লইয়া কাজ হইত, তবে সেরূপে সাক্ষী সরান কদাচ ঘটিত না—আমার অনুরোধেই আফ্‌গানস্থানের কোন পার্ব্বত্য দুর্গে সেরূপ সাক্ষী প্রভৃতিকে এখন প্রায় আটক করিয়াই রাখা হয়।

আকার প্রকার দেখিয়া চাঁদ খাঁর এই কথাও সাহেব প্রত্যয় করিয়া সুখী হইলেন।

ঢোলীন। (সহাস্যে) সে যাহা হউক, চাঁদ খাঁ, তুমি তো খুব স্পষ্টভাষী সাহসী পুরুষ—যাহার তাহার সমক্ষে গুপ্ত কথা ফুটিতেও তোমার ভয় হয় না?

চাঁদ খাঁ। (সহাস্যে) না, সাহেব, তা নয়; আপনি আমাকে যত নির্ব্বোধ জ্ঞান করিতেছেন, আমি তত বোকা বাচাল নই। আমি সাহসিক সজ্জন সৈনিক চিনিতে পারি—আমি ইউরোপীয় উচ্চ ধাতুর লোক চিনি—তাঁহারা বিশ্বাসঘাতক নন—প্রাণান্তেও গুহ্য কথা প্রকাশ করিয়া বিশ্বাসস্থাপকের অনিষ্ট করেন না! যদি বলেন, তথাপি নিষ্প্রয়োজনে অজ্ঞাত ব্যক্তির নিকট এমন সকল গুপ্ত রহস্য বলি কেন?—বলিবার অভিপ্রায় আছে।

ঢোলীন। কি অভিপ্রায়?

চাঁদ খাঁ। প্রথম দর্শন হইতেই, আপনার প্রজ্বলিত চক্ষু দেখিয়াই বুঝিয়াছি, আপনি উৎসাহময় সাহসের কাজ ভালবাসেন—আপনি নব আগত, এখনো কুচক্রীদের কুচক্র-জালে জড়িত হয়েন নাই—আমাদের যদি এত দূর সৌভাগ্য হয় যে, আপনাকে আমাদের দলের নায়ক রূপে পাই—*

দ্বৌলীন। আর না—যথেষ্ট হইয়াছে—

চাঁদ খাঁ। (সেলাম পূর্ব্বক) তাহা না হইলেও সাহেবের হাতে আমার যে কোন শঙ্কা নাই, তাহা বেস জানি।

দ্বৌলীন। সত্য বটে, আমার হাতে সে আশঙ্কা নাই, কিন্তু তথাপি সাবধান! যাহার তাহার নিকট এত সরল হইও না।

চাঁদ খাঁ। আ সাহেব, আমরা মানুষ চিনি—

দ্বৌলীন। (সহাস্য) কৈ চিনিলে? চিনিতে তো ঐরূপ প্রস্তাব কদাচ করিতে না—তাহার আভাষ মাত্রও দিতে না! যাউক, সে কথা যাহাই হউক, এখন আমার আত্ম সম্বন্ধে কিছু কথা হউক।

চাঁদ খাঁ। দোহাই খোদাবন্দ! হুজুর স্বচ্ছন্দে গোলামের প্রতি যা ইচ্ছা হুকুম করিতে পারেন।

দ্বৌলীন। চাঁদ খাঁ, তুমি যখন আমাকে এত বিশ্বাস করিলে, তখন আমারও উচিত তোমাকে আমার মনের কথা কিছু বলা। আমি আজ এই পর্য্যন্ত বলিতে চাই, রাজ-দরবারের অনুগ্রহ লাভের আশাতেই আমার আসা। কিন্তু আমি তো দরবারের কি এ রাজধানীর কাহাকেও চিনি না, কিছুই জানি না। তুমি কি আমাকে সে সকল বিষয়ে কিছু পরিচয় দিতে পার? ইটা মনে করিও, তুমি আপনা হইতে এত কথা বলিলে বলিয়াই আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। (ফলতঃ দ্বৌলীন ভাবিলেন, এ ব্যক্তি যখন দরবার সংক্রান্ত কোন বড় লোকের দলভুক্ত নয়, বরং বিপরীত, তখন এ অপক্ষপাতে সংবাদ দিতে পারিবে) অতএব যদি কোন বাধা না থাকে,

* চাঁদ খাঁর এই বৃত্তান্ত পাঠে এরূপ ঘটনা অসম্ভব বলিয়া যাঁহারা সন্দেহ করিবেন, তাঁহাদের প্রবোধার্থ নিবেদন যে, বিখ্যাত স্যার হেনেরি লরেন্স মহোদয় এ প্রকারের অবিকল ঘটনা চাক্ষুষ করিয়াছেন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ ইংরাজেরা যখন এদেশে প্রথম আগমন করেন, তখন তাঁহাদের প্রতি লোকের এমনি অসীম বিশ্বাস ছিল। হায় সে দিন!!

আর তোমার ভালরূপ জানা থাকে, তবে বল দেখি, দরবারের ও রাজকীয় ব্যাপারের ভাবগতিক কিরূপ? কাহার প্রতি মহারাজার অধিক অনুগ্রহ—অধিক বিশ্বাস? কাহার কথাই বা তিনি বেশী শুনেন? অথবা রাজ্যমধ্যে কাহার প্রভুত্ব প্রবল? মহারাজার প্রকৃতি কে বেশী বুঝে? প্রধানগণের মধ্যে কাহার কিরূপ স্বভাব?

আমরা এই প্রশ্ন গুলি একত্রে লিপিবদ্ধ করিলাম, কিন্তু দ্বৌলীন এ প্রণালীতে জিজ্ঞাসা করেন নাই। তিনি একে একে জিজ্ঞাসা করিয়া এক একে উত্তর পাইয়াছিলেন। চাঁদ খাঁ আহ্লাদ পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় সারল্য ও উৎসাহ সহকারে সমস্ত প্রার্থয়িতব্য বিষয় ও প্রধান মন্ত্রীবর্গের নাম, ধাম, গুণ-মাসা জ্ঞাত করাইল। তবে মধ্যে মধ্যে অনেকের উদ্দেশে যে পবিত্র বাক্য কতক গুলি উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহা তো প্রত্যাশাই করা যায়—পাঠকগণকে তাহা আর খুলিয়া বলিয়া কষ্ট দিলাম না।

এই কথোপকথন অনেকক্ষণ চলিতেছিল, সম্পূর্ণ শেষ হইতে না হইতেই বয় আসিয়া সংবাদ দিল, ফকির আজিজুদ্দিনের ভ্রাতা কালিফা নুরদ্দিন বাহাদুর আগমন করিয়াছেন। দ্বৌলীন কালিফাজীকে সেই স্থানেই আনিতে আজ্ঞা দিলেন। কালিফাজী আইলে তিনি তাঁহার যথোচিত সৎকার সম্ভাষণ করিলেন। কালিফার দর্শনে চাঁদ খাঁ কিছু মাত্র ভীত বা কুণ্ঠিত হইল না, বরং যতক্ষণ তাঁহাদের প্রথম স্বাগত ও শিষ্টাচার চলিতেছিল, ততক্ষণ স্বচ্ছন্দে বসিয়া থাকিয়া পরে রীতিমত বিদায় গ্রহণান্তে চলিয়া গেল!

কালিফার সহিত দ্বৌলীনের অবাধে কথোপকথন হইল। কালিফার মসৃণ মুখমণ্ডলে বুদ্ধি-চাতুর্য্যের প্রাখর্য্য বিলক্ষণ প্রকাশ পাইল। উভয় পক্ষেই শীলতা ও শিষ্টবাগ্মীতার ত্রুটি হইল না। এই প্রথম আলাপ যে গাঢ় আত্মীয়তায় পরিণত হইতে পারিবে, এমন প্রত্যাশা উভয়ের মনেই সমুদিত এবং বাক্যেও প্রস্ফুটিত হইল। কালিফাজী এরূপ আভাষ পর্য্যন্ত দিলেন যে, কোন বিশেষ কারণে তাঁহার অগ্রজ মহাশয় সাহেবের সহিত মিত্রতা করিতে ইচ্ছুক। দ্বৌলীন আন্তরিক বাধ্যতা স্বীকার করিলেন।

তিনি চাঁদ খাঁর মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন এবং এখন যাহা জ্ঞাত হইলেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝিলেন যে, যদিও সকল প্রধানের সহিতই সৌহৃদ্য করা উচিত, তথাপি ফকির বাহাদুরের পক্ষাবলম্বন ও বশ্যতা স্বীকার অধিক পরি-

মাণে ও সর্ব্বাগ্রে নিতান্তই আবশ্যক। ফকিরের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে পারিলেই তাঁহার পঞ্জাবাগমনের উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব। অতএব সানন্দচিত্তে ভ্রাতাদ্বয়ের মনোমত আচরণ (আত্মগৌরব ও ধর্ম্ম রক্ষা পূর্ব্বক) করিবার সংকল্প কালিফাজীকে জ্ঞাপন করিলেন।

কালিফাজীও সাহেবের দেদীপ্যমান সারল্য, সাহস, বুদ্ধিমত্তা, বাক্‌পটুতা এবং প্রীতিকর রূপযৌবন দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বীয় সহোদরের সহিত যাহাতে তাঁহার গাঢ় বাধ্য-বাধকতা জন্মে, তৎপক্ষে যথোচিত চেষ্টা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। বাস্তবিকও মনে মনে সে সংকল্প আঁটিয়া গেলেন। এতদূর পর্য্যন্ত ধার্য্য হইল যে, পরদিন সাহেব যাহাতে দরবারে উপস্থিত হইতে পারেন, তাঁহার অগ্রজ দ্বারা তদুপায় অবশ্যই করা হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাজ-আহ্বান।

প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ দ্বৌলীনের চির অভ্যাস। দরবারে যাইবার আশায় পরদিন আরো প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিলেন। পূর্ব্ব রজনীতে অনুচরগণের প্রতি যেরূপ আদেশ দেওয়া ছিল, তদনুসারে তাহারাও অতি তৎপর প্রস্তুত হইল। বিশ্বাসী বন্নু ও তৎসহকারী ধন্নু, ইংরাজ-অশ্বারোহী সুবাদার ও হাওলদারের ন্যায় বেশভূষায় আপনারা সুসর্জ্জিত হইয়া অন্য সকলকেও যথাযোগ্য জমকালো পোষাক ও অস্ত্রশস্ত্রে সুশোভিত করিয়া সুপ্রণালীতে উদ্যানের পুরদ্বার সমীপে অশ্বপৃষ্ঠে অপেক্ষা করিতেছিল। দ্বৌলীন অবিলম্বে কর্ণেলযোগ্য বেশভূষাদিতে সুন্দর সুসজ্জ হইয়া বেলুনারোহণ পূর্ব্বক তথায় আসিয়া মিলিলেন। মনে মনে সর্ব্ব-শুভ-দাতা পরম পিতার নাম স্মরণ পূর্ব্বক সেই দ্বাবিংশতি সংখ্যক সুদৃশ্য সহচর দলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া যাত্রা করিলেন।

যে ভাবে, যে বেশে, যে প্রণালীতে পূর্ব্বদিন লাহোর প্রবেশ করেন, অদ্যাও অবিকল সেই তেজস্বী ও সেই দৃশ্য-মনোহর ভাবে রাজভবনাভিমুখে চলিলেন। প্রভেদের মধ্যে পূর্ব্ব দিনের ক্লান্তিস্থলে অদ্য পুষ্টকান্তি—অদ্য

হৃষ্টভাব—অদ্য নব উৎসাহ। কিন্তু চিন্তাও আছে—রাজসভা কিরূপ? সভাসদ্‌গণের কে কেমন? তাঁহাকে সহসা দেখিয়া কে কিরূপ ব্যবহার করে? মহারাজার নিকট কিরূপে গৃহীত হন? পরিচয়ের পথ কি ফকির সাহেব মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন? সত্যই কি তিনি অকারণ-বন্ধু হইবেন? অথবা কোন স্বাভিপ্রেত সাধনোদ্দেশে অনুকূল হইলেন? যাহা হউক, "সাবধানে বিনাশ নাই!" সতর্ক হইয়াই চলিতে হইবে—তোষামোদ জানি না, করিবও না—ধর্ম্ম ও মান রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকিতে হইবে, তাহার পর ভাগ্যে যাহা থাকুক। ইত্যাদি বিবিধ তীব্র চিন্তায় কিঞ্চিৎ অনাবিষ্ট ভাবে অশ্ব চালাইতেছেন, অথবা বেলুন যেন মদগর্ব্বে বক্রগ্রীবায় আপনিই চলিতেছে, এমত সময় দক্ষিণ দিকৃস্থ আর এক প্রশস্ত রাজপথ বাহিয়া একদল সমাবেশ সম্পন্ন বাহিনী আসিতেছে, দেখিতে পাইলেন।

দ্বোলীন চমকিয়া উঠিলেন! সে দল অতি নিকট—নিজ দলের সহিত প্রায় তাহাদের মিশামিশি। দেখিয়াই বুঝিলেন, এ দল সামান্য দল নহে, স্বয়ং মহারাজ আগমন করিতেছেন। অতএব সহচরগণের সহিত দ্বোলীন কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্‌গামী হইয়া পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন।

রাজদল সম্মুখীন—আরো অগ্রসর। মধ্যস্থিত এক মহাশয়ের অশ্ব ও সজ্জাদি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং তাঁহার প্রতি ওমরাহগণ নত ভাবে মান প্রদর্শন করিতেছেন; ইহা দেখিয়াই দুলীন বুঝিলেন, ইনিই নরসিংহ রণজিৎ। নতুবা তাঁহার মুখশ্রী ও গঠন যেরূপ সামান্য, শুদ্ধ তন্মাত্র দর্শনে তিনি যে সেই ভুবিখ্যাত রাজচক্রবর্ত্তী রণজিৎ সিংহ, এমন সংস্কার কদাচ জন্মিতে পারে না। যদিও তিনি মহারাজার শারীরিক সৌন্দর্য্য-হীনতার কথা পূর্ব্বে কিছু শুনিয়াছিলেন, কিন্তু যাহা চাক্ষুষ হইল, এত দূর আশা করেন নাই—জনরব এত নিকৃষ্ট বলিয়া প্রচার করে নাই!

ইহা সম্ভব যে, কথোপকথন কালে বা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ সময়ে অথবা রণক্ষেত্রে এই পঞ্জাব-সিংহকে অপেক্ষাকৃত শ্রীমান ও বলবান দেখাইতে পারে; কেননা অসামান্য প্রতিভাশালী পুরুষ বা স্ত্রী মাত্রেই দৈহিক রূপে বঞ্চিত থাকিলেও অবস্থা ও স্থল বিশেষে এমন এক প্রকার মুখশ্রী ও মাধুর্য্য সম্পন্ন হইয়া উঠে যে, তত্তৎ কালে তাহাকে অল্প-মেধা সুরূপ ব্যক্তির অপেক্ষাও প্রিয়দর্শন বলিয়া বোধ হয়। কোন কোন কুরূপ কুরূপা বিখ্যাত

গায়ক গায়িকাকে গানের উত্তাল তরঙ্গ কালে সুশ্রীবৎ যে দেখায়, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই কারণে ইহাও অসম্ভব নয় যে, আলাপ পরিচয় কিছু পুরাতন হইলে দুলীনের দৃষ্টিতে মহারাজাও তদ্রূপ সুশ্রী রূপে লক্ষিত হইতে পারেন। এখন হয় তো, শৌর্য্য-বীর্য্য-সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন আমীর মণ্ডলীতে মহারাজ পরিবৃত থাকাতে সূর্য্য-কিরণাধীন দীপের ন্যায় তাহাদের রূপের ছটার নিকট তাঁহাকে নিষ্প্রভ দেখাইতেছিল। যে কারণেই হউক, রণজিৎ সিংহের শরীর দেখিয়া দ্বোলীনের মনের ভাব যেন কিছু বিস্ময়ের রেখায় অঙ্কিত হইল। ইনিই সেই রণজিৎ, যাঁহার এত বড় নাম? এই সামান্য দেহে এত অসামান্য গুণ—এত অতুল পরাক্রম? অথবা "বাহ্য রূপ গ্রাহ্য করা কভু ভাল নয়!" ঈশ্বরের সৃষ্টিতে তাহাই ভাবা উচিৎ! নিমেষ কালের মধ্যে তাঁহার মনে এই ভাবের উদয় হইল—আমাদের বর্ণনার কাল যতই দীর্ঘ হউক!

কিন্তু মহারাজার দেহখানি যেমন হউক, দ্বোলীন দেখিলেন, একটী পরম সুন্দর সুশিক্ষিত সবল অশ্ব-পৃষ্ঠে অতি প্রশংসনীয় সুচারু ভঙ্গীতে—যথার্থ বীরোচিত ভঙ্গীতে—মহারাজ উপবিষ্ট। তখন তিনি প্রভাত সমীরণ সেবনের পর প্রত্যাগমন করিতেছেন। পশ্চাতে প্রধান সচিব ও সর্দ্দারগণ।

প্রত্যেকের শিরে রেসমের ছত্র ধারণ জন্য এক এক ছত্রধারী নিযুক্ত। সম্মুখে ও পশ্চাতে শত শত উত্তম অশ্বারোহী। সর্ব্ব পশ্চাতে পাঁচ শত বলবান পদাতিক। উভয় প্রকারের সৈন্য মধ্যেই শিখ, পাঠান, হিন্দু, গুর্খা প্রভৃতি নানা জাতীয় পুরুষ। তাহারা সকলেই, নীল পীত রক্ত পরিচ্ছদে সুন্দর সজ্জিত। সকল অশ্বই সুদীর্ঘ, সুগ্রীব, সুপুচ্ছ, সুশ্রী ও সুগতি-বিশিষ্ট। সৈনিকগণ বন্দুক, পিস্তল, তলবার, ভল্ল ও কিরীচাদি অস্ত্রধারী। সমস্ত প্রহরণই সুমার্জ্জিত—নিবোদিত অরুণচ্ছটায় ভয়ানকরূপে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে! অস্ত্রধারিগণের মধ্যে উচ্চ উচ্চ পাগধারী কতকগুলি, আকালি শিখ সৈন্যও ছিল; সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মোন্মত্ততায় তাহাদের মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর বন্য লোকের ন্যায়; তাহাদের ধৃষ্টতাও অসীম! তাহারা যে শিষ্টাচারে নিতান্তই বর্জ্জিত, দ্বোলীন তখনই তাহার বিশেষ পরিচয় পাইলেন। কেননা, সানুচর দ্বোলীন সাহেবকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের কেহ কেহ—ধৃষ্ট দুশ্চরিত্রের স্বভাবানুসারে—সহসা কটূক্তি প্রয়োগ করিল। কিন্তু সেই কালেই আজিজুদ্দিনের

জনৈক কর্ম্মচারী আসিয়া দৌলীনকে রাজদলের সঙ্গী হইতে অহ্বান করাতে, সৌভাগ্য ক্রমেই তিনি সেই কটূক্তি সম্পূর্ণরূপে শুনিতে সময় পাইলেন না।

তৎকালে কি বাদসা, কি নবাব, কি হিন্দু রাজা, প্রত্যেক রাজ্যাধিপতির রাজধানীতে বা প্রধান নগর মাত্রেই "সালীমার" নামা এক একটী বিলাস-উদ্যান থাকিবার প্রথা ছিল। লাহোরের সালীমার উদ্যান সুপ্রসিদ্ধ—অদ্যাপিও দ্রষ্টাবস্থায় আছে। মহারাজা এই উপবনে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিতি মাত্র অশ্বারোহী ও পদাতিকগণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া দুই শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইল, মহারাজা তন্মধ্য দিয়া যেমন চলিয়া গেলেন, অমনি তাহারা নত প্রহরণ-প্রণালীর সম্ভ্রম প্রদর্শন করিল।

দৌলীনকে কিয়ৎকাল পুরদ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করিতে হইল। তদ্দর্শনে রাজসৈনিকগণ আসিয়া ক্রমে তাঁহাদিগের চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কতক বা কৌতূহলে, কতক বা অন্য অভিপ্রায়ে আগন্তুক দলের আকৃতি, প্রকৃতি, অস্ত্রশস্ত্র, বেশভূষাদি দেখিতে লাগিল। কেহ বা প্রশংসা, কেহ বা হিংসা, কেহ বা উপহাসেও প্রবৃত্ত হইল। নিম্নপদস্থ অধিকাংশ সৈনিক দৌলীনকে সম্মান প্রদর্শন সহকারে সেলাম করিল, তিনিও প্রসন্নভাবে মস্তক হেলাইয়া প্রত্যভ্যর্থনার ত্রুটি করিলেন না। অপর সকলে, বিশেষতঃ কতিপয় গর্ব্বিত অশ্বারোহী "সাহেবের দাড়ি নাই কেন?" ইত্যাদি আলাপের সূত্র তুলিয়া সম্পূর্ণ ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও অভদ্র ব্যবহার আরম্ভ করিল।

দেশ-কাল-পাত্রজ্ঞ বিজ্ঞ দৌলীন তথাপি কিছু না বলিয়া অন্যমনস্কের ন্যায় উপেক্ষা করিতে লাগিলেন—তাহাদের বাক্য যেন শুনেন নাই, কি কিছুই বুঝেন নাই! যে কয়জন ঐরূপ দুঃশীলতায় প্রবৃত্ত, তাহারা নিম্ন শ্রেণীর সামান্য সৈনিক নহে—উচ্চ শ্রেণীর কর্ম্মচারী। তন্মধ্যে নন্দসিং নামা এক ব্যক্তি কিছু বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল। মহারাজার নব-সৃষ্ট এক অশ্বারোহী রেজিমেণ্টে এ ব্যক্তি দ্বিতীয় নায়ক। পরে জানা গেল, সে অত্যন্ত ধূর্ত্ত এবং জ্ঞানে ও ধর্ম্মনীতিতে নিতান্ত হীন। তজ্জন্য সাহঙ্কার ঔদ্ধত্যে সে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রবল। যথা সময়ে পাঠকের সহিত তাহার প্রচুর আলাপ পরিচয় হইবে। যৌবনসুলভ তৎপরতা ও সাহসিকতা (অথবা দুঃসাহসিকতা) তাহার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীতে ও দৃষ্টিতে দীপ্তিমান।

সেই সঙ্গে নীচাশয়তা ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার লক্ষণও দেহ-তত্ত্বদর্শীর চক্ষুতে অলক্ষিত হইত না।

গুন্ গুন্ করিয়া একটা অশ্লীল হিন্দি গান গাইতে গাইতে নন্দ সিং স্বীয় তেজস্বী অশ্বকে দৌলীনের অশ্বরাজ "বেলুনের" চতুস্পার্শ্বে চালাইতে লাগিল—যেন ব্যঙ্গচ্ছলে প্রদক্ষিণ করিতেছে! অভিসন্ধি, কোনরূপে একটা বিবাদ বাঁধানো; কি হয় তো সাহেবের ঘোড়াকে খেপাইয়া আরোহীর (উৎক্ষেপণাদি) দুর্দ্দশা ঘটাইয়া তামাসা দেখা; অথবা নিজের রণ-কুশলী শিক্ষিত ঘোটকের দ্বারা কোন কিছু বিঘটন ঘটাইয়া তোলা। এ প্রকার মন্দ উদ্দেশ্য ভিন্ন অত নিকটবর্ত্তী হইয়া ঘুরিবে কেন?

ক্রমে ঘুরিতে ঘুরিতে এত নিকটে আসিতে লাগিল যে, উভয় আরোহীর অসিতে অসিতে, পায়ে পায়ে পর্য্যন্ত সংলগ্ন হইল। দ্বৌলীন মৃদু মধুর স্বরে এই বলিয়া সতর্ক করিলেন যে, "আমার ঘোড়াটা বড় চাইট মারে, একটু সাবধান হইলে ভাল হয়।"

সে কথা কে শুনে? দুষ্ট নন্দ সিংহ আরো বাড়াইল—হাসি মুখে আরও বেগে ঘুরিতে লাগিল। দ্বৌলীনের আর সহ্য হইল না। মহারাজার নিকট পরিচিত হইবার পূর্ব্বেই—রাজদর্শনের প্রাক্কালেই অস্ত্র চালনা, বা বিবাদ, বা কোনরূপ অপ্রার্থনীয় গোলযোগ বাঁধানো নিতান্তই অনিচ্ছা। কিন্তু কি করেন? আত্ম-গৌরব রক্ষাও তো কর্ত্তব্য—যাহার কিছুমাত্র আত্ম-গৌরব-জ্ঞান আছে, এ অত্যাচার তাহার কি আর সহ্য হইতে পারে? কিছু তেজঃবল না দেখাইলেও স্বদলে বিদলে উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

অতএব, বেলুনের বল্গা কিঞ্চিৎ আকর্ষণ এবং অন্যের অলক্ষিত এক প্রকার সঙ্কেত দ্বারা (সে সঙ্কেত তিনিই জানেন, আর তাঁহার বেলুনই বুঝে) বেলুনের গ্রীবা-কেশ স্পর্শ মাত্র উচ্চৈঃশ্রবার বংশধর মহা তেজস্বী সেই অশ্ব অমনি পশ্চাতের সুদীর্ঘ চরণদ্বয় ঊর্দ্ধে তুলিয়া ভীষণ বলের সহিত নিদারুণ পদাঘাত করিল—ভ্রাম্যমান্ নন্দের প্রখর হয়বর ঠিক সেই সময়ে পশ্চাতে আসিয়াছিল—নিমেষ মধ্যে আরোহী সহিত বাজীরাজ কিয়দ্দূরে "পপাত ধরণীতলে!"—ঠিক যেন মেড়া করে কেল্লার দেয়াল ভাঙ্গিল—ঠিক যেন রামের বাণে রাবণ-পুত্র অতিকায় সতুরঙ্গ ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল! ঘোর শব্দ হইল! বীর নন্দ সিংহের দক্ষিণ চরণ অশ্বের দক্ষিণ গ্রীবার নীচে

ভূমিসাৎ...বাম পদ শূন্যে উত্থিত! স্বপক্ষ বিপক্ষ, উভয় দল হইতেই বিকট হাস্যের হো হো ধ্বনি উঠিল!

অমনি নন্দের অধীনস্থ আট দশ জন অশ্বারোহীর আট দশখানি তরবার, খাপ হইতে ঝণাৎ করিয়া বাহির হইল—সাহেবের অভিমুখে বা বিপক্ষে তাহারা ধাবিত হইল! তৎক্ষণাৎ অমনি বন্নু ধন্নু প্রভৃতির বাইশখানি অসি নিষ্কোষিত হইয়া চক্ চক্ করিয়া খেলিতে লাগিল! দ্বৌলীন সে সব না দেখিয়াই অশ্বমুখ ফিরাইয়া "আহা! হা! একি? একি? দেখ, দেখ, উঠাও, উঠাও" বলিয়া চকিতের ন্যায় নামিয়া পড়িলেন।

ভাগ্য ভাল, নন্দ সিংহের দক্ষিণ পদ ঘোড়ার পার্শ্ব কি পেটের নীচে পড়ে নাই; তাহা হইলে ভাঙ্গিয়া যাইত। ঘটনা সূত্রে পা খানি ছটকিয়া গিয়া ঘোড়ার গলার নীচে পড়িয়াছিল। দ্বৌলীন ত্রস্ত হইয়া সকলের অগ্রে স্বয়ং গিয়া তাহাকে উঠাইলেন। ঘোড়াকে উঠাইবার জন্য স্বীয় অনুচরগণকে আজ্ঞা দিলেন। যদিও তখন তাহারা রোষকষায়িত লোচনে যুদ্ধোদ্যত, কিন্তু প্রভুর আদেশে নন্দের অশ্বকে কেহ কেহ উঠাইল। সাহেব নন্দের দেহ পরীক্ষায় বুঝিলেন, কোনরূপ গুরু আঘাত লাগে নাই। তখন হাস্য চাপিয়া বলিলেন "তখনি তো সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম, আমার ঘোড়াটা বড় দুরন্ত! সে কথা শুনিলে কখনই এমন হইত না!"

নন্দ সিং রাগে, দুঃখে, লজ্জায়, ঘৃণায় ও প্রতিহিংসার ইচ্ছায় অভিভূত থাকাতে কিছুই উত্তর দিল না। কিন্তু তাহার বদনে ও নয়নে বেদনা-চিহ্ন অপেক্ষা জিঘাংসা ও বৈর নির্য্যাতনের লালসা যেন মূর্ত্তিময়ী দৃষ্ট হইল। জানিনা, কি কারণে তাহার অনুচর বন্ধুগণ নিবৃত্ত হইল—হয় তো নন্দের অন্যায় দেখিয়া ক্ষুব্ধ; নয় তো সাহেবের সদ্ব্যবহারে, বেলুনের পরাক্রমে ও সহচরগণের সাহস দৃষ্টে তুষ্ট; অথবা অন্য যে কোন হেতুর বশীভূত হইয়াই হউক, আপন আপন উত্থিত বাহুকে নমিত করিল! ফলতঃ বিরুদ্ধাচরণ দূরে থাকুক, বরং সম্মানসূচক সানুরাগ ব্যবহারই প্রদর্শন করিতে লাগিল। দয়া-মিশ্রিত শৌর্য্যের এমনি আশ্চর্য্য মহিমা!

সাহেবের সম্মান বৃদ্ধির আর এক প্রবল সূত্র তখনই উপস্থিত। অর্থাৎ ঐ গোল মিটিতে না মিটিতে উদ্যান মধ্য হইতে একজন রাজানুচর আসিয়া দ্বৌলীনকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক কহিল "আপনি রাজসভায় আসুন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজসম্ভাষণ।

দৌলীন দরবারে প্রবেশিয়া দেখিলেন, প্রায় দ্বাদশজন সচিব রাজসম্মুখে উভয় পার্শ্বে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া প্রধান স্থানে উপবিষ্ট। কিঞ্চিদ্দূরে অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারী। তৎপরে অনেকগুলি বিজ্ঞাপক, লেখক বা মুন্সী প্রভৃতি—অধিকাংশ দণ্ডায়মান। তাহারা কেহ কেহ নানাবিধ বিষয়ের বিজ্ঞাপনাদি পাঠ করিয়া বা মুখে মুখে তন্মর্ম্ম শুনাইতেছে. কেহ কেহ প্রত্যেক রাজাজ্ঞা ও মীমাংসা লিপিবদ্ধ করিয়া লইতেছে—রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে সেই সব আদেশ প্রেরণ করাই তাহাদের প্রধান কাজ। তদ্ভিন্ন অন্যান্য কত প্রকারের লোক এবং ছত্রধারী, পাখাধারী ও চোপদার পদাতিক প্রভৃতির কথা আর কি লিখিব।

দৌলীন অল্প অগ্রসর হইয়া এক রৌপ্যপাত্রে এক শত রৌপ্যমুদ্রা নজর স্বরূপে রাজ-সমক্ষে রাখিয়া অভিবাদন করিলেন। মহারাজ অর্দ্ধোত্থিতের ন্যায় কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া শিরশ্চালন দ্বারা অভ্যর্থনা জানাইয়া ইঙ্গিতে ফরাসে অর্থাৎ সভামণ্ডপের গালিচায় বসিবার অনুমতি দিলেন। সেই ইঙ্গিতানুসারে দৌলীন সিংহাসনের অতি নিকটে গিয়া বসিলেন—কেননা ইঙ্গিতে সেই স্থানই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

কোথা হইতে আসা, নিবাস কোথায়, নাম কি, বয়স কত? রাজবদন হইতে ইত্যাকারের প্রশ্ন হইলে দৌলীন সসম্ভ্রমে যথোচিত উত্তর দান করিলেন।

মহা। কি কর্ম্ম ভাল জান? কি ব্যবসা করিয়া থাক? এখানে আসিবার অভিপ্রায় কি?

দৌ। মহারাজ! ইংলণ্ডীয় ভদ্রযুবকেরা বিদ্যালয়ে যে সব বিদ্যা শিখেন, আমার সে শিক্ষা যথাসাধ্য সমাপ্ত হইলে কেবল সামরিক বিদ্যাই অভ্যাস করিয়াছি—প্রথম যৌবনাবধি কেবল অস্ত্রালোচনা ও যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সেনা-নায়কত্ব করিয়া আসিতেছি। কিছুকাল পূর্ব্বে ফরাসী সৈনিক-কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত ছিলাম। লেঃ কর্ণেল পদ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। সাংঘাতিক রোগে কয়েক মাস শয্যাগত থাকিয়া আরোগ্যের পর নানা

কারণে (—এস্থলে ক্ষণকালের নিমিত্ত মুখ যেন লজ্জায় কিছু আরক্ত হইয়াছিল) সে দেশ আমার ভাল লাগিল না। মহারাজার খ্যাতি ধরাব্যাপ্ত, মহারাজার নাম যশঃ শুনিয়াই, যদি কোনরূপ প্রতিপত্তি লাভে মান পূর্ব্বক প্রতিপালিত হইতে পারি, এই মহৎ আশাতেই ভাগ্য পরীক্ষা করিতে আসিয়াছি।

মহা। তুমি কোন্ কোন্ ভাষায় কথা কহিতে পার?

দো। আমি ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মান, পারসিক, উর্দ্দু, হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষা ন্যূনাতিরেকে জানি।

মহা। তুমি এত ভাষা এই অল্প বয়সে কিরূপে শিখিলে?

দো। কতক ইংলণ্ডে, কতক ফ্রান্স দেশে, কতক এ দেশে। ঈশ্বর আমাকে স্মরণ-শক্তি কিছু বেশী দিয়াছেন, তাহাতেই অল্প সময়ে এ দেশীয় ভাষা কয়েকটী শিখিতে পারিয়াছি। ভরসা করি, মহারাজের কৃপাকটাক্ষ পাইলে, পঞ্জাবী শিখিতেও অধিক সময় লাগিবে না।

মহা। ভাল, দুর্গ-নির্ম্মাণ, সন্ধি খনন, কামান ঢালাই, এসব কি জান?

দো। এ সব করিতে দেখিয়াছি, কখন করি নাই; কেননা, এ সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারেরা করিয়া থাকেন—আমি প্রকৃত প্রস্তাবে ইঞ্জিনিয়ার নই। কিন্তু মহারাজার দয়া হইলে ইহার একটাও অসাধ্য বোধ করি না।

মহা। ভাল, তুমি আমার ঘড়ী মেরামত করিতে পার? রোগের চিকিৎসা কিম্বা অশ্বের তদারক জান? (এ প্রকার গোলমেলে প্রশ্ন করার তাৎপর্য্য এই যে, রণজিৎ সিংহ ইউরোপীয়দিগকে এবম্প্রকার কর্ম্মে পটু বলিয়া জানিতেন)।

দো। আজ্ঞা, না, মহারাজ! ঐ তিনটী কাজ পৃথক্ তিন শ্রেণীর লোকে করিয়া থাকে। প্রথমটী শিল্পীর, দ্বিতীয়টী চিকিৎসকের, তৃতীয়টী ঘোড়ার ডাক্তার বা অশ্ব-পালকের কাজ। ইউরোপীয়দিগকে মহারাজ, এ সকল কাজ করিতে দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু যাহারা সামরিক অধিনায়কস্বরূপ বীরের কর্ম্ম করে, তাহারা এ সকল হইতেও উচ্চ পদবীর লোক!

এই শেষোক্ত বক্তব্য বলিবার সময় দৌলীনের অলক্তাভ-শুভ্র বদনমণ্ডল ঈষৎ আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল, এবং অধরোষ্ঠও কিছু কাঁপিয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতার সময় মহারাজ বক্র দৃষ্টিতে তাঁহাকে মাঝে মাঝে দেখিতেছিলেন।

উপসংহার-কালিক তেজের ভাব তাঁহার অলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহাতে বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং সন্তোষজ্ঞাপক "সাবাস ঢুলীন * সাহেব!" বলিয়া ফকির আজিজুদ্দিনের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন "ফকিরজী! তোমার এই বন্ধু খুব সাহসী জোয়ান বুটে!"

ফকিরজী অমনি উত্তর করিলেন "আজ্ঞা, হাঁ মহারাজ! হুজুর যদি কৃপা কটাক্ষ দানে পরীক্ষা করেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, সাহেবের কথাও যেমন, কাজও তেমন—বরং বেশী! রুমের মহারাজা, পারস্যের রাজা ও চীনের সম্রাট্ ইঁহাকে রাখিতে খুব যত্ন পাইয়াছিলেন, কিন্তু ইনি মহারাজের প্রতি এমনি ভক্তিমান যে, কাহারো অনুরোধ শুনিলেন না!!"

এই বক্তৃতা শুনিয়া ঢুলীন অবাক্। এত বড় অসামান্য মর্য্যাদাপন্ন মন্ত্রী হইয়া কিরূপে এত বড় মিথ্যা কথা কহিয়া ফেলিলেন, ঢুলীন ইহাতেই অবাক্! তাঁহার অত্যন্ত ভয় ভাবনা হইল, পাছে মহারাজা ইহার সত্যতা পক্ষে তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন! তবে কি হইবে? এত বড় লোকের অপমান—এত বড় হিতৈষী বন্ধুর অপমান তাঁহার দ্বারা ঘটিবে? বড় মর্ম্মান্তিক দুঃখের বিষয়! অথচ চারাও নাই!

কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে তাহা ঘটিল না—মহারাজ সেরূপ প্রশ্ন করিলেন না, অথবা করিবার সময় পাইলেন না। কেননা, তন্মুহূর্ত্তে দুই জন অতি সামান্য ব্যক্তিকে প্রহরীরা ধরিয়া আনিল। তাহাদের পিন্ধনে আর কিছুই নাই; কেবল চেল্লা ও ল্যাঙট্ এবং মাথায় এক এক মলিন টুপি! তাহারা শিখ নয়, হিন্দুস্থানী। বোধ হইল, সহিস কি ঘেসিয়াড় হইবে। অপরাধ—সালীমার বাগানের ফল পাড়িয়াছিল। তাহারা এই চৌর্য্যাপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক দয়া ভিক্ষা করিল। তথাপি একজনের নাসাগ্র, অপরের কর্ণাগ্রভাগ ছেদনের দণ্ডাজ্ঞা হইল! নিমেষ মধ্যে সেই নিষ্ঠুরাদেশ নিষ্ঠুর পদাতিকগণ প্রতিপালন করিয়া শোণিত-ধারাভিষিক্ত সেই দুর্ভাগ্যদ্বয়কে ধাক্কা মারিয়া তাড়াইয়া দিল!

---

* সেই দিন হইতে আমাদের নায়কের "ঢোলীন" নামের পরিবর্ত্তে "ঢুলীন" নামটাই বেশী জানিত হইল। যেহেতু মহারাজা রণজিৎ সিংহ ভুল ক্রমে বা যে কারণে হউক ঢুলীন বলিয়া ডাকিতেন। আমরা ইংরাজি (Dowlin) ডৌলীনকে বাঙ্গালায় শ্রুতিসুখাবহ ঢোলীন করিয়াছিলাম, তাহাও আর থাকিল না। ফলে ঢোলীন ও ঢুলীন দুয়েরি অর্থ দুয়েতে লীন, অর্থাৎ ঢক্কাধ্বনীয় ও ঢোলীয় ঢুলভাবেই যিনি লীন।

তদ্দর্শনে আত্মবিস্মৃতাবস্থায় "ঈস্!" এবং "আহা!" শব্দ ডুলীনের মুখ হইতে যেন অজ্ঞাতসারে অতি মৃদুস্বরে বহিষ্কৃত হইল। কিন্তু মৃদু হইলে কি হয়, নিস্তব্ধ সভায় তাহাই উচ্চ শব্দের কার্য্য করিল—মহারাজ শুনিতে পাইলেন! এবং হাসিয়া কহিলেন "তুমি ইহা গুরুদণ্ড জ্ঞান করিতেছ—আমরা জীবন লই না, শাসন করি!" ডুলীন ঘৃণায় জর্জ্জরিত হইতেছিলেন, কিন্তু অন্তঃকরণে যত দূর, বাক্যে তত দূর প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না। অথচ কিছু না বলিয়াও থাকিতে পারিলেন না; মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন "বোধ হয়, ক্ষুধার জ্বালায় এই দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকিবে। ইউরোপে এরূপ অপ—" এই পর্য্যন্ত বলিতে না বলিতে দ্বাদশ খানি বদন হইতেই "আঃ! কি কর—চুপ কর!" এরূপ মিষ্ট তাড়না শ্রুত হইল—ফকিরজীর নয়ন হইতেও সতর্কতাকারক ইঙ্গিতের ভঙ্গী দৃষ্ট হইল।

কিন্তু মহারাজ হাসিয়া কহিলেন "না, না, বলিতে দেও। আমি স্পষ্টবক্তাকে বেশী ভালবাসি! বিশেষ ডুলীন সাহেব নয়া (নূতন) জোয়ান!" তৎপরেই ডুলীনকে বলিলেন "আমি শুনিলাম, তুমি উত্তম সওয়ার।" ডুলীন বিনীতভাবে উত্তর দিলেন "মহারাজের প্রসাদে আমি বাল্যকাল হইতেই অশ্বারোহণে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত।" মহারাজা কহিলেন "তোমরা ফিরাঙ্গী লোক, অশ্বের উল্লম্ফনে বড় পটু বটে। ভাল, দেখা যাউক, ঐ যে ব্যক্তি এখন আসিতেছে, ও তোমাকে একটা বেড়া লঙ্ঘনের কৌশল দেখাইবে।"

ডুলীন চাহিয়া দেখেন, নব আগন্তুক আর কেহই নয়, তাঁহার পূর্ব্বের বন্ধু নন্দ সিংহ! নন্দ সিংহ মহারাজার প্রিয় কর্ম্মচারী। ভাবে বোধ হইল, সে জানিতে আসিয়াছে, ফটিকের কাণ্ড মহারাজার জ্ঞাতসার হইয়াছে কি না ও সে কথার কিছু আন্দোলন হইতেছে কি না? ডুলীন যথাবিধি শিষ্টাচার সহকারে নন্দ সিংকে সেলাম করিলেন। নন্দ সিং গর্ব্বভরে প্রতি-নমস্কারের অর্দ্ধ নিয়ম মাত্র রক্ষা করিল।

মহারাজ গাত্রোত্থান করিলেন। সেই সঙ্গে মন্ত্রীবর্গ ও সভাস্থ ভাবলোক এই পরীক্ষা-রঙ্গ দেখিতে রাজানুগামী হইয়া সালীমার বাহিরে একটা উপ যুক্ত স্থানে উপস্থিত হইলেন।

. আমরা ভাল লোকের মুখেই শুনিয়াছি, শিখজাতি অতি প্রশংসনীয়রূপে উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী। কোন ইংরাজ লেখক তাহা তত দূর স্বীকার করেন না।

তাঁহারা বলেন, শিখেরা অশ্বকে বেশী খাটায়, উপযুক্ত রূপে পালন করে না; সুতরাং সে অশ্বের তেজ কোথায় যে, আরোহী সে তেজের শাসন-কৌশল দেখাইয়া আরোহণ-বিদ্যার প্রতিষ্ঠা-পত্র পাইবেন? কিন্তু এ বর্ণনায় আমরা সম্মতি দিতে অনিচ্ছুক। যদিও এ সব বিষয়ে বাঙ্গালীর অপেক্ষা তাঁহারা অবশ্যই সমধিক সূক্ষ্ম বিচারক, কিন্তু ইংরাজ-কুসংস্কারকে আমরা চিনি—হয় তো সেই কাণা রিপুই তাঁহাদের বিচারশক্তিকে নিরপেক্ষ হইতে দেয় না! পাটনা নগরে ইংরাজ-কৃত একটী অত্যুচ্চ গোলাঘর আছে; তাহার চূড়ায় উঠিবার জন্য প্রায় দেড়শত সংখ্যক সোপান (পৈঠা) আছে। সেই সোপানশ্রেণী গোলাঘরের ভিতরে নয়, বাহিরে নির্ম্মিত—তাহার গায় বাঁকিয়া বাঁকিয়া চূড়া পর্য্যন্ত উঠিয়া আবার অন্যদিকে নামিয়াছে। সে দিকেও ঠিক সেইরূপ ততগুলি সোপান। অর্থাৎ ধাপগুলি সেই অত্যুচ্চ গোলাকার গৃহের গা বেষ্টন করিয়া আছে—যে দিকে ইচ্ছা, সেই দিক্ দিয়া উঠিয়া অন্যদিকে অবতরণ করা যায়। আমরা সেই গোলাঘরেই দাঁড়াইয়া পাটনার গণ্য মান্য ব্যক্তিগণের মুখে শুনিয়াছি যে, কোন প্রসিদ্ধ শিখসর্দ্দার অশ্বারোহণে সেই অত্যুচ্চ মন্দিরের চূড়ায় সেই সোপান শ্রেণীর এক দিক্ দিয়া উঠিয়া অপর দিক্ দিয়া নামিয়া আসিয়াছেন! ইহা পাটনার বহু বহু লোকে দেখিয়াছেন—যাঁহারা এই অদ্ভুত কার্য্য দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই কেহ কেহ এ কথা আমাদিগকে বলিয়াছেন। পাটনার লোক বলে "ঘোড়া উঠিল, কি পক্ষীরাজ গরুড় ছুটিল, বুঝিলাম না—সোপানের পার্শ্ব-রক্ষক আলিসাও উচ্চ নয়। কিরূপে আর কি সাহসে সেই ভয়ানক সিঁড়িতে ঘোড়া ছুটাইয়া চূড়ায় উঠিয়া অপর দিকে নামিয়া আসা হইল, তাহা এক প্রকার সামান্য মানবের বুদ্ধির অগম্য!" ফলতঃ আমরা নিরীহ বাঙ্গালী, আমাদের নিকট সে কার্য্য মানুষিক বলিয়াই বোধ হয় না! আবার, কলিকাতায় কোন ধনী বন্ধুর মুখে তাঁহাদের দৃষ্ট শিখসর্দ্দারগণের আশ্চর্য্য অশ্বচালনা চাতুর্য্য যাহা শুনিয়াছি, তাহাতেও অবাক্ হইতে হয়।

সে যাহা হউক, নন্দসিং তৎকালে শিখদিগের একজন প্রসিদ্ধ অশ্বারোহী। অশ্ব চালনাই তাহার ব্যবসায় এবং লুধিয়ানাতে মৃগয়াকারী ইংরাজ সম্প্রদায়ের অধীনে বহুকাল এই কর্ম্মে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইয়াছে।

দুলীনের কাছে একবার লজ্জা পাইয়াছে। এক্ষণে তদ্বিরুদ্ধে স্বীয় গুণ-

পনা প্রদর্শনের সুযোগ পাইয়া সে মহা আহ্লাদিত ও প্রোৎসাহিত হইয়া মহারাজা যে বেড়া দেখাইয়া দিলেন, তদভিমুখে বেগে অশ্ব চালাইল। সে বেড়া উচ্চ বটে, কিন্তু তদুল্লঙ্ঘন উত্তম অশ্বারোহীর পক্ষে অসাধ্যও বলা যায় না। কিন্তু নন্দের দুরদৃষ্ট বা অসতর্কতা বা উন্মত্ততা-জনিত চাঞ্চল্য, যে কারণেই হউক, সে কায্য সে পারিল না—ঘোড়ার পা বেড়ায় ঠেকিয়া ঘোড়া প্রতিবেগে বিপরীত দিকে (দর্শকগণ যে দিকে) উল্টাইয়া আসিয়া পড়িয়া গেল! তবু ভাগ্য ভাল যে, প্রাণটা গেল না!

এখন ডুলীনের পালা। ইঙ্গিত অনুসারে বেড়ার কতক দূর হইতে ধাবিত হইয়া স্বীয় পাদুকাস্থিত লৌহ-কণ্টক দ্বারা বেলুনের পার্শ্বে অত্যল্প আঘাত এবং সঙ্কেত বিশেষ করিবা মাত্র হয়শ্রেষ্ঠ বেলুন এক লম্ফে বেড়া পার হইয়া মণ্ডলাকারে কতক দূর ঘুরিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার অবলীলাক্রমে প্রতি-লঙ্ঘন পূর্ব্বক দর্শক মণ্ডলীকে চমৎকৃত করিল! মুহূর্ত্ত মধ্যে বীরবর ডুলীন অবতরণ করতঃ মহারাজের পদতলে আসিয়া কুর্ণিস করিয়া দাঁড়াইলেন।

"সাবাস্ ডুলীন! তুমি আমার অশ্ব-সৈনিকের শিক্ষক ও অধ্যক্ষ হইবে! অদ্যাবধি আমার সৈন্য মধ্যে কর্ণেল পদে নিযুক্ত হইলে—এখনই খেলাত পাইবে! উদ্যানমধ্যে যে বীরত্ব দেখাইলে, রণভূমিতে যদি তদ্রূপ প্রদর্শনে সমর্থ হও, তবে তুমি নিশ্চয়ই রণজিতের বন্ধু হইলে! কিন্তু আমি শুনিতে চাই, ফটকে তখন কি হইয়াছিল?"

ডুলীন দেখিলেন, ইতিমধ্যেই রাজকর্ণে সে কথা উঠিয়াছে। শত্রু কি মিত্র-পক্ষ শুনাইয়াছে, বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু সত্যের মা'র নাই জানিয়া, যাহা ঘটিয়াছিল, অলঙ্কার ও কাপট্য ত্যাগ পূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সরল বর্ণনা করিলেন। মহারাজ মনোযোগের সহিত সমস্ত শুনিয়া বলিলেন "তুমি যে সত্য কহিলে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। নন্দসিং আপন ওজনের বাহিরে যাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; অনেক অনিষ্টের মূলে উহার নাম শুনা যায়। বিশেষতঃ অদ্য বুঝা গেল, সে অশ্বারোহণ-বিদ্যা জানে না।"

পুনশ্চ হাসিয়া বলিলেন "কিন্তু ডুলীন তোমাকে একটু সাবধান হইতে হইবে—রাজপুরী রণ-ক্ষেত্র নয়, রাজ-শরীর-রক্ষকেরাও বিপক্ষ নয় এবং তাদের নিজের অঙ্গ ও তাদের অশ্বের উদরও তোমার অশ্বের পদ-চালনার জন্য পরীক্ষার স্থল নয়।" এই পরিহাসের সহিত বেলুনেরও বিশেষ প্রশংসা

ও কোথায় কিরূপে এমন উচ্চ ধাতুর ঘোটক পাইলে, তদ্রূপ প্রশ্নাদির পর কহিলেন "দরবারে তোমার উপস্থিতির জন্য অন্য এক দিন নিরূপিত হইবে—এজন্য পরওয়ানা ও উপদেশ পত্র পাইবে। সতর্ক ও বিবেচক হইয়া চলিও, তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, আত্ম-দোষে যেন তার বৈপরীত্য ঘটাইও না।"

মহারাজা ঐ ভাবের কথা কতক স্পষ্ট, কতক ভাবভঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়া পুনর্ব্বার সভামণ্ডপে চলিলেন ; আর সকলেও পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। পুনর্ব্বার সভাস্থ হইবার কিছু পরেই ডুলীনকে খেলাত প্রদত্ত হইল। অর্থাৎ একটা মনোহর অশ্ব ও তৎসজ্জা, একখানি ভাল তরবার, এক জোড়া সাল, এক ছড়া মুক্তার কণ্ঠী, একটা সালের চোগা, কয়খণ্ড মস্‌লিন (বোধ হয় পাগ্‌ড়ি চাপকানাদির জন্য) প্রভৃতি সব্বশুদ্ধ একাদশ প্রকারের দ্রব্য। সর্ব্ব সমষ্টির মূল্য একাদশ শত মুদ্রা। তৎসঙ্গে এক হাজার নগদ টাকার একটী তোড়া তাঁহার ভৃত্যের হস্তে অর্পিত হইল—খেলাতের সমস্ত দ্রব্যই তাঁহার, অনুচরগণ লইয়া গেল !

গুণপ্রবীণ ডুলীন যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সহকারে অধীনতা ও বশ্যতা স্বীকার করিলে মহারাজ উঠিলেন—সভা ভঙ্গ হইল। মহারাজ রণজিৎ সিংহের বাক্য-বিন্যাস-প্রণালী কোন বিশেষ পারিপাট্যে—কোন বক্রালঙ্কারে—কোন রসমাধুর্য্যে সুরঞ্জিত নহে—সাদা সিধে—সৈনিক নায়কবৎ নিতান্তই সরল ! তাহাতে ডুলীনের মনে অধিক সন্তোষ হইল।

তিনি যখন রাজসভায় প্রথম প্রবেশ করেন, তখন মন্ত্রী-সমাজে "আবার ফিরাঙ্গী—ফিরাঙ্গীর জ্বালায় জ্বালাতন হওয়া গেছে !" এইরূপ গালা ঘুষা যে স্পষ্ট শ্রুত হইয়াছিল, সভাভঙ্গের পর সে ভাব আর নাই ! সকলেই যেন তাঁহার সৌভাগ্যে মহা পুলকিত—সকলেই যেন শুভপ্রার্থী—সকলেই যেন তাঁহাকে পদস্থ ও উন্নত করিয়া দিলেন—সকলেই তাঁহার বন্ধু—সকলেই ডুলীনের যখন যাহা ইচ্ছা, তৎসাধনে প্রস্তুত ! ডুলীন বেশী কথা কহিলেন না, সৌজন্য শিষ্টাচার দেখাইয়া সদলে বাসায় চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সাধু সঙ্কল্প।

যদিও ঠিক মধ্যাহ্ন নয়, তথাপি নৈদাঘ মার্ত্তণ্ড দেব প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অগ্নি-কিরণ বর্ষণ করিতেছেন, এমন সময় দুলীন রাজোদ্যান হইতে বাসোদ্যানে চলিলেন। রৌদ্রে তাঁহার অতিশয় কষ্ট হইল। বেলুনও অত্যন্ত ফেনিল হইয়া উঠিল। সহচর মণ্ডলী একে প্রত্যুষাবধি অশ্বপৃষ্ঠে, তাহাতে প্রখর আতপ-তাপে ও পথের ধূলাতে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। সুশীতল সুরম্য বাসোদ্যানে প্রবেশিয়া সকলেই সুস্নিগ্ধ বিশেষতঃ আশা-সিদ্ধির উৎসাহে পরম পরিতৃপ্ত হইল।

দুলীন স্নানাহার করিয়া গতক্লম হইলেন। বসিবার ঘরে একখানি বিচিত্র চৌপায়াস্থ শয্যায় অৰ্দ্ধ শায়িত ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্ণের ঘটনা-বলীর রোমন্থন (যদি এ শব্দ দূষ্য না হয়) করিতে লাগিলেন—পুরুষ সিংহ-রূপী রণজিৎ সিংহের চরিত্র; প্রতাপশালী সভাসদ্গণের আকৃতি প্রকৃতি; নিজের আশাতীত সৌভাগ্যোদয়; নন্দ সিংহের অহেতুক শত্রুতা; তাহার যেমন প্রকাশ্য, অপরের তেমন অপ্রকাশ্য বৈরিতারও সম্ভাবনা; ফকিরজীর সৌজন্য সহায়তা ইত্যাদি সেই চিন্তার বিষয় হইল।

"নিতান্ত অনিশ্চিত ভাগ্যদাস যে আমি—নিতান্ত উদাসীন পথিক যে আমি—আমার প্রতি মহারাজা কি সত্যই এত কৃপা করিবেন? এ দয়া যেমন আকস্মিক, তেমন ক্ষণিক তো হইবে না? বিশেষ সুযোগ পাইলেই আমার জন্ম-বৃত্তান্ত বিরলে তাঁহাকে বলিতে হইবে—কপট প্রতারক কদাপি হইব না, তাহাতে ভাগ্যে যা ঘটুক—তাহার ফল তো ফ্রেঞ্চ পিতার ন্যায় হইবে না?"

ইত্যাকার আত্ম-মীমাংসা-বিরোধী বিবিধ চিন্তায় যখন মগ্ন—যখন সৌভা-গ্যের সুখে, ভাবী আশায়, অজ্ঞাত শত্রুর শঙ্কায়, ইতি-কর্ত্তব্যতার সন্দেহে, সরল ধর্ম্মপথের আপদ-শূন্যতার বিশ্বাসে, অর্থাৎ "ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং" ইতি দৃঢ় প্রত্যয়ে দুলীন কখনো ঊর্দ্ধে উঠিতেছেন, কখনো রসাতলে পড়িতেছেন, কখনো অস্থিরতায় দুলিতেছেন, এবং সর্ব্বশেষে প্রাণ ভরিয়া

করুণা-ময়ের ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করিতেছেন, সেই কালে কালিফা-নুরদিন সাহেব দেখা দিলেন।

ফুলীন সহর্ষে গাত্রোত্থান ও স্বাগত সম্ভাষণ পূর্ব্বক সাদর সম্বর্দ্ধনায় তাঁহাকে বসাইলেন। কালিফাজী ফুলীনের রাজ-প্রসন্নতা লাভের প্রসঙ্গে মহা আহ্লাদ প্রকাশ ও তদুপলক্ষে বিবিধ উপদেশও দিলেন। বলিলেন, "আর কি সাহেব, আপনার শুভগ্রহ তো সম্পূর্ণ তেজ করিয়া উঠিয়াছে! এমন দয়া, এমন সমাদর, একদিনেই এত অনুগ্রহ, মহারাজ আর কাহাকেও—আপনাদের কোন ইউরোপীয়কেও—কখনো দেখান নাই! আপনার অদৃষ্ট-চক্র নিশ্চয়ই সৌভাগ্যের পথে সুচালিত হইয়াছে!"

ফুলী। কালিফাজি, সত্য। কিন্তু মহারাজের এই যে কৃপাদৃষ্টি, এ কেবল আপনাদের দুই ভ্রাতার অনুগ্রহে। কিন্তু এই রাজ-দয়া কি ভাবে কিসে পরিণত হয়, তাহা আমি এখনো বুঝিতে পারি নাই।

নুর। কিসে পরিণত হয়? আপনি আমাদের মহারাজার বিষয়ে এতই অনভিজ্ঞ? রাজানুগ্রহ কিসে পরিণত হয়? কিসে না হয়, বরং তাহা এক-বার জিজ্ঞাসা করুন! রণজিৎসিংহের দয়ার কটাক্ষও যা, অতুল সৌভাগ্যও তা! যারে বলে রণজিতের দয়া, তারেই বলে ঐশ্বর্য্য, তারেই বলে সম্পত্তি, তারেই বলে ক্ষমতা, তারেই বলে নাম যশঃ কীর্ত্তি, তারেই বলে প্রভুত্ব! কেমন সাহেব, আর কি আমার বুঝাতে হবে? যদি এ দয়া বজায় রাখিতে পারেন, তবে এই যে কর্ণেল হ'য়েছেন, এই যে একদল অশ্বারোহীর অধ্যক্ষ হ'য়েছেন, এ থেকে বৃহৎ বাহিনীর সেনাপতি—এ থেকে রাজ্যপতি—এ থেকে দ্বিতীয় ধ্যান সিংহ পর্য্যন্ত হইতে পারিবেন!

ফুলী। যাহাই হই, কিন্তু আপনি আর আপনার মহাসম্ভ্রান্ত জ্যেষ্ঠ মহাশয় শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন যে, অকৃতজ্ঞের উপকার করেন নাই!

এই কথায় কালিফাজী আরো নিকটবর্ত্তী হইয়া অনুচ্চস্বরে কহিলেন—"আপনার প্রতি আমার ভ্রাতা যে যথার্থই অনুকূল হইয়াছেন, তাহা আপনি ক্রমেই অনেক কাজে জানিতে পারিবেন। আপনার শুভোদ্দেশেই এখন তিনি আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন—আপনাকে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিতেই আমার আসা। আমি নিশ্চিত জানি যে, ইহার মধ্যেই আপনার বিরুদ্ধে ঘোর চক্রান্ত আরম্ভ হইয়াছে। রাজা ধ্যান

সিং এবং রাজা গোলাপ সিং এই দুই ভ্রাতাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা পাওয়া আপনার অত্যাবশ্যক। যদিও অগ্রজ মহাশয় মহারাজার মুখ স্বরূপ, কিন্তু রাজা ধ্যান সিংহই হস্ত—প্রধান মন্ত্রী ও, ভাল মন্দ ঘটাইবার প্রধান যন্ত্রী। অতএব যদি রাজানুগ্রহ অটুট্ রাখিবার বাসনা থাকে, তবে কদাচ ঐ যুগল ভ্রাতাকে কিঞ্চিন্মাত্রও অবহেলা করিবেন না। আর, সরকারে যে কয়জন আপনাদের ইউরোপীয় উচ্চপদস্থ লোক আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা বা বিশেষ অনাত্মীয়তা, এ দুয়ের কোনটী যেন না করেন—মাঝামাঝি ভাব রাখিবেন। আপনি যুবা পুরুষ এবং বোধ হয় বিলক্ষণ তেজস্বী, কিন্তু পঞ্জাবে যদি প্রতিপত্তির আশা থাকে, তবে রাগদ্বেষাদি রিপু দমনের অত্যাবশ্যক, অধিক বলা বাহুল্য। কে যে আপনার শত্রু হইয়াছে, কি হইতে পারে, তাহা উল্লেখ করিব না; কিন্তু আপনি যে অনেকের চক্ষুঃশূল হইবেন, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। ইউরোপ, আর এ রাজ্য সর্ব্বাংশেই বিভিন্ন—উভয় স্থানের রাজা, প্রজা, মন্ত্রী প্রভৃতি যে এক ধাতুর নন, ইটী যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে। যাহাকে শত্রু বলিয়া সংস্কার জন্মে, তাহাকে গোপনে হত্যা পর্য্যন্ত এদেশে সচরাচর ঘটে! বিনা অস্ত্র, বিনা শরীররক্ষক, প্রধানেরা কেহই প্রায় বাহিরে যান না—বিশেষতঃ যে যত রাজার প্রিয় পাত্র, তাহাকে ততই আত্মসারা হইয়া চলিতে হয়! আপনি যদি সুচতুর হয়েন, তবে এই সব কথার এক বর্ণও স্মৃতি-স্খলিত হইতে দিবেন না। আজ্ আর অধিক বলিব না, আপনি বিশ্রাম করুন, আমি এখন বিদায়।” এই বলিয়া উঠিলেন।

এই উপদেশ-মালার একটীকেও কপট আত্মীয়তার কথা বলিয়া সুবুদ্ধি দুলীনের সন্দেহ হইল না—এই ব্যবহারে আশ্রয়দাতা ভ্রাতৃদ্বয়কে বরং যথার্থই অকপট বন্ধু বলিয়া বুঝিলেন। সুতরাং তদ্রূপ ভাবেই অন্তরের সহিত বাধ্যতা স্বীকার করিলেন।

কালিফাজীর ভৃত্যগণ বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করিতেছিল, এক্ষণে কালিফাজীর ইঙ্গিতে তাহারা গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক নানাবিধ মিষ্টান্ন ও মেওয়া প্রভৃতি [illegible] দ্রব্য নিচয় গৃহ-প্রাঙ্গণে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে রক্ষা করিল।

দুলীন সবিস্ময়ে ঈষৎ বিরক্তি-ব্যঞ্জক মিষ্ট ভর্ৎসনার স্বরে কহিলেন, “একি? আপনাদের অনুগ্রহ-দৃষ্টিই যথেষ্ট—এ আবার কেন?”

কালিকাজী হাসিয়া বলিলেন "ইহা আমার বা আমার পরম পূজ্য অগ্রজ মহাশয়ের প্রদত্ত নহে; এ সব রাজ-প্রসাদ-চিহ্ন, মহারাজের আজ্ঞাতেই রাজভাণ্ডার হইতে প্রেরিত!"—এই বলিয়া প্রধান ভৃত্যের হস্ত হইতে সুবর্ণ-মুদ্রা-পূর্ণ একটী তোড়া লইয়া তুলীনকে অর্পণ পূর্ব্বক পুনশ্চ কহিলেন "জিয়াফৎ স্বরূপ ইহাও প্রেরিত হইয়াছে!"

ভূপতির এই বিশেষ দয়াতে তুলীনের হৃদয় আরো দ্রবীভূত হইল। ভৃত্যগণ বাহিরে গেলে এবং তুলীন বন্ধুকে ডাকিয়া তাহাদিগকে পারিতোষিক দানের কথা বলিয়া দিলে, কালিকাজী অতি সরল, সহৃদয় ও সমবেদনশীল বন্ধুর ন্যায় তুলীনের নব আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় তুলীনের বাস-স্থানে ভৃত্যবর্গ ব্যতীত কোন ভদ্র সহচর নাই জানিতে পারিয়া সহাস্য বদনে একটী সঙ্গী দিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন "সে ব্যক্তি বয়সে প্রবীণ, কিন্তু উৎসাহে ও কার্য্যে নবীন! সে অতিশয় ঋজু-স্বভাব—কপটতা মাত্রই জানে না—তাহার হৃদয়খানিকে বালকের হৃদয় বলিলেই হয়! পরিশ্রান্তির পর সাবকাশ কালে তাহাকে লইয়া আপনি মাঝে মাঝে আমোদ উপভোগে সমর্থ হইবেন। সে যেমন সরল, তেমনি বিশ্বাসী, তেমনি প্রভুপরায়ণ—তাহার হস্তে তহবিল ও হিসাবাদি লেখা পড়ার কাজ দিয়া আপনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন—লক্ষ মুদ্রা ন্যস্ত করিলেও কিছু মাত্র আশঙ্কা নাই। সে এ দেশের লোক নয় অথচ এ দেশের প্রায় সমস্তই জানে। আট দশ বৎসর আমার ভ্রাতার নিকট থাকাতে রাজসভা-সংক্রান্ত অনেক অবস্থা ও তাবল্লোকের বিষয় জ্ঞাত আছে। আপনি নূতন আগত, এ রাজ্যের কিছুই অবগত নহেন, সুতরাং সে আপনার অনেক কাজে লাগিতে পারিবে—অন্ততঃ যখন যাহার পরিচয় বা যে বিষয় জানিতে চাহিবেন, চৈতন দাস তখনই তাহা শুনাইয়া দিবে।"

তুলী। চৈতনদাস? তবে কি সে বাঙ্গালী?

কালিকা। হাঁ বাঙ্গালী। দাদা যখন মহারাজার কোন নিগূঢ় প্রয়োজনে কলিকাতায় গিয়াছিলেন, তখন গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের সহিত কথোপকথন জন্য জনৈক দ্বিভাষীর প্রয়োজন হয়, তদুপলক্ষেই চৈতন্য জুটে। যদিও তাহার তর্জ্জমা শুনিয়া সাহেবেরা হাসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নিজের লোক দ্বারা সে কাজ নির্ব্বাহ করাইয়াছিলেন; কিন্তু চৈতনের

স্বভাব চরিত্র দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া দাদা তাহাকে লইয়া আইসেন। তাহার বিস্তর গুণ; কেবল অস্ত্র চালনায় সে নিতান্তই নির্গুণ—লড়াই ঝকড়ার নামে পাশ কাটায়! কিন্তু সে যথার্থই নিমকের চাকর; কেবল আপনার সুবিধা ভাবিয়াই তাহাকে ছাড়িতে চাহিতেছি, নতুবা তাহাকে আমরা অত্যন্ত ভালবাসি।

তুলীন। (সহাস্তে) মহাশয়! যথেষ্ট হইয়াছে, আর বলিতে হইবে না। আমি সত্য কহিতেছি, সে ব্যক্তি আমার বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ উপকারে লাগিবে। বিশেষ, আমি বাঙ্গালীকে ভালরূপ জানি—বাঙ্গালীকে খুব ভালবাসি। এদেশের লোক সাহসী ও যুদ্ধপটু বটে, কিন্তু সভ্যতা ও সাহচর্য্য বিষয়ে কদাচই বাঙ্গালীর ন্যায় নহে। অমন সুবুদ্ধি শান্ত জাতি অতি কম পাওয়া যায়। আমার সৌভাগ্য যে, বিনা আয়াসে বঙ্গদেশীয় একজন সুশিক্ষিত সহকারী লাভ করিলাম—ইহাতেও আমার প্রতি আপনাদের সামান্য অনুগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে না!

কালিফা। (সহাস্তে) কিন্তু তাহার সকল কথা এখনো বলা হয় নাই—সে কথা শুনিলে আপনি সাগ্রহে লইতে, কি ভয়ে পরিত্যাগ করিতে চাহিবেন, বলিতে পারি না! লাহোরে তাহাকে অনেকে পাগল বলিয়া জানে—

তুলীন। (সহাস্যে) জানে? তবে বাস্তব সে পাগল নয়? আমি এত পাগল নই যে, ইটা বেস বুঝিতে পারি না যে, সে যথার্থ পাগল হইলে আপনি তাহাকে আমার হস্তে দিতে চাহিতেন এবং তাহার এত গুণ ব্যাখ্যা করিতেন!.অবশ্যই তাহার পাগলামির কোন বিশেষ হেতু আছে—

কালিফা। আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন। আপনার নিকট সত্য প্রকাশের বাধা কি? আমার দাদার অনিষ্টাচার উদ্দেশে দুরাশয় গোলাপ সিংহ তাহাকে প্রচুর উৎকোচের লোভ দিয়া কোন অবৈধ গুপ্ত কাজে লওয়াইতে চেষ্টা পায়। কিন্তু চৈতন সে লোক নয়, সে যথার্থই ধার্ম্মিক—নিমকের চাকর। যাহাতে নিজের ধর্ম্ম ও প্রভুর কর্ম্ম হানি হয়, সেকি প্রাণ থাকিতে এমন কাজ করে? সে মহা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পাগলের ন্যায় এলো মেলো বকিতে লাগিল! গোলাপ সিংহও বাতুলের হাতে গুরু ভার অর্পণে ভীত হইল! চৈতন তৎকালে ভয় প্রযুক্ত যাহা করিয়াছিল, এখন দাদার পরামর্শে ছলক্রমে তাহাই করিয়া থাকে; কেননা অত

শীঘ্র বায়ু-রোগ সারিয়া গেলে দুষ্ট গোলাপ সিংহের কোপানলে তাঁহাকে দগ্ধ হইতে হইবে!

ছুলী। যথেষ্ট! আপনি যখনই অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন, তখনই সমাদরে তাহাকে গ্রহণ করিব।

কালিকা। চৈতনও আপনাকে পাইলে মহা সুখী হইবে—সে কথায় কথায় "এত সাধের ইংরাজটা একেবারে ভুলিয়া গেলাম" বলিয়া সর্ব্বদাই আপশোষ করে।

এইরূপ কথোপকথন ও পরামর্শের পর কালিকাজী চলিয়া গেলেন। ছুলীন আবার রোমন্থনে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি সে দিবসের পূর্ব্বাপর ঘটনাবলী চিন্তা করিয়া সুখানুভবই করিলেন। শত্রুর চক্রান্ত-কথা মনে বড় স্থান পাইল না। চৈতনের সঙ্গ-লাভকেও সুখের ঘটনা ভাবিলেন। এক এক বার এ প্রকার সন্দেহের কণা জ্ঞান-নেত্রের নিকট উড়িতেছিল বটে যে, "হয় তো আমার উপর প্রহরিতা উদ্দেশেই, ইঁহারা ছলক্রমে এক জন গুপ্ত চরকে ভণ্ড ভৃত্য-ভাবে আমার নিকট রাখিয়া দিলেন।" কিন্তু পরক্ষণে মন কেন এমন অন্যায়রূপে সন্দিহান হয় বলিয়া মনকে তিরস্কার করিলেন! আবার সন্দিগ্ধ মনকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত বলিলেন "মন! তোমার সন্দেহ সত্য হইলেই বা আমার ক্ষতি কি? আমি যখন ধর্ম্মতঃ জানি যে, আজিজুদ্দিনের প্রতি অকপট বন্ধুতা, আন্তরিক বাধ্যতা ও সরল কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ আছি এবং যত দিন তিনি যথার্থ বন্ধু থাকিবেন, তত দিন কখনই তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধাচার করিব না, বরং সর্ব্বদাই প্রিয়াচরণে নিযুক্ত রহিব, তখন তাঁহার প্রহরী (যদি তাই হয়) নিকট থাকাতে উপকার বৈ অপকার কি?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাজ-পরিচয়।

মহারাজা রণজিৎ ও তাঁহার প্রধান সচিবগণের কিছু কিছু পরিচয় দিবার সময় উপস্থিত। উপাখ্যানের প্রয়োজনে সেরূপ ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত (যত সংক্ষেপে সম্ভব) না লিখিলে পাঠকগণের বোধ-সৌকর্য্যের পক্ষে পরে

ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। অতএব সর্ব্বাগ্রে মহারাজার বিষয়ে এই অধ্যায়টী পূর্ণ হইতেছে। ধৈর্য্যশীল পাঠক মহাশয়কে অভিনিবেশ পূর্ব্বক এইটী ও পরবর্ত্তী অধ্যায় দুইটী পড়িতে অনুরোধ করিতেছি—অধৈর্য্যশীল মহাশয়েরা এই ঐতিহাসিক বৃত্তান্তগুলি ছাড়িয়া দিলেও দিতে পারেন, কিন্তু যেন স্মরণ রাখেন, ধৈর্য্যের ন্যায় বন্ধু দ্বিতীয় নাই!

যে সময়ের ঘটনাবলী লইয়া এই উপাখ্যান, তৎকালে এই বিশাল ভারত-রাজ্য মধ্যে নবোদিত দুই প্রবল শক্তি অন্যান্য পূর্ব্ব শক্তি-সমূহকে নিঃশক্তি করিয়া তুলিয়াছিল। এক প্রান্তে ব্রিটিস-সিংহ, অন্য প্রান্তে পঞ্জাব-সিংহ! এই দুই রাজসিংহ এই বৃহৎ ভূভাগকে যেন দুই (ন্যূনাতিরেকে) ভাগে বিভক্ত করিয়া একাধিপত্য করিতেছিলেন। যবনের তিরোভাবে মহা-রাষ্ট্রীয়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। অমোঘ ব্রিটিস-পরাক্রমে সে প্রবল বল তখন হতবল হইয়া পড়িয়াছে।

ওদিকে রণজিতের ভুজপ্রতাপে পঞ্জাব ও চতুঃপার্শ্বস্থ বহু বহু হিন্দু ও যবন-জাতীয় পার্ব্বতীয় ভূপালবর্গ রাজ্যচ্যুত বা হীনবীর্য্য হওয়াতে একটী সুবিস্তৃত রাজ্য তাঁহার কর-কবলিত অথবা তাঁহারই কর্ত্তৃক দৃঢ়রূপে রচিত হইল। তাঁহার রিপুঞ্জয় নামটী কাবুলের সিংহাসন পর্য্যন্ত কম্পিত করিয়া তুলিয়া-ছিল। রণজিৎ নাম হিমালয়ের উত্তর খণ্ড হইতে কুমারিকা কূল এবং সাগর পারে ইউরোপ আমেরিকা পর্য্যন্ত ধরা-ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এমন পুরুষের অধিক পরিচয় অনাবশ্যক, কেবল বিশেষ বিশেষ কয়েকটী কথা যাহা সচরাচর সুজানিত নয়, তাহাই বক্তব্য।

যখন দুলীন লাহোর গিয়াছিলেন, তখন মহারাজার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। তাঁহার আকৃতি খর্ব্ব ও সৌষ্ঠবশূন্য—তিনি এক চক্ষুহীন। তদুপরি আবার অবিশ্রান্ত রণ-ক্ষেত্রের পরিশ্রম, শারীরিক নিয়ম পালনে অসাবধানতা এবং অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবার ফল স্বরূপ জরা রাক্ষসী তাঁহাকে যেন অকালেই গ্রাসোদ্যতা, এমনি বোধ হইত!

তাঁহার শরীর সম্বন্ধে এই। মানসিক কর্ষণ ও গুণজ্ঞানাদির বিষয়েও কিছু বলিবার আছে। লেখা পড়া বিদ্যা সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিব, যাহাকে নিতান্ত বর্ণ-জ্ঞান-হীন বা নিরক্ষর বলে, তিনি তাঁহাই ছিলেন! কিন্তু বিস্ময়ের পর বিস্ময় এই, প্রকৃতি দেবী তাঁহাকে অতি তেজস্বী, অতি

প্রখর, অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি বৃত্তি এবং অতুল্য স্মরণ-শক্তি রূপ অমূল্য রত্নদানে এককালে মুক্তহস্তা হইয়াছিলেন!

মহা কবি পোপ লিখিয়াছেন "সিন্ধু যেমন এক কূল ভাঙ্গে, আর কূল গড়ে; স্বভাব তেমনি, যে মনে বুদ্ধিবৃদ্ধি অধিক দেন, সে মনে স্মরণশক্তি তত দেন না!" অর্থাৎ এক জনের বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি উভয়ই উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু কবিবরের দৃষ্টি যদি মহারাজ রণজিতের ন্যায় মনুষ্যে পতিত হইত, তবে তিনি ঐরূপ নীতি-তত্ত্ব কদাচ লিপিবদ্ধ করিতেন না! তাঁহার ঐ বাক্য সামান্যতঃ সত্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক নিয়মের ন্যায় ঐ নিয়মেরও ব্যতিরেক আছে। মহারাজ রণজিৎ সেই ব্যতিরেকের প্রথম শ্রেণীরও প্রধান! কারণ কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার সূক্ষ্মাংশে প্রবেশ করা এবং সকল বিষয়—অতি সামান্য—অতি ক্ষুদ্র কথাও—চিরদিন স্মরণের অধীন করিয়া রাখা, এই দুইটী মানসিক ক্রিয়াতে মহারাজ অদ্বিতীয় নিপুণ ছিলেন!

তিনি এই দুই শক্তির সাহায্য বলেই তাঁহার সুবিস্তৃত রাজ্য-সংক্রান্ত তাবদ্ব্যাপার, বিদ্বান্ রাজগণাপেক্ষাও সমধিক যোগ্যতার সহিত নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইতেন। রাজস্ব বিভাগের আয়, ব্যয়, কর-নির্দ্ধারণ, কর-সংগ্রহের উপায় স্থিরীকরণ ও অন্যান্য হিসাবাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্তই তাঁহার আপন দৃষ্টির অন্তর্গত ছিল। কিসে মিতব্যয়িতা ব্যবস্থাপিত হইয়া অসংখ্য যুদ্ধ বিগ্রহাদির অপরিমেয় ব্যয় সংকুলান হইতে পারে এবং কিসে রাজপুরুষ ও ভূম্যধিকারিগণ ঠকাইতে না পারে, তত্তাবৎ দুরূহ কার্য্য তাঁহার অমার্জ্জিত মেধা কি আশ্চর্য্যরূপেই সম্পাদন করিত! তিনি বলিতেন; রাজকোষের সচ্ছলতা ও রাজস্বের সু ব্যবস্থা না হইলে রাজ্যের সুপালন কদাচ সম্ভবে না।

তিনি যেমন সূক্ষ্মদর্শী, তেমনি কর্ম্মঠ, তৎপর ও মহোদ্যমশালী ছিলেন। আয়াস-সাধ্য কর্ম্মে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। যে কালে ও যেরূপ সমাজে তিনি আধিপত্য করিতেন, তদ্বিবেচনায় তাঁহাকে এক জন মহান্ ন্যায়বান ও দয়ালু ভূপালই বলা যাইতে পারে। তাঁহার নিকটে যাঁহারা থাকিতেন, তাঁহাদের প্রতি প্রতিনিয়তই তিনি সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার করিতেন। এজন্য তাঁহার পারিপার্শ্বিকবর্গ অবিচ্ছেদে প্রায় সকলেই মনের সহিত তাঁহার প্রতি ভক্তি ও প্রীতিপরায়ণ ছিল। ইহা রাজহৃদয়ের

কারুণ্যাদি গুণ পক্ষে সামান্য কষ্টি পাথর নয়! ফলতঃ আশ্রিত ও শরণাগত-রক্ষক রূপে তিনি প্রসিদ্ধই ছিলেন। যে কেহ যে বিষয়ের জন্য ভিক্ষা-প্রার্থী বা অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইত, সঙ্গত বোধ হইলে, তিনি তাহাকে প্রায়ই বিমুখ করিতেন না। কিন্তু যথার্থ বলিতে গেলে, সকল সময় সে সকল আজ্ঞা সুরক্ষিত হইত কি না সন্দেহ।

রণজিৎকে অনেকে লোভী সংজ্ঞা দিত। ইহা যে নিতান্তই অমূলক অপবাদ, তাহা বলা যায় না। কিন্তু সুশিক্ষার অভাব এবং তাৎকালিক (কি দেশীয়, কি ইউরোপীয়) রাজন্যবর্গের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিলে তিনি যে স্বীয় লোভ রিপুকে আরও অসীমরূপে পরিচালন করেন নাই, ইহাই বরং বিশেষ প্রশংসার বিষয়। আবার, কোন কোন রাজবংশ সম্বন্ধে তাঁহাকে সন্ধিভঞ্জক বিশ্বাসঘাতক বলিয়াও ইংরাজ লেখকেরা দোষ দেন, কিন্তু চতুর্ভূখণ্ড মধ্যে প্রাচীন ও আধুনিক কালে সভ্যাসভ্য সমাজে এমন মহীপাল একটীও দেখাও, যিনি সুযোগ পাইলে অন্য দেশস্থ হীনবল রাজ্যের সর্ব্বনাশ না করিয়াছেন—অন্য ভূপতির সহিত পূর্ব্ব-নির্ব্বন্ধ বা পূর্ব্ব-সন্ধি-ভঙ্গ-দোষে দোষী না হইয়াছেন? এ বিষয়ে পরছিদ্রানুসন্ধায়ী কর্ত্তারা—স্বয়ং সুসভ্য ব্রিটিস রাজপুরুষেরা কি মুক্ত? না, অগ্রগণ্য? তাঁহারা অন্যান্য জাতির প্রতি—আর অন্য কি, রণজিতের বংশধরগণের প্রতিই যে আচরণ করিয়াছেন, তত্তুলনায় রণজিৎ তো সাধু! ফলতঃ তাঁহার যে সব দোষ ছিল, তদ্রূপ ও তদপেক্ষাও গুরুতর অপরাধ-মালা তাৎকালিক আসিয়াস্থ (ইউরোপেও কোন্ নয়) প্রায় সমুদয় রাজার কণ্ঠভূষণ-রূপেই দেদীপ্যমান হইত; কিন্তু তাঁহার যে অসাধারণ গুণমালা ছিল, সেরূপ প্রায় কোন রাজ-হৃদয়েই আর দৃষ্ট হইত না।

রণজিৎ সাহসী পুরুষ—স্বয়ং বীর ও বীরগণের সুদক্ষ নায়ক ছিলেন। অনেক স্থলে এরূপ সমর-কৌশল দেখাইয়াছেন যে, তিনি অতি সুযোগ্য সেনাপতি নামে ঘোষিত হইতে পারেন। প্রথম প্রথম বহু যুদ্ধে স্বহস্তেও অস্ত্রচালনা করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, রণ-ভূমি ব্যতীত আর কোন্ স্থলে—এমন কি, বিচারস্থলে দণ্ড প্রদান কালেও—কখন যে কোন মনুষ্যের প্রাণ হনন বা তদনুমতি দান করিয়াছেন, এমন কথা তাঁহার বিপক্ষ পক্ষও কস্মিন্‌কালে বলিতে পারে নাই। সুতরাং নিষ্ঠুরতা, হিংসা বা জিঘাংসা

তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। আবার, দিল্লীর সম্রাট ও কাবুলের আমীরের ন্যায় বিজিত নৃপতিগণকে তিনি এককালে পথের ভিখারী করিয়া ছাড়িয়া দিতেন না, নিয়মতন্ত্র আধুনিক ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের ন্যায় প্রায়ই তাঁহাদিগের বৃত্তি বিধান করিতেন। অনিয়মতন্ত্র যথেচ্ছাচার-প্রণালীর একাধিপত্যে এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে কয়টা পাওয়া যায়?

মহারাজ বর্ষে বর্ষে ভ্রমণে বহির্গত হইয়া স্বীয় সাম্রাজ্যের প্রায় সকল অংশই স্বচক্ষে দর্শন করিতেন। তদুপলক্ষে যাহা কিছু দেখিতে, শুনিতে, জানিতে পারিতেন, স্বীয় সুবিশাল স্মরণরূপ পুস্তকে তত্তাবৎ তন্ন তন্ন রূপে মুদ্রাঙ্কিত রাখিতেন—প্রয়োজনমতে সে সব কাজে লাগিত। অধীন ভূম্যধিকারী জায়গির-ভোগী ও রাজাগণ যদি এরূপে আপনাপন অধিকার শাসন করিতে পারিতেন যে, প্রজাদের দুঃখবার্ত্তা মহারাজকে শুনিতে না হয়, তবেই তিনি তাঁহাদের প্রতি মহা সন্তুষ্ট থাকিতেন। তিনি ঐরূপ আর্দাসকে মনের সহিত ঘৃণা করিতেন। সুতরাং যাহাতে তাঁহার নিকট সেরূপ অভিযোগ উপস্থিত হইতে না পারে, ভূস্বামীবর্গ তাহাতে সম্পূর্ণ চেষ্টাবান ও সতর্ক থাকিতেন। তথাপি তাঁহার বার্ষিক পরিদর্শন কালে এখানে সেখানে কোন কোন প্রপীড়িত দুঃখী প্রজা নৃপচরণে রোদনাশ্রু বর্ষণ করিতে ছাড়িত না। সেই অল্প রোদনেই তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রকৃত অবস্থা হৃদ্বোধ করিতে সমর্থ হইত। ফলতঃ প্রধানবর্গের দুর্ব্যবহারে রাজ্য মধ্যে কোথায় কি হইতেছে, তদ্বিষয়ে তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত থাকাতে প্রায়ই প্রতিবিধান ঘটিত।

তিনি আর এক উপায়ে প্রধানগণের চরিত্র-গত ও ব্যবহার-গত আভ্যন্তরিক ব্যাপার সকল জানিয়া লইতেন। অর্থাৎ কোন সূত্রে আপন সমক্ষে তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে রাগোদ্রেক করিয়া দিয়া বা বাগ্‌বিতণ্ডা বাধাইয়া তাঁহাদের অতর্কিত বচনাবলী ও ভঙ্গীর প্রতি তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে প্রহরিতা করিতেন। যদিও তাঁহারা আপনাদের গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিবার লোক নন, তথাপি পরস্পরের প্রতি দোষারোপ কালে যাহা কিছু বলিয়া ফেলিতেন, তাহাই রণজিতের পক্ষে যথেষ্ট হইত। যে ছিদ্র অন্যের পক্ষে অগম্য, তাহার স্বাভাবিকী সূক্ষ্ম-প্রবেশিকা-শক্তি তন্মধ্যেই প্রবেশের পথ করিয়া লইত।

ফলতঃ যে দেশে উচ্চ রাজবংশে জন্ম এবং রাজযোগ্য শ্রীছাঁদ ব্যতীত

পূজ্য হওয়া ভার—যে দেশে অসংখ্য সর্দ্দার ও মিসলপতিরা সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান, কাহারো নিকট কেহ অবনত হইতে স্বীকৃত ছিল না—সে সমাজে এক জন সামান্য সর্দ্দারের পুত্র কুৎসিৎ কলেবর লইয়া, কোন কিছু আমিরী চালের বিশেষ ভড়ং না দেখাইয়া এবং লেখাপড়ায় সম্পূর্ণ মূর্খ হইয়াও যে এ প্রকার একচ্ছত্রা রাজচক্রবর্ত্তী হইতে পারিয়াছিলেন, ইহা কি সাধারণ মস্তিষ্কের কাজ? একটী সামান্য মিসল-পতির উত্তরাধিকারীত্ব অবস্থা হইতে স্বীয় বুদ্ধি ও বাহুবলে রণজিৎ কি না করিয়া গিয়াছেন? সেই ভুজবল একখানি অপকৃষ্ট দেহ হইতে উৎপন্ন—সেই বুদ্ধি-কৌশল সম্পূর্ণ নিরক্ষর ও অমার্জ্জিত মনের সম্পত্তি! তথাপি তাঁহার নাম, যশঃ, কীর্ত্তি দিগন্ত-ব্যাপ্ত—যে নামে ইউরোপ পর্য্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট! দোর্দ্দণ্ড ইংলণ্ড তাঁহাকে আমরণ পূজা করিল! দিল্লীর মোগলবংশের অতুল সাম্রাজ্যের ধ্বংশকারী তাৎকালিক অদ্বিতীয় প্রতাপান্বিত মহারাজ যশোবন্ত হোল্‌কার ব্রিটিস ক্রোধ হইতে পলাইয়া গিয়া তাঁহারই শরণাশ্রিত, তাঁহারই ভুজরক্ষিত ও কিছুকাল তাঁহারই অন্নপালিত হইলেন; তাহাতেই সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন! কাবুলের কত রাজপুত্র তাঁহার রুটী খাইয়াই জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন! অতএব পুনশ্চ বলি "রণজিৎ না করিয়াছেন কি?"

তাঁহার দুরদৃষ্টি নবোদিত ইংরাজ-রাজশক্তির অসীমতা দেখিতে পাইল—ভারতের অন্যান্য ভূপাল অন্ধ হইল! তাঁহার সেই দূর-দর্শন-ক্ষমতা এত প্রবল ছিল যে, তাঁহার সকল মন্ত্রীর মন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়াও তিনি পরম ভবিষ্যদ্দর্শীর ন্যায় ইংরাজের ভাবী ভাগ্য বুঝিতে পারিয়া ইংরাজের বিপক্ষ-রাজার পক্ষ অবলম্বন করিলেন না, অথচ তাঁহাকে (যশোবন্তকে) আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না! আরো কত সময় তাঁহার গর্ব্বান্ধ পারিষদেরা তাঁহাকে ইংরাজের সহিত যুদ্ধ বাঁধাইবার কুমন্ত্রণা দিয়াছিল, তিনি তাহা শুনেন নাই! তেমন সুবুদ্ধির কাজ না করিলে তেমন অটুট কীর্ত্তি রাখিয়া কি তিনি ইহলোক ত্যাগ করিতে পারিতেন? তাঁহার রাজ্য যেমন এক রণজিৎ লইয়া, ইংরাজের রক্তবীজের রাজ্য তেমন সহস্র রণজিৎ লইয়া! এ কথা কেবল তিনিই বুঝিয়াছিলেন! অতএব ইহাতেও অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য, তিনি একজন অসামান্য-মেধাবী ক্ষণজন্মা পুরুষ রূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাজ-পারিষদ।

রাজ-সচিবগণেরও কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। রাজা ধ্যান সিংহ, জমাদার খোসাল সিংহ, ফকির আজিজুদ্দিন, এই তিন ব্যক্তিই সচিবমণ্ডলীর প্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা মহারাজার অধিক বিশ্বাসভাজন ও প্রিয় পাত্র ছিলেন। রাজ্যমধ্যে আরো বহু বড় লোক ছিলেন, কিন্তু যিনি যত বড়ই হউন, ইহাদের সমকক্ষ কেহই হইতে পারেন নাই।

এই তিনের মধ্যে রাজা ধ্যান সিংহই প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। যে সূত্রে যেরূপে তাঁহার ও খোসাল সিংহের অভ্যুদয় হয়, তাহা ভদ্র লোকের অকথ্য ও অশ্রোতব্য, সুতরাং বলিব না। ধ্যানসিংহের আর দুই ভ্রাতার নাম গোলাপ সিংহ (যিনি পরে স্বদেশবিপক্ষ ইংরাজ-পক্ষ অবলম্বনের ফলে ৭৫ লক্ষ টাকা দিয়া কাশ্মীরাধিপতি হন) ও সুচেৎ সিংহ। এই তিন ভ্রাতার ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা অসামান্য ছিল। অধিক কি, ধনসম্পত্তি ও রাজ্যাধিকারে ভ্রাতাত্রয় মহারাজার অপেক্ষা বড় ন্যূনকল্প ছিলেন না। প্রভেদের মধ্যে রণজিৎ মহারাজা, তাঁহারা রাজা—রণজিৎ রাজার রাজা, স্বাধীন মহারাজা, তাঁহারা অধীন রাজা—তাহাও প্রায় নামে! কার্য্যতঃ স্বীয় স্বীয় অধিকারে তাঁহারা প্রায় একাধিপত্যই করিতেন!

যদিও তাঁহারা সদ্বংশজ—ক্ষত্রিয় কুলজাত—কিন্তু কোন প্রসিদ্ধ বংশ-সম্ভূত নহেন। পূর্ব্বে তাঁহাদের ব্যবসায়-বৃত্তিও উচ্চ ধরণের ছিল না। গোলাপ সিংহ তো পূর্ব্বে সামান্য সওয়ারের কর্ম্ম করিয়া বেড়াইতেন। একদা গোলাপ সিংহ কোন বিবাদে একটী নরহত্যা করেন। হত ব্যক্তির স্বপক্ষ-লোকের আক্রমণ হইতে পলাইয়া আসিয়া তিনি মহারাজ রণজিতের শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। রণজিৎ তাঁহার আকার দর্শনে ও বক্তৃতা শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অভয় দিয়া স্বীয় অনুচর-শ্রেণীভুক্ত করিলেন। ক্রমে ক্রমে গোলাপ সিংহ প্রিয় পাত্র হইতে এবং ভ্রাতা ধ্যান সিংহকে রাজানুগ্রহের শীতল ছায়ায় স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন। সুতরুণ রূপবান ধ্যান সিংহ অবৈধ সেবা কৌশলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম হইতে

পারিলেন। তিনি আবার তাঁহার অনুজ সুচেৎকে আনিয়া রাজানুগৃহীত করিয়া দেন।

মহারাজার হিতৈষী বন্ধু মাত্রেরই এইটী বড় আশ্চর্য্য বোধ হইত যে, তিনি এত সুচতুর, সতর্ক ও সুবোদ্ধা হইয়াও উক্ত ভ্রাতৃত্রয়ের ক্ষমতাকে এত অসঙ্গত রূপে বাড়িতে দিয়াছিলেন। ক্ষমতা এতদূর বাড়িয়াছিল যে, শেষে তাঁহার পক্ষেও সে ক্ষমতাকে যথা-সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা মহা ভার হইয়া উঠিয়াছিল।

সাধারণের এই মনোগত ভাবটা ধ্যান সিংহের অগোচর ছিল না। পাছে কেহ মহারাজকে খুলিয়া বলিয়া বিরূপ ঘটাইয়া তুলে, তৎপ্রতিবিধানার্থ তিনি প্রায়ই প্রভুর সমীপবর্ত্তিতা পরিত্যাগ করিতেন না। যদি কখনো কোন কার্য্য ব্যপদেশে স্বল্প কালের নিমিত্তও স্থানান্তর যাইতে বাধ্য হইতেন, বিশ্বাসী প্রতিনিধি না রাখিয়া যাইতেন না। তাঁহার বেতন-ভোগী, উপকার-গ্রাহী, ক্ষমতাভাগী, সুতরাং তাঁহার স্বার্থে স্বার্থবান, এমন বহু জন রাজসদনে তাঁহার হইয়া সর্ব্বক্ষণ প্রহরিতা ও পক্ষ সমর্থন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। অপর পক্ষীয় কেহ যে রাজকর্ণ অধিকার করিয়া ভ্রাতাত্রয়ের বিরুদ্ধে সহসা গ্লানির কথা শুনাইবে, এমন সুযোগ ঐ সব প্রহরীর ভয়ে কাহারো প্রায় ঘটিয়া উঠিত না! তথাপি কোন শুভাকাঙ্ক্ষী যদি সাহস বাঁধিয়া বা সুবিধা পাইয়া এই ভাবে প্রশ্ন করিতেন যে, "কেন মহারাজ উহাদিগকে এত অতিরিক্ত ক্ষমতাশালী হইতে দিতেছেন?" তদুত্তরে মহারাজা বলিতেন "নাচার! আমার অদৃষ্টে এইরূপই লেখা আছে—কেবল অখণ্ডনীয় ভবিতব্যতার বশেই আমি উহাদের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছি!" ফলে এ কথাকে বড় মিথ্যা বলাও যায় না, নচেৎ পথের পথিকবৎ নিঃসম্পর্কীয় ধ্যান সিংহ যে রণজিতের ন্যায় পুরুষসিংহকে মেষশাবকবৎ চালাইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া লইতে পারিতেন, ইহা বিশ্বাস-যোগ্যই হইবার নয়!

রাজ্য মধ্যে এক ধ্যান সিংহই সব—ধ্যান সিংহ দ্বার-রক্ষক, ধ্যান সিংহই শরীর-রক্ষক, ধ্যান সিংহ সেনাপতি, ধ্যান সিংহ প্রধান মন্ত্রী, ধ্যান সিংহই প্রধান মুসাহেব! ধ্যানের অনুমতি বা অভিমতি ব্যতীত কাহার সাধ্য মহারাজার নিকটস্থ হয়? কাহার সাধ্য কোন আর্দ্দাস করে? পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, তদনুসারে যদিও কোন দুঃখার্ত্তের 'দোহাই' রাজকর্ণ-গোচর

হইত ও মহারাজ তৎপ্রতিকার করিতেন, কিন্তু পরক্ষণেই সেই প্রার্থী টের পাইত যে, অগ্রে প্রধানামাত্যের শরণ না লইয়া যাওয়াটা দুষ্কর্ম্ম হইয়াছে!

ধ্যান রাজসভায়, আর গোলাপ ও সুচেৎ প্রদেশ মধ্যে থাকিতেন—ইহারা প্রায়ই রাজধানীতে আসিতেন না—অগণ্য সৈন্য-শিরে সংগ্রাম এবং স্বীয় স্বীয় অধিকৃত ভাগে যদৃচ্ছাক্রমে রাজত্ব ভোগ করিতেন—কেবল অত্যাচার ও অবিচারই যে করিতেন, তাহা বলিতেছি না; তবে যথেচ্ছাচারের রাজ্যে রুচি, খেয়াল ও অবস্থা ভেদে ন্যায়ান্যায় যেমন সর্ব্বত্রই ঘটিয়া থাকে, তাহাই হইত! তবে গোলাপ সিংহের কঠোর শাসন প্রসিদ্ধই ছিল। বিশেষতঃ লবণের ঠিকা তাঁহার একচেটিয়া থাকাতে তিনি প্রজার দৈনিক আহারেরও এক প্রকার হর্ত্তা কর্ত্তা ছিলেন।

ধ্যান সিংহ ঈষৎ খঞ্জ, কিন্তু পরম শ্রীমান্, শিষ্টাচারী, মিষ্টালাপী, সদ্বক্তা এবং সুসভ্য ছিলেন। সমস্ত পঞ্জাবের মধ্যে (মহারাজা ব্যতীত) তাঁহার ন্যায় রাজনীতিকুশল যোগ্য পুরুষ কেহই আর ছিল না। যেমন রাজনীতিজ্ঞ, তেমনি কৌশলী। বোধ হয়, তজ্জন্যই পঞ্জাবের শাসন-দণ্ড তাঁহারই করাঙ্গুলীতে ঘুরিত! আশ্চর্য্যের পর আশ্চর্য্য এই, তিনিও তাঁহার প্রভুর ন্যায় নিরক্ষর!! তথাপি সভ্যতা ও শীলতা ও বাক্‌পটুতায় অদ্বিতীয়!! এক এক সময় এক এক অঞ্চলে এক এক প্রকার প্রতিভার উদয় হয়, তদনুসারে নিরক্ষর প্রতিভা তৎকালে একাধিক উত্থিত হন। সে যাহা হউক, যাহা বলিতেছিলাম, তাহা বলি। ধ্যান সিংহ প্রায়ই সভাস্থলে মহারাজের পশ্চাভাগে ভূমিতে উপবেশন করিতেন—তাঁহার নিম্ন পদস্থ ব্যক্তিরা আসনোপবিষ্ট হইলেও তিনি ঐরূপ নম্রতা পরিহার করিতেন না।

জমাদার খোসাল সিংহ পঞ্জাবী নহেন, ব্রিটিস অধিকারস্থ সাহারণপুর নামক নগর তাঁহার জন্মস্থান। যৌবনে তিনি সুশ্রী ছিলেন, দুলীনের অবস্থিতি সময়ে ইতর আকৃতি ও কর্কশ প্রকৃতির তেজস্বী পুরুষ রূপে পরিণত হইয়াছিলেন। ধ্যান সিংহের প্রকৃত অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে দ্বার-রক্ষকতা অর্থাৎ শরীর-রক্ষকদলের সর্ব্বাধ্যক্ষতা পদ তাঁহারই ছিল—দ্বাররক্ষীও যা, প্রভুর কর্ণাধিকারীও তা! আবার কর্ণাধিকারীও যা, প্রভুত্বাধিকারীও তা! কিন্তু ধ্যান সিংহের ন্যায় চতুরতা ও সতর্কতা তাঁহার ছিল না।

একদা লাহোর হইতে অমৃতসরে যাইবার নিমিত্ত তিনি মহারাজকে

পুনঃ পুনঃ অনুরোধ ও উত্তেজনা করেন; তাহাতে চক্রান্তের সন্দেহ হওয়াতে তাঁহাকে অধ্যক্ষতা হইতে অন্তরিত করিবার জন্য মহারাজার সংকল্প হয়। কিন্তু অত বড় ক্ষমতাশালী লোককে স্পষ্ট কিছু বলিতে না পারিয়া ধ্যান সিংহকে গোপনে দুর্গ ও রাজভবন অধিকারার্থ আদেশ করেন। ধ্যান অতি চতুর, অতি তৎপর, রাত্রিকালে স্বদলে শমনবুরুজ নামক রাজদুর্গ ও রাজপুরীর প্রাচীর উল্লংঘন পূর্ব্বক বিনা বাধায়—বিনা রক্তপাতে সহজেই রাজাভিপ্রায় সুসিদ্ধ ও খোসালকে পদচ্যুত করিয়া তদবধি প্রধান পদাধিষ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। খোসাল বুঝিলেন, বিবাদ বা বিপক্ষতাচরণ কেবল আত্ম নাশের সোপান মাত্র; সুতরাং চুপে চুপে সে অপমান সহ্য করিয়া থাকিলেন। কিন্তু মহারাজা তাঁহাকে অন্যান্য বিষয়ে পূর্ব্বের ন্যায় সম্মানে ও নিম্ন-মন্ত্রীত্ব পদে রাখিতে ত্রুটি করেন নাই।

রণজিতের পুত্র কুমার সের সিংহ যৎকালে কাশ্মীরের শাসন-ভার প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার সহকারী পদে এবং তদ্রাজ্যের দুরবস্থ রাজস্ব বিভাগের সংশোধক রূপে খোসাল সিংহকে তৎসঙ্গে প্রেরণ করা হয়। খোসালকে নির্ব্বোধ রাজকুমার আঁটিতে না পারিয়া তাঁহার হস্তেই সমস্ত কার্য্যভার দিয়া নিজে নিশ্চিন্ত হইলেন। খোসাল ইক্ষু-মর্দ্দন-যন্ত্রের ন্যায় নিঃস্ব প্রজাপুঞ্জকে অধিকতর নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক যতদূর সম্ভব রসাকর্ষণ করিয়া লইলেন। তৎকালে একে অজন্মা, তাহাতে এই নিদারুণ নিষ্পীড়ন, সুতরাং ভূ-স্বর্গোপম সোণার কাশ্মীর দেশ দুর্ভিক্ষ ও দৌরাত্ম্য দাবানলে এককালে ছারখার ও প্রজাশূন্য-প্রায় হইয়া পড়িল—কতক মরিল, কতক নির্জীব অবস্থায় রহিল, কতক ভিক্ষা দ্বারা প্রাণ রক্ষা উদ্দেশে হিন্দুস্থানে পলায়ন করিল! মহারাজ এই মর্ম্মান্তিক সংবাদ শুনিতে পাইয়া খোসালের উপর অত্যন্ত কুপিত হইলেন—তদবধি বহু দিন পর্য্যন্ত খোসাল সিংহ রাজপ্রসাদে বঞ্চিত ছিলেন। আমাদের উপাখ্যানের সময়ে তিনি পূর্ব্বানুকম্পার ছায়ায় পুনঃস্থাপিত হইয়াছেন। দ্বাররক্ষণ-কালে অর্থাৎ আদ্যাবস্থায় যে জমাদার নামটী পাইয়াছিলেন, পরে একজন অগ্রগণ্য প্রধান সর্দ্দার হইয়াও সে নাম ঘুচে নাই।

ফকির আজিজুদ্দিন চিকিৎসা ও ক্ষৌর-ব্যবসায়ীর পুত্র। পূর্ব্বে নিজেও তিনি পৈতৃক ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন। প্রৌঢ় বয়স্ক পাঠক অবশ্যই জানেন যে, কিছুকাল পূর্ব্বে (কুত্রাপি এখনও) অস্মদ্দেশে নাপিতেরাই

অস্ত্র-চিকিৎসক ছিল। ইহা শুদ্ধ বঙ্গদেশে নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে এবং প্রায় সমস্ত আসিয়া মহাখণ্ডে অদ্যাপিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। শুদ্ধ আসিয়া খণ্ডেই বা বলি কেন? ইত্যগ্রে ইউরোপেও যে ঐরূপ ছিল, তন্নিদর্শন বহু ইংরাজী গ্রন্থে দেখা যায়। অপিচ, আমরা বঙ্গীয় নাপিত জাতিকে যেরূপ চতুর, ধূর্ত্ত, কৌশলী, চিকিৎসাকুশল, মিষ্ট রসাভাষী ও উপস্থিত বক্তা দেখিতে পাই, আসিয়া ইউরোপে সর্ব্বত্রেই সেই ক্ষৌর-ব্যবসায়ীরা সেইরূপ! এই অদ্ভুত সমতা কেবল ক্ষুরের গুণে কি অন্য কারণে হয়, তাহা আমরা বলিতে পারি না—দার্শনিক পাঠকগণ সিদ্ধান্ত করিয়া লইবেন!

সে যাহাই হউক, যিনি নাপিত ও হাকিম ছিলেন, তিনি ফকির হইলেন কিসে, তাহা প্রিয়বন্ধু ভুলীন মহাশয়ের অনুসন্ধানে যত দূর আবিষ্কৃত হইয়াছে, বলিতেছি।

আজিজুদ্দিন্ চতুর, কার্য্য-তৎপর ও সাহসী যুবা ছিলেন। দৈহিক বলবীর্য্যে ও বুদ্ধি-কৌশলে একদল পদাতিকের অধিনায়ক হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু কোন সূত্রে দীননাথ প্রভৃতি মহারাজার হিসাবাধ্যক্ষগণের ফাঁদে পড়িয়া বিপন্ন ও সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিলেন। তাঁহাদের সহিত সমকক্ষতাভাবে বিবাদ করা বিফল ও নিজের মহানিষ্ট-সাধক জানিয়া অবশেষে ফকিরের ভেক্ ধারণ করিলেন! উত্তম শাস্ত্রজ্ঞান ও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা প্রভাবে অচিরাৎ মহারাজার অনুগ্রহ আকর্ষণের সুযোগ পাইয়া অল্পকালের মধ্যেই দ্বিতীয় ধ্যানসিংহ হইয়া উঠিলেন!

তিনি রণজিতের মুখস্বরূপ। রণজিতের অর্দ্ধোচ্চারিত বাক্য কি স্বল্প প্রকাশিত যৎকিঞ্চিৎ ইঙ্গিতও বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিতেন। অশিক্ষিত মহারাজ সালঙ্কৃত বাক্য প্রয়োগে পটু ছিলেন না, কিন্তু ফকিরজীর গুণে সে হীনতা সর্ব্বতোভাবেই পূর্ণতায় পরিণত হইত। মহারাজার বদন বা নয়ন হইতে অভিপ্রায়টী যেন কাড়িয়া লইয়া ফকির সাহেব তাহাকে এমন সৌষ্ঠব-সম্পন্ন করিয়া উদ্দিষ্ট পথে ছাড়িয়া দিতেন যে, যাঁহার ভাবাভিপ্রায়, সেই প্রভু এবং যাঁহাকে বলা হইত, সে ব্যক্তি, উভয় পক্ষই মহা সন্তোষ লাভ করিতেন! তাঁহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বাক্‌চাতুর্য্যের প্রভাবে মহারাজার বাক্‌পারুষ্য মসৃণতা ধারণ করিত—সেই চতুরতাপূর্ণ বাগ্মীতার সহায় ব্যতীত সে কার্য্য মহারাজার দ্বারা কদাচই তেমন সুচারুরূপে সাধিত

হইত না, সুতরাং মহারাজ যেন বাঁচিয়া যাইতেন! এ ক্ষমতাকে সামান্য বলা যায় না! আবার যাহারা শুনিত, তাহারা ভাবিত, হয় তো মহারাজ এ সকল গূঢ় বিষয়ের পরামর্শ ফকিরজীর সহিত পূর্ব্বেই করিয়াছেন, নতুবা একটু কটাক্ষ মাত্রেই ফকির কি এত দূর বলিতে পারিতেন? তাহাতে তাঁহার পদমর্য্যাদার আরো গুরুত্ব ও মহত্ব বাড়িয়া ধন মান বৃদ্ধির পক্ষে পরম সহায় হইত; কেননা দরবারের প্রার্থী মাত্রেই তাঁহাকে অকাতরে ধন-দান ও মান-দান করিত। ফলতঃ রণজিতের বিশাল রাজ্যান্তর্গত কর্ম্মচারী, ভূম্যধিকারী ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি তাবল্লোকেই তাঁহাকে ও রাজা ধ্যানসিংহকে ঐরূপে পূজা না করিয়া বাঁচিতে পারিত না!

দুলীনের সময় ফকিরজী পরিণত-বয়স্ক হইয়াছিলেন। তিনি যথার্থ ফকিরের ন্যায় সামান্য পরিচ্ছদে দীন বেশেই দেখা দিতেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর! তিনি শুধু মন্ত্রী নন, রাজ-চিকিৎসকও ছিলেন; সুতরাং মহারাজার অতি প্রিয়—অতি বিশ্বাস-ভাজন। স্বভাবতঃ তিনি কুলোক ছিলেন না, বরং পরোপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার সদ্বুদ্ধি, সুমন্ত্রণা ও সুকৌশলে মহারাজার অশেষ উপকার হইত।

অন্য অমাত্যগণের মধ্যে রামসিংহ, গোবিন্দরাম ও বেণীরাম সমধিক সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী। প্রথম দুই জন সহোদর। তন্মধ্যে রামসিংহ পহল গ্রহণ পূর্ব্বক শিখ হইয়াছিলেন। গোবিন্দরাম হিন্দুই ছিলেন। এই হেতু কেবল রামই সিংহ হইতে পারিয়াছিলেন। গোবিন্দরাম মহারাজার বিশেষ আহ্বান ব্যতীত প্রায় আসিতেন না। তিনি শিখ না হইলেও তাঁহার প্রতি রণজিতের এত ভক্তি যে, কখন কখন স্বয়ং তাঁহার নিকট পর্য্যন্ত গিয়া পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। এইরূপে একদিন তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পিতাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন বাস্তিরাম, কুশলে তৃপ্তিসুখে তো আছ? কোষাধ্যক্ষ নিয়মিতরূপে তোমার বৃত্তি তো পাঠায়?" তদুত্তরে বাস্তিরাম কহিলেন "আমি মহারাজার কোন বৃত্তিই পাই না এবং চাই না: কেননা শিখ হইতেও পারিব না, বৃত্তির স্পৃহাও রাখি না!" এবং এতদুপলক্ষে একটী কবিতা আওড়াইলেন, তাহার অর্থ;—

"রাজ্য অধিকার তব পূর্ণ হৈল যবে,"
"এক আস্তরণ মাত্র দিলে মোরে তবে।"

"দাসানুদাসের যোগ্য, কিন্তু নহে যেবা,"
"ধন, রত্ন, পরিচ্ছদে কৈলে তার সেবা !"

এই স্পষ্টভাষিতায় মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া পক্ষপাতী ধর্ম্মান্ধ কোষাধ্যক্ষকে পদচ্যুত করিয়া সেই পদে বৃদ্ধ বাস্তিরামকে নিয়োগ পূর্ব্বক বাস্তিরামের মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহাকে বিশেষ মান্য করিতেন এবং তাঁহার উক্ত পুত্রদ্বয়কে বিশ্বসনীয় পদে উন্নত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপর এক পুত্রের নাম গুরুমুখ বা গুরুমুখ। তিনি মহারাজার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। এই ভ্রাতাত্রয়ের রাজনৈতিক সংস্কার, ধ্যান সিংহের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। তজ্জন্য উভয় পক্ষে বড় মনান্তর ছিল।

বেণীরাম আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত সচিব ও প্রধান কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। স্বীয় কর্ম্মে সুদক্ষ ও বিশ্বাসী বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল। তিনি যেমন প্রভুরত, মহারাজও তাঁহাকে তেমনি বিশ্বাস ও স্নেহ করিতেন।

এস্থলে ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণের উল্লেখ উচিত। এলার্ড, কোর্ট ভেঞ্চুরা ও আবিটেবিল। বিবিধ প্রকারের সৈন্য প্রস্তুত ও সুশিক্ষিত করিবার ভার তাঁহাদের উপর অর্পিত ছিল। মন্ত্রণাকার্য্যে ইঁহাদের সাহায্য গৃহীত হইত না।

দুলীনের সময় মহারাজার তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ খড়্গ সিংহ অত্যন্ত দুর্ব্বল ও নিতান্ত স্ত্রৈণ—ধর্ম্মের ভেক লইয়া বেড়াইতেন! দ্বিতীয় সের সিংহ—যদিও বড় বুদ্ধিমান নহেন, তথাপি সাহসিকতা ও কার্য্যক্ষমতা, রাজপুত্রগণের মধ্যে ইঁহাতেই যাহা কিছু ছিল। তৃতীয়ের নাম তারা সিংহ। ইনি অত্যন্ত ভোগাসক্ত, লম্পট ও সর্ব্ব বিষয়েই দুশ্চরিত্র ছিলেন। এমন কি, একপ্রকার কাজের বাহির বলিলেই হয়। চতুর্থ পুত্র দলীপ—যিনি খ্রীষ্ট পদাশ্রয় গ্রহণান্তে ইংলণ্ডের রাজসভার প্রসাদ-ভোজী শূনাবৎ তথায় যৌবন যাপন করিয়া শেষে পিতৃরাজ্যাপহারী সেই ইংরাজ-বিরুদ্ধে হন্যা হইয়া পুনর্ব্বার শিখ্-ধর্ম্মাবলম্বনের পর রুষ ফ্রান্সাদি রাজ্যে টো টো ভাবে ঘুরিতেছিলেন! কিন্তু এখন মৃত। দুলীনের সময় তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই। শুনিতেছি, শেষে পীড়িতাবস্থায় ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন ও পাইয়াছিলেন।

———

নবম পরিচ্ছেদ।

শাসন-প্রণালী।

পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদ দুইটীতে যেমন মহারাজ ও সচিব প্রভৃতির কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া হইল, এ অধ্যায়ে তদুপসংহার স্বরূপ তদ্রূপ সংক্ষিপ্ত রীতিতে শাসন-প্রণালী সংক্রান্ত গুটিকতক কথা বলা অত্যাবশ্যক।

প্রথম, রাজস্ব। কয়েক বৎসর মেয়াদে রাজ্যের সমস্ত ভূসম্পত্তিতে (ক্ষুদ্র বৃহৎ খণ্ডে) ইজারার বন্দোবস্ত হইত। আনুমানিক উৎপত্তির পাঁচ ভাগের দুই ভাগ ইজারদার ও রাজ-সরকারের প্রাপ্য—বাকী তিন ভাগ কৃষকের। প্রজার নিকট হইতে ইজারদার তাহার বেশী আদায় করিতে পারিত না। যদি করিত, তবে দণ্ডনীয় হইত। সে অত্যাচার রাজগোচর হইবারও উপায় ছিল। রাজগোচর হইবা মাত্র ইজারদারের প্রদত্ত হিসাব অগ্রাহ্য হইয়া তাহার নামে এরূপ অঙ্কপাত হইত, যাহাতে সে অসন্তুষ্ট হইতে না পারে, অথচ বেশী লভ্য লাভেও সমর্থ না হয়। এই কৌশলময় দণ্ডদানের ফল অতি শুভ হইত। ইজারদার দেখিল, অনিয়ম ও দৌরাত্ম্য দ্বারা প্রজার অতুষ্টি জন্মাইয়া যাহা কিছু অতিরিক্ত আদায় করিলাম, তাহা যখন আমার ভোগে আসিল না, বরং সেই অতিরেকেরও অতিরেক দিতে হয়, তখন বৃথা কেন পীড়ন করিয়া প্রজার বিরাগ-ভাজন হই? এই শ্রেষ্ঠ উপায়ে মহারাজ প্রজাবর্গকে বাঁচাইয়া দিতেন—তাহাদিগকে রাজস্বঘটিত জমীদারী অত্যাচার প্রায়ই সহ্য করিতে হইত না—ইহাতেই তাহাদের স্বচ্ছলতা ও সুপালন ঘটিত। বোধ হয় এই জন্যই তাঁহার প্রতি ছোট বড় সমুদয় প্রকৃতিপুঞ্জ এত ভক্তিমান ও অনুরাগী ছিল। কোন ইজারদার নির্দ্দিষ্ট করদানে ইতস্ততঃ করিলে অবস্থানুসারে অল্প বিস্তর কাঠিন্য সহকারে কারা-রুদ্ধ হইত। অথবা রাজসভায় মুরব্বির বলানুসারে হয় এককালে ক্ষমা, নয় তো অনুরূপ স্বল্প দণ্ড দিয়াই ত্রাণ পাইত। সমর্থ ব্যক্তি হইলে তাহাকে দ্বিতীয় সুযোগ দান জন্য তাহার নামে বাকী টানার রীতিও ছিল।

দ্বিতীয়, বিচার। ঐ ইজারদারই স্বীয় অধিকৃত অংশে জজ, মাজিষ্ট্রেট, কলেক্টর, মুন্সেফ, প্রভৃতি ইংরাজ-রাজ্যের বিভিন্ন কর্ম্মচারীর কার্য্য করিত।

সুশিক্ষিত পাঠককে বলা বাহুল্য যে, বিচার-নিরপেক্ষতা বিষয়ে ইংলণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নত হইয়াছে। যদিও ব্রিটিস-বিচার-বিতরণ-প্রণালী (আমরা ভারতে যাহা দেখিতেছি) নির্দ্দোষ নহে—যদিও কেবল ন্যায় ও সত্য মাত্রকেই আশ্রয় করিয়া ইংরাজ-ধর্ম্মাধিকরণে জয়ী হওয়া দুর্ঘট—যদিও দলিল ও সাক্ষ্যাদির শতবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ তদ্বির ও পাকা মোক্তারের হুজুরি ও আমলা রূপ কর্ব্বুদকুলের রাক্ষসী উদর পূরণ ভিন্ন জয় লাভ একপ্রকার অসম্ভব, কিন্তু সে সব আইনের ত্রুটিতে এবং কর্ত্তৃপক্ষের ব্যয়কুণ্ঠতা দোষে, বিচারকের দোষে তত নয়। অধুনা বিচারক মণ্ডলীর (বিশেষ বঙ্গদেশে) কেহই প্রায় পক্ষপাত ও উৎকোচ-রাহুগ্রস্থ নহেন—সে পক্ষে প্রায় নির্ম্মল। কেবল উপযুক্ত বেতনের ব্যবস্থা না থাকাতে বিচারকগণের নিম্নে সচ্চরিত্র সহকারীর অভাব ঘটিয়া অর্থী প্রত্যর্থীর সর্ব্বনাশ ঘটে! তথাপি আমরা যেরূপ বিচারক ও বিচার দর্শনে অভ্যস্ত, তাহাতে রণজিতের রাজ্যের বিচারক ও বিচার বিবরণ শুনিয়া যে নিন্দা করিব, তাহা আশ্চর্য্য নহে।

তথায় বিচারালয় মাত্রই অর্থাকর্ষণের যন্ত্র স্বরূপ ছিল—উঠিতে বসিতে প্রায় সকল বিষয়েই ন্যায়তঃ অন্যায়তঃ প্রজার অর্থদণ্ড হইত—বিচারকগণ নিজের ও মহারাজার "নেমকের চাকর"! সুতরাং ভাক্ত বিচার নামক পদার্থের বিনিময়ে রাশি রাশি টাকা বর্ষে বর্ষে আদায় করিতেন! যাহারা হারিত, তাহাদের তো কথাই নাই; জয়ী ব্যক্তিকেও বিচারঘটিত সম্পত্তির প্রায় চতুর্থাংশ বা তদ্রূপ কোন কিছু ডালি না দিয়া নিস্তার পাইবার যো ছিল না!*

সে দেশে বিচার ক্রয়ার্থ অর্থ-শ্রাদ্ধ ব্যাপারটী লোকের এত দূর অভ্যাসের তলে পড়িয়া সহজ ব্যাপার হইয়াছিল যে, বিচারক টাকা খাইয়া শীঘ্র কাজ করিয়া দিলে সন্তুষ্ট বৈ কেহই অসন্তুষ্ট হইত না! কোন কোন বিচারক উভয় পক্ষের নিকট উৎকোচ লইতেও কিছু মাত্র কুণ্ঠিত, ব্যথিত বা লজ্জিত হইতেন না। যাহার টাকা গেল, অথচ জয় হইল না, সেই কেবল পক্ষপাতী

---

* লেখকের পার্শ্বস্থ একজন দুষ্ট লোক ঐ টুকু পড়িয়া বলিলেন "এ যে বরং ভাল—চতুর্থাংশ বৈ তো নয়! এবং তাহাও চট্ পট্ যাহা হয় একটা হইত! আমাদের সুসভ্য ইংরাজ-আদালতে যে বহুকাল ধরিয়া কাটিয়া কাটিয়া ঘুণ পুরিয়া বহু জ্বালাতনের পর শেষে হয় তো ঘুষ ও খরচার দায়ে সর্ব্বস্ব ডালি দিয়া আসিতে হয়!" দুষ্ট বন্ধুর এ কথার সদুত্তর আমাদের উকিল, কৌন্সিল ও ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা দিবেন, আমি পারিলাম না!

ও কুবিচারক বলিয়া গালি দিত। যে দেশের ধর্ম্মাধিকরণের বিচার এত অধর্ম্ম-মূলক ও এত দুর্মূল্য, সে দেশে দীন দুঃখীর দুরবস্থার বিষয় পরিচয় দেওয়াই বাহুল্য। কিন্তু বলিতে কি, আমাদের "অতি-সভ্য" সুনীতিজ্ঞ শাসন-কর্ত্তারা যখন বিচার-বিক্রয়ের লোভটী সম্বরণ করিতে (অদ্যাপি) পারিতেছেন না, তখন অশিক্ষিত অর্দ্ধসভ্য রাজ্যে তাহার আশা করাই অন্যায়। তথায় বরং অধিকাংশ বিষয় শালিসী বা পঞ্চায়েত কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হওনের প্রাচীন প্রথা প্রবর্ত্তিত থাকাতে অনেক বাঁচন ছিল! এবং এই সুপ্রথার জন্যই বিচারকের দ্বারে অত্যল্প লোকই যাইত।

তৃতীয়, শুল্ক। বাণিজ্যের শুল্ক হইতেই চতুর্ব্বিংশতি লক্ষ মুদ্রা সংগৃহীত হইত। তন্মধ্যে এক অমৃতসরেই নব লক্ষ। কেবল রাজকোষের নিমিত্ত ঐ কর দিয়াই ব্যবসায়িগণ নিস্তার পাইত না; প্রত্যেক পার-ঘাট, রাজপথ, পণ্যস্থান ও গঞ্জাদি রক্ষক প্রভৃতি বহুবিধ প্রকারের রাজকর্ম্মচারীরা—পদাতিক পর্য্যন্ত—যাহার যেমন ইচ্ছা ও যাহার যেমন সুবিধা, সে স্বীয় কোষের উপকারার্থও কর বসাইত! কিন্তু ধর্ম্ম কথা বলা উচিত, হাঁস না মরে—মূলার ক্ষেৎ না হইয়া উঠে—রাজদরবার পর্য্যন্ত কথাটা না যায়, এরূপ বিবেচনাতেই তাহারা স্বল্পে সন্তুষ্ট হইত! তথাপি রণজিৎ সিংহ ফলিতার্থ বাণিজ্যের বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার সুশাসন গুণে পঞ্জাব রাজ্যে বাণিজ্য ব্যবসায়ের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছিল।

চতুর্থ, সৈনিক। পূর্ব্বে যে ইউরোপীয় চারি জন কর্ম্মচারীর নাম করা গিয়াছে, তাঁহারা পঞ্জাব-সৈন্য-মধ্যে নূতন পদ্ধতি, নূতন শাসন-প্রণালী, নূতন নিয়ম, নূতন প্রকারের পদোন্নতি, নূতন প্রকারের নিয়োগ-রীতি প্রভৃতি আনয়ন করেন। তাহাতে সর্দ্দারগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও উদ্ধত হইয়া উঠেন। পূর্ব্বে তাঁহারা নবাবী ধরণে স্বেচ্ছাচারে যাহা করিতেন, তাহাই হইত। এখন ইউরোপীয় প্রণালীতে কিছুই আল্‌গা থাকিবার যো নাই—সকলই শক্ত-শাক্ত—সকলই বাঁধাবাঁধি! কাজেই তাঁহারা চীৎকার আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সুবোদ্ধা ও সুযোদ্ধা রণজিৎ তাঁহাদের কথা শুনিলেন না; একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া এ বিষয়ের "তকরার-ওয়ালা" মাত্রকেই বিশেষ শাসনে নিবদ্ধ করিলেন।

সকল সুদ্ধ মহারাজার পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ প্রভৃতি

বিভিন্ন সৈনিক শ্রেণী এমত নিপুণ ও আজ্ঞাবহ হইয়া উঠিল যে, ভাগ্যহীন আসিয়া খণ্ডস্থ কোন রাজা ও কোন সম্রাটের তেমন তেজস্বী সজীব বাহিনী ও তেমন উৎকৃষ্ট সমর-সজ্জা একালে আর কখনই দৃষ্ট হয় নাই। যত দিন তদ্রূপ উন্নত অবস্থা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ না হইয়াছিল, তত দিন পর্য্যন্ত মহারাজের যত্ন অবিচলিত ও আয়াস অপরিমিত দেখা গিয়াছিল—তত দিন পর্য্যন্ত তাঁহার প্রাণ, মন, ধন, আহার, নিদ্রা সমস্তই উহাতে উৎসর্জ্জিত হইয়াছিল। তিনি নিজে তদ্রূপ অধ্যবসায়ী না হইলে এলার্ড ও ভেঞ্চুরা প্রভৃতির সাধ্য কি যে, এত প্রবল প্রতিবন্ধক প্রশমিত করিয়া সে কার্য্যে সিদ্ধ হইতে পারিতেন ?

কিন্তু একটী বিশেষ ত্রুটির নিমিত্ত উক্ত ইউরোপীয় মহাশয়েরা মহা ভাবিত হইতেন। সে দোষ শুধু পঞ্জাব বলিয়া নয়, তৎকালে এ দেশে প্রায় সকল রাজসংসারেই দৃষ্ট হইত। সে দোষ অন্য কিছু নয়—সৈন্যগণের বেতন প্রদানে অমনোযোগ, অনিয়ম ও বিলম্ব। বাহিনীর সুদক্ষতা অটুট রাখিবার নিমিত্ত সৈনিকগণের একান্ত বশবর্ত্তীতা নিতান্ত আবশ্যক। আবার সেই বশ্যতাকে ও সন্তোষকে অক্ষুণ্ন রাখিবার নিমিত্ত অন্যান্য সাধনের মধ্যে যথাকালে বেতন বণ্টনই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ উপায়। রণজিৎ সাংগ্রামিক অপরাপর সমস্ত বিষয় স্বদেশীয় সর্ব্ব জনাপেক্ষা উত্তম বুঝিতেন। সর্দ্দার বর্গের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বীতা ছেদন পূর্ব্বক কর্ম্মচারিগণকে ইউরোপীয় উন্নত আদর্শ স্থাপন করিতে দেওয়াতেই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। কিন্তু এত বুঝিয়াও বেতনের বিশৃঙ্খলা ও বিলম্ব নিবারণে —ঐ কয়জন প্রিয় সৈন্যাধ্যক্ষের বিস্তর অনুরোধেও—মনোযোগী হইলেন না, ইহার পর আশ্চর্য্য ও ক্ষোভের বিষয় আর কি ? সৈন্য সম্বন্ধে ইহাই তাঁহার বিশেষ ত্রুটি ছিল।

যৎকালে মুলতান প্রভৃতি বিজিত বিবিধ জনপদের লুণ্ঠিত ধনে রাজকোষ এত পরিপূর্ণ হইল যে, অর্থের মহাপ্লাবনে ধনাগার উথলিয়া উঠিতেছিল, তখনও সৈন্যসংঘের অন্ততঃ দ্বাদশ মাসের বেতন প্রাপ্য! একদা ঐ কারণে গুর্খা সৈনিকগণ বিদ্রোহীপ্রায় হওয়াতে গোবিন্দগড় নামক অমৃতসরের দুর্ভেদ্য দুর্গ মধ্যে মহারাজ আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অর্থের অভাবেই সেনাপতি বা ভূপতিগণ এইরূপ অপমান ও উপদ্রব সহ্য করিতে বাধিত হন। রণজিতের কিছু মাত্র অর্থাভাব ছিল না—রাজস্ব

বিষয়ে সর্ব্বদাই সতর্ক, ব্যয় বিষয়ে সমুচিতরূপেই পরিমিত—গোবিন্দ গড়ের ভাণ্ডার স্বর্ণ, রজত, হীরকাদি মণি মাণিক্যে পরিপূর্ণ—লাহোরের "শমন বুরুজ" নামে দুর্গ ও একটী সুদৃঢ় "মসিদবাড়ী" নামা রাজকোষও ঐরূপ চাক্‌চিক্যময় রত্নে পরিপূরিত—তথাপি সৈনিকেরা বেতন পাইত না! ইহাতেই বোধ হয়, মহারাজার ইটী একটী রোগ ছিল!

যে দিবস সেনাপতিরা ভয়ঙ্কর বিজ্ঞাপন পাঠাইতেন যে, "সৈন্যগণ না খাইতে পাইয়া মরিয়া যাইতেছে" অথবা "তাহারা ঘোর অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে" তখনই যাহা কিছু চৈতন্য ও প্রতিবিধানের লক্ষণ দৃষ্ট হইত, নতুবা সামান্য আবেদন ও অনুরোধ-পত্র বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হইত না! সেই প্রতিবিধানই বা কি? তাও কি নগদ টাকা? তাও না—কেবল "তনখা বা তঙ্কা-নামা!" অর্থাৎ সাম্রাজ্যের কোন বিভাগের শাসনকর্ত্তার উপর পরওয়ানা বাহির হইত—কখন কখন দুই তিন বিভাগের প্রতিও ঐ ভার বিভাজিত হইত!

যিনি এই আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার ভার পাইতেন এবং যাঁহার উপর এই বরাত যাইত, তদুভয়ের ক্ষমতা ও অবস্থানুসারে হয় তাঁহাদের সর্ব্বনাশ, নয় তো পৌষমাস ঘটিত! ইহার নিগূঢ় অর্থ এই;—

যে কার্য্য মহারাজার ঠিক মনোমত নয়—যে আদেশ যথার্থ আন্তরিক আদেশ নয়—কেবল দায়ে পড়িয়া আপাততঃ উত্তেজনা কাটানো মাত্র অভিপ্রায়—যাহা অপ্রসন্ন হৃদয়ে ব্যবস্থা করিতে বাধিত হইয়াছেন, তদ্রূপ বিষয়ে যিনি মুখ বুঝিয়া চলিতে না পারিতেন, কিম্বা তাড়াতাড়ি সে কাজটী করিয়া ফেলিতেন, তাঁহার প্রতি রাজান্তঃকরণে ভয়ানক অসন্তোষ জন্মিত! আবার, হয় তো এক বিষয়ে অদ্য যেরূপ আদেশ; রাত্রি অবসান হইতে না হইতেই তদ্বিপরীত ভাবের আজ্ঞা; পরক্ষণে পুনশ্চ হয় তো প্রথম প্রকারের; আবার হয় তো সেই দ্বিতীয় কি কোন নূতন ধরণের অনুমতি প্রেরিত হইত! একদা পঞ্চ পরিবর্ত্তনও দৃষ্ট হইয়াছিল!

একটী দৃষ্টান্ত দিব—সৈনিক নয়, অন্য বিষয়ক—কিন্তু যথার্থ ঘটনা। কোন অধীন সর্দ্দার স্বীয় অনুচরকে একটী ক্ষুদ্র জায়গির দিয়াছিলেন। পরে উভয়ের বিবাদ হওয়াতে সর্দ্দার সেই অনুচরকে সেই জায়গির হইতে দূরীভূত করিলেন। উভয়েই মহারাজার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন।

দরবার হইতে অনুচরের পক্ষে "ডিক্রী" দেওয়া হইল। সে ব্যক্তি প্রফুল্লচিত্তে অধিকার করিতে গিয়াছে, এমত সময় তাহার বিপক্ষের পক্ষে অনুকূল আদেশ আসিয়া উপস্থিত! এই দ্বিতীয় পক্ষ অধিকার করিতে না করিতে তদঞ্চলের অন্যান্য প্রধান সর্দ্দারগণের প্রতি অনুমতি গেল যে, তাঁহারা আপনাপন সৈন্য সমাবেশ পূর্ব্বক দ্বিতীয় ব্যক্তিকে রহিত ও প্রথম ব্যক্তিকেই স্থাপিত করেন! এই গোলে প্রায় এক বৎসর কাটিল। তদন্তে দরবারের গুপ্ত আদেশে এক দল সরকারি সিপাই গিয়া সেই জায়গিরের দুর্গটী অধিকার করিয়া বসিল! হরিবোল হরি! সব গোল চুকিল!

"Disputes generally end in loss to both parties!"

"বিবাদের চরম, উভয় পক্ষেরই ক্ষতি!" এই মহাবাক্যই সফল হইয়া উঠিল। সে বিষয়টী তদিতরের কাহারও আর রহিল না—সরকারের হইল! ইহাতে তাহারা উভয়ে মিলিয়া বিদ্রোহিতা করিবার পরামর্শ আঁটিতেছে, সহসা রাজসৈন্য তাহাদের শিবিরে পড়িয়া উভয়কেই নির্জ্জিত, ধৃত ও বন্দী করিয়া ফেলিল—বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র গর্ভের বস্তু গর্ভেই রহিয়া গেল!

যদিও এই চিত্র সুখজনক নয়, কিন্তু ইহার একটী অসাধারণ গুণ এই যে, ইহা সত্য! যদিও এই যথার্থ চিত্রে মহারাজার চরিত্রে কলঙ্কপাত হইতেছে, যদিও তাঁহার যশশ্চন্দ্রের পক্ষে ইহা কৃষ্ণপক্ষ, কিন্তু আমরা কি করিব, চন্দ্র হইলেই শুক্ল কৃষ্ণ দুই পক্ষই ভোগ করিতে হয়! তবে কিনা গুটীকতক কথা বিচার করিয়া দেখিলে রণজিতের এজাতীয় দোষ তত গুরু বলিয়া গণ্য না হইতে পারে, শুক্লপক্ষের দীপ্তিই হয় তো উজ্জ্বলতর বলিয়া বোধ হইতে পারে!

প্রথমতঃ। স্মরণ করুন, সুশিক্ষা তো বহু দূরের কথা, শিক্ষা মাত্রেই রণজিৎ বঞ্চিত।

দ্বিতীয়তঃ। বাল্যাবধি জন্মভূমিতে ও চতুঃপার্শ্বস্থ সমুদয় রাজ্যে—কাবুল, পারস্য, তাতার ও ভারতবর্ষের অসংখ্য জনপদে—কিরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতেছিলেন? যে কালে তিনি সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, তখন পঞ্জাবে পরস্পর-বিরোধী বহু বহু স্বেচ্ছাচারী, স্বাধীন মিসলপতি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধীন ভূম্যধিকারী ও "সর্দ্দার" নামধারী মাত্রেরই জ্বালায় সর্ব্বশ্রেণীর লোকই নিতান্ত দগ্ধ ও উৎপীড়িত কি হইতেছিল না? তিনি সমস্তই আত্মসাৎ ও একীভূত করিয়া সেই অনন্ত উৎপাতের অন্ত করেন!

তৃতীয়তঃ। গ্রীক-দিগ্বিজয়ী আলেকজ্যাণ্ডার, রোমীয় মহাবীর সিজার, ফরাসি শূরেন্দ্র নেপোলিয়ান এবং ব্রিটীস নায়ক ক্লাইব প্রভৃতি ভূমণ্ডলের বড় বড় সাম্রাজ্য-স্থাপয়িতাগণ ন্যায়াচরণকে জীবনের আদর্শ করিলে কি সেই সব মহা রাজ্য প্রণয়নে সমর্থ হইতেন? দিগ্বিজয়ী মহিপালগণের মধ্যে এ বিষয়ে কে ধার্ম্মিক? কে পরস্বাপহরণে বিরত? কে ন্যায্য লইয়াই সন্তুষ্ট? আমি তাঁহাদিগের দোষ দেখাইয়া রণজিংকে নির্দ্দোষী বলিতেছি না—আমি বলিতেছি, তাঁহাদের অপেক্ষা রণজিং অধিক দোষী নন—অধিক তিরস্কার-ভাজন হইতে পারেন না। ইংরাজ-লেখকগণ দুর্ভাগ্য ভারতবাসী-দের অপরাধ বিচার কালে এককালে ইউরোপীয়দের তদ্রূপ বা তদপেক্ষা গুরুতর দোষও ভুলিয়া যান—ভুলিয়া গিয়া বলিয়া ফেলেন "এ দেশীয় রীতা-নুসারে রণজিং অমুক দোষে দোষী—ন্যায় বর্জ্জিত ও লোভী ইত্যাদি!" যেন অন্যায় ও লোভ, ও পরস্ব-হরণ আসিয়ার রাজন্যবর্গের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, যেন ইউরোপীয় কীর্ত্তিচাঁদেরা তাহার নাম গন্ধও জানেন না! এইরূপ ছিদ্রা-ন্বেষী লেখক মহাশয়দের প্রবোধার্থই ঐ কয়টী কথার উল্লেখ হইল—রণ-জিতের দোষোদ্ধারের নিমিত্ত তত নয়। আমরা জানি, যে দেশেরই দিগ্বি-জয়ী হউন, দিগ্বিজয়ের অর্থই পররাষ্ট্র জয়—নব সাম্রাজ্য-নির্ম্মাণের অর্থই পররাজ্য হরণ! তাহার দৃষ্টান্ত জন্য অন্যত্র যাইতে হইবে না—অন্য কালের চিত্রও তুলিতে তুলিতে হইবে না, এই বর্ত্তমান ইংরাজ ভূপালের ভারত-সাম্রাজ্য গঠনেই দেদীপ্যমান! ইংরাজ যদি মুর্শিদাবাদ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, পঞ্জাব, সেতারা, বর্ম্মা প্রভৃতি অপহরণ না করিতেন, তবে কি এত বড় সুবিশাল সাম্রাজ্যটা ইংলণ্ডের মুকুটে প্রধান রত্ন রূপে ধক্ ধক্ করিতে পারিত? তেমনি, রণজিং যদি বাহিরের ও ভিতরের সর্দ্দারগণকে সেইরূপে বঞ্চিত না করিতেন, তবে কদাচই অমন সুদৃঢ় সাম্রাজ্যের পত্তন দিতে পারিতেন না।

চতুর্থতঃ। যখন তাহার অভ্যুদয় হইল, তখন দেশে কি দেখিলেন? কি পাইলেন? দেখিলেন, "জোর যার, রাজ্য তার!" যেন এই কুনীতি সমর্থনার্থই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূপতি বা সর্দ্দারগণ পরস্পরে লাঠালাঠি, কাটাকাটি, লুটালুটি করিতেছেন! তাহাতে প্রজাকুল ধন, মান, প্রাণ, জাতি ও ধর্ম্ম লইয়া মহা ব্যাকুল—তাহাতে জনপদ জন-শূন্য; গ্রাম নগর শ্রীশূন্য; বাণিজ্য-স্থান ব্যবসায় শূন্য; লোকালয় মাত্রই শান্তি-শূন্য হইয়া কেবল দস্যুপূর্ণ ও

জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া উঠিতেছে! অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন, সেই সমস্ত ভূখণ্ড এক জনের সবল বাহুরক্ষিত হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই পূর্ব্ব সৌষ্ঠব-সম্পন্ন হইতে পারে না। ভাগ্য ও যোগ্যতা মিলিত হইয়া তাঁহার বাহু যুগলকেই সেই প্রার্থনীয় বলে বলী করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ভাগ্য-দত্ত ও যোগ্যতা-লব্ধ সুযোগকে বহু যত্নে বর্দ্ধিত করিয়া মহা বলবন্ত একছত্রাধিপতি হইয়া উঠিলেন! অধিপতি হইবা মাত্র শ্রীভ্রষ্ট গ্রামনগরাদির পুনর্জ্জীবন-দান; ধর্ম্মে ও সামাজিক কর্ম্মে স্বাধীনতা-দান; দুর্দ্দান্ত দস্যু প্রভৃতির হস্তে প্রকৃতি-পুঞ্জকে অভয়দান; বাণিজ্য-ব্যবসায়ের বিস্তৃতি বিধান দ্বারা সর্ব্বত্র বিবিধ সুখদানেও সমর্থ হইয়া অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রজা-হিতৈষিতার পরিচয় দিলেন!

এইরূপ বহু বহু মহৎ গুণাবলীর মধ্যে পূর্ব্বোক্ত যে সব দোষ লক্ষিত হইত, তাহাও পূর্ব্বোক্ত অবস্থা সমূহ ও কালধর্ম্ম কারণে, বা উপযুক্ত উপকরণের অভাবেই ঘটিত—তাঁহার প্রকৃতিগত দোষ জন্য ততটা নয়। তিনি যদি ইউ-রোপে গিয়া একবার কিছু দিন থাকিতে পারিতেন—তাহা না হউক, যদি ইউরোপীয় সুমন্ত্রীর ন্যায় দুইজন মাত্র সুপরামর্শদাতা সচিব পাইতেন—তাহা না হউক, যে সব সভাসদ্ মণ্ডলীতে তিনি পরিবৃত ছিলেন, তাঁহারা যদি আধুনিক সুশিক্ষিত দেশীয় মন্ত্রীবর্গের ন্যায় ধর্ম্মভীরু ও সচ্চরিত্র হইতেন, তবে নিশ্চয়ই ঐ সমস্ত দোষের চারিভাগের অন্ততঃ তিন ভাগও ঘটিতে পারিত না! মনুষ্য অবস্থা ও শিক্ষার দাস, তাৎকালিক অবস্থা ও শিক্ষার দোষেই যাহা কিছু অশুভ ঘটাইয়াছিল। নতুবা প্রকৃতি তাঁহাকে যথার্থ মহৎ ভূপতির লক্ষণে ভূষিত করিয়াছিলেন, কেবল মানব-কৃত বাধাতেই সে সকল উচ্চ গুণ সকল স্থলে ও সকল সময়ে সম্পূর্ণরূপে স্ফুর্ত্তি পাইতে পারে নাই।

তথাপি তিনি যে সুপালক নরনাথ ছিলেন, তাহার তিনটী প্রমাণ জাজ্বল্য-মান। প্রথম;—তাঁহার প্রতি সর্ব্বসাধারণের আন্তরিক অনুরাগ ও ভক্তি—তাঁহার নামে বিশিষ্টরূপেই "দশের মুখে যশের বাখান!" দ্বিতীয়;—প্রতি বর্ষেই প্রচুররূপে বাণিজ্যের উন্নতি। তৃতীয়;—ইংরাজাধিকৃত সুখময় রাজ্য অতি নিকটে, তথাপি তাঁহার অধিকার-সীমা ত্যাগ করিয়া এক প্রাণীও ব্রিটিস ভারতে কখনই যায় নাই! পীড়ন পাইলে কি ইহা সম্ভবে? যাওয়া দূরে থাকুক, বরং প্রতিদিন তাঁহার অধিকার মধ্যেই প্রজার সংখ্যা-বৃদ্ধি দৃষ্ট হইত! ইহা আমার নিজের মনগড়া প্রশংসাবাদ নহে,

সুপ্রসিদ্ধ স্যার হেনেরি লরেন্স প্রভৃতি ইংরাজ লেখকেরাই ইহা লিখিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু আর না—এরূপ ঐতিহাসিক তত্ত্ব আর না। আমি তো নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস শুনাইতে বসি নাই! যে যে বিষয়ের স্বরূপ বর্ণনা ভিন্ন প্রিয় বন্ধু দুলীনের জীবনী বুঝিতে পাঠক সাধারণের অসুবিধা সম্ভব, কেবল তদ্বিবরণই উদ্দিষ্ট—এক্ষণকার মত তাহা সিদ্ধ হইল। কেবল পঞ্জাবী লোকের তাৎকালিক সাধারণ চরিত্র সম্বন্ধে দুই চারি ক্ষুদ্র বাক্য অবশিষ্ট।

রণজিতের পূর্ব্বে অত্যাচার ও অরাজকতাই রাজা ছিল। যদি কেহ ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন স্যার জন্ ম্যালকম্ মহাত্মার লিখিত পঞ্জাব-বিষয়ক প্রবন্ধটী পড়িয়া দেখেন। ফলতঃ সেই অরাজকতা ও অত্যাচার নামা নিষ্ঠুর শাসকদ্বয়ের প্রভাবে পঞ্জাববাসী ও তৎপার্শ্বস্থ জনগণ এক পক্ষে এমন এক প্রকারের ঔদ্ধত্য ও অপর পক্ষে এমন নীচ শঠতাদিতে শিক্ষিত হইয়াছিল যে, যথার্থ ভদ্রতা ও ভদ্রলোক প্রায়ই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল! অধিকাংশ লোক মিথ্যা প্রয়োগে এত অভ্যস্ত হইয়াছিল যে, বিনা স্বার্থে ও বিনা কারণে অনায়াসেই কেবল মিথ্যা কহিতেই ভালবাসিত! তাহাদের সহিত বিশেষ সতর্ক ব্যবহার না করিলে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা ছিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

জহব সিং ও চৈতন।

অতি প্রত্যূষে—এমন কি, রজনীর অবগুণ্ঠন মোচন হইতে না হইতেই দুলীন অশ্বারোহণে প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইতেন।

প্রথম দিন একাকী গিয়াছিলেন, বন্নু ধন্নু তখন উঠে নাই। বন্নু উঠিয়া শুনিল, সাহেব বায়ু-সেবনে গমন করিয়াছেন। এমন অপরিচিত দেশে এত ভোরে প্রভুর একা নিষ্ক্রমণ যুক্তি যুক্ত নয়; বিশেষতঃ নন্দ সিংহের শাত্রবতা স্মরণ হওয়াতে বন্নু মহা উৎকণ্ঠিত ও মনে মনে অপ্রতিভ হইল। প্রভুর পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করে নাই, ইহাই অপ্রতিভ হওনের কারণ।

পরবর্ত্তী উষার প্রাক্কালে ডুলীন যখন বহির্গত হন, দেখেন বন্নু ধন্নু উভয়েই স্ব স্ব অশ্বপৃষ্ঠে প্রস্তুত। দেখিয়া মনে মনে মহা তুষ্ট হইলেন, কিছুই বলিলেন না; তাহাদের অগ্রগামী হইয়া প্রান্তরাভিমুখে চলিলেন।

অর্দ্ধ ক্রোশও অতিক্রম করেন নাই, বর্ত্ম-পার্শ্বস্থ তিমিরাচ্ছন্ন আম্রবাগান হইতে সহসা একটী তীর আসিয়া তির্য্যগ্‌ভাবে তাঁহার মস্তকে লাগিয়া মস্তকের টুপিটী লইয়া বহুদূরে নিক্ষেপ করিল। তীরটী আর একটু নিম্ন মুখে আসিলেই সর্ব্বনাশ ঘটাইত!

বন্নু তীরের উৎপত্তি-স্থানাভিমুখে তীব্রবেগে অশ্ব চালাইল। কতক দূরে একজন শিখ-বেশী লোককে পলায়ন-পরায়ণ দেখিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাহার সন্নিহিত হইল। অতিক্রম অসাধ্য জানিয়া, দুরাত্মা অসি মোচন পূর্ব্বক বন্নুর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তখনই ধন্নু আসিয়াও যোগ দিল। যুদ্ধ করিতে করিতে বন্নু ডাকিয়া বলিল, "শুন ধন্নু! যদি আমাকে অপমানিত করা তোমার অভিপ্রায় হয়, তবেই তলয়ার খুলিবে, নচেৎ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখ—এই গোলামের জন্য দুজন!"

বলিতে বলিতে প্রভু ডুলীনও তথায় আসিয়া উপস্থিত। ডুলীন দুর্ব্বৃত্ত শিখকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ্‌ছিস্ তো, আমরা দলে বলে পুষ্ট, কেন মিছে পাগ্‌লামি ক'রে নষ্ট হবি, অস্ত্র ফাল্, ভয় নাই, প্রাণে মা'র্ব্বো না।"

সে তখন একটা দারুণ প্রহার পাইয়াছে, তাহার বাম বাহু হইতে বস্ত্র ফুঁড়িয়া রক্ত দেখা দিতেছে, কিন্তু সাংঘাতিক আঘাত বোধ হইতেছে না। ডুলীনের বাক্যোত্তরে সে কাতর-স্বরে বলিল "তবে সাহেব তোমার লোককে নিবারণ কর।" ডুলীন কহিলেন "আচ্ছা বন্নু, যেই মাত্র এ অস্ত্র ফেলিবে, তুমিও নিরস্ত্র হইবে।" বলিবা মাত্র শিখের অসি ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল, বন্নুর উত্থিত অস্ত্র অমনি ঊর্দ্ধেই রহিল। তৎক্ষণাৎ ধন্নু গিয়া শিখের তীর ধনু কাড়িয়া লইল। বন্নু বলিল "এখনও বিশ্বাস নাই, ছোরা লুকানো থাকিতে পারে।" বাস্তবই তাহা ছিল। বন্নু ধন্নু তাহার কোমরবন্ধ হইতে একখানি শাণিত ছুরিকা বাহির করিল।

তখন ডুলীন তাহাকে প্রিয় বাক্যে অভয় দান এবং সে যাহা বলিবে, সে কথা গোপনে রাখার অঙ্গীকারাদি কৌশলে তাহার নিয়োগকর্ত্তার নাম জানিয়া লইলেন। বন্নুর সন্দেহই সত্য হইল। পূর্ব্বদিন ডুলীন একাকী

ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, দুরাত্মা নন্দ সিং তাহা শুনিতে পাইয়া তিনি প্রত্যহই ঐরূপে একা বাহির হইবেন ভাবিয়া, এই হত্যাকারী তীরেন্দাজকে নিযুক্ত করিয়াছিল। সে যদি দৈবাৎ ধরা পড়ে, তবে নিয়োগ কর্ত্তার নাম না করে, এ কারণ পহলের গুরুতর শপথ পর্য্যন্ত করাইয়া লইয়াছিল।

কিন্তু ডুলীনের অসম্ভব মহত্বগুণ দেখিয়া তীরেন্দাজ মোহিত ও ভক্তিরসে আর্দ্র হওয়াতে তাঁহার আজ্ঞা হেলন করিতে পারিল না—শপথ ও নন্দের উপরোধ উপেক্ষা করিয়াও নিয়োগকর্ত্তা নন্দের নাম বলিয়া দিল।

ডুলীন বলিলেন "যত পাপ আছে, নরহত্যার ন্যায় মহাপাপ আর কিছুই নাই, তাও কি তুই জানিস না? এখন আমি যদি এর শাস্তি দিই, কি মহারাজার দরবারে তোরে উপস্থিত করি, তবে বল্ দেখি তোর কি হয়? তুই এমন কাজ কেন কল্লি?"

তদুত্তরে তীরেন্দাজ দুঃখ-গম্ভীর-স্বরে কহিল "কি করি, সাহেব, পেটের দায়ে সব ক'র্ত্তে হয়!"

ডুলীন তাহার অবস্থাদির তাবৎ কথা জিজ্ঞাসার পর কহিলেন "সত্যই কি তবে পেটের দায়ে এই দুষ্কর্ম্ম স্বীকার ক'রেছিস্?"

তীরেন্দাজ বিবিধ শপথ পূর্ব্বক দৃঢ়রূপে পূর্ব্ব বাক্যেরই সমর্থন করাতে এবং তাহার ভাব ভঙ্গীতে, সে যে সত্য কথাই বলিতেছে, প্রত্যয় হওয়াতে দয়ালু ডুলীন দয়ার্দ্র হইয়া তাহাকে কিছু অর্থ দিলেন এবং কহিলেন "দ্যাখ্, তুই আমার প্রাণ হরণ ক'র্ত্তে এসেছিলি, তোর প্রাণ নিলেও আমার অধর্ম্ম হয় না, তবু তোরে দুঃখী জেনেই ক্ষমা ক'ল্লেম, আর আপাততঃ যা সঙ্গে ছিল, তোর খোরাকির জন্য দিলেম। আবার আমার বাসায় গেলে তোর ব্যবসায়ের মত কিছু পুঁজি ক'রে দিব, কিন্তু সাবধান; এমন কুকর্ম্ম, কি কোন রকম দুষ্কর্ম্ম আর কখনই করিস নে।"

সে ব্যক্তি সজল-নয়নে ডুলীনের মুখপানে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া স্বীয় বক্ষে চপেটাঘাত পূর্ব্বক বাষ্প-গদ্গদ-স্বরে বলিল "না, সাহেব, কোন কুকর্ম্ম তো আর কখনই ক'র্ব্বো না, ব্যবসায়ও ক'র্ব্বো না, তোমার কাছে পুঁজির টাকাও আর নেব না। যে খল পাপিষ্ঠ আমায় পাঠিয়েছে, সে স্বীকার ক'রেছে, আমি পারি না পারি, আমাকে কর্ম্ম দেবে! আমি তার কাছে কর্ম্ম নেব, নিয়ে দেখ্বেন তখন কি করি!"

দুলীন চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন "কি তারে খুন ক'র্ব্বি নাকি ?"

সে কহিল, "না, তা কেন ? কোন দুষ্কর্ম্মই আর ক'র্ব্বো না, তাতো ব'লেছি। আমি এই জন্যে তার চাকরী স্বীকার ক'র্ব্বো যে, সে যখন আপনার মন্দ কর্ব্বার্ কোন মতলব ক'র্ব্বে, অবশ্যই আমি টের পাব—টের পেলেই আপনিও জা'ন্তে পার্ব্বেন—আ'জ্ অবধি আমার প্রাণদাতার কাজেই প্রাণ মন সমর্পণ ক'ল্লেম !" এই বলিয়াই উত্তরের অপেক্ষায় না থাকিয়া সেলাম করিয়া তীর ধনুক তরবার লইয়া তীর বেগে চলিয়া গেল। তাহার নাম জহর সিং।

এ দিকে আম্রোদ্যানের সমীপে এই কাণ্ড, ও দিকে দুলীনের বাসোদ্যান-সমীপে আর এক ব্যাপার। সৈনিক রীত্যনুসারে ফটকে এক এক জন সিপাই পর্য্যায়ক্রমে বন্দুক সাঙ্গিন স্কন্ধে দিবারাত্রি প্রহরিতায় নিযুক্ত। এই সিপাই দুলীনের সঙ্গীদলের লোক, মহারাজার ভৃত্য নয়। বনুর অনুরোধে ও কালিফাজীর পরামর্শে এই পাহারার ব্যবস্থা হয়। ভেঙ্কুরা এবং এদ্‌লাড মহাশয়দের ফটকেও ঐরূপ পাহারা ছিল।

ঐ প্রভাতে পাহারার সিপাই একা ছিল না—উষা ও প্রদোষের প্রহরীকে প্রায়ই একা থাকিতে হইত না—তাহার সঙ্গিগণ ফটকের নিকট এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ মূলে আপনাদের ব্যায়াম-স্থান প্রস্তুত করিয়াছিল, ঐ প্রভাতেও অনেকে তথায় মল্লক্রীড়াদিতে নিযুক্ত ছিল।

এমত সময়ে ফটকে একজন অপরিচিত লোক আসিয়া উপস্থিত। লোকটা প্রৌঢ়বয়স্ক, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, একহারা, নাতিখর্ব্ব নাতিদীর্ঘ, গোঁপ-দাড়ী-হীন, অল্প শ্রীছাঁদ-বিশিষ্টও বটে—নাও বটে! কারণ নাসা যেমন দীর্ঘ, চক্ষু তেমন নয়! কপাল খানি যেন কিছু উঁচু ; নাসিকার মধ্যস্থলও বেস উঁচু, তদুপরি একটী শুভ্র তিলক চক্ চক্ করিতেছে!

তাহার বেশ ভূষা নিতান্তই নূতন ধরণের—মাথায় একটী পাগড়ী, কিন্তু শিখ বা হিন্দুস্থানীদের ন্যায় নহে ; একখানা শাদা ধুতির এক মুড়া টুপির কাজ করিতেছে, অবশিষ্ট সমুদয় অংশ জড়াইয়া পগ্‌গ রচিত হইয়াছে—ঠিক যেন কলিকাতার কানখুস্কিওয়ালা পরামাণিক! * পাগড়ীর আশে পাশে

* নবা বঙ্গীয় যুবকদের গোচরার্থ বলা আবশ্যক যে, আমাদের সে কালের কর্ত্তারা কেহ কেহ এইরূপ পাগড়ী বাঁধিয়া আফিসে যাইতেন!

খাট খাট কৃষ্ণবর্ণের চুল দেখা যাইতেছে এবং পশ্চাদ্ভাগে শিখার একটু লেজও ঝুলিয়া বাহিরে পড়িয়াছে! দক্ষিণ কর্ণের উপরিভাগে একটী কলম গোঁজা আছে—দুটী কর্ণেরই নিম্ন অংশে দুটী ছিদ্র—সেই দুটী ছিদ্র মধ্যে ক্ষুদ্র দুইটী খড়িকা—সেই খড়িকাদ্বয়ের যতটুকু দেখা যাইতেছে, ততটুকুই ময়লায় আবৃত থাকা প্রযুক্ত বিবর্ণ হইয়াছে! গলায় মাঝারি গোছের তুলসী-কাষ্ঠের মালা—সে মালা তেলে পাকিয়া চক্ চক্ করিতেছে—সে মালায় ও মালার সূত্রে তৈলাক্ত ধূলার ময়লা ধরিয়াছে—সে মালা দুই তিন স্তবকে পরা—সে মালার সকল অংশ দেখা যাইতেছে না, চাপকানের কণ্ঠির উপরে এক স্তবকের একটু ও বুকের দক্ষিণাংশে চাপকানের জোড়ের মুখে অপর স্তবকের আর একটু দৃষ্ট হইতেছে! কারণ, চাপকানটী বোতামদার নয়, বন্ধ-ওয়ালা, তায় আবার উপরের ঘুণ্টি ছিঁড়িয়া যাওয়াতে বক্ষস্থলের কতকটা দেখার পক্ষে কোন অসুবিধা হইতেছে না—বিশেষ, চাপকানের নিম্নে অন্য অঙ্গরাখা দ্বারা অঙ্গ ঢাকা ছিল না! আবার, চাপকানের একটী হাতা যত লম্বা, অপরটী তত নয়; বোধ হয় একটার অগ্রভাগের কাপড় ছেঁড়া ফুটা হইয়া থাকিবে—পুরুষের রাগ—ছেঁড়া অংশটুকু এককালে ছিঁড়িয়া দূর করিয়া ফেলিয়াছেন! ফলতঃ চাপকানটী বনিদি—আধুনিক নয়—অনেক স্থানের রিপু ও ফাটাফুটাতেই তাহা স্পষ্ট প্রকাশ! কটি হইতে, জানুর কিছু নিম্নদেশ পর্য্যন্ত এক খানি শাদা ধুতি পরিধান—কোঁচাটী গোছানো গাছানো কোঁচানো বটে! পায়ে চটি জুতা, মোজা নাই। বিনামা জোড়াটীও বিনিদি; সুতরাং ফটর্ ফটর্ শব্দে রাস্তার ধূলা আর রাস্তায় না রাখিয়া অধিকারীর মস্তকেই তুলিয়া দিতেছে!

ওহো! উত্তরীয়ের কথা বলিতে ভুলিয়াছি! একখানি মুড়িশেলাই মল্-মলের চাদর—ধুতি চাপকান অপেক্ষা বহুগুণে সফেদ—কিন্তু বোধ হয়, বহুকাল বোচ্‌কাবন্ধ ছিল, নচেৎ তাহার স্থলে স্থলে জরদ আভা কেন? চাদরখানি চৌড়াভাবে দিব্য পাট পিট করা—উভয় কক্ষের মধ্য দিয়া বক্ষে মিলিয়া ঢেরাভাবে যুগল স্কন্ধের উপর দিয়া পৃষ্ঠদেশে দ্বিভাগে ঝুলিতেছে!

এইরূপ অপরূপ পরিচ্ছদধারী অপরিচিত আগন্তুক ফটকে আসিয়া অগ্নিক্রীড়ালয়ে একবারে অভ্যন্তরে প্রবেশোদ্যত। প্রহরী নিবারণ পূর্ব্বক বলিল "কে তুমি—কোথা যাইবে?" উত্তর হইল "যে হই না, সাহেবের

কাছে যাব।" একে ঐ বেশ, তাহাতে চোটালো কথা, প্রহরীরা যত সন্তুষ্ট হইল, বুঝাই যাইতেছে। কোন পরিচয় দিবে না, অথচ জোর করিয়া যাই-তেও ছাড়িবে না, দেখিয়া প্রহরিগণ বল প্রকাশের উপক্রম করিল।

তখন মহা বিরক্ত হইয়া সাভিমানে বিড় বিড় করিয়া এইরূপ স্বগত হইতে লাগিল—"আমাকে কি অপমান ক'র্ত্তে কালিফাজী পাঠালেন ? আমি দরবারে পর্য্যন্ত না বলা, না কওয়া, চ'লে যাই ; তাঁদের আপনাদের বাগানে এই অপমান!" প্রহরীরা পাগল ভাবিয়া তাঁহাকে লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ চালাইতেছে, এমত কালে বয়ু ধয়ু সমভিব্যাহারে ডুলীন সাহেব তথায় আসিয়া উপস্থিত।

সাহেবকে দেখিবা মাত্র একেবারে নমিত ধনুকাকারে নত হইয়া "গুড্ মার্ণিং" বলিয়া মহাড়ম্বরে সেলাম বা কুর্ণিস বা স্থালিউঠ যাহা হউক একটা হইল! কথা তো অল্প, কিন্তু ভঙ্গীই সব! ডুলীন তাঁহার ভঙ্গী দর্শন ও ইংরাজী শ্রবণ মাত্রেই বুঝিতে পারিলেন কে! তথাপি বিশেষজ্ঞ হওনাভি-প্রায়ে অশ্বের বেগ থামাইয়া ইংরাজীতে নাম ধামাদি বিষয়ক কথোপকথন করিতে করিতে শনৈঃ শনৈঃ ভবনাভিমুখে চলিলেন। পাঠকমণ্ডলী চৈতনের ইংরাজী বিদ্যার ব্যুৎপত্তি বিষয়ে পাছে সন্দিহান থাকেন, সেই সন্দেহ সন্তোষজনকরূপে দূর করণার্থ ডুলীনের সহিত এই প্রথম সাক্ষাতের সময় তিনি যেরূপ অপূর্ব্ব আলাপ করিয়াছিলেম, প্রিয়বন্ধুর পুস্তক হইতে তাহার নমুনা স্বরূপ দুই চারিটী পদ-বিন্যাস উদ্ধার করিতেছি। তাহাতে নব্য পাঠকমণ্ডলী তখনকার ইংরাজী-নবিসীদের উচ্চারণ-পদ্ধতির আভাসও কিঞ্চিৎ পাইতে পারিবেন।

ডুলীন। Who and what are you ? (তুমি কে এবং কি ?)

চৈতন। (পুনশ্চ সেলাম পূর্ব্বক) ম্যাষ্টার য়্যাস্কেড্ মি হু য়্যাণ্ডো হোয়াট্‌ স্মাই ? ম্যাষ্টার কি, নট্ সি মি ম্যান ? (ম্যাষ্টার আমাকে জিজ্ঞাসিতে-ছেন, কে এবং কি ? ম্যাষ্টার কি আমাকে দেখিতেছেন না মানুষ ?

ডুলীন। (সহাস্যে) "Yes, you seem to be a man, but what sort of man are you ?" (হাঁ, তোমাকে মানুষ বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু তুমি কি প্রকারের মানুষ ?)

চৈতন। "আই ম্যান্ আভ্ বেঙ্গল—আই ম্যান্ আভ্ ফকিরজী—

নৌ (Now) ম্যাষ্ট্যার্সো মোষ্টো ওবিডিয়েণ্টো স্থার্ভ্যাণ্টো ! * (আমি বাঙ্গালার মানুষ—আমি ফকিরজীর মানুষ—এখন আমি ম্যাষ্ট্যারের অত্যন্ত বাধ্য ভৃত্য !)

এইরূপ অদ্ভুত ইংরাজীতে নাম, জাতি, পেষা ইত্যাদি পরিচয়ের পর ঢুলীন যখন জিজ্ঞাসা করিলেন ; "তুমি এখন কোথা হইতে আসিয়াছ ?"

চৈতন। (তদুত্তরে) আই কমিং কালিফাজীস্ য়্যাট্ কম্যাণ্ডো ! (আমি আসিয়াছি কালিফাজীর আজ্ঞাতে !) +

ঢুলীন। Why have you been sent here ? (তোমাকে কি জন্য এখানে পাঠানো হইয়াছে ?)

এই কথায় একবারে সিহরিয়া—একপ্রকার লাফাইয়া উঠিয়া—বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে এবং পরক্ষণেই বিষাদের মালিন্য-মণ্ডিত বদনে পুনঃ পুনঃ ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে—ও ! ব্যাড্ ফ্যাচুর্ন !—ও ! ব্যাড্ ফ্যাচুর্ন।—ম্যাষ্ট্যার্ য়্যাস্কেড্ (asked) নৌ (now) হোয়াই মি সেণ্ডো ? (হা দুর্ভাগ্য। ম্যাষ্ট্যার এখন জিজ্ঞাসেন, কেন আমায় পাঠিয়েছেন ?)

ঢুলীন। (সাহাস্যে) "Why bad fortune ?" (দুর্ভাগ্য কেন ?)

চৈতন। আভ্ কোর্সো ব্যাড্ ফ্যাচুর্ন—কালিফাজী টেল্ মি, দ্যাট্ ম্যাষ্ট্যার ওয়াণ্টো গুড্ ইণ্টারোপ্রিটার—ম্যাষ্ট্যার ওয়াণ্টো গুড রাইটার—ম্যাষ্ট্যার ওয়াণ্টো গুড য়্যাক্‌কৌণ্ট্যান্টো—ম্যাষ্টার ওয়াণ্টো হেড্ বাবু—ম্যাষ্ট্যার হিজ্‌সেল্‌ফো (his-self) য়্যাস্কেড্ ফার এ দেওয়ান—ম্যাষ্ট্যার্সো ওউন্ (own) আর্ডার্—তা না, ম্যাষ্ট্যার নৌ সে (say) "হোয়াই সেণ্ডো ?" ও ! ব্যাড্ লাক্—ইল্ লাক্ ! (অবশ্যই দুর্ভাগ্য ! কালিফাজী আমাকে বলিয়াছেন যে, ম্যাষ্ট্যার ভাল দ্বিভাষী চাহেন—ম্যাষ্ট্যার ভাল কেরাণী চাহেন—ম্যাষ্ট্যার ভাল হিসাবী চাহেন—ম্যাষ্ট্যার হেড্ বাবু চাহেন—ম্যাষ্ট্যার নিজে একজন দেওয়ানের কথা বলিয়াছেন—ম্যাষ্ট্যারের নিজের

---

*চৈতনের উচ্চারণ যথার্থই ট বর্গে ো যোগে যেরূপ হয়, ঠিক সেই রূপ ; যথা,—"মোষ্টো ওবিডিয়েণ্টো স্থার্ভ্যাণ্টো !"

+ সেকেলে "বাক্যাবলী" পড়িয়া যাঁহাদের ইংরাজী বিদ্যা জন্মিত, তাঁহাদের ভাষা-প্রণালী এইরূপই ছিল। "অর্থাৎ কালিফাজীর আজ্ঞাতে" বলিতে হইলে "কালীফাজীস্ য়্যাট্ কম্যাণ্ডো !" য়্যাট্ মানে তে ; কম্যাণ্ডো মানে আজ্ঞা !

হুকুম—তা, না, এখন কি না ম্যাষ্টার বলেন "কেন পাঠাইয়াছেন?" হা দুরদৃষ্ট! হা দুর্ভাগ্য!)

দুলীন হাস্য সম্বরণে অসমর্থ, কিন্তু প্রকাশ্যে যেন অপ্রতিভ হইয়া আত্ম-ভ্রম স্বীকার পূর্ব্বক অনেক কথার পর প্রশ্ন করিলেন, "তোমার স্ত্রীপুত্র পরিজন কে আছে?"

চৈতন। (দীর্ঘ নিশ্বাস সহিত ঘাড় নাড়িয়া) নো স্যার্, লড্ ঈশ্বর টেক্ আল্—মাই ফাদার্সের মেডিসিন্ শেভ্সো ডে মাই ওয়াইফ্ ডাই! এণ্ডো মাই ওয়াইফ্সো টেন্ পিণ্ডিস্ ডে মাই সন্ ডাই—আল্ কলরা স্যার্, আল্ কলরা!

দুলীন বরাবর চৈতনের ইংরাজী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এইবার পারি-লেন না—"মেডিসিন শেভ্" বুঝা অসাধ্য হওয়াতে অনেক প্রশ্নোত্তরের পর বুঝিলেন, মেডিসিন্ কি না ঔষধ এবং শেভ্ (Shave) মানে কামানো—তবেই হইল অষুদে কামানো অর্থাৎ অশৌচান্ত ক্ষৌর! (সমুদায় পদটীর অনুবাদ এই;—না, মহাশয়, ঈশ্বর লইয়াছেন—আমার পিতার অশৌচান্তের দিন আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং আমার স্ত্রীর দশপিণ্ডের দিন পুত্রের কাল হয়—সকলেই ওলাউঠায় মরে!)

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে, ফটক হইতে প্রাসাদ পর্য্যন্ত যে দীর্ঘ পথ, তাহা অতিক্রম করা হইল। দুলীন গৃহাভ্যন্তরে গিয়াও চৈতনের সহিত ঐরূপ ইংরাজীতে অনেকক্ষণ আলাপ করিলেন; মনে মনে ভাবিলেন, কালিফাজী কি কেবল পরিহাসের নিমিত্তই এই অদ্ভুত লোক দিলেন? কিন্তু চৈতনকে ইংরাজী ছাড়াইয়া তাহার মাতৃভাষায় কথা কহাইয়া দেখিলেন যে, তাহাতে বরং বুদ্ধির দৌড় অত দীর্ঘ না হইয়া কাজের মতন খর্ব্বাকারে থাকে! তখন চৈতন যথার্থই রাজসভা ও রাজকার্য্য-সংক্রান্ত অনেক বিষয় তাঁহাকে জানাইতে সক্ষম হইল। বুঝিলেন, তাহার বাহ্যিক পাগ্লামি বা হাস্যোদ্দীপক সারল্যের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে চতুরতা ও একপ্রকার মিষ্ট ধূর্ত্ততাও আছে। অতএব বলিলেন "দেখ চৈতন, আমি তোমাদের বাঙ্গালা দেশে অনেক কাল ছিলাম, বাঙ্গালা কথা কহিতে বুঝিতে পারি, বাঙ্গালা পুস্তকও কিছু পড়ি-য়াছি। বাঙ্গালা ভাষা আমার কর্ণে বড় মিষ্ট লাগে। অতএব তুমি আমার সহিত ইংরাজী না কহিয়া এখন অবধি নিজ মাতৃভাষাতেই কথা কহিও।"

চৈতন এই আদেশে কিছু ক্ষুণ্ণ হইল, যে হেতু ইংরাজী চর্চ্চার ব্যাঘাত-শঙ্কা ঘটিল! সে ভাব বুঝিতে পারিয়া তুলীন হাসিয়া বলিলেন "যখন তুমি আমার খুব-সাবকাশ দেখিবে এবং অনুমতি পাইবে, তখনই ইংরাজী কহিয়া অভ্যাসটা রাখিতে পারিবে, অন্য সময় নয়!" এই ব্যবস্থাতে চৈতনের ক্ষোভ মিটিয়া অন্তঃকরণ কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ হইল!

উদ্যানের নিম্নতলে দুইটী ঘর চৈতনের হইল—একটী আফিস, একটী শয়নগৃহ। তদ্ব্যতীত দূরস্থ একটী একতলা কামরা পাকশালার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল—চৈতন অবশ্যই স্বহস্তে পাক করিবেন বৈ অন্য উপায় কি?

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অভ্যুদয়।

তুলীন এক অশ্বারোহী রেজিমেণ্টের অধিনায়ক হইয়াছেন, কিন্তু কার্য্য-ভার প্রাপ্ত হন নাই। আর এক দিন রাজ দর্শনের পর তাহা হইতে পারিবে। কিন্তু সেই পুনর্দ্দর্শন তাঁহার নিজের স্বেচ্ছাধীন নহে, মহারাজ দিন ধার্য্য করিয়া বলিয়া পাঠাইবেন, এমন আজ্ঞা করিয়াছেন। সুতরাং আপনা হইতে যাওয়া ভাল দেখায় না।

ইতিমধ্যে ফকির আজিজুদ্দিনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ফকির প্রথমাবধিই তাঁহাকে সুনয়নে দেখিয়াছেন; সানুগ্রহে রম্য বাসস্থান দিয়াছেন, রাজদ্বারে সম্মান ও উন্নতি লাভের সূত্রপাত করিয়াছেন এবং বিনা স্বার্থে (অন্ততঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তো স্বার্থ কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না) স্বতঃ পরতঃ বিস্তর উপকার ও আনুকূল্য করিতেছেন। আজিজুদ্দিনের ন্যায় ক্ষমতা-বান মন্ত্রী যে একজন উদাসীনকে এতদূর দয়া করেন, ইহা স্বার্থ ব্যতীত আর দুইটী কারণে সম্ভবে—হয় নিজের সদাশয় স্বভাব, নয় সুদৃষ্টিতে দেখা—এস্থলে হয় তো দুটীই ঘটিয়াছে—কখনো কখনো কোন অপরিচিতকে দেখিবামাত্রই তাহার প্রতি স্নেহ ও দয়া জন্মে—হয় তো তাহাই হইয়াছে! ফলতঃ অন্য হেতু যাহাই হউক, ফকির যে তুলীনকে স্নেহ-নয়নে দেখিয়াছেন, তাঁহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। তায় আবার তুলীনের সহৃদয়তা, ভদ্রতা,

সারল্য, ধর্ম্মপরায়ণতা, সাহস প্রভৃতি সদগুণ দিন দিন যতই প্রকাশ পাইতে লাগিল, ততই ফকিরজী তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ও আরো আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। বাস্তবিক উত্তমাধম নির্ব্বাচন, লোকের চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা এবং গুণগ্রাহিতাদিগুণে রণজিতের অপেক্ষা আজিজুদ্দিন কোনমতে ন্যূন ছিলেন না। সুতরাং দুলীনের মহোচ্চ গুণাবলী অত্যল্প আলাপেই তাঁহাদিগের উভয়েরই সূক্ষ্ম বুদ্ধির সুগোচর হইবে, আশ্চর্য্য কি ?

দুলীনের পক্ষে রাজা ধ্যান সিংহকে প্রসন্ন করা সর্ব্বাগ্রে অত্যাবশ্যক—না করিলে অমঙ্গল, তাহা আজিজুদ্দিন স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিলেন। তদনুসারে দুলীন, মহামূল্য উপঢৌকন সহিত ধ্যান সিংহের নিকট গমন করিলেন এবং বিবিধ সৌজন্য সহকারে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পাইলেন। বোধ হয়, অসিদ্ধও হইলেন না। বিশেষতঃ চিরবশ্যতা ও সময়ে সময়ে আর্থিক উপহার প্রদানের ইঙ্গিত প্রকাশেও ত্রুটি করিলেন না। রাজা বাহাদুর বিশেষ অমায়িকতায় যথোচিত সমাদর এবং ভাবী সহায়তার আশ্বাস দানে কৃপণ হইলেন না। কিন্তু তাহা বাচনিক কি আন্তরিক, এক্ষণে জানিবার উপায় নাই—ভবিষ্যতের গর্ভেই রহিল। আপাততঃ তাঁহার মনের গতি এরূপ হইতে পারে যে, "দেখা যাউক, মনোমত হও—বশীভূত থাক—তো আশামত ফল পাইবে!"

ধ্যানসিংহ ও আজিজুদ্দিন, উভয়ের মুখেই দুলীন শুনিলেন যে, আর দুই দিবস পরে তাঁহাকে দরবারে যাইতে হইবে। এই বিলম্বের কারণ কি, দুলীন তখন বুঝিতে পারিলেন না—জিজ্ঞাসা করাও উচিত হয় না—হয় তো তাঁহার রীতি চরিত্রাদি পরোক্ষে সন্ধান লওয়াই উদ্দেশ্য। ভাবিলেন, "যাহাই হউক, উতলা হওয়া অকর্ত্তব্য। বরং মহারাজ যাহাতে তাঁহাকে কাজ-হাংলা ও টাকা-ক্যাংলা না ভাবেন, এমন ভারিত্ব দেখাইতে হইবে। অতএব সাক্ষাতের নিমিত্ত যে দিন ধার্য্য হইল, বরং সে দিনে কোন ছলে না গিয়া তাহার দুই এক দিন পরে গেলে আরও ভাল দেখাইবে।" মনে মনে এই সংকল্প উদিত হওয়াতে সে প্রসঙ্গে দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া অন্যান্য বাক্যালাপের পর বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ঐ সাক্ষাৎকালে রাজা ধ্যানসিংহ কথায় কথায় স্বীয় অগ্নি-মান্দ্যজনিত অস্বাস্থ্যের পরিচয় দেওয়াতে দুলীন কহিলেন, "আপনার যদি ভক্তি হয়,

তবে আমি এক ঔষধ দিতে পারি, যাহাতে অবশ্যই আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন।" রাজা ব্যগ্রতা পূর্ব্বক তাহা চাহিলেন। দুলীন বাসায় আসিয়া চৈতনের দ্বারা ব্যবস্থা-লিপি সহিত পাঠাইয়া দিলেন।

বন্নুর প্রভুভক্তি জানাই আছে। যাহাতে প্রভুর আহারের পারিপাট্য ঘটে, সে পক্ষেও বিশেষ দৃষ্টি। বহু সন্ধানে একজন বিখ্যাত মোগল-সূপকারকে বন্নু নিযুক্ত করিয়াছে। তাহার নাম ভাওন—চৈতন তাহাকে "ভুবন" বলিয়া ডাকিত! বন্নুর ইচ্ছামতে ভাওন সে দিন উত্তম পলান্ন (পোলাও) রাঁধিয়াছে! তারিপ করিতে করিতে দুলীন তাহা ভোজন করিতেছেন, এমত সময় বলা না, কওয়া না, চাঁদ খাঁ আসিয়া উপস্থিত—প্রহরীরা প্রভুর আলাপী লোক বলিয়া ফটকে আটক করে নাই।

চাঁদ খাঁ সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। দুই একমাত্র ভোজন-পাত্রে ভোজন এবং জল মাত্র পানীয় দেখিয়া চাঁদ আশ্চর্য্য হইল! তাহার বহুভাষিতা গুণটী পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। চাঁদ খাঁ বিস্ময়-বিকাশ-স্বরে কহিল "হুজুর কি লাল পানি পান করেন না?" দুলীন সহাস্যে উত্তর দিলেন "প্রায় না।" শুনিয়া বলিল "তবেই হ'য়েছে! তবেই তো রাজদরবারে পেয়ার হ'তে পেরেছেন! ভাল, হুজুরের চ'কে শিখেদের পোষাক কেমন লাগে? রণজিৎ সিং তাও হুজুরকে পরাবে! ক দিন ধ'রে হুজুরের কত যে খবর নিচ্ছে, তার আর সংখ্যা নেই। আ'জ হুজুরের দু একজন চাকরকেও ডেকে নে গেছে—এতক্ষণ হয় তো নানান কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্ছে! এখন তো দেখ্ছি, দরবারে যতদূর পেয়ার হ'তে হয়, তা হুজুর হয়েছেন, কিন্তু এক চ'কোর মেজাজের আর খাওয়া পরার সঙ্গে ঠিক মিল্তে না পা'ল্লে কি এ ভাব থা'ক্‌বে?"

চাঁদ খাঁর এ প্রকারের কথাবার্ত্তা আদব-কায়দা-সঙ্গত নয়। এত বেয়াদবিতেও দুলীন বিরক্ত হইলেন না। বুঝিলেন, যে উপায়েই হউক, চাঁদ খাঁ সঠিক সমাচার রাখে এবং তাহার স্পর্দ্ধা একটু সহ্য করিতে পারিলে সঠিক সংবাদ প্রাপ্তিরও সুবিধা হইতে পারে—সে সব সংবাদ হয় তো বহু লোক জানে, কিন্তু চাঁদের সাহায্য ভিন্ন তাঁহার জানিবার উপায় কৈ? অতএব চাঁদ খাঁর উত্তরে হাসিয়া বলিলেন "মহারাজ যদি সে আশা করেন, তবে নিরাশ হইবেন!"

রাজানুগ্রহ পাইতে ও রাখিতে যেরূপ ব্যবহার আবশ্যক বলিয়া চাঁদ খাঁ বর্ণনা করিল, তচ্ছ্রবণে পূর্ব্ব-সংকল্পিত ভারিত্ব-ভাবের ঔচিত্য আরো হৃদ্বোধ হইল। অর্থাৎ এমন সংস্কার জন্মিল যে, যদ্যপি তিনি মহারাজার ইচ্ছা মাত্রকেই অবিচার্য্যভাবে শিরোধার্য্য করিয়া লয়েন—যদি তিনি এ দেশীয় চাটুকার কর্ম্মচারীদের অনুকরণে নিতান্ত প্রসাদ-ভোজী কুক্কুরের ন্যায় অধীনতা শৃঙ্খল ধারণ করেন—যদি তিনি নিতান্ত কর্ম্মলোলুপ, নিরুপায়, নিস্তেজ দাসবৎ আচরণ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে "আপনার মান আপনার ঠাঁই" না হইয়া আপনার মান আপনিই ত্যাগ করা হয় এবং যাহারা আত্ম-গৌরব রাখিতে জানে না, সেই অপদার্থ দলে মিশিয়া তৎফলস্বরূপ একটা অপদার্থ ভুকো সাহেব হইতে হয়! সে অবস্থায় মহারাজা সুযোগ পাইলেই তাঁহার প্রতি যথেচ্ছাচারের ব্যবহারও দেখাইতে পারেন! অতএব বিশেষ বিবেচনার সহিত সামান্য সামান্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ তেজ-প্রকাশ এবং সকল বিষয়েই ভারিত্ব, অথচ কর্ত্তব্য-পালন-পক্ষে অবিচলিত অধ্যবসায়, সম্পূর্ণ বিশ্বাস-ভাজনতা ও অকৃত্রিম প্রভুভক্তি প্রদর্শন করিতে হইবে।

তদনুসারে বলিলেন "শুন চাঁদ খাঁ, তুমি সে চিন্তা করিও না—আগে তোমাদের মহারাজার নিকট চাকরীই স্বীকার করি, তার পর সে সব কথা! এখানে যদি তেমন মানপূর্ব্বক থাকিবারই সুবিধা না হয়, তবে থাকিবার প্রয়োজন কি? নিকটে কোম্পানির মুলুক, সুখের স্থান, তথায় আমার অনেক ইংরাজ বন্ধুও আছেন—আরো তো অনেক স্বাধীন রাজাও আছেন, আমাকে পাইলে কে না আহ্লাদ পূর্ব্বক উচ্চ পদে নিযুক্ত করিবেন? সা সুজা আপনার রাজ্য পুনর্ব্বার পাবার উদ্যোগে বেড়াচ্ছেন, সুযোগ্য সেনা-পতি একজন তাঁর বড় প্রয়োজন—"

এই কথা শুনিয়া চাঁদ খাঁ পরমোৎসাহে উত্তর দিল, "বহুতাচ্ছা হুজুর, এ গোলাম পঞ্চাশ জন চাঙ্গা সোয়ার নিয়ে হুজুরের যেখানে ইচ্ছা সঙ্গে যেতে প্রস্তুত। তারা যেমন তেমন সোয়ার নয়, আগুন খেগো! লড়ায়ের সময় তাদের মুখ বৈ পীঠ কেউ দেখ্‌তে পায় না!"

তুলীন কহিলেন, "আচ্ছা, চাঁদ খাঁ, দেখি আগে কি হয়, প্রয়োজন পড়িলে তোমার এ প্রার্থনা ভুলিব না!" চাঁদ খাঁ মহা সন্তোষে চলিয়া গেল। ফলতঃ চাঁদ খাঁকে ঐরূপ অভিপ্রায় শুনাইবার বিশিষ্ট হেতু ছিল। তুলীন

জানিতেন, এ দেশ এমন নয়, এ কথা অবশ্যই রাজকর্ণে উঠিবে। তাঁহার রাজ্যে একজন সাহসী সাহেব আসিয়া অমনি ফিরিয়া যাইবে, ইহা মহারাজ কখনই সহ্য করিতে পারিবেন না—অবশ্যই তাহাকে সসম্মানে উচিত কর্ম্মেই নিযুক্ত করিবেন। পূর্ব্বে যে কয়জন ইয়ুরোপীয় সৈনিক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন, প্রধানতঃ তাহাদিগের গুণেই তাঁহার বাহিনী অজেয় হইয়া উঠিয়াছে। তিনি কি সুযোগ্য ইয়ুরোপীয় পাইলে ছাড়িয়া দিবার লোক ?

যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল—সেই দিনেই তাঁহার মনের অস্থৈর্য্য বিষয়ক সংবাদটী রাজকর্ণে উঠিল। ডুলীন পঞ্জাবে থাকিবার বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ সন্দেহের আভাস মাত্র দিয়াছিলেন, কিন্তু লোকের মুখে মুখে সেই জনরবের অবয়ব বাড়িয়া গিয়া "থাকিতে তাঁহার নিতান্ত অনিচ্ছা" এম্নি ভাবের কথাই রাজগোচর হইল!" তৎফল-স্বরূপ রাজসভায় ডুলীনের মূল্য আরো উচ্চ হইয়া উঠিল! মহারাজ ফকিরজীকে অনুরোধ করিলেন, "ডুলীন সাহেব কল্যই যেন দরবারে উপস্থিত হন।" কিন্তু অসুখের ছল করিয়া ডুলীন সে দিন গেলেন না। প্রতিদিন মিষ্টান্নের সহিত এক শত টাকা "জিয়াফৎ" আসিতে লাগিল। ডুলীন আরো একটু মহার্ঘ হইলেন—সেই অসুখের ছলে আরো দু তিন দিন বিলম্ব করিলেন।

রাজা ধ্যান সিংহকে ডুলীন যে ঔষধ দিয়াছিলেন, তাহাতে রাজা বাহাদুরের বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে। তিনি রাজসভায় সেই উপশমের কথা মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন "আগে আমার মূলেই প্রায় ক্ষুধা হইত না, এই ঔষধ দু তিন দিন খাইতে না খাইতেই প্রচুর আহার করিতেছি!" ঘটনাক্রমে মহারাজারও অগ্নিমান্দ্য জন্মিয়াছিল, হাকিমী চিকিৎসায় কিছুই হইতেছে না। সুতরাং প্রধান মন্ত্রীর মুখে আশ্চর্য্য ভৈষজ্যের কথা শুনিবা মাত্রই তদ্‌ভিষক্‌কে আনিতে তৎক্ষণাৎ দূত প্রেরিত হইল।

ডুলীন ব্যগ্রচিত্তে ব্যবস্থা সহিত ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু আপনি গেলেন না, কেবল সেই অসুখের ছল করিয়াই বিস্তর অনুনয় পূর্ব্বক ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া পাঠাইলেন।

সৌভাগ্যক্রমে ঔষধ সেবনে একদিনেই মহারাজার কিছু উপকার বোধ হইল। ঔষধ-দাতার প্রতি অনুরাগ আরো বাড়িল। পরদিন সিংহাসনে বসিয়াই নব বৈদ্যকে স্মরণ করিলেন—অবিলম্বে তাঁহাকে আনিতে লোক

চলিল। বলিয়া দিলেন "যদ্যপি তিনি না আসিতে পারেন, কাজেই তাঁহাকে দেখিতে আমাকে নিজে যাইতে হইবে! অন্ততঃ কল্য প্রাতে যেন অবশ্য আইসেন।" সে দিবস এক শতের পরিবর্ত্তে এক সহস্র মুদ্রার জিয়াফং প্রেরিত হইল। দুলীন ভাবিলেন, আর না—যথেষ্ট হইয়াছে—"সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং!" অতএব সবিনয় কাতর বচনে বলিয়া দিলেন "কল্য প্রাতে নিশ্চয়ই রাজদর্শন করিয়া ধন্য হইব।"

রাত্রি প্রভাত। দুলীন দরবারের পোষাক পরিতে পরিতে গবাক্ষ দিয়া দেখিতে পাইলেন, কতিপয় রাজ-অশ্বারোহী উদ্যানে প্রবেশ করিতেছে। অনুভবে বুঝিলেন, এ আড়ম্বর নিতান্তই সম্মান-সূচক—ইহারা শরীর-রক্ষক রূপে প্রেরিত হইয়া থাকিবে। আনন্দে শরীর রোমাঞ্চ হইল! পরক্ষণে একটু ভয় ও ভাবনাও হইল—মহারাজার এত গৌরবে অপরের ঈর্ষাজনিত শাত্রবতা ঘটিতে পারে। কিন্তু এই ভাবিয়া সুস্থ হইলেন যে, "যখন সারল্য, সত্য, কৃতজ্ঞতা ও ধর্ম্ম আমার বন্ধু, তখন যাহাই কেন ঘটুক না—যেই কেন শত্রু হউক না, সে সব আমার দেখিয়া, শুনিয়া, জানিয়া তত কাজ কি?"

সুসজ্জ হইয়া বেশ-গৃহ হইতে উপবেশন-গৃহে পদার্পণ মাত্র দেখেন, এক জন সর্দ্দার তথায় অপেক্ষা করিতেছেন। উভয়পক্ষে সাদর সম্ভাষণের পর সভাসদের মুখে তাঁহার ও অশ্বারোহিগণের আগমন কারণ যাহা শুনিলেন, তাহাতে পূর্ব্ব অনুভব সত্য জানিয়া সুখী হইলেন।

দুলীন মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া সেই প্রধানের সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। রাজানুচর ও স্বীয় সহচরবর্গ অগ্র পশ্চাৎ চলিল। প্রথম দিবস হইতে অদ্যকার যাত্রা বহুলাংশে বিভিন্ন—লাহোরের লোক সে দিন একজন ভ্রামক বা অনিশ্চিত অনুগ্রহার্থী ফিরাঙ্গীকে দেখিয়াছিল মাত্র, অদ্য তাঁহাকে মহারাজার অনুগৃহীত প্রিয়পাত্র জানিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিতে লাগিল।

দরবারে উপস্থিত হইলে মহারাজ সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। ইঙ্গিত অনুসারে সিংহাসনের অতি নিকটেই গালিচার উপর দুলীন উপবিষ্ট হইলে পরস্পর কুশল-প্রশ্ন ও দুলীনের ভৈষজ্যের প্রশংসাবাদাদি অনেক কথা কথন হইয়া গেলে মহারাজ কথাচ্ছলে ইউরোপ ও আমেরিকার নানা

জিজ্ঞাসা করিলেন। তন্মধ্যে ইংলণ্ডের প্রসঙ্গই অধিক। সে সব সবিস্তার বলিয়া লিপি-বাহুল্য করিব না।

উপযুক্ত সময়ে মহারাজ বলিলেন "ডুলীন সাহেব, এক্ষণে গুরুতর বিষয়ে যাহা বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। তোমার সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইতেছি—তোমার সাহসিকতা দেখিয়াছি—তোমার চরিত্র আর ব্যবহার যেরূপ তাহা বুঝিয়াছি, কতক বা অনুসন্ধানেও জানিয়াছি—সেই অনুসন্ধানে তোমার আরো নানা গুণ শুনিয়াছি—এক কথায়, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। অনেকেই বলিয়া থাকে আমি মানুষ চিনিতে অপটু নহি; একথা সত্য হইতেও পারে, নাও পারে। যাহাই হউক, আমার সংস্কার জন্মিয়াছে, তুমি সাহসী ও সমর্থ, তুমি বিশ্বাসী ও বুদ্ধিমান। যদিও তুমি যুবা, কিন্তু অল্প বয়সেই বহুদর্শী—বার্দ্ধক্য ও বিজ্ঞতা সর্ব্বদা সহচর হয় না—অনেকে যৌবনেও জ্ঞানী হয়! তুমি যে শেষোক্ত ধাতুর লোক, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। আমি বাক্‌চাতুর্য্য জানি না, অতএব মনের কথা খুলিয়া বলিতেছি যে, তোমার প্রতি গুরু ভার অর্পণ করিলে তুমি যে তাহা অবলীলাক্রমেই বহন করিতে পারিবে, আর সরকারের খয়ের খাঁ থাকিবে, যে কারণেই হউক, সে বিশ্বাস আমার জন্মিয়াছে। আমি তোমাকে একটী অশ্বারোহী রেজিমেণ্টের অধ্যক্ষতা প্রদানে স্বীকার করিয়াছি, সে পদ তোমার থাকিল। অধিকন্তু আরো গুরুতর ভারার্পণ করিতেছি—তোমাকে একবারে এক অঞ্চলের শাসনভারও দিতেছি। তুমি পূর্ব্বে কেবল মেজর ছিলে, অদ্য হইতে কর্ণেল এবং শাসন কর্ত্তা সর্দ্দার হইলে—তাহাতে অনেক প্রকারের সৈনিকগণেরও কর্ত্তা হইতে পারিবে। অদ্যই কোট-কাংরা বিভাগের শাসনকর্ত্তৃত্বের ফর্ম্মান পাইবে। কোট কাংরা কিছু বন্য ও পার্ব্বতীয় প্রদেশ। * তথাকার স্বভাবের ভাব যেমন কর্কশ, তত্রত্য অধিবাসীরা তদপেক্ষাও দুর্দ্ধর্ষ। তোমার প্রতি অতি সরল ভাব প্রয়োগ করাই অভিপ্রায়, বিশেষ তুমি এদেশে নূতন আগত, তজ্জন্যই পূর্ব্বাহ্নে এসব বলিয়া দিতেছি। তুমি যে কার্য্যভার পাইতেছ, তাহা অত্যন্ত কঠিন। সম্প্রতি তথায় যেরূপে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে, তাহা নিতান্তই অসন্তোষকর হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে নয় লক্ষ টাকা রাজস্ব আসিত, প্রজাগণও সুখে থাকিত; হইল। বলিয়াই

* তথায় বহু চা কর সাহেব চার চাষ করিতেছেন।

এখন ছয় লক্ষেরও ন্যূন আসিতেছে, প্রজারাও জ্বালাতন হইয়াছে। তোমাকে সে সম্বন্ধে এবং অন্যান্য সকল বিষয়েই প্রতিকার করিতে হইবে। সেই প্রতিকারের জন্য আপাততঃ দুই বৎসর পর্য্যন্ত তুমি যদি পঞ্চ লক্ষ পাঠাও, তাহাতেও আমি অসন্তুষ্ট হইব না। কেননা আমি জানি, যাইবা-মাত্র একেবারেই প্রতিবিধান সম্ভবে না—ভবিষ্যতের সুপালন ও সুশাসন উদ্দেশে বর্ত্তমানে বিস্তর পরিবর্ত্তন ও নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তনার আবশ্যক হইবে। সুতরাং প্রথমেই আয়াধিক্যের প্রতি তত দৃষ্টি নয়—যাহাতে প্রজা-বৃদ্ধি, প্রজার সুখ ও বিশ্বাস-বৃদ্ধি এবং কৃষি-বাণিজ্যের বৃদ্ধি ইত্যাদি সুশাসনের সূত্রপাত ও সুব্যবস্থা হয়, তৎপক্ষে অণুমাত্র শিথিল-যত্ন হইবে না—এখন রাজস্বের হ্রাস বৃদ্ধি বিচারের সময় নয়—সুপালন হইলে রাজস্ব আপনা হইতেই দিন দিন বাড়িতে থাকিবে! তোমার বেতন বার্ষিক পনের হাজার অবধারিত হইল, তদ্ভিন্ন নজরানা মাত্রই তোমার।"

সভামণ্ডপের চতুর্দ্দিকেই অনুচ্চস্বরে "বা! বা!" ইত্যাদি ধন্য ধ্বনি ঘোষিত হইতে লাগিল। ঢুলীন নত ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপক্রম করিতেছিলেন, রণজিৎ নিবারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন ;—

"তোমার নিজের অশ্বারোহী দল ব্যতীত এক রেজিমেণ্ট পদাতিক, কিছু গোলেন্দাজ এবং দুই রেজিমেণ্ট নাজির সঙ্গে লইয়া যাইবে। শেষোক্ত দুটী রেজিমেণ্ট তোমাকে নূতন প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। তাহার কাপ্তেন লেপ্তেন প্রভৃতি কর্ম্মচারী তুমি নিজে মনোনীত ও নিযুক্ত করিবে—তাহাদের এবং প্রথমোক্ত দুই রেজিমেণ্টের সৈনিকগণের ছাড়ান বহালের সম্পূর্ণ এক্তার তোমার। সরকারী পদাতিক রেজিমেণ্ট জমাদার খোসাল সিংহের চমূ মধ্য হইতে পাইবে। কিন্তু তোমার অধীন সমুদয় সৈনিকের তন্‌খা তোমাকে যোগাইতে এবং এই সৈন্য লইয়া তোমাকে কোট কাংরা রক্ষা করিতে হইবে। প্রয়োজনমতে যদি আরো দুই একটী রেজিমেণ্ট বা গোলেন্দাজ দল বাড়াইতে হয়, তাহাও দরবারে এত্তালা দিয়া করিতে পারিবে। গমনে বিলম্ব করিও না—আশু যাত্রা বড় আবশ্যক হইয়াছে। কোন বিষয়েই গোপনীয় ভাব রাখিবে না। একজন উপযুক্ত উকীল দরবারে রাখিয়া যাও। সকল বিষয় রাজাজীকে (ধ্যানসিংহকে) জানাইতে ক্রটি করিবে না। ঢুলীন! ইটী যেন তোমার স্মরণ থাকে, আমার সাম্রাজ্য মধ্যে যেখানে যাহা ঘটে—

যে যাহা করে—তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ আমি পাইয়া থাকি! অন্য বিশ্বসনীয় সূত্রে তোমার বিরুদ্ধে (গুরুজী না করুন) যাহা শুনিব, আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিবে—ব্যবহারে তাহার অপহ্নব করা তোমার কার্য্য! পদটী সামান্য নয়, সুতরাং বিশ্বাস স্থাপন সামান্য হইতেছে না!”

ফকিরের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র ফকিরজী একটী মোহর-বন্দী পুলিন্দা রাজ-হস্তে দিলেন। মহারাজ পুলিন্দাটী লইয়া দুলীনকে দিয়া বলিলেন;—

“এই লও, ইহার মধ্যে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য তাবৎ উপদেশই আছে। সাবধান! পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, সাবধান! বিশেষ সতর্কতা, বিশেষ দূরদর্শিতা, বিশেষ চতুরতার সহিত সকল কাজ নির্ব্বাহ করিবে—প্রজার কোন অভিযোগ যেন দরবারে না আইসে—রোকশোধ—গুরুজী তোমার মঙ্গল করুন!”

পূর্ব্বাপেক্ষা দশগুণ অধিক মূল্যের খেলাত প্রদত্ত হইল। দুলীন উঠিয়া অতি নম্রভাবে হর্ষবিকসিত-বদনে ও উৎসাহোৎফুল্ল নয়নে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশক অভিবাদন করিলেন—বাক্যে কিছু বলিতে গেলেন, কণ্ঠ রোধ হইল, ফুটিতে পারিলেন না—চক্ষুর্দ্বয়ও বাষ্পভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল!

মহারাজের কার্য্যের প্রতিষ্ঠাবাদে ও ধন্য-ধ্বনিতে সভা স্পষ্টতঃ নিনাদিত হইতে লাগিল। কিন্তু তন্মধ্যে অনেকের শ্রীমুখের প্রতি কোন আকার-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত যদি তৎকালে দৃষ্টিপাত করিতেন, তবে হয় তো অসন্তোষ, বিরাগ ও রাগ-দ্বেষাদির আভা-প্রভাও দেখিতে পাইতেন এবং কোন সুকর্ণ বা উৎকর্ণ শ্রোতা যদি তথায় থাকিতেন, তবে হয় তো প্রভুর যশোগানের মধ্যেও (সভার স্থল বিশেষে) অন্তবিধ গালাঘুষাও শুনিতে পাইতেন!

সভা ভঙ্গের পূর্ব্বেই কোষাধ্যক্ষ স্বর্ণ-মোহর-পূর্ণ একটী বৃহৎ তোড়া আনাইয়া কোট কাংরার নূতন গবর্ণরকে অর্পণ করিলেন। উপর্য্যুপরি এই সমস্ত রাজপ্রসাদ ও প্রসন্নতা-চিহ্ন লাভ করিয়া দুলীন গদ্গদ চিত্তে পুনর্ব্বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশোদ্যত হইতেছেন, মহারাজ বুঝিতে পারিয়া হাস্যমুখে সিংহাসন ত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

বড় বড় সর্দ্দার আসিয়া দুলীনকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। সকলেই মহা আহ্লাদ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন—অনেকের হয় তো অকৃত্রিম, অনেকের হয় তো বচনে সুধা, অন্তরে বিষ! দুলীন কিন্তু সকলকেই যথাযোগ্য সমাদর সম্ভাষণাদি দ্বারা বাধ্যতা প্রকাশ করিয়া যত সত্বর সম্ভব বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক

সহচরগণ সমভিব্যাহারে বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সকলেরই পরমানন্দ—পরমোৎসাহ—বিশেষ বন্নু যেন আপনিই গবর্ণর হইল! তাঁহাদের আসিবার আগেই বাসায় সংবাদ আসিয়াছে—চৈতন বাহু তুলিয়া নাচিতেছে!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আদেশ ও উপদেশ।

নব গবর্ণর কর্ণেল তুলীন উদ্যানে আসিয়াই অশ্ব-ত্যাগ পূর্ব্বক বন্নুকে আহ্বান করিলেন। বন্নু আসিতে না আসিতেই আগে ভাগে ভূ-লগ্ন-কর-মস্তকে সেলাম করিতে করিতে চৈতন উপস্থিত! "হুজুর! এখন আর শুধু সাহেব নন, রাজাসাহেব! হুজুর এখন কোট কাংরার সংসার চাঁদের রাজ্য পাইলেন!"

তুলীনের তখন নির্জ্জন হইবার বাসনা। যদিও তিনি ভারতের শিশু, কিন্তু ইংলণ্ডের মানুষ! এদেশীয়েরা মঙ্গল ঘটনায় হাস্য, কৌতুক, আমোদ-উৎসব-প্রিয়, কিন্তু ইংলণ্ডের লোক তদবস্থায় নিজ হৃদয়ের সহিত বিরল আনন্দ উপভোগে অধিক প্রয়াসী। সুতরাং চৈতনকে লইয়া তখন আমোদ আহ্লাদ করা তত ইচ্ছা নয়। বিশেষতঃ রাজ-দত্ত মোহর-নিবদ্ধ পত্রপাঠ জন্য তুলীনের মন তখন উৎসুক। অতএব চৈতনকে মিষ্ট কথায় কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট করিয়া এবং তহবিলের ভার দিয়া বন্নুকে কহিলেন, এখন যেন আমার নিকট কেহই না আসিতে পারে, কেবল ফকিরজী কি তাঁহার ভ্রাতা কি তাঁহার কোন লোক আইলে স্বতন্ত্র কথা।"

বন্নু লোকজনকে সে কথার কিছু বলিয়া দিবার অগ্রেই চৈতন "যো হুকুম" বলিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ পদ ক্ষেপণ পূর্ব্বক কিয়দ্দূরে গিয়া অনুচরগণকে উচ্চৈঃস্বরে প্রভুর ঐ আদেশটী যেন নিজের অনুজ্ঞাবৎ জ্ঞাপন করিলেন। তাহাদের মধ্যে দুইজনকে বাছিয়া দ্বারবানের কার্য্যভার দিলেন। আর দুইজনকে দ্বিতলের সোপান-মূলে রক্ষা পূর্ব্বক "খবরদার, ইন্দির চন্দর বাই বরুণ এলেও নেই যাগা—যাগা তো গুলি করেগা!" এইরূপ অপরূপ হিন্দীতে কড়া হুকুম দিয়া তাঁহাদিগকে প্রহরিতা কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। তুলীন অনিচ্ছাতেও একটু মৃদু হাস্য না হাসিয়া উপরে যাইতে পারিলেন না।

দুলীন স্নান ভোজনান্তে সেই মোড়কখানি মোচন করিলেন। করিবা মাত্র তন্মধ্য হইতে একখানি বৃহৎ পত্রাকার কাগজ বহিষ্কৃত হইল। দুলীন ব্যগ্র হইয়া পড়িতে গেলেন। একি? তন্মধ্যে একি আশ্চর্য্য ব্যাপার? তাহাতে না পঞ্জাবী, না পারসিক, না ইংরাজী, কোন ভাষায় কিছুই লেখা নাই, কেবলই শূন্যগর্ভ গোলাকার বিন্দু-মালার ন্যায় অজানিত চিহ্নশ্রেণী মাত্র—উলটিয়া পালটিয়া কিছুই আর দৃষ্ট হয় না—সেই অসংখ্য গোল! বিষম গোল!

দুলীনের শুনা ছিল, বহু দেশে রাজকীয় গুহ্য বিজ্ঞাপন ও আদেশাদি এই প্রকার সাঙ্কেতিক বর্ণমালায় লিখিত হয়; ভাবিলেন, ইহা হয় তো তাহাই হইবে। কিন্তু প্রচুর প্রয়াসে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। উপায় কি?

সন্দিগ্ধ, ভীত ও নিরাশ মনে পত্রখানি এক পার্শ্বে রাখিলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া পুনর্ব্বার মোড়কখানির মধ্যে ভালরূপে দেখিলেন। মোড়কখানি যেন স্তবকে স্তবকে রচিত বোধ হইল, দেখিতে দেখিতে ভিন্ন স্তর-মধ্যে অপর একখণ্ড কাগজ পাওয়া গেল—ভরসা হইল। আস্তে আস্তে খুলিয়া দেখেন, পারসিক লেখা—আশা বাড়িল। সেখানিতে ফকিরজীর মোহর—তাহাতেই প্রধান পত্র পাঠের সঙ্কেত—"তবু ভাল! তাই তো বলি, এমন কি হয়!" এই বলিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বহু কষ্টে ও বহু ক্ষণের পর সঙ্কেত বুঝিয়া শূন্যময় লিপির মর্ম্মভেদ করিলেন। তাহার মর্ম্মানুবাদ এই;—

"গুরু নানকজী ও গুরু গোবিন্দজী তোমার মঙ্গল করুন! প্রভুর তুষ্টি-জনক কর্ম্মে জ্ঞানী ভৃত্য অবহেলা করে না। বরং বশ্যতার গণ্ডিতে বাস-পূর্ব্বক এইটী সর্ব্বদা ধ্যান করে যে, বিশ্বাসরক্ষাতেই উন্নতি হয়। মিথ্যা বাক্য তদ্বক্তাকে লজ্জার পাশে লইয়া যায়। অনৃতমাখা রসনা তদধিকারীর অপমানের কারণ হয়। অতএব অনৃত ব্যবহার ও অনৃত বাক্যকে পরম শত্রু জ্ঞানে পরিত্যাগ করিও—বিশ্বাসী, ধর্ম্মভীরু ও সত্যপরায়ণ হইও। তাহাতে লোকে প্রশংসা করিবে—আমারও অনুগ্রহ সেই প্রশংসার নিতান্ত অনুগামী হইবে। তোমার কর্ত্তব্য ও উদ্দেশ্যকে স্মরণে রাখিও এবং দুঃখীকে পীড়া দিও না। তাহা হইলে যখন তোমার আর কিছুই থাকিবে না, তখনও তোমার সুনাম রহিয়া যাইবে!"

এই পর্য্যন্ত পড়িয়া দুলীন হাসিয়া বলিলেন "আঃ! মহারাজ অথবা

ফকিরজী আমার প্রিয় মিত্র সাদির * সাহায্য লইয়াছেন! যাহাই হউক, উপদেশগুলি যখন মহার্থ ও মহোপকারী, তখন যে উৎস হইতেই উৎপন্ন হউক, আমার পক্ষে অমৃত! ভাল, তাহার পর কি, দেখা যউক—"

"তুলীন! তোমার ন্যায় বিদ্বান্, বুদ্ধিমান ও সুবিজ্ঞ যুবা পুরুষের প্রতি এই উপদেশই যথেষ্ট। এক্ষণে কার্য্য-সম্বন্ধীয় পশ্চাদ্বর্ত্তী আদেশ উপদেশের প্রতি বিশিষ্টরূপে অভিনিবিষ্ট ও ঠিক তদনুযায়ী কর্ম্ম করিতে একান্তই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হও।

"আমার রাজ্য নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়—ক্ষুদ্র ছিল সত্য, এখন বৃহৎ হইয়াছে। পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ও আভ্যন্তরিক বিবাদে বিক্ষিপ্ত, বিপর্য্যস্ত ও ভগ্নদশাগ্রস্ত ছিল সত্য, কিন্তু এখন গুরুজীর কৃপায় সুসম্বদ্ধ ও সুদৃঢ় সাম্রাজ্য-রূপে পরিণত হইয়াছে। ভরসা আছে, আরো উন্নত অবস্থায় (এই প্রকার একচ্ছত্রা শাসনে) আমার বংশধরের হস্তে দিয়া যাইতে পারিব!

"তৈমুরের রাজ-নীতি আমার পথ-প্রদর্শক—তৈমুরের কাজ নয়—তাঁহার লেখা! তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আমি তাহা কাজে করিতে চেষ্টা পাই। † ভরসা করি, আমার পালনে প্রজারা (অন্ততঃ সামান্যতঃ) সুখে আছে। অনুসন্ধান দ্বারা গুণীজনকে পুরস্কৃত, সাহসীকে উন্নত ও দোষীকে তিরস্কৃত করা আমার জীবন-ব্রত। রণক্ষেত্রে সামান্য সৈনিকের সহিতও সম-কষ্ট-ভোগী ও সম বিপদ্‌ভাগী হই কিনা এবং বীরের পদোন্নতি করি কিনা, সকলেই জানে। কি সমরাঙ্গনে কি সিংহাসনে কখনই কেবল নিজের সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখি না। যত দিন রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছি, চিন্তার কবজ হৃদয় হইতে একদণ্ডও খুলি নাই! অতিথি, পথিক, সন্ন্যাসী, ফকীর প্রভৃতি ধর্ম্ম-পরিব্রাজক মাত্রকেই ভক্তিপূর্ব্বক ভোজনাদি দিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকি। আমি মহা দোষীরও জীবনদণ্ড করি না— যে শত্রু আমার জীবন হরণে হস্তোত্তোলন করিয়াছে, তেমন আততায়ীকেও ক্ষমা দান করিয়া আসিতেছি। সেই সব কারণেই শ্রীপরাগজী তাঁহার দীন দাসের প্রতি অনুকূল হইয়া তাহার ক্ষমতা ও শাসন মহা চীন দেশের

* সাদি—একজন সুপ্রসিদ্ধ পারসিক কবি।

† খঞ্জ বাদসাহ তৈমুরের লেখা পড়িলে বোধ হইতে পারে, তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী, দয়ালু, ন্যায়পরায়ণ সম্রাট্ আর বুঝি ছিল না; কিন্তু হায়! আচরণে তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত করিতেন!

কোল পর্য্যন্ত—অপর দিকে আফগানের সীমা পর্য্যন্ত—অন্যান্য ভিতে মূল-তান পর্য্যন্ত এবং শতদ্রুর পরপার বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়া দিয়াছেন! এমন রাজার প্রিয় কর্ম্মচারী হওয়া কি সৌভাগ্যের বিষয় নয়? সে মহা রাজ্যের কোন খণ্ডের শাসনকর্ত্তৃত্ব পদ পাওয়া কি মহা সম্ভ্রম নয়?

"এক্ষণে তোমার কর্ত্তব্যের কথা। তোমাকে প্রতি নিয়তই কোট কাংরায় বাস করিতে হইবে। যদি কোন বিশেষ কারণে অনুপস্থিতির প্রয়োজন হয়, তবে যাহাকে তোমার অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারে, এমন সুযোগ্য প্রতিনিধি না রাখিয়া কোথাও যাইও না। সে ব্যক্তি তোমার নিয়মিত সহকারী হউক, বা অন্যই হউক, কিন্তু সর্ব্বোতোভাবে সে যেন তোমার স্বরূপ পাত্র ও মনের মত লোক হয়।

"তোমার প্রতি দৃঢ় আজ্ঞা যে, সর্ব্বপ্রকার আগন্তুকের বিরুদ্ধেই কাংরা দুর্গ রক্ষা করিবে। এমন কি, যদ্যপি আমার পুত্র, কি আমার কোন প্রিয় মন্ত্রীও যায়, তথাপি কাহাকেও দুর্গ ছাড়িয়া দিবে না। আমার মোহরাঙ্কিত পাকা সনন্দ পত্র লইয়া গেলেও কেহ যেন প্রবেশাধিকার না পায়। অধিক আর কি বলিব, আমি স্বয়ং গিয়া যদি ফটকের ক্ষুদ্র কাটা দ্বারের মধ্যে তিন-বার স্বীয় মস্তক না দেখাই এবং (শুধু মস্তকও নয়) সেই তিনবার তুমি যদি স্বচক্ষে আমার শ্মশ্রু দেখিতে না পাও, তবে আমাকেও ছাড়িয়া দিবে না! অর্থাৎ আমি গিয়া যখন ঐরূপে বারত্রয় স্বীয় মস্তক ও শ্মশ্রু গলাইব—যখন তুমি আপনি তাহা প্রত্যক্ষ করিবে, তখনই কেবল জানিবে যে দ্বার মোচন করা যথার্থই আমার আন্তরিক অভিপ্রায়—তখনই কেবল প্রবেশ-পথ ছাড়িয়া দিবে, নতুবা কদাচ নয়—কদাচ নয়!

"কাশ্মীর হইতে বিলাসপুর পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থানীয় প্রতিবাসীদের গতি-মতি দর্শনার্থ তোমার নয়ন যেন জাগ্রত থাকে। জম্বু, নুরপুর বা মণ্ডী প্রভৃতি প্রদেশে কোন বিশেষ গতি বিধি দর্শন, শ্রবণ বা সন্দেহ হওন মাত্রেই মুহূর্ত্ত বিলম্ব ব্যতীত তদ্বিশেষ বিবরণ ফকিরজীকে গোপনে বিজ্ঞাপন করিয়া পাঠাইবে। * আর কোন দিকে গোলযোগ শুনিলে বা আমাদের প্রভুত্ব বিস্তারের সুযোগ সম্ভাবনা দেখিলে, তৎক্ষণাৎ ঐরূপে বিজ্ঞাপন করিবে। কিন্তু কোন কার্য্যানুষ্ঠান করিও না—আত্মরক্ষার বিশেষ

* যে সকল দেশের নাম হইল, সমস্তই তখন রণজিতের নিজের অধীন রাজ্য।

প্রয়োজন বা আমার বিশেষ আদেশ ভিন্ন সহসা কোন কিছুই করিয়া ফেলিও না। স্পষ্ট আজ্ঞা পাইলেও অধিক চঞ্চলতা বা বিশেষ ব্যগ্রতায় কার্য্যে লিপ্ত হইও না। কেননা রাজার (অর্থাৎ আমার) মন পরিবর্ত্তন হইতে কতক্ষণ? ঘটনার রূপান্তর হওয়াও বিচত্র নয়, সুতরাং চাঞ্চল্য সর্ব্বদাই পরিহার্য্য!

"অধিক বক্তব্য প্রকাশের প্রয়োজন নাই—রীতিও নয়। কিন্তু তুমি বিচক্ষণ; তোমাকে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে তোমার সুপ্রবেশক্ষম সূক্ষ্ম বুদ্ধি যে অবশিষ্টের অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে পারিবে, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। আমার প্রিয় প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষগণ জ্ঞানী, বিশ্বাসী ও বাধ্য; অতএব মনে করিও না যে, আমার অন্তঃকরণে অবিশ্বাস বা সন্দেহ সহসা স্থান পায়। বরং ইহার বৈপরীত্যই সত্য। কাংরা প্রদেশের চতুর্দ্দিকস্থ সর্দ্দারগণ সর্ব্বদা রাজ-প্রসাদ-ভাজন আছে। শ্রীগুরুজী তাহাদিগকে চিরকালই যেন তদ্রূপ রখেন। তথাপি বিপৎপাত নিবারণ হেতু দূর-দৃষ্টি ও সতর্কতায় দোষ কি? অতএব যদি অনুগ্রহাস্পদ থাকিতে চাও, তবে সতর্ক হইও—সাবধানে থাকিও—প্রহরিতা করিও—আর অধিক বলিব না!"

এই বিচিত্র পত্র এইরূপ ঠারে ঠোরে সমাপ্ত হইয়া তৎপাঠককে বিস্ময়, উৎসাহ, ভয়,ভক্তি প্রভৃতি নানা রসে পালা ক্রমে ডুবাইতে উঠাইতে লাগিল! কিন্তু সেই অবগাহনে উপকার বৈ অপকার হইল না!

ডুলীন বুঝিলেন, মহারাজ নিজে যদি পত্রখানি লিখিতেন, কি সাক্ষাতে লিখাইতেন, তবে বোধ হয়, তাহাতে এতদূর আত্ম-প্রশংসা থাকিত না। ফলতঃ ইহাকে মহারাজার না বলিয়া ফকিরের উক্তিমূলক লিপি বলিলেই সমধিক যুক্তি-যুক্ত হয়। যাহাহউক, এই বিদেশে—এরূপ অজ্ঞাত-কুল-শীল স্থানে—এরূপ পরিচয়-প্রকাশক ও এরূপ সার-উপদেশ-গর্ভ পত্র—কষ্টপাঠ্য ও দীর্ঘ হইলেও—এক খানার পরিবর্ত্তে দশখানা পাইলেও আরো ভাল হইত!

মোড়কের মধ্যে আর দুইখানি কাগজ ছিল;—একখানি কোট কাংরার পূর্ব্ব শাসনকর্ত্তার প্রতি দরবারের রীতিমত পরওয়ানা। তাহাতে প্রধান মন্ত্রী রাজা ধ্যান সিংহের স্বাক্ষর ও মোহর। অপর খানি নূতন শাসনকর্ত্তার নিয়োগ-পত্র। তাহাতে ফকির আজিজুদ্দিনের সই মোহর দৃষ্ট হইল। উভয় পত্রেই তদ্ব্যতীত মহারাজার মোহর ও গুপ্ত চিহ্ন আছে। কিন্তু শূন্যময়

সাঙ্কেতিক পত্রে ফকিরজীর স্বাক্ষর ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। রাজাদেশে ফকিরজী সেই অতিরিক্ত গুপ্ত উপদেশ পত্র লিখিয়াছেন, ইহাই বুঝা গেল।

সমস্ত পাঠ করা হইয়া গেলে মনে মনে যেমন বিমলানন্দ, তেমনই কর্ত্তব্যের গুরুত্ব বিষয়ক চিন্তাও উদিত হইল। সত্য বটে, মান ও পদলাভ আশার অতিরিক্তই হইয়াছে, কিন্তু সেই সম্ভ্রম ও সেই উচ্চ পদ রাখিতে না পারিলে তদপেক্ষা অপমান, লজ্জা ও মনস্তাপ আর নাই! একে অপরিচিত দেশ, তাহাতে ঈর্ষ্যা-জনিত বৈরভাব অবশ্যম্ভাবী—ফকিরজী ব্যতীত কোন হিতৈষী বন্ধুই নাই—তিনিও সদর বৈ মফঃস্বলের ব্যাপারে সাহায্য করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ! অতএব ঐশিক দয়া এবং স্বীয় বুদ্ধি সাধ্য সাহসের উপর নির্ভর ভিন্ন অন্য অবলম্বন দেখিতে পাইলেন না—তন্নির্ভরেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

সুযোগমতে সেই দিনই ফকিরজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; বিরলে স্বীয় জন্ম-কর্ম্ম-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত জানাইলেন। আজিজুদ্দিন শুনিয়া অনেকক্ষণ গম্ভীর ভাবে নীরব থাকিয়া শেষে বলিলেন "প্রিয় ডুলীন! এ সব কথা আমিই শুনিলাম—এই পর্য্যন্তই ভাল—আর অধিক দূর যাইবার এখন আবশ্যক নাই!"

ডুলীন ত্রস্ত হইয়া উত্তর দিলেন "আবশ্যক আছে—অন্য কারণে না হউক, আমার নিজের আত্মগ্লানি হইতে মুক্তি লাভার্থ মহারাজ এবং আমার আত্মার নিকট পরে দোষী না হই যে, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক আশ্রয়দাতা প্রভুর প্রতি প্রতারণা করিয়াছি। সুযোগ পাইলে এ কথা আপনাকে পূর্ব্বেই জানাইতাম, কিন্তু কয় দিবস কিছুতেই আপনার সময় পাই নাই। অদ্যও পাইতাম না, কেবল অদ্য না জানাইলে নয়, এই জন্যই এই নির্জ্জন সুযোগের নিমিত্ত ইতিপূর্ব্বে এত অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছিলাম—আপনিও অনুগ্রহ পূর্ব্বক সে সুযোগ করিয়া দিলেন।"

আজিজুদ্দিন ক্ষণেক চিন্তার পর হাসিয়া বলিলেন, "ফ্রেঞ্চ যুবতীর পিতার ন্যায় আমাদের মহারাজা গর্ব্বান্ধ ও ততদূর অবিবেচক নহেন যে, তুচ্ছ জন্ম-সূত্র তুলিয়া গুণীজনের গুণের সাহায্য গ্রহণে আপনাকে বঞ্চিত করিবেন; বিশেষ আপনি তো তাঁহার অনুগ্রহ লাভার্থেই সাহেব সাজিয়া আইসেন নাই—আপনি প্রায় জন্মাবধি যথার্থই সাহেব! আপনি সামান্য একজন

ইংরাজ-কর্ণেলের পুত্র না হইয়া ভারতবর্ষের এক তেজস্বী রাজবংশের সন্তান, ইহা তো স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। সাহেব-অপত্যাপেক্ষা তাতো আরো গৌরবাস্পদ! তবে কি জানেন, সকলেই আপনাকে সাহেব বলিয়া জানিয়াছে এবং আ'জ্‌ কা'ল্‌ সাহেবি নামের সৌরভ মৃগনাভির ন্যায় অত্যন্ত তেজস্কর—অনেক বিকার কাটাইয়া তুলে! যাহাহউক, অণুমাত্র চিন্তা করিবেন না; আপনি স্বচ্ছন্দে নাজির সৈনিকাদীর নিয়োগ প্রভৃতি তাবৎ উদ্যোগ করুন! তাহাতেও তো আপনার কয় দিন সময় লাগিবে, আমি ইতিমধ্যে সুযোগ বুঝিয়া মহারাজকে সমস্ত কথা ভালরূপে বুঝাইয়া দিব। এমন কি, আপনার যাত্রার পূর্ব্বে মহারাজার স্বমুখের ইঙ্গিত-বচনেই আপনি বুঝিতে পারিবেন যে, এ সংবাদে রাজানুকম্পার কিছু মাত্র হ্রাসতা না হইয়া বরং আপনি যে ধর্ম্মভীতি-মূলক সত্যবৎসলতা প্রদর্শন করিলেন, তজ্জন্য আপনার প্রতি তিনি অধিক সন্তুষ্ট এবং আপনার চরিত্রের প্রতি আরো শতগুণে অধিক বিশ্বস্ত হইয়াছেন! কেবল একটী কাজ করিবেন, এ কথা যেন আর কেহই জ্ঞাত না হয়।”

ভুলীন পরমাহ্লাদে ব্যগ্রচিত্তে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ এবং ফকিরজীর দ্বারা দুই একটী বিশ্বাসী সহকারীর নিয়োগ প্রার্থনা করিয়া বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

যাত্রার উদ্যোগ।

বাসোদ্যানে মহা ধুম পড়িয়া গেল! ভুলীনের গবর্ণর হওনের সংবাদ জলপ্লাবনের ন্যায় অল্প কালের মধ্যেই চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। নানা কর্ম্মের অসংখ্য উমেদার তাঁহার বাসোদ্যান আক্রমণ করিতে লাগিল। চৈতন দেখিয়া মাঝে মাঝে ডাকিয়া বলেন “ওরে তোরা কি লালা বাবুর শ্রাদ্ধ বাড়ী পেলি নাকি? এত্তা ভিড় মৎ করো—গুলি করেগা।” ফলতঃ চৈতন বড় ভারি হইয়া উঠিলেন। ভারি হইবারই কথা; নব শাসনকর্ত্তা যিনি, তিনি ইংরাজ; চৈতন ইংরাজ-নবিস—চৈতন ভিন্ন অন্য এক প্রাণীও

ইংরাজী জানে না! যদিও বয়ু জানে, কিন্তু বয়ুর পঠিত বিদ্যা নয়—সাহেব-ঘেঁসা মাদ্রাজী ও কলিকাতার চিনাবাজারী অনেককে গ্রন্থ পড়িয়া ইংরাজী শিখিতে হয় না, তাঁহারা বিলাতী সরস্বতীর বরপুত্র—স্বতঃসিদ্ধ—অনর্গল কহিয়া যায়! সুতরাং চৈতন বলিতেন, বয়ুর ইংরাজী ইংরাজীই নয়—সে তো বাক্যাবলী পড়ে নি—সে, ইংরাজী লিখিতেও পারে না! তবেই হইল, তিনি ন্যায়তঃ নূতন গবর্ণরের প্রধান মন্ত্রী বা প্রাইভেট্ সেক্রেটরি! অন্ততঃ নিজ মনে মনে এই যুক্তি আঁটিয়া আপনাকেই ঐ উচ্চপদে মনোনীত করিয়া লইলেন!

অতএব চৈতনের ব্যস্ততার সীমা পরিসীমা নাই; সকলের সাক্ষাতে সর্ব্বদাই বলেন "নাওয়া খাওয়ার অবকাশ নেই মিল্‌তা হায়!" একবার এ দিকে, একবার ও দিকে, একবার সে দিকে ছুটিতেছেন। একেবারে কত লোককে আসিতে দেওয়া হইবে; কিরূপ লোক সাহেবের নিকট যাইতে পাইবে বা না পাইবে; কাহাকে কখন্ বিদায় করিতে হইবে; এই সকল হুকুম জারি করিতে তাঁহার গলদ্‌ঘর্ম্ম ছুটিতে লাগিল! ভুলীন যেই মাত্র বয়ু কি ধয়ু কি অপর কাহারো প্রতি ঐ প্রকারের কিম্বা অন্য কিছুর আদেশ করেন, চৈতন অমনি সোপানের নিকট হইতে "যো হুকুম রাজা-সাহেব!" বলিয়া ছুটিয়া নীচে যান—ডাকাডাকি চেঁচাচেঁচি আর "গুলি করেগা" বলিতে বলিতে গলা ভাঙ্গিয়া ফেলেন—আবার ছুটিয়া উপরে আসিয়া সেলাম পূর্ব্বক পূর্ব্ব ভাবে সিঁড়ির মাথার নিকট একটী ক্ষুদ্র টেবিলের সম্মুখে টুলের উপর উপবিষ্ট হইয়া লিখিতে আরম্ভ করেন। তহবিলের আয়রণ-চেষ্ট পার্শ্বের ঘরে—নিচের গদিতে প্রায়ই আর বসেন না—সাহেব যখন বাহিরে যান, তখনই তথায় গিয়া নবনিযুক্ত মুন্সি বখ্‌সী প্রভৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব করেন—এক প্রকার দরবারই সে!

রজনীতে তাঁহার স্বস্তি নাই—সমস্ত দিবস যে যে বিষয়ে যত ব্যয় হইল এবং যে কর্ম্মে যত লোক নিয়োগ পাইল, তাহার কতক প্রত্যক্ষে, কতক পরোক্ষে—কতক প্রভুর নিকট, কতক মুন্সিদের নিকট, কতক বয়ুর নিকট জানিয়া শুনিয়া লিখিয়া রাখেন! তজ্জন্য বৃহৎ বৃহৎ খাতা খুলিলেন—কতক বাঙ্গালায়, কতক ইংরাজীতে। কলিকাতার রীত্যনুসারে ভাউচার রসিদ সমস্তই ঠিক ঠাক—সাহেবের সহি ভিন্ন কেহ কপর্দ্দকও পায় না—সাহেবের সম্মুখের হুকুমেও না! দয়ালু ভুলীন হাসেন, চৈতনের প্রবর্ত্তিত

প্রথানুসারেই কাজ করেন। তাহা না করিলে শুধু যে চৈতনের মনে ব্যথা জন্মিত, তাহা নয়—কাজের গোলমালও ঘটিতে পারিত। চৈতনের হস্তাক্ষর কি ইংরাজী কি বাঙ্গালা, যথার্থই উত্তম এবং হিসাবে নৈপুণ্য যথার্থই অসামান্য। সুতরাং তামাসাচ্ছলে চৈতনের তুষ্টি জন্মাইতে গিয়া তুলীন দেখিলেন যথার্থই রীতিমত কাজ হইতেছে। চৈতনকে না পাইলে বাস্তবই সেরূপ বিষয়ে বিশেষ গোল ঘটিত—অবিশ্বসনীয় ধূর্ত্ত মুন্সির হাতে পড়িয়া ক্ষতিগ্রস্ত ও বিরক্ত হইতে হইত! অতএব বাঙ্গালী ইতিহাস-লেখক জাতীয় গৌরবের সহিত লিখিতেছে যে, যে বাঙ্গালীকে তুলীন অকর্ম্মণ্য ভাবিয়াছিলেন, সে একটা ভারি দরকারি কাজে লাগিল—দুই এক দিনেই সাহেবের পরিহাস প্রবৃত্তি ঘুচিয়া গেল—চৈতনও গুরুতর বিশ্বাসের কর্ম্মভার পাইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে যথার্থই ভারি হইয়া পড়িল—সাহেবও তন্ন তন্ন রূপে আয় ব্যয় পর্য্যবেক্ষণরূপ একটা মহা বিরক্তিকর ব্যাপারের দায়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া অন্য গুরুতর কাজে নিবিষ্ট হইতে পারিলেন।

ওদিকে কর্ম্মচারী, পদাতিক ও অশ্বারোহী প্রভৃতি সৈনিক বিভাগের নিয়োগ-কার্য্য চলিতে লাগিল। তদ্ধেতু সাহেবকে দিবারাত্রি যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিতে হইল। বিশেষতঃ যতদূর সম্ভব, দুশ্চরিত্র (বদ্‌মায়েস) লোক দলমধ্যে প্রবেশ না করে, এই মহদুদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি সামান্য পদের লোক জনকেও স্বচক্ষে না দেখিয়া, পরীক্ষা না করিয়া এবং তাহাদের পূর্ব্ব-জীবন-বৃত্তান্তের বিশেষ তত্ত্ব না লইয়া নিযুক্ত করিলেন না। সুতরাং অসীম শ্রম হইবে, আশ্চর্য্য কি ?

ফকিরজী ও কালিফাজীর সাহায্যে সুযোগ্য বিশ্বাসী লোক বাছিয়া দেওয়ান, সহকারী দেওয়ান ও মুন্সি, কার্কুন প্রভৃতি রাজ্যশাসন ও রাজস্ব-সংক্রান্ত কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত করিলেন। সৈনিক নিয়োগেও তাঁহাদের আনুকূল্য অল্প কাজে লাগে নাই। উমেদারের সংখ্যার কথা তো পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তুলীনের দৈনিক পুস্তকে লেখা আছে যে, "বোধ হইল, পঞ্জাবের মধ্যে দুই পায় চলিতে পারে, এমন পুরুষ বুঝি সকলেই আসিয়াছিল! অধিক কি, স্বয়ং নন্দ সিংহও বহু বহু জনের নিমিত্ত অনুরোধ জানাইল। যাহারা আমাকে প্রথম দিন নগর প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল,

তাহারা আপনাদিগকে আমার পরম বন্ধু ভাবিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর দাবি খাড়া করিল! আর যাহারা আমার সহিত কথাবার্ত্তা বা একটীও বাক্যালাপ করিয়াছিল, তাহারা তো সাক্ষাৎ মামাতো পিস্‌তুতো ভাই সাজিয়া বসিল! তদ্বাদে প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যবসায়ীদল, যাহার যাহা পণ্য—হস্তী, অশ্ব, উট, খর, যান, বাহন, বেশভূষা, বিবিধ দেশজাত বন্দুক পিস্তল তরবার বর্ম্মাদি —সজীব, নির্জীব—দেহরক্ষক, দেহবাহক, দেহনাশক, দেহ-শোভক এবং উপকারক অপকারক জীবজ, খনিজ, শিল্পজ ও অন্যান্যবিধ রাশি রাশি পদার্থ বিক্রয়ার্থ আনয়ন করিল! তাহার কিয়দংশ গৃহীতও হইয়াছিল।”

এখনও পরম ভক্ত চাঁদ খাঁর কথা বলা হয় নাই। চাঁদখাঁর ন্যায় স্ফূর্ত্তি বন্ন, ধন্ন ও চৈতন ব্যতীত আর কাহারও দৃষ্ট হয় নাই—চাঁদ খাঁ যেরূপ সদর্পে দুলীনকে নিজস্ব সম্পত্তি ভাবিয়াছিল, এমত আর কে করিবে? কে পারিবে? এত সাহস —এত যোগ্যতাই বা আর কাহার হইবে? প্রথম প্রবেশের দিনে দুলীনকে দূর হইতে দেখিয়া অন্য সকলে গ্রাহ্যও করে নাই, অথবা “আর একটা ফিরাঙ্গী আইল” বলিয়া উপহাস বা ঘৃণা করিয়াছিল; সেই দুর্দ্দিনে একা চাঁদ খাঁই কেবল গৌরব ও আত্মীয়তা দেখাইয়াছিল! সুতরাং অমন অদিনের বন্ধু এমন সুদিনের সুখভাগী হইবে, বিচিত্র কি?

ফলতঃ চাঁদ খাঁই যেন দুলীনকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার হাব ভাবে এমনই প্রকাশ পাইতে লাগিল! কিন্তু যথার্থ বলিতে গেলে, এই মুলতানী মুসলমান যতই কেন চঞ্চল, যতই কেন তড়্‌বড়ে, যতই কেন বহুভাষী ও যতই কেন জেঁকো হউক না, সে খল নয়। তাহার অন্তঃকরণ সরল, অকপট এবং দুলীনের প্রতি যথার্থই ভক্তি-প্রবণ হইয়াছিল। তাহার দ্বারা যে কোন প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতিতা ঘটিবে, লোকটার আকৃতি প্রকৃতি ভাব-গতিক দেখিয়া দুলীনের মনে নিমেষের নিমিত্তও সে ভয় হইত না। এই জন্যই প্রথমাবধি সে যখনই আসিয়াছে, দুলীন তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই।

দুলীন নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছিলেন, যদিও জাতীয় বিদ্বেষ বশতঃ চাঁদ খাঁ শিখজাতির হিংসা করিতে পরাঙ্মুখ ছিল না এবং সুযোগ পাইলে শিখের সর্ব্বস্ব হরণেও পাপ বোধ করিত না, কিন্তু স্বভাবতঃ সে নিষ্ঠুর ও মিথ্যানুরাগী নহে। অধিকন্তু প্রভু-পরায়ণতা ও কৃতজ্ঞতা রূপ মহদ্ধর্ম্ম তাহার

হৃদয় হইতে প্রতি নিশ্বাসে যেন নিঃসৃত হইত—সেটী যেন তাহার জাতীয় গুণ। অতএব এমত হৃদয়বান্ ব্যক্তিকে ছাড়িতে ইচ্ছা হইল না—ভয়-মৈত্রতা প্রদর্শন, উপকার সাধন ও সদুপদেশ দান দ্বারা তাহার দোষগুলিকে দমনে রাখিয়া গুণাবলীকে স্বীয় কর্ম্মে লাগাইতে ডুলীন সংকল্প করিলেন।

চাঁদের নিতান্ত ইচ্ছা, একপ্রকার নায়েব সেনাপতি হইয়া সাহেবের সঙ্গে যায়। যদিও সে কর্ম্মে সে অনুপযুক্ত নহে, কিন্তু উকীল হইয়া দরবারে থাকে কে? সে গুরুতর কার্য্যের জন্য উপযুক্ত বিশ্বাসী লোক ডুলীন আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। যেখানে যেমন উপকরণ সুপ্রাপ্য, তাহার দ্বারাই জ্ঞানীজন সদুপায় গঠন পূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধন করিয়া লন। অতএব চাঁদের প্রার্থনায় সম্মত না হইয়া ডুলীন তাহাকে গোপনে বলিলেন, "শুন চাঁদ, আমার সঙ্গে তোমার যাওয়া ঘটিবে না—তোমাকে আমার উকীল হইয়া দরবারে থাকিতে হইবে। কিন্তু যে দুর্ব্বৃত্ততায় এতকাল রত ছিলে, তাহা আর করিতে পারিবে না। তোমার কথায় আমার সম্পূর্ণ প্রত্যয় আছে, তুমি যদি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া শপথ কর যে, অদ্যাবধি সেই ভয়ানক পাপজনক ব্যবসায়ে আর অণুমাত্র লিপ্ত থাকিবে না, আমি তাহাতেই নিশ্চিন্ত হইয়া যাইতে পারিব। তুমি যে ধনলোভে সে দুষ্কর্ম্ম কর না—তুমি যে জাতীয়-আক্রোশে সে পথের পথিক—তাহা আমি জানি, তথাপি তাহা দস্যুবৃত্তি। আমি তস্করকে আমার প্রতিনিধি করিব না। তুমি সে কুপথ ত্যাগ করিলেই তোমার মত উকীল আর পাইব না, তাহাও জানি। অতএব তুমি এই অঙ্গীকারে নিয়োগপত্র গ্রহণ এবং ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য পালন কর, তাহা হইলে অবশ্যই আমি তোমার ভাল করিব।"

চাঁদ খাঁ একে সঙ্গে যাইতে পারিবে না, সেই দুঃখে কাতর হইল; তাহাতে শিখজাতির গোপনীয় পীড়ন-ব্রতে এককালে নিরস্ত হইতে হইবে, সে শোকও শেলবৎ তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল! কিন্তু ডুলীন শেষোক্ত ব্রতের অবৈধতা পুনঃ পুনঃ অকাট্য যুক্তি ও ভয়মৈত্রময় উক্তিতে এমন পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, সে মহা ব্রত সে জন্মের মত ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইল; কিন্তু সাহেবের সঙ্গী হইবার আশাটী সহসা ছাড়িতে চাহিল না। যখন ডুলীন কিছুতেই শুনিলেন না এবং সাহেব তাহাকে কত বেশী বিশ্বাসের ভার অর্পণ করিতেছেন, [illegible] গৌরব যখন অনুভব করিতে পারিল,

তখন চাঁদ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া সরল অন্তরে শপথ পূর্ব্বক ওকালতি ভার গ্রহণ করিল। তুলীন নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট হইলেন।

তখন চাঁদ খাঁ বাষ্পাকুল নয়নে নিবেদন করিল "হুজুর! যথার্থ কহিতেছি, কি শুভক্ষণে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল যে, আমার স্বদেশীয় স্বজাতীয় রাজার প্রতিও এত ভক্তি কদাপি জন্মে নাই! বিশেষ, দিন দিন যতই আপনার মহত্ব ও সদাশয়তা দেখিতে পাইতেছি, ততই আপনার কিসে ভাল হইবে, (বেয়াদবি মাপ করিবেন) আমার সেই মাত্র ধ্যান জ্ঞান হইয়াছে! দুর্জ্জন শিখেরা যাহাকে বিশ্বাস করে না, যাহার সহিত ভাল করিয়া কথাটাও কয় না, জগতে যাহার কেহ নাই বলিলেই হয়, যাহার পাপের জীবন আপনার অগোচর নাই, পথের পথিক সেই চাঁদ খাঁকে আপনি যখন বিশ্বাস করিলেন—তাহাকে পাপের পথ হইতে ফিরাইয়া সুপথে আনিলেন—তাহার ভাল করিবার ইচ্ছা জানাইলেন—তখন এ ছার জীবন কি আপনার চরণে বিক্রীত না হইয়া থাকিতে পারে? নিশ্চিত জানিবেন চাঁদ খাঁ কেনা গোলাম হইল! নিশ্চিন্ত থাকিবেন যে, এ কেনা গোলাম এমন প্রভুর কখনই নেমখারামি করিবে না! যদি সঙ্গে লইতেন, তবে দেখিতে পাইতেন, চাঁদ খাঁ আপনার প্রাণ দিয়াও প্রভুর ঋণ শুধিতে জানে কি না! আরো দেখিতেন, এ কথাটা কথার কথা কি একান্তই কাজের কথা! যাহাই হউক, যখন গোলামকে নিতান্তই রাখিয়া যাইবেন, তখন যাহাতে হুজুরের সঙ্গীদলের মধ্যে নিদান জন কত প্রকৃত বিশ্বাসী ভৃত্য সঙ্গে থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে এ দাসকে অনুমতি দিউন!"

তুলীন হাসিয়া বলিলেন "কিরূপ ব্যবস্থা?"

চাঁদ খাঁ আরো নিকটে গিয়া মৃদুস্বরে কহিল "হুজুর চাঁদ খাঁর দৃষ্টি অনেকের চেয়ে তীক্ষ্ণ—আমি বেস জানি, হুজুরের সঙ্গে এই যে এত লোক লস্কর যাইতেছে, ইহার মধ্যে এমন ছদ্মবেশী তাঁবেদারও আছে, যাহারা দিনের বেলা হুজুরের জন্য প্রাণ দিতে মুখে আগুয়ান হইবে, কিন্তু রাত্রিকালে বা সুযোগ পাইলেই হুজুরের প্রাণ নিতেও সঙ্কোচ করিবে না! চাঁদ খাঁ স্পষ্টভাষী, হুজুর মাপ করিবেন। এই জন্যই এ গোলাম এত অবিশ্বাসী অনুচরের মধ্যে নিদান পঞ্চাশ জন বিশ্বাসী সওয়ার ও পঞ্চাশখানি বিশ্বাসী তরওয়াল দিতে চায়! তাহারা সাহসে সিংহ, প্রভুভক্তিতে কুকুর! অধিক

কি, এই পঞ্চাশ জন অনুচরে হুজুর পঞ্চাশ জন বন্ধু পাইবেন! আবার তাহারা দুই শত শিখের সমকক্ষ হইবে, সন্দেহ মাত্র নাই!”

ডুলীন মনে মনে এ প্রস্তাবের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন; কিন্তু বাহে তাহা ততদূর প্রকাশ না করিয়া কেবল হাসিয়া বলিলেন “আচ্ছা, চাঁদ, যদি তাহাতেই তুমি সন্তুষ্ট হও, তবে আমারও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য!”

পরে যখন সুসজ্জিত অশ্বসহ সেই পঞ্চাশৎ অশ্বারোহীকে চাঁদ খাঁ পরদিন আনিয়া উপস্থিত করিল, তখন বারাণ্ডা হইতে তাহাদিগকে এবং তাহাদের অশ্বচালননৈপুণ্য ও সামরিক গতি-ক্রিয়াদির অভিনয় অবলোকনে ডুলীন মহা সুখী হইলেন; ভঙ্গী দ্বারা সেই সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, বাক্যেও প্রশংসাবাদ জানাইলেন এবং তাহাদিগের অধ্যক্ষ আলিবর্দ্দি খাঁকে ও চাঁদকে গোপনে নিকটে আনাইলেন।

নিকটে আসিলে আলিবর্দ্দিকে চাঁদ খাঁর সমস্ত কথা—সে তাঁহার কতদূর প্রিয় বিশ্বাসপাত্র, কেন তাহাকে সঙ্গে লইতে পারিলেন না, ইত্যাদি বুঝাইয়া পরে বলিলেন “একারণ চাঁদকে রাখিয়া যাইতে হইল। কিন্তু চাঁদ আমাকে বলিয়াছে যে, তুমি তাহার অতি আত্মীয় প্রিয় মিত্র—তাহার যাওয়া আর তোমার যাওয়া সমান কথা! অতএব আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক তোমাকে সদলে আমার নিজ শরীর-রক্ষকরূপ অতি সম্ভ্রমের পদে নিযুক্ত করিতেছি—দুই বন্ধুকে দুই দিকে দুইটী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিশ্বাসের কার্য্যভার দিলাম—একজনের হাতে প্রাণ, অপরের হাতে মান সমর্পণ করিলাম—এখন তোমাদের উন্নতি অবনতি তোমাদের নিজ নিজ বিবেচনা ও ব্যবহারের উপর নির্ভর—আমার আর অধিক কথা নাই!”

চাঁদ অদূরে নীরব ছিল। যুবা আলিবর্দ্দির স্বাভাবিক তেজোদ্দীপ্ত চক্ষু উৎসাহে ও আনন্দে আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—চতুরতা, শূরতা, কৃতজ্ঞতা, স্নে নয়নে যুগপৎ যেন মূর্ত্তিমান হইয়া খেলা করিতে লাগিল! তদবস্থায় সাহেবের বাক্যান্তরে যাহা যাহা বলা উচিত, আলিবর্দ্দির দ্বারা তাহার ত্রুটি হইল না। আলির আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া ও বাক্য শুনিয়া ডুলীন মহা তুষ্ট হইলেন এবং এমন কর্ম্মচারী ও এমন সহচরগণকে আনয়ন জন্ত চাঁদ খাঁর প্রতি বাধ্যতা-জ্ঞাপক নয়নে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিলেন।

চাঁদ খাঁ সে দৃষ্টির মর্ম্ম বুঝিল। মহা মহা হর্ষে জানু পাতিয়া সাহে-

বের হস্ত গ্রহণার্থ যেন উৎসুক হইল। ভুলীন তৎক্ষণাৎ হস্ত প্রসারণ করিলেন। চাঁদ খাঁ বিশেষ নম্রতা সহকারে হস্ত চুম্বন করিয়া ধন্য হইল এবং স্বজাতীয় রীতিতে নীরব অভিবাদনাদি পুনঃ পুনঃ করিবার পর সাহেবের ইঙ্গিতানুসারে উত্থান করিল।

এই অভিনয় ব্যাপারের ফলশ্রুতি অতি আশ্চর্য্য হইল—তথায় সেই তিন জন মাত্র উপস্থিত, তিনজনের এক জনের বদন হইতেও কিছু মাত্র বাক্যস্ফুরণ হইল না, তথাপি নয়নরূপী মধ্যস্থগণের দ্বারা পরস্পরের মানসিক ভাবের এমনি সুন্দর বিনিময় ঘটিল যে, কোন একরার পত্র তদপেক্ষা অধিক বন্ধন করিতে পারে না—তখন যেন সেই ভিন্ন প্রকৃতিস্থ তিন ব্যক্তির হৃদয় পরস্পরের রক্ষক ও কল্যাণ-সাধক হইবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল!

ফলতঃ চাঁদ খাঁ, আলিবর্দ্দি খাঁ এবং তাহাদের সঙ্গিগণের সাহচর্য্য-লাভ ব্যাপারটী ভুলীনের পক্ষে অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়ই হইল। যদিও তাহারা চরিত্রে নির্ম্মল নয়, কিন্তু সেকেলে অর্দ্ধ-দস্যু বঙ্গীয় পাইক সর্দ্দারের ন্যায় "নুণ খাই যার, গুণ গাই তার!" এই মহা বাক্য তাহাদের জাপ্যমন্ত্র! তাহারা প্রাণ দিয়াও আশ্রয়দাতার কার্য্য করিবে—করিবেই করিবে!

চাঁদ খাঁ যেমন দরবারের সকলেরই স্বভাব চরিত্রাদি উত্তম জানে, আলিবর্দ্দি ও তৎসঙ্গীদল তেমনি গম্য পথ ও গন্তব্য পার্ব্বতীয় প্রদেশের সকল তত্ত্বই বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিল। তাহারা প্রত্যেকেই সাহসী জোয়ান —অস্ত্র চালনায় বাল্যাবধি দিক্ষিত ও অভ্যস্ত—তাহারা কাহাকেই ভয় করে না। এমন দুর্দ্দম্য লোক অনুগত ইচ্ছুক ভৃত্য হইলে এবং এমন সরল যোদ্ধৃদলকে দয়াভাবে চালাইতে জানিলে কত যে হিত, তাহা পাঠক বুঝিবেন!

ভুলীন শুদ্ধ চাঁদ খাঁকেই উকীল রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন না—কি জানি, সে কোন গতিকে কাহারো কুপরামর্শে কুপথগামী বা অসতর্ক হইয়া উঠে— অন্ততঃ সে কিরূপ কাজ করে, ইহা জানাও তো উচিত—এই জন্য ফকিরজীর পরামর্শে ও সুপারিসে বাপ্পাজী নামা একজন মহারাষ্ট্রীয় সুধীর মুন্সিকে চাঁদ খাঁর গোপনীয় পরিদর্শক ও সকল বিষয়েই স্বাধীন বিজ্ঞাপক স্বরূপ নিযুক্ত করিলেন। তাহার প্রতি বিশেষ উপদেশ এই যে, সে চাঁদের সহিত আলাপ করিবে না; কেবল চুপে চুপে দরবারে যাইবে; চাঁদ খাঁর গতিবিধি

ও অন্যান্য সকল ব্যাপারই পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সর্ব্বদা বিজ্ঞাপন পাঠাইবে। কালিফাজী তাহাকে দরবারে যাইবার সুযোগ করিয়া দিবেন।

চাঁদ খাঁর সহিত যেরূপ বন্দোবস্ত ও তাহার প্রতি যে উপদেশ ও আদেশ হইল, তন্মর্ম্ম এই ;—

সে প্রতিদিন দরবারে উপস্থিত থাকিবে। ডুলীনের পত্র পাউক না পাউক, তাঁহার নাম করিয়া মহারাজকে ও প্রধান মন্ত্রীকে নমস্কার জানাইয়া তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। ইহা ভিন্ন দরবারে অন্য কথা কহিবে না—কোন বাদানুবাদে লিপ্ত থাকিবে না, মতামত ব্যক্ত বা প্রশ্ন প্রস্তাবাদি উত্থাপিত করিবে না। নিতান্ত অচতুর বোকার ন্যায় অবস্থান করিবে, অথচ চক্ষু কর্ণ সর্ব্বদাই সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখিবে। কোন রকমে একবার মাত্রও তাহার কোন ছলনা যদি প্রকাশ পায় ও সপ্রমাণ হয়, তবে সাহেবের সহিত জন্মের মত তাহার বিচ্ছেদ ঘটিবে। আর যদি যথার্থ বিশ্বাসী উকীলের ন্যায় এবং সদ্বিবেচনার সহিত কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করে, তবে মাসিক বেতন তো তুচ্ছ কথা—তাহা তো প্রচুরই পাইবে— তদ্বাদে পুরস্কারের সীমা রহিবে না। বিশেষ বিশেষ সংবাদ যাহা পাঠাইবে, তাহার প্রত্যেকের গুরুত্বানুসারে পৃথক্ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবে। কোন গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হইলে—যত ব্যয় হউক—যে রূপে পারুক—অতি দ্রুতগামা অতিরিক্ত অশ্বারোহী দ্বারাও সে সংবাদ তৎক্ষণাৎ পাঠাইবে। নিয়মিত ডাকের নিমিত্ত প্রতি পঞ্চ ক্রোশান্তরে এক জন করিয়া হরকরা নিযুক্ত থাকিবে।

এ সমস্ত ও অন্যান্য বন্দোবস্ত হইয়া গেলে ডুলীন তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, "আমি যে কাহারো পদলেহন করিতে রহিব, সে পাত্র নই—আমার উচ্চ আশা। যদি তুমি ঠিক পথে চলিতে পার, নিশ্চিত জানিবে, আমার উন্নতির সঙ্গে তোমারও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।"

চাঁদ যে কৃতজ্ঞতা ও আহ্লাদ সহকারে এই সকলে অঙ্গীকারবদ্ধ হইল, তাহা বলা বাহুল্য। চাঁদ খাঁর পরামর্শে তাহার হস্তে বহু অর্থ ন্যস্ত হইল—বোধ হয়, তদ্দারা রাজসভার বহু দেবতার পূজা হইবে! অর্থাৎ যত জনকে সম্ভব, ক্রয় করিয়া চাঁদ খাঁ "সাহেব-পক্ষাবলম্বী" একটি দল প্রস্তুত করিয়া লইবে। যেহেতু চাঁদের মতানুসারে "ভাল না পারি, মন্দ ক'র্ব্বো—কি দিবি তা বল্?" এইরূপ গরলময় খল-দলকে নির্ব্বিষ করিয়া রাখা আবশ্যক!

এই সকল আয়োজন ও অবধারণ করিতে এক সপ্তাহের অধিকও অতীত হইল। সকলই উত্তম—সকলই প্রার্থনীয়রূপ হইয়া উঠিল, কেবল দুঃখের মধ্যে "ল্যান্সার" নামক যে রাজার অশ্বারোহী রেজিমেণ্ট সঙ্গে চলিল, নন্দ সিংহই তাহার "মেজর" অর্থাৎ অধিনায়ক হইল। শুদ্ধ সেই কর্ম্ম নয়, নন্দ কোট কাংরা দুর্গের সহকারী সেনাপতিত্ব-পদ-লাভ করিতেও সমর্থ হইল।

যাহা হউক, ঐ কাল মধ্যে ডুলীন প্রায় সার্দ্ধ সহস্র সংখ্যক নূতন সৈনিক নিযুক্ত করিলেন। তদ্বাদে উক্ত ল্যান্সারের সাত শত, জমাদার খোসালের রেজিমেণ্টের আট শত এবং গোলন্দাজ, তীরন্দাজ প্রভৃতি অন্যান্য প্রকারের সৈনিক কয়েক শত; সর্ব্বশুদ্ধ তিন সহস্রেরও অধিক সৈনিক, এবং চালক, বাহক, সহিস, তাম্বুদার ভৃত্য প্রভৃতি রেসেলদার প্রায় দ্বিসহস্র; সুতরাং সর্ব্ব সমষ্টিতে পাঁচ হাজারেরও অধিক লোক তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। সর্ব্ব প্রকার অস্ত্র-শস্ত্রোপরি ছয়টী বিভিন্ন প্রকারের কামানও সঙ্গে ছিল। অতএব ডুলীনের বাহিনী বড় সামান্য হইল না।

ডুলীন এই বাহিনী লইয়া লাহারের বাহিরে গিয়া এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ছাউনি করিলেন। নন্দ সিংহাদি উচ্চ কর্ম্মচারী সত্বেও বিশ্বাসী বন্নু, ধন্নু ও আলিবর্দ্দি খাঁ, ব্যবস্থার প্রধান অধ্যক্ষ হইল—সমুচিত যোগ্যতাও দেখাইল। খাজাঞ্চী চৈতন বাবুর কথা বলিবার সাবকাশ এখন অল্প—চৈতনের ব্যস্ততার সীমা নাই—রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত তাঁহার রসনা ও লেখনী চলিতে লাগিল—তিনি তাঁহার সহকারী মুন্সিদেরও প্রাণান্ত করিয়া তুলিলেন! সমুদয় ঠিক বন্দোবস্ত করিয়া প্রভাতে ডুলীন সাহেব মহারাজার নিকট শেষ বিদায় লইতে গেলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

যাত্রার সকলই প্রস্তুত—গমন জন্য মহারাজার অনুমতিও আছে; তথাপি সৈন্য সমাবেশ প্রভৃতি কিরূপ হইল, তাহা বিজ্ঞপ্তি পূর্ব্বক একবার শেষ বিদায় লওয়া আবশ্যক।

মহারাজা সানুকূল ভাবে, সদয় হৃদয়েই, বিদায়ী আলাপ সম্ভাষণাদি করিলেন। ডুলীনের আশা ছিল, অল্প কথায় দেখা সাক্ষাৎ সমাপ্ত করিয়া তখনই স্কন্ধাবার উঠাইয়া চলিয়া যাইতে পারিবেন। কিন্তু মহারাজ যেরূপ গল্প ও দীর্ঘ আলাপ ফাঁদিয়া বসিলেন, তাহাতে সে দিন যে লাহোর ছাড়িতে পারেন, এমন সম্ভাবনা রহিল না।

সে সব গল্প নানাবিষয়ক, কোট কাংরা সম্বন্ধীয় কোন বিশেষ কথা নয়। ভাবে বোধ হইল, সে সব গুরু তথ্য প্রকাশ্য সভাস্থলে আলোচিত হওয়া মহারাজার অনভিপ্রেত—সে সম্পর্কে যাহা বলিবার, তাহা গুপ্ত পত্র দ্বারাই হইয়াছে। ফলতঃ আলাপ ও কথোপকথন এমন সরসভাবে, এমন সুন্দর প্রণালীতে হইল যে, ডুলীন সে দিন প্রভুর নিকট বিদায় লইতে যে গিয়াছেন, তাহা কোনমতেই বুঝিতে পারিলেন না—ঠিক যেন বিদেশ গমনের পূর্ব্বে কোন সুহৃদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন, এমনই বোধ হইল! এতদূর যে, মহারাজ ক্রমে যেন আরো আত্মীয়তা ও অধিক, প্রসন্নতা প্রদর্শন নিমিত্ত রাজভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাজি পর্য্যন্ত আনাইয়া আমোদ পূর্ব্বক ডুলীনকে দেখাইতে লাগিলেন। ইহাতেই এবং তাঁহার পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে রাজ-বদন হইতে অন্যের অবোধ্য গুটীকতক ইঙ্গিতাত্মক বাক্যবিন্যাস শ্রবণে ও ফকিরের নয়নভঙ্গীতেও ডুলীন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সদাশয় বন্ধু আজিজুদ্দিনের মুখে তাঁহার প্রকৃত জন্ম-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া এবং ডুলীন কর্ত্তৃক নিষ্প্রয়োজনেও সে পরিচয় প্রদানের সুমহৎ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া, মহারাজ মহা বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক বরং মহা সন্তুষ্ট ও অধিকতর অনুগ্রাহকই হইয়া উঠিয়াছেন। ইহাতে ডুলীনের হর্ষের সীমা রহিল না।

রত্ন-রাজির মধ্যে জগদ্বিখ্যাত "কহিনুর" নামা অনুপম সূর্য্যকান্ত মণি দর্শনে ডুলীন এককালে বিস্ময়াভিভূত হইলেন। মহারাজ সকৌতুক দৃষ্টির সাহচর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বোধ করি ডুলীন সাহেব, স্বদেশের রাজসংসারে এমন হীরক অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন?"

ডুলীন হস্তে লইয়া বহুক্ষণ সাভিনিবেশে নিরীক্ষণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে কহিলেন "মহারাজ! আমি যাহা বলিব, তোষামোদের কথা নহে—আমি তোষামোদ জানি না। অনেক রাজ্যে ভ্রমণ করিয়াছি, এককালে ধনশালীর সন্তানও ছিলাম, কিন্তু এমন অতুল্য হীরক, চক্ষে দেখা দূরে থাকুক, পৃথিবীতে কুত্রাপি

আর পাওয়া যায় বলিয়াও শুনি নাই!" মহারাজ মনে মনে যে মহা তুষ্ট হইলেন, তাঁহার উৎফুল্ল নয়নই তাহা প্রকাশ করিল।

প্রিয় পাঠক! কহিনুরের নাম আপনারা শুনিয়াছেন; তাহার ইতিহাসও অনেকের গোচর থাকিতে পারে, কিন্তু সকলের না—এই জন্যই এস্থলে দুই চারি কথা বলা আবশ্যক হইতেছে।

কহিনুর শব্দের মুখ্যার্থ—আলোক-গিরি। ভূমণ্ডলে এ পর্য্যন্ত যত হীরক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে কহিনুর যথার্থই আলোক-গিরি বটে! কহিনুর দৈর্ঘ্যে দেড়, প্রস্থে এক বুরুল। কহিনুর পূর্ব্বে দিল্লীর মোগল সম্রাট্‌গণের "ময়ূরসিংহাসনের" শিরোভূষণ ছিল—তৎপূর্ব্বে অবশ্যই আর্য্য-নৃপতিকুলকেই "স্বামীন্" বলিয়া ধন্য হইত! কিম্বদন্তি আছে, শত্রাজিৎ রাজা স্বীয় কন্যা সত্যভামার সহিত দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণকে যে মণিরাজ সমর্পণ করেন—যাহাকে লইয়াই মানহরণের উপাখ্যান—ইহাই সেই পৌরাণিক "স্যমন্তক মণি!" সে যাহা হউক, যৎকালে নাদিরশাহ কাবুল হইতে মহাপ্লাবনবৎ দুর্ভাগ্য আর্য্যাবর্ত্তে আগমন, আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া যায়, সেই কালে (খৃঃ ১৭৩৮ অব্দে) কহিনুরকেও হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। নাদিরের হত্যার পরে তদ্বংশজ সাসুজা নির্ব্বাসিতাবস্থায় তাহাকে সঙ্গে লইয়া স্বদেশ হইতে পলাইয়া ভারতে আইসেন! অতএব পঁচাত্তর বৎসর কাবুলে থাকিয়া আবার সুধাকার সম্পত্তি ভাগ্যে প্রত্যার্পও হইল।

সাসুজা বহুস্থান ভ্রমণান্তে ১৮১৩খৃঃ অব্দে পঞ্জাবে আসিয়া পঞ্জাবসিংহের সাহায্য ভিক্ষায় যখন তদ্দানে কাল হরণ করেন, তখন রণজিৎ সাহায্যদানের প্রতিদান স্বরূপ অন্যান্য বস্তুর মধ্যে কহিনুর চান। সাসুজা প্রথমে কিছুতেই তদ্দানে সম্মত ছিলেন না। অবশেষে রণজিতের ছলে বলে লাঞ্ছিত ও নিরুপায় হইয়া তাঁহার পদতলে "আলোক-গিরি" অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন; সাহায্যও পাইলেন না, কহিনুরও গেল! তদবধি সেই অসামান্য মণিরাজ, রণজিতের গর্ব্বমণি-রূপে পঞ্জাব রাজসভার প্রধান শোভা হইয়াছে! এখন, হায়! মহাসিন্ধু পারে পঞ্চ সহস্র ক্রোশান্তরে ব্রিটিস মুকুটে বিভাসিত হইতেছে—এবার যে আর জন্মভূমি দেখিতে পাইবে, সে আশা সুদূরপরাহত!

যদিও রণজিৎ এই সব তুলনা-রহিত রত্নাবলীর সংগ্রাহক ও অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সভার শোভা বা রাজপুরীর সৌন্দর্য্য তাদৃশ

বিস্ময়োৎপাদক বা মনোহর ছিল না। তখনকার বড় বড় রাজা, নবাব, বাদশাহ প্রভৃতি দূরে থাকুন, রণজিৎ অপেক্ষা অধিকাংশে নিকৃষ্ট শ্রেণীর ভূপালগণের সভাতেও পঞ্জাব-সিংহের অপেক্ষা বহুগুণে অধিক জাঁকজমক ও পারিপাট্য দৃষ্ট হইত। ফলকথা, রণজিৎ বিগ্রহ সন্ধি লইয়াই ব্যস্ত, শাসনকার্য্যেই রত, যুদ্ধ ব্যাপারে নিপুণ, নবাবী সখের দিকে বড় একটা যাইতেন না—যাহাকে সৌখিন বলে, তাহা তিনি ছিলেন না—অধিকাংশ বীরপুরুষই এইরূপ হইয়া থাকেন! সুতরাং রণজিৎ প্রায়ই সামান্য বেশ ভূষা ও সামান্য উষ্ণীষ মাত্রে সজ্জিত হইয়া সিংহাসনে বসিতেন। আভরণের মধ্যে কেবল এক ছড়া বহুমূল্য মুক্তার কণ্ঠি গলদেশে ধারণ করিতেন—কহিনুরকে কোন অসামান্য আড়ম্বরের প্রয়োজন ভিন্ন প্রায়ই শিরোভূষণ করিতেন না!

এ বিষয়ে তাঁহার পারিপার্শ্বিক মণ্ডলীর প্রায় সকলেই রাজানুকরণ করিতেন। সভাকুট্টিমে কেবল ধ্যানসিংহের পুত্র কুমার হীরা সিংহই(তৎকালে দশম বর্ষীয় বালক) মণি মুক্তাদামে খচিত থাকিতেন। তদ্ভিন্ন উচ্চ শ্রেণীর অন্যান্য তরুণগণকে কখন বা উচ্চ ধরণের বস্ত্রাভরণে ভূষিত দেখা যাইত মাত্র। কিন্তু হীরা সিংহের ন্যায় তাঁহারা নিয়মিতরূপে প্রত্যহ রাজসভায় বসিতেন না। হীরা সিংহ প্রতিনিয়তই মহারাজার সিংহাসন পার্শ্বে আসন পাইতেন।

এক্ষণে পুনর্ব্বার আখ্যায়িকার খেই ধরি।

মহারাজ এইরূপে নানামতে ডুলীনের সহিত আমোদ আহ্লাদ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ভাব দেখাইলেন। কিন্তু ডুলীন সে দিন যেন অন্যান্য দিনের ন্যায় পূর্ণ মাত্রায় প্রফুল্ল ও আমোদের ভাগী না হইয়া অপেক্ষাকৃত অধিকতর গাম্ভীর্য্য ভাবের বশবর্ত্তী। তদ্দর্শনে মহারাজ হাস্যমুখে ফকিরজীর প্রতি কহিলেন, "সাহেব যেন ঠিক আ'জ্ দণ্ড গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন!"

ডুলীনের চমক হইল। আস্তে ব্যস্তে নম্রভাবে উত্তর দিলেন "মহারাজের বাক্য অপ্রকৃত নয়, কিন্তু অধীনকে মার্জ্জনা করিবেন—অধীনের শিরে পূর্ব্বে কোন ভার ছিল না—কেবল একটী অশ্ব ও একখানি অসির যত্ন করিতে পারিলেই প্রাত্যহিক কর্ত্তব্যের পর্য্যবসান হইত, কাজেই চিত্তেরও লঘুতা ছিল! সেই নির্ব্বান্ধব নিঃসহায়কে মহারাজ উন্নত করিয়া তৎপ্রতি গুরু ভারার্পণ করিয়াছেন—অধীনকে এখন বহু জনের ও বহু বিষয়ের জন্য ভাবিতে দিয়াছেন, আর কি এখন সে পূর্ব্বের মত হাসিয়া কাল কাটাইতে পারে?"

মহারাজ হাসিয়া বলিলেন "সরকারের জ্ঞানী চাকরের যোগ্য কথা বটে—কিন্তু তবু দুলীন, তোমার এ চিন্তা যেন অসাময়িক—সময়ের বহু পূর্ব্বে—এখনও ঘোড়ার রেকাবে পাও দেও নাই, এখনি শাসনকর্ত্তার গাম্ভীর্য্য কেন? যা হউক, এতেও আমি সন্তোষ পাইলাম—বুঝিলাম উপযুক্ত হস্তেই ভার ন্যস্ত করিয়াছি!"

দুলীন দেখিলেন, এই কথায় সভামধ্যে কাহারো কাহারো ঠোঁট-উল্টানি ঘটিল—রিষের বিষে ভরা ঠারা-ঠুরিও চলিতে লাগিল! দুলীনও তাহাদিগের প্রতি সাহঙ্কার দৃষ্টিপাত করিলেন এবং হিংসার স্পষ্ট অভিনয় দেখিয়া প্রতি-হিংসার সাধ একটু না মিটাইয়া থকিতে পারিলেন না—তজ্জন্য ইঙ্গিতার্থক এই ভাবের কথাটা বলিলেন যে, "আশ্রয়দাতা প্রতিপালক প্রভুর সমক্ষে অধীন জনের বশ্যতা প্রদর্শনই কর্ত্তব্য ও সুখজনক, কিন্তু রাজ-গোচরেও গৃধ্রের প্রতি বায়সকুলের দ্বেষ-ভাব-প্রকাশ যেমন কৌতুকাবহ, তেমনি দুঃখজনক!"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রণজিৎ স্বীয় সভাসদ ও কর্ম্মাধ্যক্ষগণের মধ্যে বিবাদ বিতণ্ডার রঙ্গ দেখিতে ভাল বাসিতেন এবং তাহাতে উৎসাহ দিয়া তাহাদিগের ভাবাভিপ্রায় বাহির করিবার কৌশলেও সম্পূর্ণ কুশলী ছিলেন, দুলীনের ঐ তীব্র ব্যাঙ্গোক্তির তাৎপর্য্য গ্রহণে তাঁহার তিলার্দ্ধও কাল-বিলম্ব হইল না। বিবাদ বাঁধাইবার এমন সুযোগ কি তিনি ছাড়িবার লোক? অতএব কপটে যেন দুলীনের বিরুদ্ধে পারিষদগণের সপক্ষতায় কহিলেন, "আমার সভায় সব উত্তম লোক, দুলীন, সব যোগ্য লোক!"

রাজ-বদন হইতে এই কথাটী নির্গত হইতে না হইতেই খোসাল সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র তেজ সিংহ নামা জনৈক মহা স্থূলকায় সর্দ্দার সক্রোধে ও সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল "আজ্ঞা হাঁ, এ সভার সভাগণের নানারূপ যোগ্যতা আছে—বিশেষতঃ স্বদেশে যারা গাধা খচ্চরও চড়িতে পায় না, এদেশে আসিয়াই মস্ত ঘোড়সওয়ার হইয়া উঠে, এমন উদ্ধত অশ্বচালককে পদতলে দলিত করিতে পারে, এ সভায় তেমন লোক বিস্তর আছে!"

এই বাক্যে শত্রুপক্ষে বৃহৎ একটা হাসি পড়িয়া গেল। দুলীনও সেই হাস্য-তরঙ্গে যোগ দিয়া সদর্পে বলিলেন—

"কিন্তু যুদ্ধকালে যে শৃগালের ন্যায় পিছু হটে, অথচ সভায় বসিয়া ভুঁড়ি

নাড়িয়া বৃথা বীরত্বাভিমানে গর্ব্ব করে, আমি তেমন অকর্ম্মণ্য ভীরু অশ্বারোহীকে আমার দেশের সেই গাধায় চড়াইবারও যোগ্য বিবেচনা করি না! তেমন স্থূলোদর লোক নিত্য যেমন গোগ্রাসে চাপাটি গিলে, সেই প্রণালীতে স্বীয় ভল্ল তাহার মুখে পূরিয়া যথার্থ বীরত্বের ভাব কিছু শিখাইতে পারি!"

এই কথায় ঐ অতিকায় তেজ সিংহ মহাতেজে উঠিতে উদ্যত, মহারাজ স্থির থাকিতে আদেশ করিলেন। এই ঘটনায় কতিপয় সুবিজ্ঞ প্রধান সর্দ্দার, বিশেষতঃ লেনা সিংহ মাজিতা * এবং আতর সিংহ † মহারাজের অনর্থকারী রঙ্গপ্রিয়তা সম্বন্ধে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। ফকিরজী ও ধ্যান সিংহ উভয়েই ঐ প্রসঙ্গ উড়াইয়া দিয়া অন্য কথা পাড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ অন্য প্রসঙ্গে কথোপকথনের পর দুই চারি স্নেহময় শিষ্টাচারের বাক্যে ঢুলীনকে বিদায় দিয়া মহারাজ গাত্রোত্থান করিলেন; ঢুলীন রোক শোধ পাইলেন; সভা ভঙ্গ হইল; সকলেই স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন।

ঢুলীনের সে দিন আর যাত্রা হইল না, সবাহিনী সেই স্কন্ধাবারেই যামিনী যাপিত হইল। রজনীতে চাঁদ খাঁ অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত ভাবে সাহেবের শিবিরে গিয়া গোপনে এক খানি পত্র প্রদান করিল। ঢুলীন পড়িয়া দেখিলেন, লিপি খানিতে প্রসিদ্ধ লেনা সিংহের স্বাক্ষর—রাজসভায় তেজ সিংহ সম্বন্ধীয় ঘটনা-মুহূর্ত্ত হইতে লেনা সিংহ ঢুলীনের বন্ধু হইয়াছেন। পত্রের মর্ম্মার্থ এই;—"কোট কাংরা অধিকার সহজে হইবে না; বিঘ্ন, বাধা, বিপক্ষতা প্রবলরূপেই সম্ভব।" এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংবাদের আভাসাদি লিখিয়া লেনা সিংহ শেষে এই আশাপ্রদ ও সুখপ্রদ বাক্যে উপসংহার করিয়াছেন যে, "তখন আপনি লেনা সিংহকে একজন বন্ধু বলিয়া জানিতে ও পাইতে পারিবেন!"

ঢুলীনের এই নব বন্ধুর বিশেষ পরিচয় পরে দিব; আপাততঃ বিজ্ঞাপ্য যে, তিনি বিদ্বান্, বীর ও ধার্ম্মিক। তাঁহার ন্যায় মনুষ্য শিখ সমাজে অতি অল্পই পাওয়া যাইত—তিনি নানা গুণে সর্ব্ব স্থানেই গণ্য মান্য ছিলেন।

* লেনা সিংহ মাজিতা—সমস্ত শিখের মধ্যে বিজ্ঞানশাস্ত্রজ্ঞ, জ্যোতির্ব্বিদ, পদার্থ তত্ত্ববিদ, সম্ভ্রান্ত, সদাচারী, সুসভ্য এবং বহু গুণান্বিত ছিলেন।

† আতর সিংহ—মহারাজার পিতৃব্যপুত্র। শুদ্ধ সেই কারণেই যে রাজ সভায় এবং সর্ব্বত্র পূজ্য ছিলেন, এমন নয়—স্বভাব, চরিত্র, বিজ্ঞতা, ইত্যাদি সর্ব্ব বিষয়ে তিনি শিখজাতির আদর্শস্থল হওনের যোগ্য ছিলেন।

কৃতজ্ঞতা সৌজন্যতা-ব্যঞ্জক প্রত্যুত্তর প্রেরণের পর চাঁদ খাঁর সহিত বিস্তর কাজের কথা হইয়া পরস্পরে বাষ্পাকুল নয়নে বিদায় লইলেন। প্রত্যুষে ক্যাংরা যাত্রা। কিন্তু প্রত্যুষেও চাঁদ খাঁ আর একবার দেখা করিয়া শেষ বিদায় লইল।

আখ্যায়িকার দ্বিতীয় কাণ্ডও পাঠকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল!

তৃতীয় কাণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যাত্রা।

সূর্য্যোদয়ের কয়েক দণ্ড পূর্ব্বেই যাত্রা হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সৈনাপত্য বিষয়ে নন্দসিংহ প্রধান সহকারীত্ব-পদ-লাভে সমর্থ হইয়াছে, সুতরাং দুলীনের আজ্ঞানুসারে নন্দেরই দ্বারা ও তাহারই নামে, যে প্রণালীতে কুচ হইবে, পূর্ব্ব রাত্রে তাহার পরওয়ানা বাহির হইয়াছিল। কিন্তু সম্যগ্রূপে আদেশ পালিত হয় কিনা, তাহার তত্ত্ব লইতে বন্নু, ধন্নু প্রভৃতি বিশ্বাসী কর্ম্মচারিগণের প্রতিই গুপ্ত উপদেশ ছিল।

দুলীন নিজেও এরূপ আয়াস ও তৎপরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সমুদয় সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দিলেন যে, প্রথম দিবসেই আলিবর্দ্দি প্রভৃতি হিতেচ্ছু পক্ষ মহা পুলকিত, মহা উৎসাহী এবং নন্দ সিংহ প্রভৃতি প্রতিকূল পক্ষের মুখ মলিন হইল!

বাহিনীর গমন কালীন বিভাগ এবং গতি-রীতি এইরূপ হইল;—সর্ব্ব প্রথমে অতি বিশ্বাসী একদল দ্বিশত সংখ্যক অশ্বারোহী—(Van'gaurd) "অগ্রণী রক্ষক।" তৎপরে ল্যান্সার নামা অশ্বারোহী রেজিমেণ্ট; পরে খোসালের পদাতিক; পরে ছয়টী কামান; তৎপশ্চাতে দুলীনের নিজের নব প্রস্তুতীকৃত পদাতিক; পরে নিজের অশ্বারোহী; তৎপরে নন্দ সিংহের অধীন ল্যান্সার দল; সর্ব্বশেষে নিজের বিশ্বাসী দ্বিশত সংখ্যক অশ্বারোহী। দুলীন যখন যেখানেই থাকুন, চাঁদ খাঁর প্রদত্ত পঞ্চাশ এবং পূর্ব্বসহচর অশ্বারোহিগণ তাঁহার নিজের শরীর-রক্ষী রূপে সর্ব্বদা সমীপবর্ত্তী থাকিত—আলিবর্দ্দি এবং বন্নু ও ধন্নু তাহাদের কর্ত্তা।

কয়েক দিবস নির্ব্বিঘ্নে গমন হইল। শিখদিগের উৎসাহ ও প্রফুল্লতা

দর্শনে দুলীন পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। বিশেষতঃ নন্দের ভাব নিতান্তই পরিবর্ত্তিত; তদ্দর্শনে আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল। কুচের সময় নন্দ সিং দুলীনের নিকট মধ্যে মধ্যে আসিয়া পার্শ্বাপার্শ্বি অশ্বচালন পূর্ব্বক নানা কথার আলাপে ও পরামর্শে প্রবৃত্ত হইত; এক তিলের তরেও সাহেবের প্রতি যথোচিত মান দানে ক্রটি করিত না—যাহাতে সৈন্য মধ্যে কোন গোল না হয়, যাহাতে সাহেবের বিশেষ কোন কষ্ট না জন্মে, যাহাতে সুখ স্বচ্ছন্দে আমোদ প্রমোদে ঐক্যবাক্যে গমন ঘটে, নিয়ত এইরূপ চেষ্টাতেই রত!

উচ্চ-নীচ-পদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারিগণ ও সেনাব্যূহ ক্রমেই নব শাসনকর্ত্তার সাহস, দয়াদাক্ষিণ্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দার্ঢ্য এবং ন্যায়ানুরাগাদি বিবিধ সদ্গুণের যতই পরিচয় পাইতে লাগিল, ততই তাহারা (প্রায় সকলেই) ভয়, ভক্তি, প্রীতি, বাধ্যতা প্রভৃতি অনুরক্ত অনুচরের লক্ষণ সমূহ প্রদর্শন করিতে লাগিল। যদি শতবিধ বিভিন্ন জাতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মাশ্রিত মানবসংঘ একজনের অধীন থাকে, আর সেই কর্ত্তা যদি দয়া বাৎসল্যের সাহায্যে প্রভুত্ব করিতে জানেন, তবে কে বলিবে যে, তাহারা এক জাতীয় এক ধর্ম্মাক্রান্ত একপ্রাণ নয়? কিন্তু যাহার কর্ত্তৃত্ব প্রয়োগ ও কর্ত্তব্য সাধনের সঙ্গে স্নেহ-"লবণ" নাই, তাহার সাহস, বীর্য্য, জ্ঞান, উচ্চবংশোৎপত্তি, অতুল ঐশ্বর্য্যাদি সকলই বিস্বাদ বলিয়া বোধ হয়—সে কর্ত্তা আপন সহোদরকেও বশে রাখিতে পারে না, অন্য পরে কা কথা!

আমাদের প্রিয়বন্ধু অবশ্যই উচ্চ আর্য্যবংশীয়; দৈহিক সৌন্দর্য্যে অনুপম; সাহস বীর্য্যে অদ্বিতীয়; সভ্যতম দেশে সুশিক্ষিত; দয়াময় সভ্য পিতা-মাতার যত্নে পালিত; চরিত্র, অত্যুন্নত সদাদর্শে গঠিত; ইউরোপীয় সুপ্রণালীতে রণবিদ্যায় দীক্ষিত; এ সব হইয়াও তাঁহার হৃদয় যদি ন্যায়পরায়ণ ও করুণা-সুধাভিষিক্ত না থাকিত, তবে কিছুতেই কিছু হইত না—ঐ সমস্ত গুণের সহিত এই দুইটী জড়িত হওয়াতে সোনায় সোহাগার ন্যায় কি অপূর্ব্বই হইল—মানব জাতির মনোরঞ্জন ও ভক্তি আকর্ষণ পক্ষে তেমন আর কি হইতে পারে? যে কোন জাতীয়, যে কোন প্রকৃতির মনুষ্যই হউক, এমন অধিনায়ক লাভে অবশ্যই মনের অনুরাগে গলিয়া যাইবে—অবশ্যই তাঁহার হস্তে কুম্ভকারের কর্দ্দমের ন্যায় হইবে—তিনি তাহাদিগকে যেরূপ ইচ্ছা, তদ্রূপ গঠনেই গড়িতে পারিবেন!

সুতরাং অল্পকাল মধ্যে বাহিনীর অধিকাংশ লোকই যে তাঁহার একান্ত বশম্বদ ও নিতান্ত অনুগত হইয়া উঠিল, একথা প্রকাশ করিয়া বলাই বাহুল্য! তবে যেখানে সূর্য্যালোক, সেখানেই ছায়া—যেখানে গোলাপ, সেখানেই কাঁটা—যেখানে সাধারণ নিয়ম, সেখানেই ব্যতিরেক—যেখানে গুণ, সেখানেই হিংসা! অতএব কতিপয় খল ব্যক্তি মনে মনে যে তাঁহার বিদ্বেষী ছিল, তাহাও অস্বাভাবিক নয়!

তাহারা সংখ্যায় ক্ষীণ, যোগ্যতায়ও দীন, কেবল অনিষ্ট সাধনের ক্ষমতায় তত হীন নয়; যেহেতু দরবারে তাহাদের পোষক ও রক্ষক রূপে ক্ষমতাপন্ন আত্মীয় লোক আছে। তথাপি তাহারা প্রকাশ্যে হিংসা-রাক্ষসীর পূজা করিতে সাহসী হইতে পারিত না—ডাকাইতদের ন্যায় অমা-নিশা খুঁজিয়া বেড়াইত! তাহারা ছিদ্রদর্শী, ছলান্বেষী, গুপ্ত-আঘাত-প্রয়াসী! বলা বাহুল্য যে, নন্দসিংহই গোপনে গোপনে এই দলের সৃষ্টি ও পুষ্টিকারক!

এই সময় সাহেবের একটা কার্য্যে তাহারা ছিদ্র পাইল। কার্য্যটী যারপর নাই সৎ, কিন্তু অসৎ লোকের ছিদ্রান্বেষণ সৎকর্ম্মের মধ্যেই অধিক হইয়া থাকে। তুলীনের সে কার্য্য, নিতান্তই প্রতিষ্ঠার যোগ্য—ধন্যবাদের উপযুক্ত; তথাপি হিংস্রস্বভাব নীচাশয় দুষ্টগণ মনে করিল, তাহাদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করণ পক্ষে এই এক বিশেষ সুযোগ—এইবার এই উপলক্ষে সাহেবকে অপদস্থ ও বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার উত্তম সুবিধা হইল!

কার্য্যটী আর কিছুই না—কুচের সময় সৈনিকগণ কর্ত্তৃক প্রজাবর্গের প্রতি যে নানাবিধ দৌরাত্ম্য আচরণের প্রথা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তন্নিবারণ! তৎকালে রাজ-সৈন্যের সচল স্কন্ধাবার যখনই কোন হট্টে, বাজারে, গঞ্জে, খামারে বা গ্রামে যাইয়া পড়িত, তখনই মূল্যদান ব্যতীত দলস্থ সমুদয় মনুষ্য ও পশুর আহার্য্য সামগ্রী গ্রামপতি, ব্যবসায়ী ও অধিবাসিগণের নিকট ছলে বলে কৌশলে গ্রহণ করা হইত। সেনাপতিরা পরওয়ানা জারি দ্বারা লইতেন এবং তাঁহাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সামান্য সৈনিক পর্য্যন্ত সকলেই স্বেচ্ছামত গ্রহণ (বা লুণ্ঠন) করিতে ত্রুটি করিত না!

তুলীন সে রীতি এককালে রহিত করিয়া দিলেন। সৈন্যমধ্যে প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা ছোট বড় সকলকেই জানাইলেন, যে কেহ কোন দ্রব্য লইয়া তাহার উচিত মূল্য না দিবে, তাহাকে দণ্ড পাইতে হইবে—কোন আপত্তি

খাটিবে না। শুদ্ধ ঘোষণা নয়, প্রত্যহ ছাউনির পর বিশ্বাসী চর দ্বারা কেহ সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন দোষে দোষী হইল কি না, তদনুসন্ধান লইতে এবং তদ্রূপ অপরাধীকে দণ্ড দিতে লাগিলেন।

তাঁহার হিংসাকারী দুর্জ্জনেরা এই সূত্র পাইয়া বাহিনী মধ্যে অসন্তোষ-বহ্নি উৎপাদন নিমিত্ত গোপনে গোপনে কুমন্ত্রণা দিতে লাগিল। তাহাদের দুরভিলাষ সংপূরণের পক্ষে ইহা একটী সম্পূর্ণ সুযোগ সন্দেহ নাই; কেননা তদ্রূপ লুণ্ঠন তৎকালের সৈনিকগণ আপনাদের ন্যায্য বৃত্তি বলিয়াই জানিত; বিশেষতঃ যে কাজ বিনা-অর্থ-ব্যয়ে অনায়াসে সম্পন্ন হইত, তজ্জন্য গাঁটের কড়ি খরচ করিতে কাহার বা প্রবৃত্তি হইতে পারে? কাহারই বা কষ্ট না হয়? তৎ-সম্বন্ধে ফুস্‌লাইলে কেই বা তাহাকে উচিত বক্তা ও স্বপক্ষ না ভাবে? এবং ভাবিয়া তাহার দলে মিলিতে না চায়?

বিদ্রোহানল প্রজ্বলনের এই যে চেষ্টা হইতেছে, তুলীন অল্পতেই অর্থাৎ সে অগ্নি অনিবার্য্যরূপে প্রদীপ্ত ও বিস্তৃত না হইতেই তাহার সন্ধান পাইলেন। তাঁহার নানা গুণে নানা শ্রেণীর লোক মনে প্রাণে তাঁহার প্রতি সমাকৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতেই কতক নিস্তার; নচেৎ অপ্রিয় সেনাপতি হইলে অত্যল্পকালে অতি অল্পেতেই দুরাত্মারা সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারিত।

তথাপি স্বার্থ এমনি ভয়ানক পদার্থ যে, তৎপ্রভাবে লোকে অন্ধপ্রায় হয়। সেই তো আশঙ্কা! কিন্তু শত্রুদল যেমন সেই ঘোর সংক্রামক রোগের ব্যাপ্তি পক্ষে গোপনে গোপনে আয়াস পাইতেছিল, এ দিকে তেমনি সাহেবের একান্ত হিতেচ্ছু ও অনুগত প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হইতে নিম্ন কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সচ্চরিত্র নিরমগুণী মাত্রেই স্ব স্ব আত্মীয়, আশ্রিত ও অধীন জন-সমূহকে সাহেবের মহদাভপ্রায় প্রকাশ্যরূপে প্রতিনিয়ত স্পষ্ট বুঝাইয়া দিতেন।

ক্রমে বহু লোক বুঝিল। যখন পরস্পরে এ বিষয়ের আলোচনা বা বাদানুবাদ হইত—তাহাও সর্ব্বদাই—তখন বহু বদন হইতে এমন কথাও শুনা যাইত যে, "ভাই, আর সব কথা ছেড়ে দেও, মোটামুটি এইটীই কেন বুঝ না, যিনি এত গুণে গুণমণি—যে সাহেব আমাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য এক তিলও আপনার সুখ দুঃখকে গ্রাহ্য করেন না—যিনি যথার্থই দয়ার সাগর—যিনি সামান্য একজন সৈনিকের অসুখ দেখিলেও অসুখে বাঁচেন

না, হাকিমের সঙ্গে আপনি গিয়া রোগীদের তদারক করেন,–তিনি কি বিশেষ কারণ ভিন্ন খামকা যাতে আমাদের অসুবিধা ঘটে—যাতে আমাদের লাভের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে, এমন কাজ করিতে পারেন? এ হুকুমে বরং তিনি যে ন্যায়বান আর পরম ধার্ম্মিক, তাই বুঝাইতেছে। আরো শুনিতেছি, আমাদের যে লোকসান হইবে, তিনি নাকি কোট কাংরায় কিছু দিন স্থিত হইবার পর, তাহার পূরণ স্বরূপ আমাদিগকে পুরস্কার দিবেন;" ইত্যাদি।

ডুলীন আর এক উত্তম কৌশলে এই অতুষ্টিকে পরিপুষ্ট ও দীর্ঘস্থায়ী হইতে দিলেন না—সন্ধান পাইবার অনতিবিলম্বে একদা এক বিস্তীর্ণ শ্যামল দূর্ব্বাদল-পূর্ণ রমণীয় মাঠ মধ্যে সমগ্র বাহিনীকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে মণ্ডলাকারে স্তবকে স্তবকে দাঁড় করাইয়া আপনি তন্মধ্যস্থলে একটা অনতি-উচ্চ মৃত্তিকা স্তূপের উপরি দণ্ডায়মান হইলেন; প্রধান কর্ম্মচারী ও সহকারিগণ সকৌতুক অথচ সচিন্তিত বদনে এবং সোৎসুক নয়নে তাঁহার পার্শ্বে ও পশ্চাতে অবস্থিতি করিলেন। সকলেই সোৎসুক, অথচ নীরব—নিস্তব্ধ—আশান্বিত। দৃশ্যটী কি মনোহর—কি গম্ভীর—কি গুরু ভাবাত্মক! সময়টী সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে—বহুদূরে জলধরপটলবৎ পর্ব্বতমালা ও নিকটে বনভূমি দৃষ্ট হইতেছে—সেকালে যদি ফটোগ্রাফ বিদ্যার প্রচলন থাকিত, তবে তৎসাহায্যে কি বিচিত্র চিত্রই উঠিত!

ডুলীন সুপরিষ্কার মধুমিশ্রিত উচ্চস্বরে একটী সহজ-যুক্তি-পূর্ণ সারগর্ভ ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলেন। পূর্ব্বরীতির অবৈধতা এবং স্ব-প্রচলিত নিয়মের ঔচিত্য ও উপকারিত্ব এমন সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, তচ্ছ্রবণে পূর্ব্বকার অসন্তোষের পরিবর্ত্তে মহা সন্তোষ এবং নূতন আজ্ঞা পালনের আগ্রহে প্রায় সর্ব্বজনের মন মাতিয়া উঠিল! সেই সদ্বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"যাহারা রক্ষক, তাহারাই যদি এইরূপে ভক্ষক হয়, তবে কি সে রাজ্যের প্রজাবর্গ সুখে থাকিতে পারে? সৈনিক কুচ তো সর্ব্বদাই ঘটে, তবে সর্ব্বদাই এই সর্ব্বনেশে প্রথানুসারে প্রজার দ্রব্য লইলে দীন দুঃখী প্রজাদের বিষয় কত যে এত লুঠের পরও তাহাদের খাওয়া পরা স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে? তাহারা কি ক্রমান্বয়ে এই দৌরাত্ম্য সহিয়া নিতান্ত সম্বলহীন—গ্রাসা-

চ্ছাদনে বঞ্চিত হইয়া পড়ে না? এ অত্যাচার সহ্য করিতে না হইলে তাহারা কি এত দিনে সঙ্গতিপন্ন সুখী প্রজা হইত না?

"তোমরা কি কোম্পানি বাহাদুরের শাসন-পদ্ধতি শুনিতে পাও না? তাঁহাদের যিনি বড় সাহেব—যিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা, তিনিও বিনা মূল্যদানে কোন প্রজার একগাছি তৃণ পর্য্যন্তও লইতে সক্ষম নন। তাঁহাদের কুচের সময় কোন কর্ণেল, কোন কাপ্তেন, কি কোন সিপাহির এমন সাধ্য নাই যে, তাহারা মালিকের সম্মতিভিন্ন একটী সামান্য দ্রব্যও লইতে পারে! যে লয়, তখনই তাহাকে বেড়ি পায় পরিয়া মেয়াদ খাটিতে হয়! কেননা এরূপে দ্রব্যাদি গ্রহণের নাম লুঠ—লুঠও যা চুরিও তা—এরূপ লুঠ, চুরি হইতেও গুরুতর দোষ; ইহা প্রকৃতই দিনে ডাকাতি!

"লুঠ কোথায় করা উচিত? বিজিত শত্রুর সম্পত্তিই লুঠের বস্তু। প্রজারা কি তোমাদের শত্রু? প্রজাদের ন্যায় সুহৃৎ আর কে? তাহারা রাজস্ব দেয়; সেই রাজস্ব পাইয়াই মহারাজা তোমাদের প্রতিপালন করেন! তাহারা মহারাজার পরম হিতৈষী—মহারাজার প্রয়োজন হইলে প্রাণ দিয়াও সেবা সাহায্য করে! তোমরাই বা কে? তোমরাও কি সেই প্রজা শ্রেণীর মধ্য হইতে আইস নাই? তাহারা আর তোমরা কি ভিন্ন? তাহাদের বস্তু হরণ করা কি তোমাদের নিজের বস্তুর অপচয় নয়? আ'জ্ তোমরা সৈনিক, কা'ল্ তোমরা প্রজা ছিলে—আবার আগামী কল্য হয় তো সেই প্রজাই হইবে! মনে ভাবিয়া দেখ দেখি, যদি কোন কারণে তোমাদের আর এ কর্ম্মে রাখিবার জন্য মহারাজার প্রয়োজন না হয়, তবে কি যাহা বলিলাম তাহা ঘটিবে না? মনে কর, এই তাঁবুর পরিবর্ত্তে আবার তোমরা গ্রামবাসী চাষী কি ব্যাপারী হইলে; মনে কর, তখন এক দল রাজ-সৈন্য তোমাদের গ্রামে পড়িয়া তোমাদের দ্রব্য সামগ্রী যথেচ্ছাচারে কাড়িয়া লইল; ধ্যান করিয়া দেখ দেখি তখন তোমাদের দশাটা কি হয়? তখন তোমাদের প্রাণটাই বা কেমন হয়? আর কি তখন সেই সৈনিকগণকে স্বদেশীয় ভাই বলিয়া ভালবাসিতে এবং রক্ষক বলিয়া মান্য করিতে প্রাণ চাহিবে? আর কি তখন মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিতে ইচ্ছা হইবে? আর কি তাঁর জন্য প্রাণ দিতে তখন তোমাদের প্রবৃত্তি হইতে পারিবে? অতএব প্রিয় বৎসগণ! আপনাদের সেই অবস্থার কষ্ট মনে মনে কল্পনা করিয়া

পরের সেই অবস্থায় কত দুঃখ হইতে পারে, সেইটাই অনুভব করিয়া—করিয়া পরের দুঃখে দুঃখী হইতে অভ্যাস কর—তোমরা সে অবস্থায় যে কাজে অসন্তুষ্ট ও সর্ব্বস্বান্ত হইতে, তেমন নিষ্ঠুর ব্যবহারে স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় ভ্রাতাগণকে কদাচ জ্বালা যন্ত্রণা দিও না—তেমন হিতৈষী স্বদেশী ভাই বন্ধুগণকে সামান্য স্বার্থ লোভে শত্রু করিয়া তুলো না! নিশ্চিত জানিও, তাহাতে বড় অধর্ম্ম—বড়ই মর্ম্মচ্ছেদ—বড়ই সুহৃদ্ভেদ—বড়ই আত্মবিচ্ছেদ ঘটে! তোমরা আমার প্রাণাধিক প্রিয় জন, আমি কি বিশেষ কারণ ভিন্ন তোমাদের ক্ষতি করিতে পারি? আমি কি শক্তি সত্ত্বে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তোমাদিগকে তেমন নিদারুণ অপরাধের কর্ম্মে লিপ্ত হইতে দিতে পারি? আমার ক্ষমতা আর প্রাণ থাকিতে তো নয়! ইহা আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, কিছু-তেই অন্যথা হইবার নয়!

"আমি আর অধিক বলিতে চাহি না। ভরসা করি, যাহা বুঝাইলাম, তাহাতে আ'জ্ হইতে আমার বাহিনীর এক প্রাণীও সেরূপ কুৎসিত ডাকাতি কাজে আর লিপ্ত হইবে না—ভরসা করি, প্রত্যেকের ব্যবহারে এ বিষয়ে আমি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিতে পারিব—ভরসা করি, যে সুনিয়ম প্রচলন করিয়াছি, আ'জ্ তাহার মহদভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সকলেই আন্তরিক ইচ্ছার সহিত সেই আজ্ঞানুসারে চলিবে. আর যেন একজনকেও সেই আদেশ লংঘনের জন্য আমাকে দণ্ড দিতে না হয়!

"কিন্তু যদি এত বুঝানোর পরেও এই সৈন্য মধ্যে এমন হতভাগা নির্ব্বোধ কেউ থাকে যে, সে এই সকল সৎকথা ও সদুপদেশ অবহেলন পূর্ব্বক কুতন্ত্রী লোকের কুমন্ত্রণা শুনিয়া তাদের সঙ্গে চক্রান্ত করিয়া বেড়ায়, অথবা এ নিয়মে অণুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করে, তবে সে যেন নিশ্চিত জানে যে তাহার সর্ব্বনাশ অতি নিকট—এবার আর পূর্ব্বের ন্যায় অল্প দণ্ডে সে পার পাবে না—এবার এমন সাজা দিয়া বিদায় করিব যে, মরণ পর্য্যন্ত তাহা আর ভুলিতে পারিবে না! আমার চক্ষু শত দিকে অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে, দুষ্ট দুরাশয়েরা যেন তাহাও স্মরণ রাখে! কিন্তু ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি এবং আবার এই শেষকালেও ভরসা করিতেছি, তাহাদের যেন অদ্যাবধি সদ্বুদ্ধিই হয়!"

সেনাপতির মুখে এরূপ বক্তৃতার ফল চিরকালই উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে—

এরূপ সুমোহের নিস্তব্ধতা মধ্যে প্রভুর সদ্ভাবময় উত্তেজক উক্তি শুনিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সৈনিকগণ চিরদিনই অবিচার্য্যরূপে তাহার আরো বশীভূত হইয়া পড়ে—তিনি যে দিকে যে পথে চালাইবেন, মন্ত্রপ্রায় সেই দিকেই যায়—গর্হিত গন্তব্য পথ হইলেও যায়! কত সেনানায়ক এই উপায়ে স্বদেশের স্বাধীনতাকেও স্বীয় পদতলে দলিত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

যখন এতদূর হইতে পারে, তখন মহাত্মা ডুলীন যে স্বীয় স্নেহাধীন সুশাসিত সুবাধ্য সৈনিকপুঞ্জকে লুঠ-রাহিত্যরূপ নিঃস্বার্থমূলক সৎসংকল্পে সম্মত করিতে সমর্থ হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? তাঁহার বক্তৃতা সমাপ্ত হইবা মাত্র বারত্রয় উল্লাস ও উৎসাহজ্ঞাপক ভীষণ জয়ধ্বনিতে গগনমণ্ডল নিনাদিত হইল—"জয় ডুলীন সাহেবকি জয়!" তৎপরে শিখদিগের কণ্ঠ হইতে যুগপৎ "গুরুজীকো ফতে!" ইত্যাদি বিরাট শব্দ সেই বিশাল প্রান্তরকে যেন কম্পিত করিয়া তুলিল!

বক্তৃতাকালে চৈতন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হা করিয়া শুনিতে (কি গিলিতে) ছিলেন! উষ্ণীষের নিম্নে কর্ণোপরি কলম, এক হস্তে কাগজ, এক হস্তে দোলাভাবে রজ্জুবাঁধা মস্যাধার! মানস ছিল, লিখিবেন; বিস্ময়ে আর হর্ষে পারিলেন না; কিন্তু ছাউনিতে সমস্ত রাত্রি সে কাজ হইল!

সেই দিন হইতে সাহেবের প্রতি সর্ব্বজনের আন্তরিক অনুরাগ আরো বাড়িল; লুঠ-রাহিত্য জন্য পূর্ব্বে যে কিছু বিরাগ-ভাব জন্মিয়াছিল, তদ্দিনাবধি তৎপরিবর্ত্তে বরং শ্রদ্ধা ভক্তির আধিক্যই দাঁড়াইল! বিশেষতঃ শুদ্ধ বক্তৃতা নয়, ডুলীন কাজেও সুবিধান করিলেন। অর্থাৎ ইংরাজী কমিস্তেরিয়েটের দৃষ্টান্তানুসারে রসদাদির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াতে সেই দিন হইতে আর কোন গোলই হইল না—প্রত্যহ ছাউনির স্থান অধিকার করিবা মাত্র গো, অশ্ব, উট, মনুষ্য প্রভৃতির স্বাভিমত আহার্য্যাদি প্রচুর পরিমাণে সুব্যবস্থাতে মিলিতে লাগিল, অথচ দ্রব্য সমূহের বিনিময়ে যথোচিত মূল্য পায় নাই, এমন কথা কোন বিক্রেতা—কোন সংগ্রাহক—কোন গ্রাম ও গঞ্জবাসী বলিতে পারে নাই!

ফল কি হইল? অন্য সর্দ্দারের কি স্বয়ং মহারাজারও ভ্রমণ কালে কে সব লোক দ্রব্যজাত লুক্কায়িত রাখিতে কত উপায়, কত মন্ত্রণা, কত প্রতারণা

করিতে বাধ্য হইত, অথবা নানা ছল করিয়া দ্রব্যাদি সহিত স্থানান্তরে পলাইয়া যাইত, এখন তাহারা আপনা হইতে নানা জাতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনিয়া ছাউনিতে উপস্থিত করিতে লাগিল—সৈনিকগণ যাহার যাহা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে প্রাপ্ত হইয়া লুটের সময়াপেক্ষা শতগুণে বেশী সুখী হইল! তদঞ্চলে রব উঠিল, এমন বরাভয়-দাতা সৈনিক কুচ বহুকাল দৃষ্ট হয় নাই!

প্রদেশে ডুলীনের নামে ধন্যধ্বনির স্রোত প্রবাহিত হইয়া ক্রমে রাজসিংহাসন পর্য্যন্ত প্লাবিত করিল! সে স্রোতে সদাশয় বন্ধুগণের মনঃমীন সুখে সন্তরণ করিতে লাগিল, সেই সঙ্গে ঈর্ষানক্র ও হিংসামকর শিকারান্বেষণে প্রবৃত্ত রহিল!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা।

শিবির স্থাপন আর গমন—ছাউনি আর কুচ—ভোজন, শয়ন, আমোদ! প্রথম দুই চারি দিবস নিয়মিতরূপে ইহাই চলিবার পর ডুলীন ভাবিলেন, অপরাহ্ণে বৃথা কেন আলস্যে কালযাপন হয়—সৈন্যগণের শিক্ষা ও আলোচনা হউক। তদনুসারে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীর পৃথক্ পৃথক্ সমর-শিক্ষা চলিতে লাগিল। নিয়ম-বশ্যতা ও শাসন-বশ্যতার (Discipline) অণুমাত্র ব্যতিক্রমই সৈনিক নিপুণতার অন্তরায়। ডুলীন তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ও কঠোর শাসক হইলেন। ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্য মধ্যে যিনি এতকাল সুশিক্ষিত ও সুবিখ্যাত—যিনি ওয়াটারলু-রঙ্গভূমির ও অভিনেতা—তাঁহার অধ্যাপনা পদ্ধতির ঔৎকর্ষের কথা বলিয়া জানাইবার প্রয়োজন নাই। অল্প দিনেই ডুলীনের বাহিনী উৎকৃষ্ট কৌশল-শালিনী হইয়া উঠিল।

সৈন্যগণের পাণ্ডিত্য দর্শনে তিনি একদা কোন কোন প্রধান কর্ম্মচারীদের সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন, "তোমাদের বলবীর্য্য সাহসের কিছুমাত্র অপ্রতুল ছিল না, কেবল পরিবেদনা-মূলক পরিচালনারই অভাব ছিল। আমি তাহা প্রথমাবধিই বুঝিতে পারিয়া এত অসীম যত্নে ইউরোপীয় প্রণালী

প্রবর্ত্তিত করিয়াছি। মহারাজার অন্যান্য সামরিকগণও ঐ প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে নিয়ম-বশ্যতা অনেকাংশে শিথিল আছে এবং চালিত চালকে সহানুভূতিও আশামত নাই। আমি সে পক্ষে অধিক-তর দার্ঢ্য অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই এখন তোমরা পৃথিবীর চতুর্ভাগে যথেচ্ছা জয়ী হইবার সামর্থ্য ধারণ করিয়াছ—অধিক কি, সর্ব্ববিজয়ী বোনাপার্টের সৈন্যের সমকক্ষ হইতেও পার!" এ কথা শুদ্ধ ভুলীনের নিজ মুখে নয়, পরে মহারাজা রণজিৎ এবং লর্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের প্রশংসাবাদেও ব্যক্ত হইয়াছিল।

ভুলীনের প্রতি নন্দসিংহের আনুগত্য ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। ভুলী-নের কোন ইচ্ছা বা ইঙ্গিত প্রকাশ মাত্রেই নন্দ তৎপালনে প্রস্তুত। বন্নু, ধন্নু ও আলিবর্দ্দি প্রভৃতি অকপট অনুরক্তগণকেও নন্দ এ বিষয়ে হারাইয়া দিল! গমন সময়ে এবং কথন কথন সৈন্য-শিক্ষাকালেও নন্দ সর্ব্বদাই ভুলীনের পার্শ্ববর্ত্তী—সহকারী অধ্যক্ষের যাহা যাহা করণীয়, তদপেক্ষাও শতগুণে অধিক কার্য্যতৎপর ও অনুগত! শুদ্ধ একা নহে; তাহার নিজের দুই তিন জন সহচরও সাহেবের আজ্ঞা বহনাদি কার্য্যে নিয়তই নিযুক্ত—নন্দ সিংহের অত ভক্তি দেখিয়া বন্নু প্রভৃতি "অতি-ভক্তি" বলিত!

ভুলীন নিজে কথন কথন এ বিষয় লইয়া চিন্তা করিতেন—আশ্চর্য্য হইতেন! বন্নু, ধন্নু ও আলিবর্দ্দি সংগোপনে এ কথার সর্ব্বদাই অনুশীলন করিত। আদানবস্থার সমুদয় সহযাত্রী ও মূলতানী সঙ্গীমাত্রেই এ ঘটনায় নিতান্ত বিস্ময়ান্বিত হইত। ফলতঃ ভুলীনের হিতৈষী দলের সকলেই ন্যূনা-তিরেকে ভাবিত, কেবল চৈতন বাবুই কিছুমাত্র জানিতেন না, বুঝিতেন না, সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত—নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন।

আমরা আর এক ব্যক্তির নাম এখনও করি নাই, কিন্তু করা আবশ্যক। এ ব্যক্তি ভুলীনের লাহোরাগমন কালের পূর্ব্ব হইতে "নিজের খানসামা-গিরি" কাজে নিযুক্ত। তাহার নাম তুক্ষণ বা তুখন। এ ব্যক্তিও ভুলীনের মিষ্টগুণে ও আপন স্বভাবগুণে অত্যন্ত অনুরক্ত ভৃত্য হইয়া উঠিয়াছে; তাহার পূর্ব্বে বন্নুই ভুলীনের নিজের ভৃত্য ছিল। সৈনিক কর্ম্মে বন্নুর নিয়োগাবধি তুক্ষণই প্রভুর পরিচর্য্যা করে—বন্নুও ছাড়ে না, সুবিধা মত অন্ন ভাগেও অংশীদার আছে! তুক্ষণকে বন্নুই জানিয়া শুনিয়া ভাল

বুঝিয়া নিযুক্ত করিয়াছে—বন্নু তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে ও বিশ্বাস করে।

তুক্ষণ বড় সুচতুর—মানব-হৃদয়-তত্ত্বজ্ঞতায় স্বভাব-দত্ত ক্ষমতায় ভূষিত। তাহার সহিত বন্নুর সর্ব্বদা নন্দ সিংহ সম্বন্ধে কথা হইত; তাই সে জানে, নন্দ সিং প্রভুর কতদূর পূর্ব্ব শত্রু। তুক্ষণকে স্বীয় কর্ত্তব্যানুরোধে অর্থাৎ প্রভুর সেবা কার্য্যে নিয়তই সমীপবর্ত্তী থাকিতে হয়, সুতরাং যখনই নন্দ সিংহ ডুলীনের নিকট আইসে, কি আনুগত্য প্রদর্শন পূর্ব্বক কথোপকথন করে, তখনই তুক্ষণ অন্যের অজ্ঞাতসারে আড়ে আড়ে নন্দের চক্ষু ও মুখের প্রত্যেক ভাব ভঙ্গীর প্রতি সতর্ক প্রহরিতা করে। চতুর তুক্ষণ নখদর্পণের ন্যায় স্পষ্টই দেখিতে পায়, নন্দ স্বীয় হৃদয়ের প্রকৃত ভাব গোপনার্থ বিস্তর আয়াস ও কৌশল করিয়া থাকে—পাছে কোনমতে মনের উলঙ্গ মূর্ত্তি লক্ষিত হইয়া পড়ে, এই ভয়! তৎপ্রতিবিধানের জন্য স্বীয় নয়ন, বদন, বর্ণ ও অঙ্গ ভঙ্গীকে অভিপ্রেত অবস্থায় রক্ষা করিতে অসম্ভব আত্মদমন শক্তির উপাসনায় প্রবৃত্ত থাকে—নিয়তই যেন রঙ্গভূমির অভিনেতা, এম্নি বোধ হয়।

ডুলীন প্রায় প্রতি সায়ংকালের প্রাক্কালে শিবির হইতে বহুদূরে একাকী শিকার করিতে যাইতেন—ব্যাঘ্র হরিণাদির মৃগয়া নয়, সামান্য পশু পক্ষীর শিকার। এজন্য একটা বন্দুক ভিন্ন নিকটে অন্য অস্ত্র থাকিত না। শিকারে তিনি বিশেষ অনুরক্ত। যে কয়দিন সমতল প্রদেশ বাহিয়া কুচ হইতেছিল, সে কয় দিবস খাল বিল ঝোপেই শিকার হইত। এখন পার্ব্বত্য প্রদেশে উপস্থিত—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় ও জঙ্গল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শিকার করিতে হয়—কাজেই ভ্রমণের সীমা ক্রমে পূর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও দূরব্যাপী হইতেছে। কোন কোন দিন ফিরিয়া আসিতে তিন চারি দণ্ড রাত্রিও হইয়া পড়িত।

একদিন তিনি সসজ্জ হইয়া অর্থাৎ বন্দুক ও কুক্কুর (নাম, হেক্টর) লইয়া শিকারার্থ স্বীয় শিবির ত্যাগ করিতেছেন, এমত সময় বন্নু, আলিবর্দ্দি এবং তুক্ষণ, এই তিন বিশ্বাসী ভৃত্য একত্র দলবদ্ধ হইয়া সেলাম করিয়া সাহেবের গমনপথে দাঁড়াইল—যেন কিছু বলিবার ইচ্ছা। ডুলীন কিছু বিরক্ত ও চিন্তিত হইলেন। কোন কথা থাকে, এ সময় কেন—এই ভাবেই বিরক্ত। কিন্তু ইহারা আমার শিকার প্রবৃত্তির গাঢ়তা জানিয়াও যখন এমন সময়ে আসিয়াছে, তখন অবশ্যই গুরুতর কথা হইবে—এই ভাবিয়াই

চিন্তিত। বলিলেন "তোমাদের কোন কথা আছে নাকি? রাত্রে বলিলে হইবে না?"

আলিবর্দ্দি কহিল, "হুজুরকে বেশী ক্ষণ দাঁড়াইতে হইবে না, অতি অল্প কথা।"

বন্নু কহিল "হুজুর! আমাদের আর কেহই নাই, আপনিই মা বাপ সব! হুজুরের কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা মনে উদিত হইলে আমরা কি চুপ করিয়া থাকিতে পারি?"

জুলীন ত্রস্তভাবে একে একে তিন জনেরই মুখপানে চাহিলেন। বলিলেন "ভূমিকার প্রয়োজন নাই, যাহা বলিবার শীঘ্র বল।"

বন্নু ও ভুক্ষণের ইঙ্গিতে আলিবর্দ্দি বক্তা হইল। বলিল, "কেমন বদমায়েসের দ্বারা সাহেবের তাম্বু পূর্ণ আছে, তাহা কি হুজুর দেখিতে পান না? আমি বেশী কথা জানি না হুজুর—আমি সংক্ষেপে বলিব। আপনি একা শিকারে যাইতেছেন, কিন্তু ছাউনিতে শয়েক দুই শত এমন লোকও আছে, যাহারা আপনার টুপিতে ঐ যে সোনার পটিটা দেওয়া আছে, উহার লোভেও একটা গাছের আড়াল থেকে আপনাকে গুলি মারিতে পারে—অধিক কি, শুধু আপনার এই কোর্ত্তাটার জন্যও পারে!"

বন্নু বলিল, "শুধু তাও নয়, হুজুর! ছাউনির মধ্যে ঘোর শত্রু আছে, তাকি আপনার জানা নাই? যাহারা সম্মুখভাগে সর্ব্বাপেক্ষা আজ্ঞাবহ ও অনুগত, সুযোগ সুবিধা পাইবামাত্র, হয় তো তাহারাই শয়তানের কাজ করিবে! দোহাই খোদাবন্দ! আমরা অকারণে ভয় পাইবার, কি ভয় দেখাইবার লোক নই—দুষ্ট লোকে যে আপনার পাছ নিয়েছে, তাহা আমরা টের পেয়েছি—কেবল উপযুক্ত স্থান পাইতেছে না। কিন্তু এরূপে শিকার করিতে গেলে শত্রুর পক্ষে মনোমত স্থান বাছিয়া লইতে কতক্ষণ?"

জুলীন হাসিয়া বলিলেন, "এই কথা! যাহা হউক, তোমরা আমার অতি বিশ্বাসী হিতৈষী ভৃত্য—শুধু ভৃত্য নও—বন্ধু, তোমাদের এরূপ চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। এ কারণ তোমাদের প্রতি বাধ্যতা স্বীকার করিতেছি। কিন্তু এতই কি ভয়? একাকী যাই বলিয়া তোমাদের শঙ্কা? এই বন্দুক, আর এই কুকুর, ইহারা কি উপযুক্ত রক্ষক নয়? অন্ততঃ পাঁচ সাত জনকে তো ভাগাইতে ও শোয়াইতে পারিব!—আর যে কয়েক শত বদমায়েসের কথা

বলিলে, আমার নিজের কৃত রেজিমেণ্টে নয়; অন্য দলে থাকিতে পারে। কিন্তু তন্মধ্যে সৎলোকও কি বিস্তর নাই? এই বাহিনীতে যত সৈনিক, সব কি এখন আমার শিষ্য নয়? ভারতবর্ষের লোক, ওস্তাদকে বড় মানে; তাহারা কি ওস্তাদ বলিয়া আমার পক্ষ হইবে না? আর কেহ না হউক, আমার খুব বিশ্বাস আছে, আমার নিজের কয়টী নূতন রেজিমেণ্টভুক্ত সকল লোক আমার জন্য প্রাণ দিতে পারে! সেই সঙ্গে, আলিবর্দ্দি, তোমার পঞ্চাশ, বন্নুর বিশ পঁচিশ, আর আমাদের এই তিন জনের অসি, ইহাদের কি সংখ্যায় ন্যূন দেখিতেছ বলিয়া সামান্য জ্ঞান কর? আমি তাহাদের পরিচালক হইলে এই এক শ লোকই এক হাজার হইতে পারে—ও পক্ষে তেমন নায়কবলের সম্ভাবনা কৈ?

আলিবর্দ্দি সমুৎসাহে বলিল, "না, হুজুর, সে বিষয়ে চিন্তা মাত্রই করি না—সম্মুখ সংগ্রামে কিছু মাত্র ভয় ভাবনা করি না! কিন্তু সাহেব! (দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে) যাহারা বদ্‌মাস্, তাহারা কি প্রকাশ্যে কিছু করিবে? আপনি সজ্জন মাত্রেরই পরম প্রিয়—দেবতার ন্যায় পরম পূজ্য! সেই জন্যই দুর্জ্জনেরা গুপ্ত শত্রু! সেই গুপ্ত শত্রুরা (বিশেষ একজন) এত নির্ব্বোধ নয় যে, জানাইয়া শুনাইয়া—সংবাদ দিয়া বৈরিতা সাধিবে! পাছে সেই ভীরু পাপিষ্ঠেরা সাহেবের শিকার হইতে ফিরিয়া আসিবার কালে অন্ধকারে দুরভিসন্ধি সাধনের সুযোগ পায়, সেই ভয়ই ভয়—সেই জন্যই অধীনদের প্রার্থনা, শিকার বন্ধ করুন!"

তুলীন এ আশঙ্কার বিরুদ্ধে কোন প্রবল যুক্তি দেখাইতে পারিলেন না। বিশেষতঃ যে শত্রু পূর্ব্বে একবার গুপ্তহত্যার আয়োজন করিতে পারিয়াছিল, সে পুনশ্চই বা না পারিবে কেন? সে তো সঙ্গেই আছে। সে এখন শত্রুতা না দেখাইয়া পরম বন্ধু হইয়া উঠিয়াছে—ছায়ার ন্যায় অনুগত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ছদ্মবেশী শত্রবতার আরো অধিক সম্ভাবনা!

তথাপি তুলীন বুঝাইতে ও নিজ মনে বুঝিতে চেষ্টা করিলেন যে, সে হয় তো পূর্ব্ব-দ্বেষভাব ত্যাগ করিয়াছে—পূর্ব্বাচরণের নিমিত্ত অনুতপ্ত হইয়া যথার্থ মিত্রতা দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে! অন্ততঃ বিনা প্রমাণে কোন ব্যক্তিকে দোষী মনে করাও মহা পাপ!

তুক্ষণ তখন যোড়করে নিবেদন করিল, "হুজুর! আমি তাহার আকার

প্রকার গুপ্ত ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, সে আজো সেই বিশ্বাসঘাতক নরাধমই আছে। সে হুজুরের সম্মুখে নিরীহ নির্দ্দোষ অনুতাপীবৎ প্রকাশ পায়, কিন্তু পশ্চাতে কখন কখন ভয়ঙ্কর মুখ-বিকৃতি দ্বারা হৃদয়ের দ্বেষ, হিংসা ও ঘৃণার ভাব ব্যক্ত করে—সে জানে কেহ তাহাকে দেখিতেছে না, কিন্তু তাহা ভুল, আমি সর্ব্বদাই আড়ে আড়ে দেখি।"

আলিবর্দ্দি কহিল, "হুজুর, শুনবেন? নন্দ সিংহের যে দু তিন জন অনুগত লোক হুজুরের হুকুম তামিলে সর্ব্বদা নিযুক্ত, আমার কোন বিশ্বাসী সহচর তাহাদিগকে খুব জানে—পূর্ব্বে তাহারা হত্যাকারী বনদস্যু ছিল!"

তুলীন শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন!

বন্নু কহিল, "আমাদের বিশ্বাসী সুরাটীদের মধ্যে কেহ কেহ হুজুরের শিকার গমন কালে দুই এক জন লোককে দুই একদিন গুপ্তভাবে সেই পথে অনুসরণ করিতে দেখিয়াছে। সুরাটীরা তাহাদের যেরূপ আকৃতি প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে যে, তাহারা নন্দের ঐ কয় জন বন্ধু বৈ অন্য কেহই নয়—কেবল পোষাক বদল করিয়াছিল মাত্র!

তুলীনেরও স্মরণে আসিল যে, মৃগয়াকালে একদা অদূরবর্ত্তী গুল্মগুলী মধ্যে তিনি ফুস্ ফুস্ শব্দ শুনিয়াছিলেন। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা পলায়ন করিল! বিশেষ নন্দ যে সুশীল ব্যবহার দেখাইতেছে, তাহা যেন বেশী বেশী—যেন অস্বাভাবিক—যেন সম্পূর্ণ আশাতিরিক্ত—(এক কথায়) যেন "অতি-ভক্তি!"

অতএব সর্ব্বাবস্থা বিবেচনায় ঐ তিন প্রভুপরায়ণ বিশ্বাসী অনুচরের সন্দেহ ও সতর্কতাকে নিরর্থক বলিতে পারিলেন না। কিন্তু তাহাদের প্রার্থনাটা সম্পূর্ণরূপে পূরণ না করিয়া রূপান্তরিত প্রকারে সিদ্ধ করিলেন। মৃগয়া ত্যাগ, পারিলেন না। কেবল অনেক অনুরোধে শেষে এই ধার্য্য হইল যে, মৃগয়া হউক বা বায়ু সেবনাদি কোন প্রয়োজন বশতঃই হউক, যখনই তিনি শিবির ছাড়িয়া কুত্রাপি যাইবেন, তখনই বন্নু, আলিবর্দ্দি ও তাহাদের কতিপয় অশ্বারোহী তাঁহার সমভিব্যহারে যাইবে—তিনি একা আর বাহির হইবেন না, ইটা স্বীকার করিলেন। তদ্দিনাবধি তাহাই হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিপদ ও মুক্তি।

কয়েক দিন যায়—চৈতনের দুই এক কাণ্ড ভিন্ন অন্য বিশেষ কিছু ঘটে নাই। চৈতন নাকি কথায় কথায় "গুলি করেঙ্গা" বা "গুলি চালাও" বলিতেন; তাহাতেই কয়েক জন সৈন্যাধ্যক্ষ ভুলীনের অজ্ঞাতসারে চৈতনের "গুলি ছোড়া বিদ্যার" পরীক্ষা লইতে প্রস্তুত হইলেন। চৈতন প্রথমে সম্মত হন নাই। শেষে তাঁহারা বিস্তর বুঝাইয়া পড়াইয়া জিদ করিয়া এক অপরাহ্নে এক বিস্তৃত মাঠের রঙ্গভূমিতে লইয়া গেলেন। তথায় তাঁহারা মহাড়ম্বর ও মহোদ্যোগ করিয়াছিলেন। প্রচার হইল, চৈতন গুলি ছুড়িবেন ও তলওয়ার খেলিবেন—সুতরাং লোক সমারোহ সামান্য হইল না! কিন্তু আমরা বর্ণনার আড়ম্বর করিব না—চৈতন যেরূপে আপনার সাহস, বিক্রম ও যোগ্যতা দেখাইয়াছিলেন—যেরূপে অব্যর্থ সন্ধানে আকাশ মার্গে বন্দুক ছুড়িয়াই চক্ষু মুদিয়া মোচড় খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন; অথচ বারুদও জ্বলে নাই, গুলিও চলে নাই; যেখানকার গুলি বারুদ সেই খানেই অক্ষত দেহে ছিল—যেরূপে তলওয়ার খেলাইতে গিয়া অনুপম ক্রীড়াচাতুর্য্য-বলে অসির ফলক খানি চক্ চক্ করিতে করিতে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া অসিধারীর নিজের শীর্ষদেশেই ঝন্ঝনা শব্দে পতিত হইয়াছিল—যেমন শিক্ষাবল, ভাগ্যবল তেমন হইলে মস্তক কাটিয়া যাইত, কিন্তু অসিপৃষ্ঠ লাগাতে সর্ব্বদিক্ রক্ষা হইল! ইত্যাদি সুবর্ণনীয় ও সুজ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবাহুল্য ভয়ে বিবৃত করিতে না পারিয়া পরম দুঃখের সহিত সহৃদয় পাঠকের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইল!

অতএব সেই মহা ব্যাপার ভিন্ন অন্য কিছুই আর ঘটে নাই—কয়েক দিবস রীতিমত কুচেই গেল। এক দিন ভুলীন শিকার হইতে শিবিরে ফিরিয়া আসিতেছেন, পশ্চাতে বন্ধু প্রভৃতি ছিল—কেহ দূরে, কেহ নিকটে। পথ সঙ্কীর্ণ, উভয় পার্শ্ব জঙ্গলে পূর্ণ। যেইমাত্র "বেলুন" বর্ত্মের একটী বাঁক ফিরিয়াছে, অমনি বাম পার্শ্বের বনমধ্যে খস্ খস্ শব্দ শ্রুত হইল। কোন বধ্য পশু বোধে ভুলীন বন্দুক তুলিয়া লক্ষ্য করিতেছেন, এমত সময়

জনৈক শিখ তথা হইতে বহির্গত হইয়া সেলাম করিল। বন্দুক নত করিয়া দুলীন তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন—পূর্ব্বে তাহাকে কোথায় যেন দেখিয়াছেন; এমনি বোধ হইল। বন্নু নিকটস্থ হইয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিল। কহিল "এ, হুজুর, সেই শিখ, যে আম্র বাগান হইতে তীর ছুড়িয়াছিল।"

শিখ পুনর্ব্বার সেলাম পূর্ব্বক বলিল, "হাঁ দয়াল সাহেব, এ গোলাম সেই বটে! গোলামের তখনকার কথা কি হুজুরের স্মরণ আছে? আমি যে উদ্দেশে দুরাত্মার চাকরি স্বীকার করিয়াছি, আ'জ্ সেই অভিপ্রায় সাধনের সময় উপস্থিত। অধিকক্ষণ হুজুরের কাছে থাকিতে পারিব না—পাপিষ্ঠেরা যদি দেখিতে পায়, তবে ভবিষ্যতে আর প্রাণদাতা সাহেবের কাজে লাগিতে পারিব না! সুতরাং একটী কথা কহিয়াই ছুটিব; হুজুর আ'জ্ খুব সবাধানে যাইবেন—স্পষ্ট কিছু শুনি নাই, কিন্তু যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, আ'জ্ দুর্জ্জনেরা কোনরূপ ফাঁদ পাতিবে, সন্দেহ নাই।"

এই বলিয়া সে বনমধ্যে অদৃশ্য হইল। দুলীন ডাকিলেন, সে শুনিতে পাইল কি না, বা শুনিতে পাইয়াও ফিরিল না, বলা যায় না। শেষেরটাই সম্ভব। সে যাহাই হউক, কিন্তু দুলীনের ভঙ্গীতে বোধ হইল, শিখের প্রদত্ত সংবাদকে তিনি গুরুতর জ্ঞান করিলেন না—সংবাদদাতা সামান্য সূত্রে আত্মীয়তা ও কৃতজ্ঞতা জানাইল, এইমাত্র ভাবিলেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া বন্নু কহিল, "হুজুর উপহাসে উড়াইবেন না। আপনি এই শিখকে প্রাণ ও ধন দিয়াছিলেন; ও কখনই চাতুরী করিবে না—চাতুরিতে তাহার লাভ কি? অবশ্যই সম্মুখে বিপদ।"

সে দিন বন্নু ও আলিবর্দ্দি ব্যতীত আরো ছয় জন অশ্বারোহী সঙ্গে ছিল। আলিবর্দ্দিকে ডাকিয়া সমস্ত বলা হইল। চারি জনের সহিত আলি অগ্রসর হইল; বন্নু অপর দুজনকে লইয়া পশ্চাৎ রক্ষায় রহিল। দুলীন ব্যতীত আর সকলেই অসি, বর্শা, ও বন্দুকধারী—দুলীনের হস্তে কেবল একটা রিনগ বন্দুক। সকলেরই সঙ্গে গুলি বারুদ যথেষ্ট। সকলেই সতর্ক ও প্রস্তুত। দুইজন অশ্বারোহী "অগ্রণী" রূপে পথের এ দিক্ ওদিক্ দেখিতে দেখিতে চলিল। প্রথমতঃ দুলীন সর্ব্বাগ্রে যাইতেই ইচ্ছুক হইয়াছিলেন,

কিন্তু বন্নু করযোড়ে কাতরস্বরে বুঝাইল, "এ যদি যুদ্ধক্ষেত্র কি শত্রু আক্রমণের স্থল হইত, হুজুর অবশ্যই তাহা করিতেন, কাহার সাধ্য কথা কয়? চৌর্য্যপ্রণালীর গুপ্ত ঘাতুক তো যুদ্ধ করিবে না—ঝোপে ঝাপে লুক্কায়িত থাকিয়া গুলি মারিয়া বনে বনে পলাইবে, ইহাতে আপনার অগ্রবর্ত্তী হওয়া অনাবশ্যক।" তুলীন বন্নুর ব্যবস্থায় আপত্তি না করিয়া যথাস্থলেই চলিলেন।

সে দিন অধিক দূর যাওয়া হইয়াছিল, ফিরিয়া আসিতে পথেই সন্ধ্যা হয়। দুইটী হরিণ, কয়েকটী খরগোস ও অন্যান্য ক্ষুদ্র পশু পক্ষী শিকারলব্ধ হইয়াছিল। তাহাও ভাগমত সঙ্গীগণের অশ্বপৃষ্ঠে আবদ্ধ আছে। সকলের ইচ্ছা, সে সকল ফেলিয়া দিয়া ভার লাঘব করে, কিন্তু তুলীন সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন।

একে পার্ব্বতীয় পথ, তরঙ্গায়িত—একবার উন্নত ভূমিতে উত্থান, একবার ঢালু ভূমিতে বা সহসা অতি নিম্ন দেশে অবতরণ—অতি বন্ধুর, কণ্টকাকীর্ণ; তাহাতে প্রতি মুহূর্ত্তেই অন্ধকার গাঢ়তর হইতেছে। গমনের অপেক্ষা এখন প্রত্যাগমনে অধিক কষ্ট জন্মিতেছে। তাহাতে আবার পথিমধ্যে দুইটী নালা পার হইতে হইবে—জল বেশী নয়, ঘোটকের জানু পর্য্যন্তও মগ্ন হয় না। কিন্তু শিলাময় পাড় অতি উচ্চ; তাহাতেই বোধ হয়, বর্ষাকালে সেই নালা গভীর ও প্রখর স্রোত-বাহিনী হইয়া থাকে।

প্রথম নালাটী নির্ব্বিঘ্নে পার হইয়া অপরটীর তীরে উপস্থিত। তথা হইতে শিবির অর্দ্ধক্রোশেরও অধিক। নালার উভয় তীরে একপ্রকার বড় বড় আগাছার বন—না তরু, না গুল্ম, মাঝামাঝি—চারি পাঁচ হাত করিয়া উচ্চ এবং অত্যন্ত ঘন—আগত অন্ধকারে আরও নিবিড় দেখাইতেছে। নালাটী পাইবার পূর্ব্বে কতকদূর হইতে ঐ প্রকার ঘন আগাছার বন মধ্য দিয়া যাইতে হইল।

অশ্বপৃষ্ঠে সুদৃঢ়ভাবে বসিয়া একে একে নয়জন বহু কষ্টে নদী গর্ভে নামিলেন। তীর হইতে নামিতে যে কষ্ট, অগভীর জল পার হইতে তত নয়। জলে উলিয়া পার্শ্বাপার্শ্বিভাবে চলিলেন—পূর্ব্বকার ন্যায় অগ্র পশ্চাৎ সারিবদ্ধ নয়। যেহেতু আক্রান্ত হন তো সকলেই যুগপৎ প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিবেন। যদিও তাহাতে সকলের দেহই এককালে আহত হওয়া সম্ভব,

কিন্তু রণোৎসাহে সে আশঙ্কা অগ্রাহ্য করিলেন। তাই এবারে দুলীনের বামে চারিজন, দক্ষিণে চারিজন, এই প্রণালীতে চলিলেন।

নালার অর্দ্ধভাগ পার না হইতেই গুড়ুম্! গুড়ুম্! গুড়ুম্! প্রায় যুগপৎ উনিশ কুড়িটা বন্দুকের শব্দ! সম্মুখ হইতেই সে শব্দ! সম্মুখ হইতেই সন্ সন্ শব্দে গুলি আসিল! সম্মুখের উচ্চ পুলীনস্থ বন হইতেই দুরাত্মারা বন্দুক ছুড়িয়াছে। কয়েকটা গুলি জলে পড়িয়া হিস্ হিস্ শব্দ উৎপাদন করিল; কয়েকটা কাণের কাছ দিয়া ভোঁ ভোঁ রবে ছুটিয়া গেল; কয়েকটা কয়েক জনের গায় লাগিল, কিন্তু অল্প হানি করিল।

নিমেষ মধ্যে দুলীন হুকুম দিলেন "ছড়িয়ে পড়; জলদি চালাও; ডেঙ্গায় উঠেই ঘোড়া ছেড়ে দৌড়াও; বনে চড়াও হও; তরবাব খোলো; কুত্তাদের কেটে ফেল—বন্দুক ছুড়ো না—জল্দি, জল্দি, জল্দি!"

হুকুম দিতে দিতেই ও শুনিতে শুনিতেই তদনুসারে কাজ হইতে লাগিল—আশ্চর্য্য বেগে বাকী জলটুকু পার হইয়াই ঘোড়া ছাড়িয়া অসি হস্তে সকলেই বনের মধ্যে দৌড়িল। দুরাত্মারা কোথায় গেল? আতি আতি খুঁজিয়া জনপ্রাণীকেও পাওয়া গেল না। যদিও দুর্ব্বৃত্তগণ সংখ্যায় হয়তো দ্বিগুণেরও বেশী—তথাপি চোর আর সাধু! তাহারা পলাইয়া গিয়াছে কি নিবিড় জঙ্গলে অন্ধকারের সাহায্যে লুকাইয়াছে, তাহা তখন স্থির হইল না।

ক্রমে অন্ধকারের বৃদ্ধি—স্কন্ধাবার দূরে—ঝটিতি মশাল আনিবার উপায়াভাব। দুলীন বুঝিলেন, এত প্রতিকূল অবস্থায় দুর্ব্বৃত্তগণকে এখানে অন্বেষণ করা বৃথা। তদপেক্ষা শিবিরে গিয়া কোন্ বিভাগের কোন্ কোন্ লোক কি সূত্রে কোথায় বাহির হইয়াছিল, তদনুসন্ধান লইলেই সত্যের মূলাকর্ষিত হইতে পারিবে।

ইহা স্থির করিয়া সঙ্গিগণকে ফিরাইলেন—বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পথে দাঁড়াইলেন। সকলকে নিকটে ডাকিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসিলেন "ভরসা করি কেহই আহত হও নাই? কৈ আর দুজন কৈ—আলিবর্দ্দি, দেখ তো কোন্ দুজন?"

আলিবর্দ্দি প্রত্যেক সঙ্গীর নাম ধরিয়া ডাকিল—রমজান ও রহিম নাম্নী দুই মুলতানী ব্যতীত আর সকলেই উত্তর দিল।

দুলীন তৎক্ষণাৎ সদলে নালায় ফিরিয়া গেলেন। তাঁহারা নদীতে নামি-

তেছেন, এমত কালে জলের ধার হইতে একটা ঘোড়া ভয়ানক বেগে দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া তীরে উঠিতে উদ্যত। কাহার ঘোটক? এত ক্ষিপ্তবৎই বা ছুটে কেন? প্রথমে তাহা বুঝা গেল না। দুই তিন জন মুলতানী সাহসপূর্ব্বক ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিল—উঠিবার জন্য অশ্বের বেগ শিথিল হওয়াতেই ধরিতে পারিল। ধরিয়াই তাহারা "আহা হা!" করিল। সকলেই সোৎসুকচিত্তে দেখিলেন, দুর্ভাগা রহিম ঐ ঘোড়ার কণ্ঠদেশ আক্‌ড়াইয়া ছিল, ধরিবা মাত্র রহিম খাঁ রহিমের দেহ ঝুপ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল—সে সম্পূর্ণ গতাসু! মৃতদেহ পরীক্ষায় প্রকাশ পাইল, ঠিক কপালে একটা গুলি লাগিয়াছিল, বোধ হইল তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটিয়াছে। কিন্তু মৃত্যুকালে উপুড়ভাবে পড়িয়া ঘোড়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল।

তৎপরে "রমজান্ রমজান্" বলিয়া ডাকা হইল। রমজান ঘোর যাতনা-ব্যঞ্জক মৃদুস্বরে উত্তর দিল—এত মৃদু যে, অমন নিস্তব্ধ স্থান না হইলে সে স্বর শুনা যাইত না। শব্দানুসারে সকলে গিয়া দেখিলেন, রমজান্ ঠিক জলের ধারে একটা গাছে ঠেস দিয়া অর্দ্ধশায়িতভাবে রহিয়াছে, তাহার অশ্ব তাহার নিয়াদ্ধ দেহ চাপিয়া পড়িয়া আছে। ঝটিতি অশ্বের দেহ অপসারিত করিয়া তাহাকে উঠানো হইল। রমজানের এ অবস্থার কারণ বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তাহার নিজের গায় গুলি লাগে নাই, অশ্বের অঙ্গে দুইটা লাগিয়াছিল। অশ্বের গুলি খাইয়াও প্রাণপণে জল পার হইয়া ডাঙ্গায় উঠিতে না উঠিতে পড়িয়া গেল। ভাগ্যক্রমে তথায় বৃক্ষটা ছিল, নতুবা রমজানের সর্ব্ব শরীর চাপিয়াই পড়িত; তাহা হইলে অথবা জলমধ্যে সহসা পড়িয়া গেলে রমজান্ হয় তো বাঁচিত না।

রহিমের মৃত দেহের প্রহরিতা নিমিত্ত দুইজন মুলতানীকে রাখা হইল। রমজান্‌কে একটা ঘোড়ার পৃষ্ঠে শোয়াইয়া উভয় দিকে দুই তিন জনে ধরিয়া চলিল। "তাঁবু হইতে চৌপায়া ও বাহক পাঠাইব" বলিয়া দুর্লীন অপর সহচরগণ সমভিব্যাহারে দ্রুত চলিয়া গেলেন।

বন ছাড়াইলেন। মাঠে পড়িলেন। মাঠের কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে সুমুখে এ কি? কতকগুলা মশাল আসিতেছে—মশালের সঙ্গে শতাধিক ভীষণ নরমূর্ত্তি দেখা যাইতেছে—তাহাদের অস্ত্র-ফলকাবলীও ঐ আলোকে ঝক্‌মক্ করিতেছে—মহা কলরবও শ্রুত হইতেছে।

ডুলীনের সঙ্গিগণের মধ্যে নানা অনুমান চলিতে লাগিল—কেহ বলে দস্যুদল; কেহ বলে রাজা ধ্যান সিংহের লোক; কেহ বলে বিবাহের বরাত্তি; কেহবলে বিপক্ষেরা দলেবলে জুটিয়া আসিতেছে! ইত্যাদি।

কিন্তু ডুলীনের আজ্ঞানুসারে আলিবর্দ্দি স্বীয় অশ্বকে দ্রুত চালাইয়া অগ্রসর হইয়াই ফিরিয়া আসিয়া সহর্ষে কহিল, "হুজুর চিনিয়াছি, আমারই মুলতানী বন্ধুরা—হুজুরের নেমকের চাকরেরাই আসিতেছে!"

শ্রুত মাত্র ডুলীনের সঙ্গিগণ "জয় ডুলীন সাহেব কি জয়!" এই ভাবের একটা সিংহনাদ ছাড়িল! সে শব্দের বিরাম-নিকম্পন না থামিতেই মশালধারী দল হইতে তদুত্তরে তদ্রূপ জয়নাদ শতগুণ অধিক বলে সেই গিরি-বন-মণ্ডিত বিশাল ক্ষেত্রকে ও নিস্তব্ধ নৈশগগনকে নিনাদিত করিয়া তুলিল! অধিকন্তু দৃষ্ট হইল, তন্মুহূর্ত্তেই মশালধারী সম্প্রদায় সেই সিংহনাদ ছাড়িতে ছাড়িতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ডুলীনের দিকে দৌড়িয়া আসিতে লাগিল!

উভয় দল মিলিত হইল। ডুলীনকে নিরাপদ ও অনাহত দেখিয়া সৈনিকগণের আহ্লাদের ইয়ত্তা নাই! প্রত্যেকে আসিয়া ভূমি স্পর্শে বহু বহু সেলাম করিতে লাগিল! ডুলীন তাহাদের অকপট অনুরাগের আন্তরিক আনন্দ, প্রতি বদনের ওষ্ঠাধরে ও নয়নে দেখিতে পাইয়া আপন জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিলেন! তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া দিলেন, প্রত্যেক সৈনিক মহোৎসাহে ও মহোল্লাসে তাহা চুম্বন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইল!

আলিবর্দ্দি ও বন্নু প্রভৃতি সহর্ষে অবতরণ করিল—কোলাকুলি সাদর সম্ভাষণের মহা ধুম পড়িয়া গেল—যেন বহু বিচ্ছেদের পর মিলন—যেন হিন্দুর বিজয়া কি মুসলমানের ইদ!

আলিবর্দ্দি ও বন্নু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কিরূপে আমাদের বিপদ জানিতে পারিলে?"

তদুত্তরে বিদিত হইল, "প্রভুভক্ত তুখন সন্ধ্যাগম দেখিয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে (সে প্রায় প্রত্যহই এইরূপ করিত) মাঠের এই দিকে বায়ু-সেবন-ছলে আসিয়াছিল; এমত সময় একবার বন্দুকের শব্দ বায়ু যোগে তাহার উৎকর্ণ কর্ণে পশিল—তাহার অন্তঃকরণ পূর্ব্ব হইতেই সন্দেহস্পৃষ্ট থাকাতে আশঙ্কা দৃঢ়ীভূত হইয়া উঠিল—অমনি শিবিরে ফিরিয়া গিয়া বিশ্বাসী সৈনিকগণকে চকিতের ন্যায় সজ্জিত করিয়া মশাল সহিত দ্রুতপদে আসিতেছিল!"

শ্রবণমাত্র আলিবর্দ্দি ও বন্নু তুখনকে কোলে তুলিয়া নাচিতে নাচিতে সাহেবের সম্মুখে লইয়া গেল! ত্নুলীন অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া সকলই শুনিতেছিলেন; সে কারণ, কারণ জিজ্ঞাসা ব্যতীতই স্বীয় অঙ্গুলী হইতে বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরী খুলিয়া তুখনকে অর্পণ করিলেন! তুখন ধূল্যবলুণ্ঠন, অভিবাদন ও পুনঃ পুনঃ সাহেবের হস্ত চুম্বন করিল! পুনর্ব্বার ভৈরব জয়নাদ উত্থিত হইল!

ত্নুলীন অশ্ব চালাইলেন—অতি বেগেই চালাইলেন ও সকলকেই বেগে আসিতে কহিলেন—মশালের আলোক অগ্রে অগ্রে দৌড়িতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধান।

ত্নুলীন ছাউনিতে আসিয়াই বন্নু ও আলিবর্দ্দির সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক ল্যান্সার রেজিমেণ্টকে তৎক্ষণাৎ শ্রেণীবদ্ধরূপে দাঁড় করাইবার জন্য নন্দ সিংহের প্রতি আদেশ পাঠাইলেন।

বন্নু সেই আদেশ লইয়া চলিয়া গেলে আলিবর্দ্দি কহিল "হুজুর! ইহাতো করুন, কিন্তু আরো একটী সহুপায় আছে। আমার সঙ্গে দুইটী লোক আসিয়াছে, তাহারা 'গোড়-গোয়েন্দা।' তাহাদের অসাধারণ ক্ষমতা। তাহারা শুদ্ধ পায়ের চিহ্ন দেখিয়া দেখিয়া চোর ধরিয়া দেয়—চোর যতদূর যেখানেই যাউক না কেন, পায়ের দাগ চিনিয়া চিনিয়া গিয়া ধরিতে পারে! এ দেশে, হুজুর, অনেকে এই ব্যবসায়ে টাকা উপার্জ্জন করে—মুলতানে এ কর্ম্মে যে কয়জন নিযুক্ত ছিল, আমার সঙ্গী দুজন তাদের মধ্যে প্রধান—এখন মুলতানের স্বাধীনতার সঙ্গে তাদেরও সে ব্যবসা গিয়াছে। তাদের নাম খয়রাতালি ও ওয়াবালি—তার মধ্যে খয়রাত এ কাজে অদ্বিতীয়!"

ত্নুলীন আগ্রহে বলিলেন "এরূপ গোড় গোয়েন্দার কথা আমারও শুনা আছে—বোধ হয় তোমার ভ্রাতা চাঁদ খাঁর মুখেই শুনিয়া থাকিব। যাহা হউক, তবে আর বিলম্ব নয়; তুমি স্বয়ং সঙ্গোপনে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই নদীতীরে চলিয়া যাও—আরো দু এক জন বিশ্বাসী লোক সঙ্গে লও—আলো কি খাদ্য সামগ্রী, কি আর যাহা কিছু আবশ্যক, সব প্রচুররূপে

যোগাড় করিয়া লইয়া চলিয়া যাও। তাহাদিগকে স্পষ্ট বলিবে, বেতন ব্যতীত প্রত্যেক অপরাধীর গ্রেপ্তার বা সঠিক সন্ধান জন্য পাঁচ শত করিয়া রৌপ্য মুদ্রা পারিতোষিক দিব।" আলি সহর্ষে বিদায় হইল।

কর্ণেল সাহেব সেই সজ্জাতেই ল্যান্সার দল পরিদর্শনার্থ গমন করিলেন। সাহেব ভালরূপে দেখিতে পাইবেন বলিয়া বহু বিস্তর মশাল জ্বালাইয়াছে। বিপদের সমাচার সকলেই শুনিয়াছিল—সাহেব বিপদোত্তীর্ণ হইয়া সুস্থ দেহে আসিয়াছেন দেখিয়া রেজিমেণ্টের তাবতেই আনন্দ প্রকাশ করিল—সে আনন্দ অধিকাংশেরই আন্তরিক। কিন্তু সাহেব কি জন্য প্রত্যেকের বদন এত তীব্র দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিল না।

এরূপ পর্য্যবেক্ষণ অনুষ্ঠানে নন্দের আকৃতিতে বৈরক্তি ও অসন্তোষ ব্যক্ত হইল। সৈনিক হাজিরা লওয়ার পদ্ধতিতে প্রত্যেকের নাম ডাকিতে নন্দের প্রতি ডুলীন আদেশ করিলেন। দৃষ্ট হইল, সকলেই হাজির, কেবল একজন নয়—তাহার নাম মহম্মদ শা। এ ব্যক্তি নন্দের অতি প্রিয়পাত্র এবং সর্ব্বদা তদুভয়ের মধ্যে গুপ্ত পরামর্শ চলে, তাহা প্রায় সকলেই জানে। ইতিপূর্ব্বে কয় দিন এই মহম্মদকে প্রতিনিয়ত সাহেবের পার্শ্ববর্ত্তী ও আজ্ঞাবর্ত্তী থাকিতে দেখা গিয়াছে।

"এত রাত্রে সে আপন রেজিমেণ্টে না থাকিয়া কোথায় গেল?" সাহেবের এই প্রশ্নোত্তরে তাহার দুই তিন জন সঙ্গী সেলাম করিয়া জানাইল, "আমরা এক সঙ্গে ঘোড়া চরাইতে ও ঘোড়ার ঘাস আনিতে গিয়াছিলাম, তাহার ঘোড়াটা কিছু খোঁড়া হওয়াতে সে আমাদের মত জল্‌দি আসিতে পারে নাই, বোধ হয় শীঘ্র আসিয়া পঁহুছিবে।"

"তাহার ঘোড়া খোঁড়া হইল কেন?" এই প্রশ্নটী ঐ তিন জনকে পৃথক্ স্থলে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করাতে তিন জন তিন প্রকার বিভিন্ন কারণ নির্দ্দেশ করিল। তৎপ্রতিবিধানার্থ নন্দ সিং বুঝাইল যে, "যে সময় ঘোড়া খোঁড়া হয়, ইহারা তিন জনেই তখন দূরে ছিল; যথার্থ কারণ জানে না, কেবল ভয়ে ভয়ে যাহা হয় একটা বলিতেছে।"

ইহাদের কথার সত্যতা প্রমাণার্থ লোক সঙ্গে দিয়া ইহাদিগকে মহম্মদ্ শার উদ্দেশে পাঠানো আবশ্যক, একথা মনে উদিত হইলেও ডুলীন তাহা করিলেন না—তাহার কারণ পরে বলিব।

মোহর সিং নামা এক ব্যক্তিকে ডুলীন কহিলেন "কি মোহর, সকলের ঘোড়া দেখিতেছি, তোমার কৈ ?"

মোহর ভয়ে থতমত খাইয়া কিছু বলিতে না বলিতেই নন্দ সিংহ কহিল, "সে কি ? একথা কি এত্তালা দিয়া আসিস্ নি ? আ'জ্ ছাউনিতে আসিবা মাত্র মোহরের ঘোড়াটা ঘুরিয়া পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে। আমাকে যেমন বলিল, অমনি হুজুরকে এত্তালা দিতে বলিয়াছিলাম ; বোধ হয় ভয়ে পারে নাই !" এই কথা কহিয়াই মোহরকে বলা হইল "তা এতে তোর ভয় কি ? তোর দোষে তো মরে নি যে, সাহেব রাগ ক'র্বেন !"

ডুলীন হাসিয়া মোহরকে বলিলেন "যখন তোমাদের কর্ত্তাকে এত্তালা দিয়াছ, আর তিনি যখন তোমাকে খালাস দিতেছেন, তবে আর তোমার মুখ এত শুষ্ক কেন ?" (নন্দের প্রতি) "সে যাহা হউক মহম্মদ শা আসিবা মাত্রই যেন আমার নিকট যায়।" এই বলিয়া রেজিমেণ্টকে ছুটি দিয়া ডুলীন চলিয়া গেলেন।

এই পরিদর্শনের ফল স্বরূপ সন্দেহটী সম্পূর্ণ বদ্ধমূল হইল। কিন্তু সন্দেহ পর্য্যন্ত—কোন প্রমাণ লাভ হইল না। গাঢ়তর অনুসন্ধান ও মহম্মদের উদ্দেশ লওয়া প্রভৃতি বিশেষ পীড়াপীড়িতে কি হইত, বলা যায় না। কিন্তু পাছে সপ্রমাণ না হইয়া কেবল তাহাতে নন্দ সিংকে অপমানিত ও প্রকাশ্য শত্রু করিয়া তোলা বই অন্য ফল কিছুই না হয়, এই বৃথা অনর্থের আশঙ্কায় ডুলীন আর বাড়াবাড়ি করিলেন না। ফলতঃ সকল কার্য্যই অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া সুকৌশলে করা আবশ্যক ; নন্দ নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি নয় ; প্রকাশ্য প্রমাণ সংগ্রহের সম্ভাবনা অতি দুর্ব্বল ; সুতরাং তখন নিরস্ত থাকা বিবেচনার কার্য্যই হইয়াছিল।

বলিতে ভুলিয়াছি—এবং অবকাশও পাই নাই—যৎকালে প্রান্তর মধ্যে ডুলীনকে পাইয়া ও তাঁহাকে অক্ষত দেখিয়া শিবির হইতে আগত সৈনিকগণ অত্যুচ্চ জয়ধ্বনি করে, তখন শিবিরে খাতা লিখিতে লিখিতে চৈতন একবার কার্য্য বিশেষ ব্যপদেশে বাহিরে আইসেন। যদিও হিসাব কিতাবের দিকেই মনটী অভিনিবিষ্ট ছিল, তথাপি তেমন নিস্তব্ধ গভীর রজনীতে পুনঃ পুনঃ তত ভৈরবনাদ প্রান্তরবাসী কে না শুনিতে পায় ? সুতরাং তাহা শ্রুতিরন্ধ্রযুগল দিয়া গমন করিয়া চৈতনের সেই অন্যমনস্ক মনকেও চৈতন্য দান করিল !

তিনি নাসা হইতে চসমা খুলিয়া হাতের কলম কাণে রাখিয়া এদিক্ ওদিক্ ছুটিয়া জিজ্ঞাসায় প্রহরীদের মুখে শুনিলেন, সাহেবকে নাকি কোন্ দুরাত্মা গুলি করিয়াছে! অমনি প্রলম্বিত কোঁচাকে উরুদ্বয়ের মধ্য দিয়া পশ্চাতে লইয়া গিয়া কাছার সঙ্গে আঁটিয়া অর্থাৎ মালকোঁচা মারিয়া শব্দানুসারে ছুটিলেন। কিন্তু ছাউনির সীমা হইতে দশ হস্ত মাত্র যাইতে না যাইতেই ভয়ানক একটা ভয় আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল! কিসের ভয়, তাহা তিনি তৎকালে কি কোন কালে কখনই নিশ্চিতরূপে নিরূপণ করিতে পারেন নাই। বোধ হয় ভূত, পেত্নী, বাঘ, মানুষ, সাপ, শিয়াল ও কুক্কুর, এতাবৎ ও আরো কত কিসের শঙ্কায় তাঁহাকে অবশ করিয়া তুলিল!

তিনি ফিরিলেন। ফিরিয়া প্রহরিগণকে বিস্তর অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক অনুরোধ যে, কেহ তাঁহাকে আগাইয়া দিয়া আইসে। তাঁহাকে তাহারা দেওয়ানজী বলিত, দেওয়ানজীর দুঃসাহস প্রসঙ্গ লইয়া কিয়ৎক্ষণ আন্দোলন ও আমোদের পর শেষে একজন ধূর্ত্ত প্রহরী সঙ্গে যাইতে স্বীকৃত হইল। সে নিজে একখানি তরবার লইল এবং দেওয়ানজীর হস্তেও একখানি সুদীর্ঘ মুক্ত অসি অর্পণ করিল। চৈতন অসি ও সঙ্গী পাইয়া প্রচুর সাহসে গল্প করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে চলিলেন—বলিলেন "তুমি যেমন পশ্চাতে, তেম্নি একজন সম্মুখে থাকিলে আরো ভাল হইত!"

ধূর্ত্ত প্রহরী কতকদূর গিয়া পথ-পার্শ্বে একটা ঘন ঝোপ দেখিতে পাইয়া তাহার অন্তরালে সরিয়া পড়িল। চৈতন যেমন গল্প করিতেছিলেন, সেই ভাবেই বকিতে বকিতে যাইতেছেন, কিন্তু বহু কথার পরেও পূর্ব্বের ন্যায় "হু—হাঁ" সায় সাড়া না পাইয়া সন্দিহান হইলেন—প্রহরী কি নাই? প্রাণ একেবারে উড়িয়া গেল! চাহিয়া দেখেন—নাম ধরিয়া ডাকেন—সত্যই নাই! তখন আবার নাম ধরিয়া প্রাণপণে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন—দূরস্থ পাহাড়ে সে ডাকের গভীর প্রতিধ্বনি পর্য্যন্ত শ্রুত হইল! এক দিকে সেই প্রতিধ্বনি, অন্যদিকে তুলীনের সঙ্গীবর্গের কলরব, অন্যত্র দূরবনে হিংস্র জন্তুর গর্জ্জন, ইত্যাদি শব্দ ভিন্ন, তাঁহার উত্তরে অন্য কিছুই আর শ্রুত হয় না! সাহেবের দল দূরে, ছাউনিও দূরে, "বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা?"

তাঁহার কম্প ধরিল—চীৎকার থামিল—অদূরে খস্ খস্ করিয়া কি যেন নড়িল—ঝোপ হইতে যেন গোঙানির মত কি একটা বিকট শব্দও শ্রুত

হইতে লাগিল! তিনি সাহেবের দিকে দৌড়িলেন। পশ্চাতে যেন ভীষণ লম্ফ ঝম্পের শব্দ—অতিশয় অস্থির দ্রুতগমনে নিজের দীর্ঘ তরবারি বাঁধিয়া পড়িয়া গেলেন—জীবনের আশায় এককালে জলাঞ্জলি দিয়া আত্যন্তিক ভয়ে জ্ঞানহত, অচৈতন্য হইলেন—যথার্থই দাঁতকপাটি লাগিল।

প্রহরী দেখিল মশালের আলোর সঙ্গে সাহেব দ্রুতগতিতে অশ্ব ছুটাইয়া আসিতেছেন, পশ্চাতে বহু লোক। চৈতনের দুরবস্থা দর্শনে পাছে সাহের তাহার প্রতি রুষ্ট হন, এই ভয়ে সে দৌড়িয়া ছাউনিতে পলায়ন করিল—চৈতন অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিলেন!

ভাগ্য ভাল, তাঁহার উপর দিয়া সাহেব ঘোড়া চালান নাই—ভাগ্য ভাল, সাহেবের আগে আগে মশাল ছুটিতেছিল—ভাগ্য ভাল, মশালধারী বেগে আসিয়া চৈতনের দেহ বাঁধিয়া চৈতনের উপরেই পড়িয়া গেল! তাহার পতনদৃষ্টে সাহেব অশ্বরশ্মি-সংযমন পূর্ব্বক কারণ জিজ্ঞাসিলেন। তৎক্ষণাৎ অপর মশালী আসিয়া দেখিল, একজন মনুষ্য অসির উপর পড়িয়া আছে। "খুন খুন" বলিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল।

সাহেব নামিলেন। ভালরূপে দেখিয়া চিনিলেন। দেখিলেন, অসির তীক্ষ্ণ ধারের দিক্‌টা মাটির দিকে, তাহাতেই চৈতন বাঁচিয়া গিয়াছেন; কেবল কণ্ঠমূলে অগ্রভাগের খোঁচাটা লাগিয়া অত্যল্প মাত্র শোণিতপাত হইয়াছে ও তখনও একটু একটু হইতেছে, নতুবা চৈতন সম্পূর্ণ অক্ষত!

চৈতন এস্থলে এ অবস্থায় অচেতন কেন? ভয়ই যে প্রকৃত কারণ—সাহেবের বিপদ শুনিয়া হয় তো দৌড়িয়া আসিতেছিলেন, পথে ভয় পাইয়া অবশেন্দ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন, ইহাই স্পষ্ট বুঝা গেল। যেহেতু দাঁতকপাটি ভাঙ্গিয়া দিবা মাত্র চৈতন "বাঘ, বাঘ; ভূত, ভূত!" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন! কিন্তু সরলহৃদয় চৈতনের প্রভুপ্রাণতার পরিচয় পাইয়া দুলীনের পূর্ব্ব স্নেহ আরো গাঢ়তর হইল!

সাহেবের আদেশে হাত-পাল্কী উপায়ে চৈতনকে শিবিরে লইয়া যাওয়া হইল। চৈতনকে ভয়ের ধাক্কা এমনি লাগিয়াছিল যে, তিনি প্রায় সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিয়াছিলেন—শেষ প্রহরে যথার্থ নিদ্রা-জনিত সুখানুভব করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। পরদিন বৈকালে একখানি অতি দীর্ঘ ইংরাজী আবেদনপত্রে প্রহরীর ধৃষ্টতা ও দুর্ব্বৃত্ততা বিষয়ক অভিযোগ সাহেবের নিকট

অর্পিত হইল—দুষ্ট লোকে বলে, তাহা বুঝিতে সাহেবের অনেক সময় লাগিয়াছিল ও অনেক কষ্ট হইয়াছিল—তাহাতেও তিনি সকল বুঝিতে না পারিয়া ফরিয়াদির মৌখিক বাঙ্গালা এজেহার লইয়া তবে বুঝিতে সমর্থ হইলেন! কিন্তু যখন বুঝিলেন এবং আসামীকে ও সাক্ষিগণকে ডাকাইয়া সমস্ত শুনিলেন, তখন যথার্থই প্রহরীর প্রতি কুপিত হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিকই রাগের কথা; যেহেতু তাহার দোষ গুরুতর—যে অবস্থায় চৈতনকে সে ফেলিয়া আসিয়াছিল, তাহাতে অতাহিত ঘটনারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। তজ্জন্য তাহার প্রতি এই দণ্ডাজ্ঞা হইল যে, ঐ প্রহরীকে চৈতনের শিবিরদ্বারে ত্রিরাত্রি পাহারা দিতে হইবে। কিন্তু প্রথম দিনের শেষ রাত্রে চৈতন একটা বিকট শব্দে জাগরিত হইয়া প্রহরীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করাতে প্রহরী উত্তর দিল, "কৈ? আমি তো কিছুই শুনি নাই!" চৈতন জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কি সারা রা'ত্ এইরূপে খাড়া আছ?" সে খাড়া থাকুক না থাকুক, উত্তরে বলিল "কি করি? সাহেবের হুকুম!" চৈতনের দয়া হইল, "আহা, আহা" বলিয়া তাহাকে জিদ করিয়া শয়নে পাঠাইলেন এবং পর দিন সাহেবকে সবিনয় অনুরোধ দ্বারা তাহার দণ্ড রহিত করিয়া দিলেন। তদবধি সেরূপ কোন বিকট শব্দ তাঁহার ঘুমের আর ব্যাঘাত করে নাই! তাহাতে চৈতন বলিতেন "একটা কৃষ্ণের জীবকে সাজা দিচ্ছলেম ব'লে আমার জীবাত্মা ঘুমের ঘোরে কেঁদে উঠ্তো!" এই ঘটনায় তাঁহার যে যথার্থই দয়ার শরীর, তাহা প্রকাশ পাইল এবং তজ্জন্য তিনি সত্য সত্যই সৈনিকগণের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র হইলেন!

ল্যান্সার দলের পরীক্ষা করিয়া দুলীন শিবিরে আইলে কয় দণ্ড পরে মহম্মদ শা আসিয়া হাজির হইল। দুলীন তাহাকে ও তাহার অশ্বকে ভালরূপে নিরীক্ষণ করিলেন—ঘোড়াকে খোঁড়া কি ক্লান্ত, দুইয়ের একও বোধ হইল না! ফলতঃ সে অশ্বটী মূলেই তাহার নয়। সেটী যে নন্দ সিংহের নিজের কয়টার মধ্যে একটা, দুলীন তাহাও চিনিতে পারিলেন। এই প্রবল প্রতারণা এবং দুই চারি প্রশ্নের যেরূপ উত্তর পাইলেন, তাহাতে পূর্ব্ব সন্দেহ সমূলক বলিয়া দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল, সুতরাং নন্দের সয়তানী পক্ষে এক প্রকার নিঃসন্দেহই হইলেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিশেষ হেতুতে "তোমার অশ্বকে তুমি যথোচিত যত্ন কর না—আ'জ্ যাহা করিয়াছ, এমন করিলে

উপযুক্ত সাজা পাইবে!” ইত্যাকারের সামান্য দ্ব্যর্থক সতর্কতা বৈ তাহাকে আর কিছুই বলিলেন না।

সে রাত্রে আলিবর্দ্দি ফিরিল না। ত্তুলীন জানেন, দিবালোক ব্যতীত গোড়-গোয়েন্দারা সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না; সুতরাং তজ্জন্য উদ্বিগ্ন না হইয়া আদেশ দিলেন, “কল্য আর কুচ হইবে না—জগদীশ্বর অদ্য আমাদিগকে গুপ্ত শত্রু-হস্তে রক্ষা করিয়াছেন, অতএব কল্য সকলে বিশ্রাম ও আমোদ করুক—আমি কল্য সকলকে পুরি ও মিষ্টান্ন ভোজ দিব।”

প্রত্যূষে যখন এই সংবাদ প্রচারিত হইল, স্কন্ধাবারের সর্ব্বাংশ হইতে সেনাপতির নামে মহোচ্চ ধ্বনি পুনঃ পুনঃ উত্থিত হইয়া গগন ভেদ করিল!

মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে আলিবর্দ্দি গোপনে আসিয়া সাহেবের হস্তে একটী পালক দিল। ল্যান্সার শ্রেণীর অশ্বারোহীরা টুপির উপর যেরূপ পালক পরিধান করে, ইহা তাহাই। নালার পারঘাটের বামপার্শ্বস্থ নলবনের মধ্যে উহা পড়িয়া ছিল। যে স্থানে উহা পাওয়া গিয়াছে, তাহার চতুষ্পার্শ্বে বহু পদ-চিহ্ন আছে। এক দিকে আলিবর্দ্দি খয়রাতালির সঙ্গে পদচিহ্নানুসরণে অর্দ্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত গিয়াছিল। অন্য দিকে ওয়াবালি তদ্রূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল।

যে দিকে খয়রাত যায়, সে দিকে একটা ঘোড়ার খুরের দাগও দৃষ্ট হয়। ঐ অর্দ্ধ ক্রোশের পর ঘোড়ার পদ-চিহ্ন আর পাওয়া যায় না। কিন্তু বহুদর্শী গোড়-গোয়েন্দা তাহার কারণ নিরূপণে সমর্থ হইল। দুরাত্মারা সেই স্থানে ঘোড়ার পা বাঁধিয়া তাহাকে যে স্কন্ধে করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। পাছে খুরের চিহ্ন তাহাদিগকে ধরাইয়া দেয়, তৎপ্রতিবিধান জন্যই এরূপ করিয়াছে। আবার, সেই স্থলে ধূর্ত্তগণ আপনাদের পাদুকার নীচে এক প্রকার বস্ত্র নির্ম্মিত আবরণ ব্যবহার করিয়া যে চলিয়া গিয়াছে, তাহাও খয়রাত দেখাইয়া দিল!

সেইআবৃত পাদুকার সাহায্যে কিয়দ্দূর গিয়া দুরাত্মারা আবার ফিরিয়াছিল। কিরূপে ফিরিয়াছে? আশ্চর্য্যরূপে; অর্থাৎ আপনাদের পূর্ব্ব পদ-চিহ্নের প্রত্যেকটীর উপর মাড়াইয়া মাড়াইয়া যে দিক্ হইতে গিয়াছিল, আবার সেই দিকে হটিয়া আসিয়াছিল! এইরূপ সতর্কতা সহকারে কতদূর হটিয়া আসিয়া তাহার পর যে কোথায় গেল, তন্নিরূপণ করা এক প্রকার অসাধ্য ব্যাপার—তাহারা কি আকাশে উড়িল, না পাতালে নামিল?”

এমত সময় ওয়াবালি যে দিকে গিয়াছিল. সে দিকে বিফল-যত্ন হইয়া ফিরিয়া আসিল। উভয় গোড়-গোয়েন্দায় অনেকক্ষণ পরামর্শের পর খয়রাত সহর্ষে বলিয়া উঠিল "পেয়েছি, পেয়েছি—আর কোথায় যায়?" সঙ্গিগণ অবাক্। ফলতঃ গন্ধানুসারী শিকারী কুক্কুরবৎ গোড়-গোয়েন্দাদের ক্ষমতা অতি আশ্চর্য্য! খয়রাত বলিল "এস আমার সঙ্গে এস—বেটারা এখান থেকে বড় বড় লাফ দিয়ে অবশ্যই জলে প'ড়েছে—অবশ্যই পার হ'য়ে ওপারে কতকদূরে গিয়ে আবার হয় তো তেম্নি ক'রে এপারে এসেছে, কি সে পারেই হয় তো কোথায় গেছে—এখনো ঠিক বলা যায় না।" বাস্তবিকও তাই—পার হইয়া সেই আবরিত পদচিহ্ন সকল পুনর্ব্বার দৃষ্ট হইল।

এস্থলে আলিবর্দ্দি এই বলিয়া বিজ্ঞাপনের শেষ করিল, "হুজুর! বেটারা ঘাড়ে ক'রে ঘোড়া ব'য়ে কি অসহ্য কষ্ট ভোগ ক'রেছে! ওপারে গিয়ে আবার আমরা ঘোড়ার পার দাগও পেয়েছি। এখন গোড়-গোয়েন্দারা আমার সহচরগণ সঙ্গে সেই সব চিহ্ন ধ'রে ধ'রে যা'চ্ছে। আমি হুজুরকে এত্তালা দিতে এলেম! বোধ হয় বহু বহু খোঁজ তল্লাস নইলে কাজ হবে না। যে কজন বুনো ডাকা'ত্‌কে আমাদের সঙ্গে আ'স্‌তে দেখা গিছ্‌লো, হয় তো তারাও কা'ল সে দলে ছিল—হয় তো তারা আর এমুখে না এসে বনে বনে পালিয়ে গেছে! কিন্তু যেখানে যা'ক্‌, খয়রাত আর ওয়াবালি ধ'রে দিতে পা'র্ব্বে! এখন হুজুরের যেমন হুকুম হয়?"

বহু বিবেচনায় অনুমিত হইল, মোহর সিং ও মহম্মদ শা অবশ্যই সে দলে ছিল—মোহরের ঘোড়ার পদচিহ্নই দৃষ্ট হইয়া থাকিবে—তাহাকে আর ফিরিয়া আনিবার সুবিধা পায় নাই, সেই অশ্ব লইয়া বন তস্করেরা (যাহারা সৈনিক দলভুক্ত নহে) পলায়ন করিয়াছে—সুযোগমতে আবার হয় তো আসিবে।

তুলীনের নিতান্ত জিদ হইল, দুরাত্মাগণ যেই হউক, ধরিতেই হইবে। যদি তাহারা দশ দিনের পথেও যায়, তথাপি অনুসরণ আবশ্যক। অতএব তিনি নিম্নলিখিত মতে ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন;—

গোড়-গোয়েন্দাদের সঙ্গে আলিবর্দ্দিকে নিজে যাইতে হইবে। বিংশতি জন বিশ্বাসী লোক তাহার সঙ্গে থাকিবে; তন্মধ্যে দশজন মুলতানী অশ্বারোহী ও অবশিষ্ট সিপাই পদাতিক। তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ উপযুক্ত অর্থ দেওয়া হইল। সকলকেই বলিয়া দেওয়া হইবে, এ কর্ম্মে যে যেমন

যোগ্যতা ও তৎপরতা দেখাইবে, তাহারা কংরায় গেলে তদনুসারে প্রচুর পুরস্কার পাইবে। চতুষ্পার্শ্বস্থ জিলার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী প্রভৃতির উপর ইহাদের সাহায্যার্থ অনুরোধ পত্র দেওয়া হইল। এই বিংশতি জনকে রাত্রিকালে বাহিনী হইতে গোপনে বাহির করিয়া লইয়া যাইতে হইবে—যেন নন্দ কি তদনুচরেরা বিন্দু বিসর্গ জানিতে না পারে।

এসব ব্যবস্থাতে আলিবর্দ্দি মহা সন্তুষ্ট, কেবল সাহেবের কাছে সে নিজে না থাকাতে পাছে কিছু বিঘ্ন বিপদ ঘটে, এই চিন্তাই তাহাকে মলিন করিল ও সে কথা সে বার বার জ্ঞাপন করিল। সাহেব তদুত্তরে অন্যান্য প্রবোধের মধ্যে বন্নু, ধন্নু ও তুথনের নামোল্লেখ করিলেন। আলি আপত্তি তুলিল "তাহারা এদেশে নূতন লোক।" তদুত্তরে সাহেব তাহার মুলতানী সহকারী কেরামত খার কথা স্মরণ করাইয়া আলির অন্তঃকরণকে কথঞ্চিৎ সুস্থ করিয়া বিদায় দিলেন।

পর দিন স্কন্ধাবারে ভূরি ভোজ—ডুলীনের নিজের ব্যয়ে—সৈনিকগণ মহা প্রফুল্ল। আলিবর্দ্দি দিবাভাগে প্রকাশ্যে সাধারণমণ্ডলীতে আমোদ আহ্লাদ এবং ভোজে মিশ্রিত থাকিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে লোক নির্ব্বাচন ও সমুদয় আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া যথাকালে সংগোপনে চলিয়া গেল। ডুলীন জনেক দ্রুতগামী অশ্বারোহী-যোগে বিগত সায়ংকালের দুর্ঘটনা-বৃত্তান্ত এবং অন্যান্য বিষয় ঘটিত বিজ্ঞাপনা রাজসভায় পাঠাইলেন। গোপনীয় পত্র ফাকরজীকে ও চাঁদ খাঁকে লিখিতেও বিস্মৃত হইলেন না।

সে দিন বৈকালে রহস্য-যুদ্ধাভিনয় দ্বারা সকলের আমোদ ও মনোরঞ্জন হইল। সন্ধ্যার পর কর্ম্মচারীদের শিবিরে নৃত্য, গীত, বাদ্যেরও ক্রটি হয় নাই। ডুলীন লাহোর হইতে একজন ওস্তাদ ও দুই একজন বাদক সঙ্গে আনিয়াছিলেন, প্রায় প্রতি নিশাতেই তাহাদের নিকট গান শুনিতেন ও শিখিতেন। পূর্ব্বে ইউরোপীয় ঐক্যতান-প্রধান সঙ্গীতেরই পক্ষপাতী ছিলেন, এখন হিন্দু স্বরানুক্রম-প্রণালীর উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের সুধাস্বাদ পাইয়া ক্রমে তৎপ্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছেন! গীত বাদ্যের সময় চেতন ঢুলিতেন—পরে কাপ্তেন হাকিম সিংহ প্রভৃতির নিকট বলিতেন, "আড হাউ কেঁই সেই, এ আবার শুনবো কি? বিশেষ যাহাতে কৃষ্ণ নাম নাই, সে কি গান? আমার বাবা ব'লতেন "কানু বিনু গান্ নাই।" এ দাড়ীওয়ালা

ওস্তাদ কানু না বলিয়া কানাইহ্‌া ব'লে বোকা পাঁঠার মত দাড়ি নেড়ে নেড়ে কি ছাই গায়—না হয়, "কানাই" বল্ যে বুঝি!" ইত্যাদি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কোট কাংরা।

ইহার পর পথিমধ্যে এমন ঘটনা আর কিছুই ঘটে নাই, যাহা বিশেষরূপে উল্লেখ-যোগ্য। কেবল পূর্ব্ব পরিচ্ছেদোক্ত হাকিম সিংহ নামক অশ্বারোহী দলের জনৈক শিখ-নেতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

হাকিম যে ঘোড়াটী চড়িয়া আসিয়াছিলেন, তাহার অসাধারণ শ্রম-সহিষ্ণুতা ও বলবত্তা প্রভৃতি গুণ শুনিয়া ডুলীন তাহার পরীক্ষা লইয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন। অশ্বটা দেখিতে পনির অপেক্ষা বড় নয়, কিন্তু নানা গুণে বেলুন ব্যতীত বাহিনীর সর্ব্ব ঘোটকাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ডুলীন ক্রমে জানিতে পারিলেন যে, হাকিমের ঘোড়া যেমন, হাকিম নিজেও তেমনি উচ্চ বংশজ না হইয়াও নানাগুণে বিভূষিত এবং সর্ব্বতোভাবেই বিশ্বাসপাত্র। হাকিম নন্দের অধীন নন—তিনি অন্য দলভুক্ত ছিলেন। সাহেব তাঁহার প্রতি মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে স্বীয় সমীপবর্ত্তী কর্ম্মচারীদের মধ্যে উন্নত পদে নিযুক্ত করিয়া লইলেন। হাকিম পূর্ব্বে লেপ্টেন (লেফ্‌টেন্যাণ্ট) ছিলেন, এক্ষণে কাপ্তেন হইলেন। কাপ্তেন হাকিম সিংহের অপরিমিত সাহস, তৎপরতা ও শীলতাদি গুণ জন্য তাহাকে সকলেই ভাল বাসিত—প্রশংসা করিত। একদা তাঁহার গুণেই ষড়যন্ত্রময় কোন সঙ্কটাবস্থা হইতে ডুলীন উত্তীর্ণ হন, বাহুল্য ত্যাগ মানসে তদ্বিশেষ উল্লেখ করিলাম না। ফলতঃ গুণগ্রাহক ডুলীন এ'ব্যক্তিতে আর এক জন বিশ্বাসী অনুগত লাভ করিয়া মহা সুখী হইলেন।

স্কন্ধাবার ক্রমে কোট কাংরার নিকটবর্ত্তী। আর এক দিন কুচ করিলেই কাংরার দুর্গ পাওয়া যায়, এমন স্থানে ছাউনি করিয়া ডুলীন মনে মনে বিচার করিলেন, একবারেই সসৈন্য দুর্গদ্বারে নিজের গমন উচিত নয়—অগ্রে দূত প্রেরণ আবশ্যক। অতএব কাংরার শাসনকর্ত্তা দণ্ডবর সিংহের নামে

সৌজন্য ও ভদ্রতা সংকৃত প্রকৃত প্রসঙ্গ ঘটিত একখানি লিপি লিখিয়া উক্ত হাকিম সিংহকে কয়েকটী সহচর সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন।

ডুলীন, হাকিমের প্রত্যাগমনের মধ্যে, বাহিনীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত রহিলেন। সমস্ত সৈনিক ও অশ্বাদির স্বাস্থ্য ও উৎসাহের বৃদ্ধি বৈ কিছু মাত্র হ্রাস লক্ষিত হইল না। বিশেষতঃ দেশীয় নায়কাধীন সৈন্যের ন্যায় কোন বিষয়ে অনিয়ম, অশাসন বা গোলযোগ মাত্রই ছিল না ; বরং বিগত কয়েক সপ্তাহের সুশিক্ষা, সুশাসন ও সুব্যবস্থাতে অবিকল ইউরোপীয় বাহিনীর ন্যায় সকলই সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে পার্ব্বত্য প্রদেশের স্বাস্থ্যকর জল বায়ুর গুণে পশু ও নরব্যূহ আরো বলিষ্ঠ, আরো রণোন্মুখ, আরো কার্য্যক্ষম হইতে পারিয়াছে। ডুলীন মনে মনে মহা আহ্লাদিত—মহা ভরসান্বিত হইলেন।

যথা সময়ে হাকিম সিং পত্রোত্তর আনিলেন। তন্মর্ম্ম এইরূপ ;—

"সাহেব বাহাদুরের ন্যায় সুযোগ্য হস্তে কাংরা সমর্পিত হওয়াতে দণ্ডবর সিংহ আপনাকে গৌরবান্বিত ও সম্মানিত বিবেচনা করেন। কিন্তু একটী কথা আছে। মহামহিমান্বিত মহারাজ তাঁহার এই আজ্ঞাধীনকে সুদৃঢ়রূপে আজ্ঞা করিয়াছেন যে, নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত ভিন্ন কাহাকেও দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে দিবে না—আমার পুত্র কি আমি স্বয়ং আইলেও দিবে না! সাহেব বাহাদুর সদ্বিবেচক, জ্ঞানী ; তিনিই বিচার করিয়া দেখুন, এ অবস্থায় আমার কি করা উচিত। আমার সাধ্য কি যে, মহারাজার সেরূপ অলংঘনীয় আদেশের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারি? অতএব হয় সেই গুপ্ত অভিজ্ঞান প্রদর্শন করুন, নতুবা কাংরা প্রদেশ হইতে বাহিনী স্থানান্তরে লইয়া গিয়া মনান্তর নিবারণ পক্ষে মনোযোগী হউন!"

দণ্ডবরের এবম্বিধ ব্যবহারে ডুলীন কিছু মাত্র ভীত বা কর্ত্তব্য-বিমূঢ় না হইয়া মেজর ফেব্রে খাঁর কর্ত্তৃত্বাধীনে (হাকিমকে তৎসহকারী করিয়া) বাছা বাছা দুই শত পদাতিক ও একশত অশ্বারোহী সঙ্গে দিয়া নিম্নলিখিত পত্র সহ পাঠাইয়া দিলেন। পাছে শুদ্ধ মুখের কথায় বা পত্রের লিখিত যুক্তিতে কাজ না হয়, এজন্য কিছু ভয় দেখাইতে এবং দুর্গাধিকার ভিন্ন তিনি অমনি ফিরিয়া যাইবার পাত্র নন, ইহাও জানাইতে, এই সৈনিক আয়োজন সম্বলিত দূত প্রেরণ আবশ্যক বোধ হইল। এবারকার পত্রের তাৎপর্য্য এইরূপ ;—

"জনশ্রুতিতে জ্ঞাত আছি, শ্রীযুক্ত দণ্ডবর সিংহ বাহাদুর মহাজ্ঞানী প্রবীণ বীর এবং অবশ্যই দরবারের বিশ্বাসী কর্ম্মচারী। তাঁহার সুখ্যাতি সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত আছে। তাঁহার গুণ ও দৃষ্টান্তের অনুকরণ করা পত্রলেখকের নিতান্ত ইচ্ছা। রাজাজ্ঞা পালনে তিনি যেরূপ ইচ্ছুক, পত্র-লেখকও সেইরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। প্রকাশ্য সভায় বসিয়া মহারাজ এ অধীনকে যে কার্যাভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই মহাশয় শুনিয়াছেন। সে দৃঢ়াজ্ঞা আমাকে পালন করিতেই হইবে। তদনুসারে কার্য্য সম্পন্ন না করিয়া অমনি অমনি ফিরিয়া গেলে মহামহিম মহারাজ কি আমার মুখ আর দেখিবেন? না, চিরজীবনের মধ্যে এই অনপনেয় কলঙ্কের কালী আমার নাম হইতে কখনও ধৌত হইতে পারিবে? অতএব বীরের হৃদয়তত্ত্বজ্ঞ বিজ্ঞ দণ্ডবর সিংহ বুঝিতেই পারিতেছেন যে, এই অবশ্য-কর্ত্তব্য কাজে অণুমাত্র অবহেলা করা আমার পক্ষে মরণাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক—এই কর্ত্তব্য নিতান্তই অপরিহার্য্য। অথচ কাংরার বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা মহাশয়ের বয়স ও মর্য্যাদা বিবেচনায় আমার একান্তই আন্তরিক বাসনা, এই কার্যটা সৌজন্যে সমাধা হয়।

"আপনার প্রতি যেরূপ রাজাদেশের কথা লিখিয়াছেন, তাহা সত্য; কিন্তু আপনি বহু কাল দরবার হইতে স্থানান্তরে ও বহুদূরে আছেন, সুতরাং পূর্ব্ব ভাবাবস্থার পরিবর্ত্তন ও নব ভাবাদির প্রবর্ত্তন বিষয়ে অভিজ্ঞাত না থাকিতে পারেন। এখনকার ভাব গতিক এবং সামরিক যন্ত্র কৌশলাদি সকলই যে আর একরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কতক আপনাকে জানাইবার নিমিত্ত এতৎসঙ্গে এক রকম গোলার নমুনা পাঠাইতেছি, তৎপরীক্ষা দ্বারা আধুনিক কালের নব উন্নতির আভাস গ্রহণে সমর্থ হয়েন, ইহাই এ হিতৈষী বন্ধুর এক মাত্র প্রার্থনা!

"সম্প্রতি ইংরাজদের নিকট ইহার নির্ম্মাণ ও ব্যবহার কৌশল শিক্ষা হইয়াছে—আমার কামানের জন্য এরূপ গোলা বিস্তর আসিয়াছে। অত্যুচ্চ শেখরে মেঘ মধ্যে বসিয়া থাকিলেও নিম্ন দেশ হইতে এই গোলা, কামান-যন্ত্র সাহায্যে তথায় প্রেরিত হইতে পারে—গোলায় যে পলিতা সংলগ্ন থাকে, তাহা ধরিবা মাত্রই গোলা গিয়া উদ্দিষ্ট স্থানে নক্ষত্রবেগে উপস্থিত হয়—তত্রত্য ভূমি স্পর্শ করিতে না করিতে গোলা ফাটিয়া তন্মধ্যস্থ ভীষণ উপকরণ সমূহ খণ্ড খণ্ড বজ্রাগ্নির ন্যায় চতুর্দ্দিকে ঘোর সংহারক রূপে বিক্ষিপ্ত হইয়া

পড়ে—তদ্দ্বারা নিমেষমধ্যেই বহু যমদূতের কার্য্য সমধা হইয়া উঠে; আপনি বহুজ্ঞ সম্ভ্রান্ত বীর, পরীক্ষা করিলেই ইহার সত্যতা পক্ষে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারিবেন! যদি পরীক্ষার ইচ্ছা হয়, তবে তদুপযুক্ত কামানও এই সঙ্গে প্রেরিত হইতেছে, আজ্ঞামাত্র আমার কার্য্যাধ্যক্ষগণ প্রদর্শন পক্ষে ক্রটি করিবে না! সুবিজ্ঞ ও সুনীতিজ্ঞ বন্ধুবরকে অধিক লেখা বাহুল্য—উভয়েই এক প্রভুর ভৃত্য—উভয়ের সৈন্যই এক রাজার চমূ—উভয় পক্ষই পরস্পরে ভ্রাতৃবৎ আত্মীয়—অকারণে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ও রাজসৈন্যক্ষয় না ঘটে, তাদ্বধান পক্ষে আপনার ন্যায় বহুজ্ঞ রাজপুরুষের উপর মহারাজার অধিক নির্ভর হওয়া স্বাভাবিক। এইটী নিতান্ত সরল ভাবে স্মরণ করাইয়া দিবার অভিপ্রায়েই এই কয়টী কথা লিখিত হইল। ইহাতে যদি-ধৃষ্টতা দোষ হইয়া থাকে, তবে প্রার্থনা, তদ্রূপ সরল হৃদয়েই তাহা মার্জ্জনা করিবেন। অধিক লিখিলে বাচালতা ও মান প্রদর্শনে ক্রটি হইতে পারে।”

এই স্পষ্ট ইঙ্গিত এবং রণসজ্জা—ভয় মৈত্রতা প্রদর্শন—কিছুতেই কিছু হইল না। দণ্ডবর যে গুপ্ত অভিজ্ঞানের কথা লিখিয়াছেন, তাহা অপ্রকৃত না হইবে। কিন্তু তাহা প্রকৃত না হইলেও, গোলাপ সিংহ গোপনে দুর্গদ্বার মোচনে নিষেধ করিয়া পাঠাইয়াছেন এবং দণ্ডবরের সাহায্যার্থ বহুদর্শী নিপুণ কর্ম্মচারী ও কয়েক শত সিপাই প্রেরণ দ্বারা তাঁহার সাহসবল ও বাহুবল সুদৃঢ় করিয়া দিয়াছেন! দণ্ডবর যে গোলাপ সিংহের অনুগত লোক এবং কাংরা যে গোলাপেরই গুপ্ত আধিপত্যের স্থান, ইহা প্রায় সকলেই জানিত!

ভুলীনকে অগত্যা রণসজ্জাতেই দুর্গের নিকটস্থ হইতে হইল—দুর্গস্থ কামানে অনিষ্ট করিতে না পারে, এমন ভাবেই সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং এমন স্থানেই ছাউনি করিলেন।

দেখিলেন দুর্গটী সামান্য নহে—অভেদ্য বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, তাহা তাঁহাকে মনে মনে স্বীকার করিতে হইল।

একটী দুরারোহ—অতি দুর্গম পর্ব্বতোপরি কাংরা-দুর্গ অবস্থিত; বাণ-গঙ্গা নামে পার্ব্বতীয় নদী কর্ত্তৃক তিন দিকে বেষ্টিত—বর্ষা ঋতুর তো কথাই নাই, অন্যান্য শুষ্ক কালেও তাহাতে বুক জল; সুতরাং দুর্গস্থ গোলাবর্ষণ ও অন্যান্য প্রহরণের প্রতিমুখে শত্রুপক্ষের সাধ্য কি, সে নদী পার হইয়া

যায়! যদিও কোন অসমসাহসিক অমানুষিক সাধনে পার হইতে পারে, হইলেই বা লাভ কি? সে তিনদিকের গিরি-গাত্র প্রায়ই প্রাচীরবৎ ঋজু—স্থানে স্থানে যৎকিঞ্চিৎ ঢালুভাব থাকিলেও নানা কারণে নিতান্তই দুরারোহ, সুতরাং দুর্গরক্ষকদলের সংখ্যা অল্প হইলেও তাহাদের গোলা গুলি প্রক্ষেপের ব্যবস্থার সহিত এই যে অনতিক্রম্য ভীষণ অবস্থা, তাহা লংঘন করে কাহার সাধ্য! রণকুশল অসংখ্য দুঃসাহসী সৈন্যকেও বিমুখ ও বিগতায়ু হইতে হয়! তাহাতে দণ্ডবরের অধীন দুর্গরক্ষকের সংখ্যা দুলীনের দলাপেক্ষা অধিক বৈ অল্প নয়!

কেবল চতুর্থ দিকেই দুর্গ প্রবেশের প্রধান পথ। পথটী পরিসর বটে—প্রস্থে অর্দ্ধক্রোশও হইতে পারে। সেটী অনুন্নত দুইটী ক্ষুদ্র গিরির মধ্যবর্ত্তী উপত্যকা—সে পথ ঢালুভাবে দুর্গে উঠিয়াছে—সেই পথ আবার দ্বিভাগে বিভক্ত, যে হেতু পথের মধ্যভাগে বৃহৎ মৎস্যের পৃষ্ঠের দাঁড়ার ন্যায় একটী সামান্য লম্বা গিরি। সেই শৈল-দাঁড়ার উভয় পার্শ্বস্থ অর্দ্ধ মাইল বা সিকি ক্রোশ করিয়া বিস্তৃত দুইটী পথ দিয়া দুর্গের দুইটী তোরণে উঠিতে হয়। সেই বর্ত্মদ্বয়ের উভয় পার্শ্বস্থ শৈলোপরি এবং দুর্গদ্বারোপরি দণ্ডবরের সৈনিক ও কামান এরূপে সজ্জিত যে, তাহাদের প্রক্ষিপ্ত অগ্নিবৃষ্টি না খাইয়া একটী পক্ষীও তোরণ-দ্বারাভিমুখে যাইতে পারে না!

ঐ ঢালু পথের দৈর্ঘ প্রায় এক ক্রোশ—তাহার নিম্ন সীমার সম্মুখে অপর একটা পর্ব্বত, তাহার নাম "জয়ন্তাগিরি"। পথের উভয় পার্শ্বস্থ সেই দুইটী গিরি হইতে জয়ন্তী সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; মধ্যে অনেকটা সমতল ভূমি। অতএব সেই মুক্ত স্থানই দুর্গবর্ত্মের নিম্ন-সীমা—সেই স্থান দিয়াই ঐ প্রশস্ত পথের কিয়দ্দূর উঠিবার পর তবে সেই গিরি-দাঁড়া দ্বারা বিভাজিত ঐ দুইটী স্বতন্ত্র পথ পাওয়া যায়। যদি জয়ন্তীর উপর হইতে কামান ও বন্দুক অনলোদ্গারণ করে, তাহা হইলে সেই প্রশস্ত পথমধ্যে পদার্পণও দুঃসাধ্য। কিন্তু দণ্ডবর সিংহ জয়ন্তী-শিরে কামনাদি রাখেন নাই। বোধ হয় প্রলোভন দ্বারা শত্রুপক্ষকে ঐ যুগল পথরূপী ফাঁদের মধ্যে আনিবার জন্যই দণ্ডবর জয়ন্তী-শির অধিকার করেন নাই! অথবা কেহ কেহ বলেন যে, "জয়ন্তী-মঠ" নামা সুপ্রসিদ্ধ দেবী-মন্দির ও "দেবী স্থান" নানা তীর্থ থাকাতে তেমন পবিত্রস্থলে অপবিত্র সামরিক হিংসার আয়োজন

করিতে হিন্দুচূড়ামণি দত্তবর কুণ্ঠিত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তাহাও সম্ভবপর হইতে পারে না, যেহেতু ঐ দেবীস্থান জয়ন্তীর শির দেশে অধিষ্ঠাপিত ; সেই স্থান দুর্গবর্ত্ম হইতে বহু উর্দ্ধে ; তাহার কিয়দ্দূর নিম্নে জয়ন্তীর দুইটী বাহু দুর্গসম্মুখস্থ বর্ত্ম বা উপত্যকা ভূমির উপর কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর। দত্তবর মনে করিলে সেই বাহুদ্বয়ের উপরিভাগে সৈন্য ও কামান রাখিতে পারিতেন, তাহাতে পবিত্রতার বিঘ্ন হইত না, অথচ পথ-রক্ষক হইতে পারিত। অতএব প্রথম অনুমানকেই উপযুক্ত কারণ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। যাহাহউক দত্তবরের এই ত্রুটিতে তুলীনের সুবিধা হইল।

তুলীন দেখিলেন, জয়ন্তীর বাহুদ্বয়ের উপরিভাগে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাকৌশলে মঞ্চবিশেষ রচনা পূর্ব্বক তাহাতে কামান বসাইয়া "শেল্" নামক গোলা ছুড়িতে পারিলে দুর্গমধ্যে অশেষ অনিষ্ট ঘটান যাইতে পারে। যদিও এই অভেদ্যদুর্গ অধিকারার্থ ইহা যথোপযুক্ত উপায় নহে, তথাপি আর যাহা কিছু বিশিষ্ট উপায় অবলম্বিত হইবে, ইহা তাহার পোষকতাপক্ষে বিস্তর কাজে লাগিতে পারিবে।

জয়ন্তীর বাহুদ্বয় হইতে সামান্য গোলাবর্ষণ হইবে, দত্তবর ইহাই জানিতেন। তজ্জন্য প্রস্তুতও ছিলেন এবং সে কথা কেহ বলিলে হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। কিন্তু জগতে "শেল্" নামক ভয়ানক গোলার যে সৃষ্টি হইয়াছে, তখন তিনি জানিতেন না, জানিলে জয়ন্তী ছাড়িতেন না! অতএব তিনি কেবল দুর্গের সর্ব্বদিক্ রক্ষার নিমিত্ত দুর্গাভ্যন্তরে অদৃশ্যে ও সুরঙ্গাদির উপর যথেষ্ট আয়োজন করিয়াই সন্তৃপ্ত হৃদয়ে ক্ষান্ত আছেন। সে সব আয়োজন সামান্য নহে ; তৎপ্রতিবিধানার্থ তুলীন সহজ উপায় কিছুই দেখিতেছেন না —গভীর চিন্তাশক্তিকে কেবল নিয়ত চালনা করিতেছেন।

আবার জনরবে শ্রুত হইল, দত্তবর দুর্গমধ্যে এত খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন যে, বর্ষব্যাপিয়া অবরোধ চলিলেও সে বিষয়ে তাঁহার শঙ্কা মাত্র নাই। বিশেষতঃ গোলাপ সিংহের সৈন্য সংযোগে তাঁহার লোকবল যখন তুলীনের অপেক্ষাও বেশী, তখন চাই কি, সাহস সহকারে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া সুকৌশলে সৈন্য চালন পূর্ব্বক আক্রমণকারীকে আক্রমণ করিতে পারিলে জয়েরও সম্ভাবনা আছে, সুতরাং অধিক দিন অবরোধে থাকিবারই বা আশঙ্কা কি? কেবল সাহেব বলিয়াই এবং সাহেব যেরূপ অসাধারণ দক্ষতা সহকারে

সৈন্যগণকে শিক্ষা দিয়াছেন, জনশ্রুতিতে সে সংবাদ পাইয়াই বহির্গমন পূর্ব্বক তদ্রূপ আক্রমণ পক্ষে ইতস্ততঃ করিতেছেন!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দুর্গ জয়।

সকলই প্রতিকূল অবস্থা; তথাপি দুলীনের অধ্যবসায়ী মন ভীত, বিচলিত বা শিথিল সংকল্প হইল না। প্রতিভার ধর্ম্মই এই; সম্মুখে বাধা বিঘ্ন যতই প্রবল হয়, তাহার উদ্ভাবিকা শক্তি ততই তেজস্বিনী হইয়া উঠে।

তিনি অনেক চিন্তার পর, জলট্টীর বাতবয়ের উপরিভাগ অধিকার ও মঞ্চ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কামান বসাইলেন; কিন্তু মনে জানেন, "শেল্" গোলা নিক্ষেপে শত্রুকে কেবল ব্যতিব্যস্ত করা বৈ অন্য বিশেষ ফললাভ হইবার সম্ভাবনা অল্প। অতএব সে কাজ যেমন চলিবে, তেমন কোন একটা গুপ্ত উপায়ে দুর্গের কোন অংশ ভেদ পূর্ব্বক অভ্যন্তর আক্রমণ ব্যতীত দুর্গাধিকার ঘটিয়া উঠা ভার—অথচ কোন দিকেই সেরূপ প্রার্থিত ঘটনার সুযোগ সুবিধা সহসা দৃষ্ট হইতেছে না। দুর্গের চতুর্দ্দিক-দর্শী গুপ্তচর ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারিগণ পুনঃপুনঃ আসিয়া যেরূপ বিজ্ঞাপন দিতে লাগিল, তাহাতে অন্য কেহ হইলে নিতান্তই নিরাশ হইয়া পড়িত। কিন্তু দুলীনের অভিধানে নৈরাশ্য শব্দ লিখিত নাই! অতএব উপায়-চিন্তাকালে স্থির করিলেন, সর্ব্বাদৌ দুর্গের বহির্ভাগের সমুদয় স্থান তন্ন তন্ন রূপে স্বচক্ষে পরিদর্শন নিতান্তই আবশ্যক। যদিও তাঁহার মনোভাব কার্য্য ও বর্ণ প্রচ্ছন্ন করা দুরূহ—শত্রুর চক্ষে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব—প্রকাশ পাইবা মাত্র প্রাণাত্যয়ের সম্ভাবনা—তথাপি কর্ত্তব্য উদ্দেশে প্রাণের মায়া ত্যাগ অত্যাবশ্যক বোধ করিলেন।

কোন কৌশলে জয়ন্তী মঠের দুইজন অবধূতের বেশ ভুষা আনাইয়া দুলীন নিজে সন্ন্যাসী সাজিয়া ও হাকিম সিংহকে চেলা সাজাইয়া ত্রিশূল আংটা হস্তে অতি সংগোপনে শিবির ছাড়িয়া শস্য-ক্ষেত্র ও আরণ্য পথ ঘুরিয়া আসিয়া নদী পুলিনে, তরুতলে, বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পক্ষিরাজ গৃধ্রের ন্যায় সুতীব্র দৃষ্টিতে দুর্গের চতুর্দ্দিগস্থ বহির্ভাগ মধ্যে এমন স্থানের সন্ধান

দেখিতে লাগিলেন, যথায় বাণগঙ্গা পার হইয়া পর্ব্বত-গাত্র বাহিয়া দুর্গে উঠা যায়। তাঁহার বানপ্রাস্থিক ঝুলির মধ্যে একটী দূরবীক্ষণ যন্ত্রও লুক্কায়িত ছিল। তরু গুল্মাদির অন্তরাল হইতে সেই যন্ত্রযোগে বহু বহু স্থানে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের পর একটী মাত্র স্থান দৃষ্ট হইল, যেস্থানে অভীষ্ট সিদ্ধি কিয়দংশে সম্ভব হইলেও হইতে পারে।

সেই অংশটার দুর্গ-শেখর ঘন বনাকীর্ণ। কিন্তু সে স্থানের তল ভূমি হইতে ঐ জঙ্গলা শেখর পর্য্যন্ত পর্ব্বত-গাত্র এককালে সরলোচ্চ—ঠিক যেন পাষাণ-প্রাচীরের ন্যায় ঋজু ভাবেই দণ্ডায়মান। যদিও উত্থানপক্ষে সে স্থানটী বিশেষ কষ্টদায়ক, তথাপি একটা মহৎ সুবিধা এই যে যদি কোন কৌশলে তাহার তলভূমিতে যাওয়া যায়, তবে উপর হইতে বড় একটা দৃষ্ট হয় না এবং উপর হইতে গুলিগোলা ছুড়িলেও নিম্নস্থ লোকদিগের গায়ে তাহা লাগিতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি, তেমন সরলোচ্চ পাষাণ-প্রাচীর বহিয়া উঠা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। বোধ হয়, সেই জন্যই দুর্গের সেই ভাগটাতে কামান কি সতর্ক প্রহরিতা রাখিতে দুর্গাধ্যক্ষ যত্ন করেন নাই।

বীরপ্রধান জুলীন সে স্থানের অবস্থা দর্শনে মহা আহ্লাদিত হইলেন—সর্ব্ব দিকে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া আসিয়া এখানে কিঞ্চিৎ (যৎকিঞ্চিন্মাত্র!) আশার সঞ্চার হওয়া কি সামান্য আনন্দের বিষয়? এমন কি সেই স্থানটী (উঠিবার পক্ষে যেমন হউক) অরক্ষিত দেখিবামাত্র হর্ষে তাহার দেহ লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল!

ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীর তাৎকালিক নেত্র-জ্যোতিঃ ও দৃষ্টি-ভঙ্গী দণ্ডধরের কোন রক্ষী যদি দেখিতে পাইত, তবে আর জটাধারী অবধূত মহাশয়কে সে স্থান হইতে ফিরিয়া যাইতে হইত না! যেহেতু তিনি হর্ষোদ্দীপ্ত সতৃষ্ণ নয়নে একবার দুর্গোপরিস্থ বনের দিকে, একবার চেলা রূপী হাকিম সিংহের মুখপানে পুনঃ পুনঃ চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন!

হাকিম তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া নমস্কার পূর্ব্বক ইঙ্গিতে আশা ও হর্ষভাব প্রকাশ করিল। কিন্তু পরক্ষণেই দুর্গ-গাত্রটা নয়ন ভঙ্গীতে দেখাইয়া দিয়া মলিন বদনে মৃদু মন্দ স্কন্ধ সঞ্চালন করিল!

জুলীন বিস্ময় ও অসন্তোষ-ব্যঞ্জক দৃষ্টির সহিত অতি মৃদুস্বরে বলিলেন

"কি ? বীর নাম ধরিয়া, জয়াশায় উদ্দীপ্ত হইয়া. এই গিরি-গাত্র দিয়া উঠিতে পারিবে না ? তবে আর সামান্য মনুষ্যে আর বীরে প্রভেদ কি ?"

হাকিম অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন "আমি পারি, দু একজন কেউ কেউ পারে, সকলে কি পারিবে ?"

ডুলীন কহিলেন, "দু একজন তো পারে ! তবে কি না হইল ? তাতেই অনেকের পথ হইতে পারিবে। আইস তাহার পরামর্শ করি গে।"

ডুলীন শিবিরে গিয়া তাঁহার নিতান্ত বিশ্বাসী আর দুই তিন জন কর্ম্মচারীর সহিত তৎপর হইয়া সমস্ত উপায় ও আয়োজন ঠিক করিলেন। সেই রজনীতে আক্রমণ স্থির হইল। সে রাত্রে জয়ন্তীর প্রসারিত বাহুদ্বয়ের উপর হইতে শেল্ গোলা নিয়ত নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। উপত্যকার দিকে দুর্গের যে দুইটী ফটক ছিল, দুই দল সৈন্য তাহাদের অভিমুখীন হইবার ভাণ করিতে লাগিল—যেন সেই তোরণদ্বয়ই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য স্থল, এরূপ আড়ম্বর ও উদ্যোগের আয়োজন দেখান হইল ! দুর্গের অন্যান্য দিকেও (যে যে স্থল কিছু ঢালু) সৈন্যগণ অনিয়মিত ও বিক্ষিপ্ত ভাবে গোলা গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু বস্তুকর্ত্তৃক যে অংশ প্রকৃত লক্ষ্যের স্থান, সে দিকে চুঁ শব্দটী নাই—সে দিকে যেন কেহই যায় নাই—সে দিকে যেন যাওয়া বৃথা ; এমন ভাবই প্রদর্শিত হইল ! অথচ ডুলীন নিজে বাছা বাছা ও বিশ্বাসী সৈনিক লইয়া সেই দিকেই রজনীর অন্ধকারে লুক্কায়িত ভাবে প্রকৃত কার্য্য করিতেছেন।

পুরাতন প্রাচীন যোদ্ধা দণ্ডবর সিংহ নিতান্তই প্রতারিত হইলেন—যে যে দিকে ডুলিন-সৈন্যের অগ্নিবর্ষণ ও আক্রমণ দেখিলেন, সেই সেই ভাগেই প্রত্যগ্নিবর্ষণ ও বিবিধ প্রতিবিধানকার্য্যে মহা ব্যস্ত সমস্ত থাকিলেন। তিনি ভাবিতেছেন, আক্রমণকারীরা তাঁহার অগ্নিমুখে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। দুর্গ একেই স্বভাবতঃ দুর্ভেদ্য, তাহাতে বিস্তর লোক ও বিস্তর কামানাদি দ্বারা সংরক্ষিত, কাজেই মহোল্লাসে যুদ্ধ করিতেছেন আর সিংহনাদে বলিতেছেন "আসুক না, ভালই তো !"

নন্দকে বিশ্বাসঘাতক জানিয়া তাহার প্রতি ডুলীন আজ্ঞা দিয়াছিলেন, "আমার বিশেষ অনুমতি ভিন্ন সৈন্যগণ অমুক অমুক সীমা হইতে একপদও যেন অগ্রে সরিয়া না যায়।" অন্যান্য সৈন্যাধ্যক্ষ ডুলীনের গোপনীয় শিক্ষা-

নুসারে প্রকৃতপক্ষে কেহই অগ্রসর হইতেছেন না—কেবল আক্রমণের ভাণ ও ধুমধাম মাত্র দেখাইতেছেন! সুতরাং দণ্ডবর অবশ্যম্ভাবী জয়ের উৎসাহে মহা আমোদিত ও গর্ব্বিত হইয়া উঠিতেছেন এবং "ডুলীন সাহেবের এই বুঝি নাম যশ!" বলিয়া মাঝে মাঝে কত স্পর্দ্ধাই করিতেছেন! কিন্তু ও দিকে যে সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, তখন তাহার বিন্দু বিসর্গ স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই!

ডুলীন পাঁচ শত বাছা সৈনিক ও সুযোগ্য সৈন্যাধ্যক্ষগণ সমভিব্যাহারে নিঃশব্দে লক্ষ্য স্থানের সন্নিহিত হইলেন। নদী তীরে গিয়া অনুচ্চ স্বরে যাহা করণীয় তত্তাবতের আদেশ উপদেশের সহিত বলিয়া দিলেন, "অগ্রে যে ব্যক্তি দুর্গোপরি উঠিয়া এই সব রজ্জুসোপানাবলী উপরিস্থ বৃক্ষাবলীতে সংলগ্ন করিয়া দিতে পারিবে, পাঁচশত মোহর তাহার পুরস্কার এবং এই স্থানেই পদোন্নতি লাভ নিশ্চিত।"

এই পারিতোষিক লোভে অনেক বীরের মধ্যেই ঘোর প্রতিযোগিতা বাধিয়া উঠিল। অথচ সেই হুড়াহুড়িতে বিশেষ গোলমাল না হয়, ডুলীন তৎপক্ষেও সুব্যবস্থার ত্রুটি করিলেন না। অতএব অতি সতর্ক ও নিস্তব্ধ-ভাবে নদী পার হইয়া কয়েকজন সুকৌশলী সাহসী পুরুষ কাঠ বিড়ালবৎ অতুল গুণপনার সহিত পর্ব্বত-গাত্র দিয়া উঠিতে লাগিল। কেহ কেহ বা পুরস্কার বিভাগ করিয়া লইবার সংকল্পে পরস্পরকে সাহায্য করিল। অর্থাৎ একের স্কন্ধে অপরে, তৃতীয় ও চতুর্থ তাহাদের পার্শ্ব ধরিয়া উঠিতেছে, অপরে গিয়া তাহাদের সাহায্য করিতেছে ও লইতেছে। ইত্যাকারে কত কত জন কত চেষ্টা করিতে লাগিল—কতক বা না পারিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল—দুই এক জন বা কিয়দ্দুর হইতে পড়িয়াও গেল।

শেষের ঘটনা-জনিত শব্দ শুনিয়া ডুলীন ভীত হইলেন। প্রতিকারার্থ নদীর একাংশে নিশ্চল জলের যে একটী খাঁড়ি ছিল, তথা হইতে রাশি রাশি শৈবাল আনাইয়া পর্ব্বতের তল-দেশে যথেষ্ট পুরু করিয়া বিছাইয়া দিলেন। তাহাতে শুদ্ধ শব্দ নিবারণ নয়, যদি দৈবাৎ কেহ পড়িয়া যায়, তাহার প্রাণরক্ষারও কতক উপায় হইল।

কিন্তু যে যতই চেষ্টা করুক, হাকিম সিংহকে কেহই পারিল না—হাকিম সর্ব্বাগ্রেই শীর্ষদেশস্থ বনভূমিতে উপস্থিত হইয়া স্বীয় কটিস্থ কয়েকটী দড়ির

সিঁড়ির মুড়া খুলিয়া বৃক্ষকাণ্ডে দৃঢ় বন্ধন করিলেন। তলায় যাহারা অপর ভাগ ধরিয়া ছিল, তাহারা উপরের টান জানিতে পারিয়া সহর্ষে দৌড়িয়া গিয়া সাহেবকে সুসংবাদ প্রদান করিল। দুলীন তৎক্ষণাৎ সেই রজ্জু-সোপান কয়টার নিম্নাগ্রভাগ বৃহৎ দুই শিলাখণ্ডে জড়াইতে ও কতকগুলি লোককে দৃঢ়রূপে তদ্বাবৎ ধরিয়া রাখিতে বলিয়া সিঁড়ি দিয়া সৈন্যগণকে উঠিতে আদেশ করিলেন—অন্যান্য উত্থানকারীরাও ততক্ষণে হাকিমের দৃষ্টান্তানুসারে অন্যান্য রজ্জু-সোপানাবলী দৃঢ়ীভূত করাতে এক এক ক্ষেপে অনেক লোক উঠিতে পারিল।

আমরা সামরিক ইতিহাস যতই পড়ি, ততই এই সংস্কার নিঃসংশয়রূপে বদ্ধমূল হয় যে, সেনাপতির গুণ দোষ তাড়িতের কার্য্যবৎ সৈন্য শরীরে সংক্রমণ পূর্ব্বক হয় তাহারা অসম্ভব শৌর্য্য, বীর্য্য দেখায়, নয় তো হাটের হাটুরিয়া তুল্য বৃথা গোলযোগকারী অকর্ম্মণ্য দল হইয়া পড়ে! যে ফরাসী সেনা অষ্ট্রিয়ার নিকট পদে পদে পরাস্ত, বিপদ্‌গ্রস্ত ও অপমানিত হইতেছিল, নেপোলিয়ানকে সেনানী রূপে শিরোভাগে পাইয়া অবাধে সেই সৈনিকগণই সেই অষ্ট্রিয়ার সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতিগণ-চালিত পূর্ব্বজয়ী সামন্তব্যূহকে পদে পদে পরাস্ত, বিপদ্‌গ্রস্ত ও যৎপরোনাস্তি অপমানিত করিয়া তুলিল! তখন নেপোলিয়ান কি ঘর হইতে নূতন লোক আনিয়াছিলেন, না, সেই সব পূর্ব্ব মনুষ্যই ছিল? পূর্ব্বে যাহারা, পরেও তাহারা! তথাপি কার্য্য দেখিয়া বোধ হইল, তিনি যেন নূতন যোদ্ধা সকল সৃজন করিয়া লইয়াছেন! বাস্তবিকই প্রায় তাই। অর্থাৎ পূর্ব্বে জড়বুদ্ধির চালনা; পরে সজীব প্রতিভার বৈদ্যুতিক তেজে যন্ত্ররূপী সৈনিকগণ যেন নবভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল—এইমাত্র প্রভেদ!

বর্ণনীয় রজনীতে তাহাই ঘটিল—দুলীনের তেজস্বী প্রতিভা, অসীম সাহস এবং সময়োচিত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি গুণাবলী সেই রজনীতে বৈদ্যুতিক অগ্নিবৎ দেদীপ্যমান হইতে লাগিল, তাহার সংক্রমণ ও সহানুভূতিতে সঙ্গীমাত্রেই অসম্ভবরূপে উৎসাহিত ও বীরকার্য্যে উত্তেজিত হইয়া উঠিল! "যোগ্য পরিচালক দ্বারাই আমরা সুচালিত হইতেছি!" এই যে বিশ্বাস, রণরঙ্গস্থলে ইটী বড় আবশ্যক—শতগুণে সাহস ও বল-বর্দ্ধক। দুলীনের সঙ্গিগণ এই আভ্যন্তরিক সংস্কারের বশেই আপনাদিগকে সম্পূর্ণ নিরাপদ জানিয়া যেন অট্টা-

লিকার সোপানেই উঠিতেছে, এই ভাবে পরমোৎসাহে, সেই রজ্জুতে ঝুলিয়া ঝুলিয়া উপরে উঠিতে লাগিল! বার বার পর্ব্বত-গাত্রসংঘর্ষে আঘাত পাইল—ক্ষণে ক্ষণে শরীর টল্‌টলায়মান, চরণ অস্থির, তথাপি গ্রাহ্য নাই! এরূপে অনতিবিলম্বেই দুর্গস্থ জঙ্গলভূমি পাঁচ শত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অস্ত্রধারী দ্বারা পূর্ণ হইল। প্রায় সকলের শেষে দুলীন উঠিলেন।

উপত্যকাস্থ সৈন্যগণের অধ্যক্ষ কাপ্তেন ফেরেব খাঁ ও মেজর সুজন সিংহের প্রতি পূর্ব্ব হইতেই এই উপদেশ দেওয়া ছিল যে, "দুর্গের অমুক ভাগ হইতে 'রকেট' নামক আগ্নেয় গোলা যেই তোমরা তিনবার শূন্যে উঠিতে দেখিবে, অমনি জয়নাদ উচ্চারণ পূর্ব্বক ফটক আক্রমণে ধাবমান হইবে: নন্দ সিং দুর্গের অন্য দিকে অধ্যক্ষতা করিতেছে, তাহার সৈন্যকে এ কাজে আবশ্যক হইবে না, সুতরাং তাহাকে এ হুকুম কদাচ শুনাইবে না—কখনই শুনাইবে না!"

অধুনা দুলীন স্বীয় পাঁচশত সহচর সঙ্গে দ্রুতপদে বন ভূমির বাহির হইবা মাত্র শূন্যপথে তিনবার রকেট (হাউই) ছাড়িয়াই ভীষণ জয়ধ্বনি সহকারে দুর্গমধ্যে দৌড়িলেন। রকেট দর্শনে ফটকদ্বয় আক্রমণকারী উপত্যকাস্থ দুই-দল সৈন্য হইতে ভয়ঙ্কর সিংহনাদের পর সিংহনাদ উঠিল—যুগপৎ অমনি অভ্যন্তরস্থ পাঁচ শত এবং বহির্ভাগস্থ শত শত বীর, ভিতর বাহির হইতে ফটকের দিকে দৌড়িল!

ওপক্ষে দণ্ডবরের লোক তখন ভিতরের ব্যাপার জানিতে পারিয়া এবং বহিরাক্রমণের অসম্ভব বেগ দর্শন করিয়া নিতান্ত হতাশ ও ভয়ে স্তম্ভিতবৎ হইয়া পড়িল। দণ্ডবর যথার্থ বীর যোদ্ধার ন্যায় স্বীয় ভগ্নোদ্যম সৈনিকগণকে দলবদ্ধ ও পুনরুৎসাহিত করিতে বিধিমতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ হইতে পারিলেন না। কতক লোক লইয়া দুলীনের অভিমুখে ছুটিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই আর শত্রুর বেগ নিবারণে সমর্থ হইলেন না—সম্পূর্ণ পরাস্ত হইলেন—তাঁহার অল্পবল অনুচরগণ যে যে দিকে পাইল পলাইতে লাগিল। দুলীনের আদেশে তাঁহার সঙ্গিগণ দৌড়িয়া গিয়া ফটক খুলিয়া দিল—"জয় রণজিৎ—জয় দুলীন—গুরুজীকো ফতে" ইত্যাদি বীরনাদে বাহিরের সৈন্য ভিতরে প্রবেশ করিল! দণ্ডবর তখনও যুঝিতেছেন, কিন্তু বৃথা—সবই বৃথা হইল!

এ দিকে দুলীন শান্তি-পতাকা ও শান্তি দূত প্রেরণ দ্বারা দণ্ডবরকে বলিয়া

পাঠাইলেন "মহাশয় বিজ্ঞ, আমরা উভয়েই এক প্রভুর ভৃত্য—এক রাজার বাহিনী, তবে কেন বৃথা আপনা আপনি কাটা কাটি করিয়া মরি? অতএব ক্ষান্ত হউন—রাজাজ্ঞা মতে আমাকে দুর্গাধিকার 'ছাড়িয়া দিউন' কথাটী বলা বাহুল্য, তথাপি আপনি প্রাচীন, আপনি সম্ভ্রান্ত বীর, আপনার মান্য রাখা আমার সর্ব্বাংশেই উচিত।"

দণ্ডবরের নিকট দূত গেল, সেই অবসরে দুলীন স্বীয় সৈন্য মধ্যে দৃঢ় আজ্ঞা প্রচার করিলেন, কেহ যেন কদাচ কোন অত্যাচার বা লুণ্ঠনাদি না করে—যে করিবে ভয়ানক দণ্ড পাইবে। সুতরাং শত্রু হস্তে দুর্গ পতিত হইলে যে সমস্ত অত্যাচার সম্ভব, তাহার কিছুই হইল না—কেবল প্রধান প্রধান পুরী, স্থান ও পথ গুলি অধিকার করা এবং দুর্গ হইতে কোন পথে কোন মতে কাহাকেও বাহিরে যাইতে না দেওয়া, দুলীন-সৈন্যের এই পর্য্যন্তই কার্য্য-সীমা নির্দ্দেশ হইল।

দণ্ডবর সিংহ দুলীন সাহেবের শৌর্য্য ও বুদ্ধিচাতুর্য্য দর্শনে যেমন নিরুৎসাহ, তাঁহার সৌজন্য জন্যও ততোধিক সন্তুষ্ট হইয়া আপন প্রধান কর্ম্মচারিগণ সমভিব্যাহারে দুলীনের সম্মুখীন হইলেন। দুলীন যথোচিত মান্য সহকারে সাদরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপ করিতেছেন, এমন সময় সংবাদ আইল—একজন অশ্বারোহী দূত রাজধানী হইতে রাজাদেশ লইয়া আসিয়াছে। সে ফটকে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না বলিয়া মহা অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে।

দুলীন তৎক্ষণাৎ তাহাকে আনাইলেন। তাহার ও তাহার অশ্বের অবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই জানা গেল যে, যথার্থই অবিশ্রান্ত ভাবে অতি দ্রুত অশ্ব চালাইয়া সে আসিয়াছে। এত ত্বরার কারণ শুধু মহারাজ ও ফকিরজীর দৃঢ় আজ্ঞা। ফকিরজী কোন সূত্রে জানিতে পারিয়াছিলেন, দণ্ডবর সহজে কাংরা পরিত্যাগ করিবেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ ইঙ্গিতে মহারাজকে তদাভাস জ্ঞাপন করেন। তখন মহারাজার স্মরণ হয় যে, "গোপনীয় সঙ্কেত-বিশেষ না পাইলে কাহাকেও দুর্গাধিকার ছাড়িয়া দিবে না" এই রাজাজ্ঞার ছল ধরিয়া দণ্ডবর সিংহ দুলীন সম্বন্ধীয় পরওয়ানা অগ্রাহ্য করিতে পারেন এবং দুলীনকেও যেরূপ ক্ষমতা ও পূর্ণাদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে তিনিও ছাড়িবার লোক নন। কাজেই ঘোর বিগ্রহের সম্ভাবনা। সে বিগ্রহ তাঁহারই নিজের দুই সুযোগ্য উচ্চ কর্ম্ম-

চারী মধ্যে এবং তৎফল নিজ সৈন্যক্ষয়। অতএব ফকিরজীর প্রতি প্রতি-বিধানের আদেশ হয়। ফকিরজী বিশ্বাসী দূতদ্বারা দণ্ডবরের নামে এরূপ পত্র ও গুপ্ত অভিজ্ঞানাদি পাঠাইয়াছেন যে, তাহাতে দণ্ডবর, নিতান্ত বিদ্রোহী না হইলে, পূর্ব্ব পরওয়ানা আর অগ্রাহ্য করিতে পারেন না।

কিন্তু তুলীনের ভুজবলে পরওয়ানা আসিবার পূর্ব্বেই পরওয়ানা-জারি হইয়া গিয়াছে! দূত ফটকে আসিয়াই তাহা জ্ঞাত হইয়াছে। তথাপি রীতিমত অভিবাদনপূর্ব্বক দণ্ডবরের হস্তে পুলিন্দা অর্পণ করিল। দণ্ডবর পাঠ করিয়া কহিলেন—

"রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য। যদিও সাহেব ছলে কৌশলে দুর্গাধিকার করিয়াছেন, কিন্তু শত্রুতার হস্তে শীঘ্র মুক্ত হইতে পারিতেন না—পুনর্ব্বার স্বস্থান প্রাপ্তি পক্ষে বিশেষ চেষ্টা না করিয়া আমি কদাচই ক্ষান্ত হইতাম না—অন্ততঃ বহু সৈন্য আনিয়া কিছুকাল অবরোধ ও বহির্ভাগ হইতে অশেষ উৎপাত করিতেও ছাড়িতাম না। কিন্তু উপযুক্ত সময়েই মহারাজার গুপ্ত অভিজ্ঞান আসিয়া সাহেবকে সে বিপদ হইতে রক্ষা করিল! এখন আমি স্বদল বল লইয়া চলিলাম, সাহেব মনের সুখে রাজত্ব করুন!"

তুলীন হাসিয়া কহিলেন "আপনি যে কারণে এই অভিজ্ঞানকে আমার সৌভাগ্যের হেতু বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, আমি কিন্তু তাহাকেই আমার হরিষে বিষাদ-সাধক বলিয়া ভাবিতেছি। কেননা, ইহা না আসিলে আপনার ন্যায় প্রবীণ যোদ্ধার যুদ্ধ-প্রণালী ও অবরোধ-প্রণালী দেখিয়া অবশ্যই কিছু শিখিতে পারিতাম! অদ্য আপনার দুর্গরক্ষণ-প্রণালী তো যথেষ্ট দেখিয়াছি, সেইরূপে আবার অবরোধ-নৈপুণ্য যে দেখা হইল না, ইহাতে বড় আক্ষেপ রহিল!"

চতুষ্পার্শ্বস্থ উভয় পক্ষীয় কর্ম্মচারিগণ পরস্পর মুখ চাহিয়া মৃদু হাসি হাসিল। তাহা দণ্ডবরের অলক্ষিত রহিল না। দণ্ডবর সরল-স্বভাব, সরল বোদ্ধা, সরল যোদ্ধা; তথাপি এই টিটকারী তাঁহার হৃদয় ভেদ করিল—ঘৃণা, লজ্জা ও ক্রোধে তাঁহার কেশ ও গাত্রলোম উচ্চ হইয়া উঠিল—দেহ ও অধরোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার শুভ্র কেশ দর্শনে তুলীনের অনুতাপ ও আত্মগ্লানি জন্মিল—একে প্রভুর স্বজাতীয়, তায় বৃদ্ধ, তায় বিজীত, তায় পুরাতন কর্ম্মচারী, তায় পদচ্যুত, তায় তাঁহারই পদে নিজে নিযুক্ত, এমন

ব্যক্তি একটু গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া এরূপ বক্র লাঞ্ছনা দ্বারা তাঁহার দুরবস্থা ও নিজের সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া দেওয়া উচিত কাজ হয় নাই।

এই চৈতন্যোদয় হইবা মাত্র তুলীন তৎক্ষণাৎ বিনীত ভাবে দণ্ডবরের হস্ত ধারণ করিয়া কাতর স্বরে বলিলেন "আমার অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা করুন—আপনি বহুদর্শী, জ্ঞানী; আপনি অবশ্যই জানেন, আমরা কত কাজ আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও করিয়া ফেলি—আপনাকে সত্য বলিতেছি, আপনার প্রতি কোন অবস্থায় কোনরূপ অমান্য প্রদর্শন আমার অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত; তথাপি দৈবাধীন আমার মুখ হইতে এমন অনুচিত বাক্য কেন নির্গত হইল, বলিতে পারি না। যাহারা যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখে বল-দর্পিত উক্তি সহ্য করিতে পারে না, এই জন্যই হউক, অথবা আমার অল্প বয়সের স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য দোষ জন্যই হউক, যাহা বলিয়া ফেলিয়াছি, তাহার আর উপায় নাই। শুনিয়াছি, আপনি উদারচেতা, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই ঔদার্য্যগুণে আমার অনুতাপ গ্রাহ্য করুন—আমাকে মার্জ্জনা করুন—আমার কথাটী ভুলিয়া যাউন।"

এই পশ্চাত্তাপমূলক ক্ষমাপ্রার্থনাটী তুলীন এরূপ অকপট ভাব ভঙ্গীতে করিলেন যে, দণ্ডবরের সরল প্রাণ প্রসন্ন না হইয়া থাকিতে পারিল না। তুলীনের পরবর্ত্তী অন্যান্য সৌজন্য ও নম্র ব্যবহারেও মনোমালিন্য সম্পূর্ণরূপেই তিরোহিত হইল; এমন কি অল্প ক্ষণেই উভয়ের মধ্যে সখ্য ভাব দেখা দিল।

দণ্ডবর সেই প্রভাতেই (অনেকক্ষণ প্রভাত হইয়াছিল) স্বীয় দল বল লইয়া যাইতে উদ্যত; কিন্তু তুলীন তাঁহাকে ছাড়িলেন না। সুতরাং তাঁহার অধিকাংশ লোক জন চলিয়া গেল, কেবল কতিপয় সহচর মাত্র তাঁহার সমভিব্যাহারে রহিল—তাঁহার সমুদয় দ্রব্যাদি তাঁহার ভৃত্যবর্গ পাঠাইতে লাগিল। তিনি সেই দিন সাহেবের নিমন্ত্রিত অতিথি রূপেই কাণ্ডো দুর্গে অবস্থান করিলেন।

সাহেবের অনুতপ্ত ব্যবহারেও অকৃত্রিম যত্নে ঋজুস্বভাব দণ্ডবর সিংহ পরিতুষ্ট হইয়া কাংরা সম্বন্ধীয় অনেক প্রয়োজনীয় কথা সাহেবকে বলিয়া দিলেন। পরদিন প্রত্যুষে যাত্রা করিলেন—যাত্রার প্রাক্কালে যাহা কিছু

হইয়াছিল, তাহা পাঠক পরে জানিতে পারিবেন। তুলীন অশ্বপৃষ্ঠে দণ্ডবরের সঙ্গে গিয়া অনেক দূর আগাইয়া দিয়া আসিলেন। বিদায়কালে প্রেমালিঙ্গন প্রভৃতি সদ্ব্যবহারে কোন পক্ষেই ত্রুটি হইল না। পূর্ব্বাদেশমত দণ্ডবরের স্কন্ধাবার কয়েক ক্রোশ দূরে ছিল, তিনি তথায় গিয়া মিলিলেন—তুলীন কাংরা দুর্গে আসিয়া শাসন-কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চৈতন ও নন্দ সিংহের কার্য্য।

ক্রিয়া বাড়ীতে কোন বড় লোক আসিলে কর্ম্মকর্ত্তা অবধি চাকর লোক জন পর্য্যন্ত সকলেই সেই বড়লোককে লইয়াই মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে; নিমন্ত্রিত সামান্ত কুটুম্বাদি জনগণকে তখন আর আদর অপেক্ষা করিবার বড় একটা সুবিধা হইয়া উঠে না।

আমাদেরও তাহাই হইয়া পড়িয়াছে—যুদ্ধাদি বড় ব্যাপার এবং সেই সব বড় ব্যাপারে লিপ্ত বড় লোকদের লইয়াই এতক্ষণ আমরা বড় ব্যস্ত ছিলাম, গরীব চৈতনের দশা যে কি হইল, তাহার তত্ত্বাবধান লইতে—এ কয় দিন তিনি কোথায় কি ভাবে কি করিতেছেন, তাহা দেখিতেও সময় পাই নাই! বড়র সেবা তো এক প্রকার হইয়া গেল, এখন একবার সেই ক্ষুদ্র প্রাণীর তত্ত্বটা লওয়া উচিত।

চৈতন অচেতন হওবার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলা হইয়াছে। তদন্তে কাংরা আগমন পর্য্যন্ত কয়েক দিনের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য বিশেষ কিছু ঘটে নাই। কাংরা দুর্গের সন্নিহিত হওনাবধি দুর্গাধিকার পর্য্যন্ত চৈতন যে কাজে কাটাইয়াছেন, তাহা বলিতে হইবে—কিন্তু তাহা বলিতে তাঁহার স্বজাতীয় লেখকের পক্ষে বিষম একটা লজ্জা বোধ হইতেছে! কেননা, সাহেবের সমভিব্যাহারে যে জাতীয় যত প্রকারের লোক (ঘোড়ার ঘাসিয়াড় পর্য্যন্ত) গিয়াছে, সকলেরই মুখে ও মনে একরূপ না একরূপ মহোৎসাহের চিহ্ন দেখা যাইত—ভয় কাহাকে বলে, প্রায় কেহই জানে নাই—কেবল আমাদের চৈতন মহাশয়ই সেই বৃদ্ধ রিপুর মান রাখিয়াছিলেন!

তিনি উপত্যকার মধ্যে একটী দিনও যান নাই—কি জানি দুর্গ হইতে দণ্ডবরের সৈন্য হঠাৎ যদি ছুটিয়া আইসে, কি উভয়পক্ষের গুলিটা গোলাটা হঠাৎ আসিয়া গায় লাগে, এই ভয়ে! আবার ঐ প্রবল হেতুতেই জয়ন্তীর বাহু যুগলের উপরিভাগের ত্রিসীমা মধ্যেও তিনি পদার্পণ করেন নাই—কোট কাংরা কেমন দুর্গ, তদ্দর্শনে কৌতূহল অন্তঃকরণে প্রবল ছিল, তথাপি ঐ আশঙ্কায় তাহার সাধন পক্ষে অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন!

কিন্তু অন্যের দ্বারা সেলাম পাঠাইয়া "ম্যাষ্টারকে" সাবধান করিয়া দিতে ভুলিতেন না! কিসের সতর্কতা? এই ভাবের যে, "সাহেবকে বলিও, তিনি আমাদের সকলের মাথা, সকলের সহায়, সকলেরই জীবন, সকলেরই মা বাপ; তিনি কেন অনর্থক অমন সম্মুখ ভাগে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এমন অমূল্য জীবনকে বিপদ্‌গ্রস্ত করেন? বলিও, চাণক্য শ্লোকে আছে 'আত্মানাং সততং রক্ষেৎ।' তিনি এই জয়ন্তী-মঠের নিকটে ব'সে হুকুম দিতে থাকুন, আমি সে সব লিখে লিখে পাঠাই, কর্ম্মচারীরা তামিল করুক—এত লোক থা'ক্তে তিনি কেন সা'ম্‌নে যান? এত লোক তবে কি জন্যে? বিশেষ, এতে যে তাঁকে হাল্‌কা হ'তে হয়, তা ও কি তিনি ভাবেন না?" ইত্যাদি।

চৈতন এইরূপ নানা যুক্তিগর্ভ সন্দেস পাঠাইতেন—এমন কি, সকাতর, সবিনয় সবোদন প্রার্থনাপত্র পর্য্যন্ত! ফলতঃ বিবিধ উপায়ে "ম্যাষ্টারকে" পশ্চাতে আনাইতে বার বার চেষ্টা পাইয়াছিলেন! তাঁহার এ সৎকার্য্যটী আর এই প্রভুভক্তি-গুণটা তাঁহার শত্রুরা পর্য্যন্ত (যদি কেউ থাকে) কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না—তিনি নিজেও তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের চির-দিনই এই আত্ম-প্রশংসার প্রসঙ্গ লইয়া মহা গৌরব করিতেন! কিন্তু অসাবধানী রণোন্মত্ত "ম্যাষ্টারের" একগুঁয়েমো বুদ্ধি দোষে সকল চেষ্টাই বিফল হইল—তিনি কিছুতেই শুনিলেন না! নিদেন এজন্য চৈতনের প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতা ও বাধ্যতা স্বীকার করিতেও একবার আসা উচিত ছিল, তাহাও করিলেন না! তাহা দূরে থাকুক, কয় দিনের মধ্যে একবার পশ্চাতে আসিয়া দেখা সাক্ষাৎ পরামর্শ বাদও করিয়া গেলেন না—এ দুঃখেও চৈতনের কোমল হৃদয়খানি চির-সন্তপ্ত ছিল!

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, চৈতন তখন কোথায় ছিলেন? শুনুন তবে—চৈতনকে নির্ব্বোধ ভাবিবেন না।

জয়ন্তী দেবীর অধিষ্ঠান স্থানটী জয়ন্তী গিরির শির দেশে—বাহুতেও নয়—নিম্নেও নয়—দুর্গের ঠিক সম্মুখে বা অতি নিকটেও নয়—উপত্যকার বিপরীত দিকে; দেবীর স্থান সে বিষয়ে নিরাপদ! সে স্থান এক মহা তীর্থ, তাহার নামও "দেবী-স্থান"। তথায় অনেক সন্ত, মোহান্ত, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতির অহোরহ অবস্থান ও গমনাগমন এবং বহু তীর্থ-যাত্রী ও পূজকদিগের সমাগম হয়। স্থানটী যেমন নিরাপদ, তরুলতা নদী নির্ঝরিণী প্রভৃতিতে তেমনি শোভাকর ও মনোহর। চৈতন এমন মনোরম আপদশূন্য পবিত্র আশ্রম পাইয়াও কি অমন বিগ্রহকালে সৈন্য-শিবিরে আর থাকিতে পারেন?

চৈতন তত্রত্য প্রধান মোহান্তের চেলা-দলের মধ্যে মিশিয়া পড়িলেন—ভক্তিরসে গলিয়া গেলেন—স্তাবকতা, শুশ্রূষা এবং ঘন ঘন সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত দ্বারা মোহান্ত মহাত্মাকে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ও স্নেহরসাভিষিক্ত করিয়া তুলিলেন! শুধু মুখের ভক্তি নয়, সাহেবের কল্যাণার্থ যথেষ্ট পূজা ও ভোগ দিলেন; ভবিষ্যতের জন্য পূজা মানিলেন; প্রচুর দক্ষিণার আশা দিয়া ব্রাহ্মণগণকে স্বস্ত্যয়নে নিযুক্ত করিলেন; কোন দিন লক্ষ দুর্গা নাম, কোন দিন লক্ষ মধুসূদন নাম জপাইতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণ, যতি, ব্রহ্মচারী ও অবধূতগণকে ভূরি ভোজন করাইলেন—ভোজন দক্ষিণাও প্রচুর দিলেন! সাহেবের খাস দেওয়ান বলিয়া পরিচিত হইয়া সকল দ্রব্যই (দক্ষিণার টাকা পর্য্যন্ত) ধারে পাইলেন। ফলতঃ জপ পূজা ধ্যান স্বস্ত্যয়নাদি সর্ব্ব বিষয়েই মহা ধুমধাম বাঁধাইলেন। 'দেবীস্থানে বহুকাল এপ্রকার আর হয় নাই,' এরূপ একটা রব উঠিল!

দোকানী, পসারী, পাণ্ডা প্রভৃতিকে বুঝাইলেন, এমন ঘোর যুদ্ধের সময় শিবিরে—কোষাগারে—তিনি যাইতে পারিতেছেন না! বিশেষতঃ এখন তিনি যেরূপ দৈব কর্ম্মে ব্রতী আছেন, তদ্রূপ হবিষ্যাশী পবিত্র অবস্থায় দেবীস্থান ছাড়িয়া যাওয়াও উচিত নয়; অতএব অর্থ পরে দিবেন। ফলতঃ সিপাহিরা তাঁহাকে ভালবাসিত অথবা তাঁহাকে ও তাঁহার আড়ম্বর লইয়া কৌতুক করিতে ভালবাসিত! সুতরাং সাবকাশমতে নানা লোক তাঁহার নিকট আসিত, সকলেই দেওয়ানজী বলিয়া ডাকিত এবং তিনিও তাহাদিগকে বিরলে সাহেবের উদ্দেশে নানা কথা বলিয়া পাঠাইতেন—মাঝে মাঝে তাড়াতাড়ি ইংরাজীতে পত্র পর্য্যন্ত লিখিয়া দিতেন, ইহাতে দেবীস্থান-

বাসীরা তাঁহাকে যথার্থই ক্ষমতাশালী দেওয়ানজী ভাবিবে, বিচিত্র কি? সিপাহি ও কর্ম্মচারীরা এই ব্যাপার টের পাইয়া আরও উৎসাহ দিতে লাগিল—তাহাতে তাহাদের নূতন একটা আমোদ এবং প্রসাদী ভোজ্য প্রাপ্তির সুগম পন্থা হইল! কাজেই দেশীস্থানের লোক তাঁহার সমস্ত কথাতেই অবিচলিত বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে অকাতরে ঋণ-দান এবং যখনই তিনি যে আজ্ঞা দিতেন, তদণ্ডে প্রাণপণে তাহা পালন করিতে লাগিল!

পরে তাহাদের প্রাপ্য তাহারা পাইয়াছিল কি না, সেটাও এস্থলে বলিয়া দেওয়া উচিত। দুর্গাধিকারের পর ঢুলীন যখন সুস্থভাবে রীতিমত শাসন-কর্ত্তা হইলেন, তখন চৈতন-দেওয়ানজী দুর্গমধ্যে গিয়া আবার প্রভুর সহিত মিলিলেন। একদা তিনি ঢুলীনের সমভিব্যাহারে ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, এমত কালে দুই তিন জন ব্যবসায়ী ধরণের লোক আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার হস্তে দুই তিন খানি ফর্দ্দ দিল।

চৈতন স্বীয় উষ্ণীষ হইতে চসমা বাহির করিয়া কোঁচার মুড়ায় মুছিয়া, ধীরে ধীরে নাকে দিয়া বুক ফুলাইয়া বক্র দৃষ্টিতে ফর্দ্দগুলির এপৃষ্ঠা ওপৃষ্ঠা দেখেন, আর এক একবার ফর্দ্দপ্রদাতাদের মুখের দিকে চাহেন! আহা চিত্রকরের তুলির যোগ্য কি চমৎকার দৃশ্য!

ঢুলীন অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলেন—চৈতনের নিকট কি কাজের জন্য ব্যবসায়ী লোক ফর্দ্দ আনিয়া উপস্থিত করিল; এই অভাবনীয় ঘটনাই তাঁহার বিস্ময়ের কারণ! সুতরাং কতক রহস্যাত্মক কতক প্রকৃতার্থক ভাবে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চৈতন! হোয়াট্‌স্ দ্যাট্?"

চৈতন মহাড়ম্বরে বাহুর নিম্নদেশ পর্য্যন্ত মস্তক নত করিয়া পুনঃ পুনঃ সেলাম করিতে করিতে বিশাল মুখব্যাদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—

ইট্‌ ইজ্‌ মাই মেনি মোন মোষ্টো বেষ্টো গুড্‌ ফ্যাচুর্ন্‌ দ্যাট্‌, ম্যাষ্টার য্যাস্ক এণ্ডো স্পিক্‌ উইথ্‌ স্যাভ্যাণ্টো ইংলিস্—ম্যাষ্ট্যার অর্ডারেড্‌ ওয়ান্‌ ডে নট্‌ স্পিক্‌ ইংলিস্—স্যাভ্যাণ্টো সফারেড্‌ পেইন্‌ ফার দ্যাট্—টুডে ম্যাষ্টার এগেইন্‌ টাক্‌ ইংলিস্—টুডে হোয়াট্‌ গুড্‌ ফ্যাচুর্ন্‌!" ঢুলীন সহাস্য বদনে বলিলেন "ওয়েল্‌, হোয়াট আর্‌ দোজ্‌ পেপার্স ইন্‌ ইওর্‌ হাণ্ড?"

চৈতন ফর্দ্দ তিন খণ্ড এক হস্তে উচ্চ করিয়া ধরিয়া অপর হস্তখানি সাহেবের মস্তকের দিকে বাড়াইয়া সগৌরবে বলিলেন—

"ইট্ ইজ্ ফার্ ব্লেসিং অভ্ গড্ ঈশ্বর—লড্ ঈশ্বর! (স্বীয় বক্ষে হস্ত দান) মাই দিস্ রেস্টো ফিয়ারেড্ ম্যাষ্ট্যার্সো ফাইট্ উইথ্ ফোর্টো—আই নট্ স্লিপ্, নট্ ইট্, ওন্লি ইটু হোলি হরিবিম্বো—মাই মাইণ্ডো থিঙ্কেড্, হাউ ম্যাষ্ট্যার ক্যান্ গেট্ ভিক্টোরি এণ্ডো এণ্টার্ ইণ্টু দিস্ ফিয়ারফুলেষ্টো ষ্ট্রংয়েষ্টো ফোর্টো. ইফ্ নট্ গেট্ বিফোর্ গ্রেট্ গড্ ঈশ্বরসো ব্লেসিংসো? য়্যাজ্ দিস্ আইডিয়া কমেড্ ইণ্টু হেড, ইওর হম্বল স্যর্ভ্যাণ্টো রনেড্ জয়ন্তী—ক্যাচেড্ ব্রাহ্মণ-প্রিষ্টোস্ ফুট্; রবেড্ দেয়ার ফুট্সো ডষ্টো অন্ দিস্ হেড্, ফাল্ডৌন্ অষ্টাঙ্গে বিফোর দি গডেস্—অষ্টাঙ্গে, দ্যাট্ ইজ্ মাই এইট্ বডি টেম্পেল্সো ফ্লোরে রোল্, রোল্, রোল্! আল্ পিপেল্ কাল্ হরিবোল্, হরিবোল্, হরিবোল্! দেন্ দিজ্ সাপ্লিকিপার্সো গিভেড্ মি অন্ ক্রেডিট্ মেনি মেনি ওয়াসিপ্সো থিংসো এণ্ডো মেনি মেনি ব্রাহ্মণ-জলপান্সো থিংসো, নেম্লি (অঙ্গুলির পর্ব্বে পর্ব্বে প্রত্যেক নামের গণন পূর্ব্বক)—অন্বয়েল্ডো (আতপ) রাইস্; ফ্লোয়ার(ফুল); গনি গনি ফ্লোর (আটা); সুগার; ক্ল্যারিফায়েড্ বটার; মিলেড্ পিজ্: ডালা ডালা সুইট্ মিট্সো; হাঁড়ি হাঁড়ি মিল্কো-ক্রে (দধি); জার জার মিল্কো; এণ্ডো য়্যার্থেন পট্সো এচ্ছেটেরা ফার ইটিং অভ ব্রাহ্মণ্সো, প্রিষ্টোস্, সেইণ্টোস্ এণ্ডো নাগাস্। দিস্ ইজ্ (ফর্দ্দ গুলির উপর, উপরি উপরি তিনটী চাপড় মারিয়া) বিল্সো ফার্ দ্যাট্।"

পাঠকের পক্ষে পড়িতে যত সময় লাগিতেছে, মনে করিবেন না যে, চৈতনের বলিতে তত দীর্ঘ সময় লাগিয়াছিল—চৈতন এত দ্রুত এইরূপ ইংরাজী বলিতে পারিতেন যে, ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ শ্রোতা মাত্রেই তাঁহাকে এক জন সুপক্ক ইংরাজী কহনেওয়ালা বলিয়া ভাবিত!

ডুলীনের আস্য আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না! পতিত রুমালখানি উঠাইবার ছলে স্বীয় হাস্যমাখা আস্য কাহারো দৃষ্ট হইতে দিলেন না! যাহাহউক, কথঞ্চিৎ মর্ম্মাবধারণে সমর্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হাউ মচ্? ওয়াট্ ইজ্ দি টোট্যাল্?"

চৈতন কহিলেন "মনি? লেট মাই ওউন্ আইজ্ ফাষ্টো এক্জামিন্ দিজ্ বিল্সো—দেন্ আই পাস্, দেন ইউ পাস্, দেন খাজাঞ্চি গিভ্ মনি!"

ডুলীন তাঁহাকে তদ্রূপ করিতে বলিয়া এবং ভৃত্যের প্রতি কোষাধ্যক্ষকে চৈতনের সহিমত মুদ্রা দিবার কথা বলিতে আদেশ দিয়া স্থানান্তরে চলিয়া

গেলেন। চৈতন ফর্দ্দ পরীক্ষা ও দোকানদারের সহিত বিতণ্ডায় নিযুক্ত রহিলেন। বহু তকরারের পর শেষে একটা স্থির হইয়া তাহারা অর্থ পাইল। কিন্তু সময়ান্তরে ডুলীন চৈতনকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে না জানাইয়া, এরূপ দৈব কি অপদৈব কোন কাজেই আর যেন কদাপি ঋণ করা না হয়।

দুর্গাবরোধ কালে যেমন সরল চৈতনের স্থিতি গতি ও কার্য্যাকার্য্যের কথা বলা হইল, তেমনি খল নন্দ সিং তখন কি ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাও বলা আবশ্যক। ডুলীন কি অভিসন্ধিতে কিরূপ উপায়াদি অবলম্বনে ব্যাপৃত ছিলেন, খলমতি নন্দ তাহা জানিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পায়। যেহেতু গুপ্তচর সহযোগে দণ্ডবরের জনৈক সেনানায়কের সহিত সে এরূপ ধার্য্য করে যে, সাহেবের গতি মতি কৌশলের তাবৎ সন্ধান সে তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইবে। অভিপ্রায় যে, তাহা হইলে দুর্গমধ্যে তৎ প্রতিবিধান হইয়া সাহেবকে বিফল-মনোরথ ও অপদস্থ হইতেই হইবে।

ডুলীনের বিশ্বাসী কর্ম্মচারীরা পূর্ব্ব হইতে নন্দের প্রতি সন্দেহ করিয়া ও তাহার দুষ্টাভিসন্ধির আভাস কিছু পাইয়া সাহেবকে ইঙ্গিত দিয়াছিল। ডুলীন সেই চক্রান্তকে বিফল করণার্থ এরূপ ভাণ করিলেন, যেন ফটকাক্রমণই প্রকৃত উদ্দেশ্য—যেন সে বিষয়ের পরামর্শটা নন্দের নিকট গোপন করিতেছেন —যেন দুর্গের অপর কোন দিক্ দিয়া উত্থান ও আক্রমণ সম্ভব কি না, নন্দের সাক্ষাতে তদালোচনায় অনিচ্ছুক হইতেছেন না।

ইহাতে এই ফল হইল—নন্দ ভাবিল "পর্ব্বত পার্শ্বের আক্রমণের প্রস্তাবটা কেবল কথা মাত্র—সেটা নিতান্তই অসাধ্য, তাহাতে কেবল সৈন্যক্ষয় বৈ অন্য লাভ কিছুই নাই, সাহেব কদাচ তাহা করিবেন না; এই জন্যই ধূর্ত্ত সাহেব আমার সাক্ষাতে ফটক সম্বন্ধীয় প্রকৃত মননটী গোপন করিয়া ঐ অনর্থ কথারই পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিতেছেন; আমাকে এমনই বোকা পাইয়াছেন, আমি অসম্ভবকে সম্ভব বুঝিয়া ভুলিয়া যাইব এবং দণ্ডবরকে ফটক অবহেলন পূর্ব্বক চারি পার্শ্বে বেশী লোক রাখিতে বলিব!"

ফলতঃ সাহেব যখনই কর্ম্মচারীদের লইয়া গুপ্ত সভা করিতেন, তখনই সে সভা ভঙ্গ হইয়া তাঁহারা তাঁহার শিবির হইতে চলিয়া গেলেই ডুলীন স্বীয় বিশ্বাসী কয়েকজনের সহিত এমনি ভাবে মিছামিছি পরামর্শ করিতেন, যেন ফটকই প্রধান লক্ষ্য! কেননা, তাঁহারা মনে মনে জানিতেন যে, নন্দ সিং বাহির

হইয়াই তাঁহাদের কি কি গোপনীয় কথা হয়, তাহা অবশ্যই যবনিকার অন্তরাল হইতে হয় স্বয়ং শুনিবে, নয় সে কাজে গুপ্তচর নিযুক্ত রাখিবে। অতএব ঐ দ্বিতীয় মন্ত্রণাকালে প্রকৃত মন্ত্রণাকে আবৃত রাখিয়া বা অকর্ম্মণ্য জানাইয়া তোরণাক্রমণের ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ পূর্ব্বক তাহারই নানা কৌশল—নানা উপায় আলোচনা করিতেন। কিন্তু প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধীয় পরামর্শ তখন নয়—গভীর রজনীতে কোন বিশ্বস্ত নিভৃত স্থলেই হইত।

সুতরাং নন্দ নিতান্তই প্রতারিত হইল—নিতান্তই দ্বিগুণিত, ত্রিগুণিত জালের ফাঁদে পড়িল—অতি বুদ্ধির যে দশা হইয়া থাকে, তাহাই ঘটিল! অতএব ফটকাক্রমণের যে সকল সুচিক্কণ ছল কৌশল ঐরূপ কপট মন্ত্রণায় মিছামিছি ধার্য্য হইত, নন্দ সিং তাহারই সবিস্তার বিবরণ দুর্গমধ্যে পাঠাইয়া মহানন্দে ভাসিত! দণ্ডবর সেই সমস্ত কল্পিত কৌশলের প্রতি-কৌশল বিধানে এত ব্যস্ত হইলেন এবং তদ্দ্বারা শত্রুকে জালবদ্ধ রোহিতের ন্যায় করকবলিত করিবার ভাবী প্রত্যাশায় এত হর্ষোন্মত্ত থাকিলেন যে, সাহেবের মনোগত প্রকৃত লক্ষ্যের দিকে লক্ষ্যই রাখিলেন না!

যখন সে আশা কেবল দুরাশার স্বপ্ন হইল—যখন দুর্গস্থ বন-ভূমির দুরারোহ পথ দিয়া সাহেব আসিয়া প্রায় বিনা রক্তপাতেই দুর্গাধিকার করিলেন, তখন নন্দের নিরানন্দের সহিত বিস্ময়, রাগ ও আত্ম-ধিক্কারের ইয়ত্তা রহিল না! সে মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করিল যে, "আচ্ছা, কেমন তুমি ফিরাঙ্গী বাচ্ছা, আমি দেখ্‌ব! আমাকে যেমন ঠকালে, তেম্নি ঠকান্ তোমাকে ঠকাতে পারি, তবে আমার নাম নন্দ সিং।"

কিন্তু প্রকাশে দুর্গাধিকার জন্য রীতিমত জয়োৎসবে যোগ দিতে ও হর্ষের নিদর্শন প্রদর্শনে নন্দের অণুমাত্র ত্রুটি হইল না! স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানেও মহোৎসাহ দেখাইল! কেবল অভিমান-স্বরূপে সাহেবকে ইঙ্গিতে বলা হইল "আমাকে সঙ্গে আনা সাহেবের উচিত ছিল—এমন গৌরবের কাজে আমাকে বঞ্চিত করাতে আমার বড় দুঃখ হইয়াছে।"

দুলীন সহাস্যে উত্তর দিলেন "পর্ব্বত-পার্শ্বের প্রস্তাবে তোমাকে তৎপর দেখি নাই—তাহা অসাধ্য বলিয়াই তুমি ধার্য্য করিয়াছিলে। সুতরাং সেইটী অসাধ্য কি সুসাধ্য, তাহা দেখাইবার জন্যই সে ভার আপন স্কন্ধেই লইয়াছিলাম; তোমাদের মতে যাহা সুসাধ্যবোধ হইয়াছিল, তোমাদিগকে সেইদিকেই রাখিয়াছিলাম।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

উকীলের পত্র।

যে প্রাতে গুপ্ত অভিজ্ঞান ও দণ্ডবরের নামে বিশেষ পরওয়ানা লইয়া রাজদূত আইসে, সেই দিনেরই অপরাহ্নে অপর এক অশ্বারোহী দুলীন ও দণ্ডবরের নামে রাজা ধ্যান সিংহের দুই পৃথক্ পত্র লইয়া দুর্গমধ্যে উপস্থিত হয়। আবার, তাহারই প্রহরেক পরে চাঁদ খাঁর প্রেরিত অন্য এক দূত আসিয়া সাহেবকে চাঁদ খাঁর এক দীর্ঘ লিপি অর্পণ করে। অতএব যে রজনীতে দুর্গাধিকার ব্যাপার ঘটে, তৎপর দিন পূর্ব্বাহ্নে, পরাহ্নে ও রাত্রে উপর্য্যুপরি তিনজন অশ্বারোহী-দূত রাজধানী হইতে তিন প্রকার স্বতন্ত্র ব্যক্তির লিপ্যাদিবাহকরূপে আগত! তখনও দণ্ডবর সিংহ দুর্গমধ্যে আছেন।

চাঁদ খাঁর পত্রখানি গোপনীয় বিজ্ঞাপন—তৎপাঠেই কর্ণেল সাহেব রাজা ধ্যান সিংহের দূত প্রেরণের তাৎপর্য্য এবং রাজসভার অবস্থাদি পরিজ্ঞাত হইলেন। পাঠকগণও সেখানি পাঠ করিলে সমস্তই জানিতে পারিবেন। এইজন্যই তন্মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু তন্মধ্যে স্তাবকতা, তোষামোদ ও গৌরবাত্মক রূপকালঙ্কারের যে সব ঘোর ঘটা আছে, সে সকলের অধিকাংশই পরিত্যক্ত হইল, কেবল নমুনা স্বরূপ প্রথম স্তবকটীর পাঠ কিঞ্চিৎ দিলাম।

[চাঁদ খাঁর পত্রের চুম্বক]

"বান্দানেয়াজ! গরিব পরওয়ার! খোদাবন্দ!" (ইত্যাদি বহু)

"প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় হুজুরের দীপ্তিশালী শ্রীঅঙ্গ অন্তর্হিত হইবা মাত্র রাজসভা ও লাহোর নগর এককালে আঁধার হইয়া উঠিল! কিয়ৎ কালের নিমিত্ত সজ্জন সভাসদ্ মাত্রেই বিষণ্ণ; মহারাজ নীরব, সুতরাং রাজসভা নিস্তব্ধ ছিল! (রাজসভার এ অবস্থা, বোধ হয়, চাঁদের নিজ কল্পনা-দৃষ্টিতেই অধিক দেখা হইয়া থাকিবে! কিন্তু পরবর্ত্তী বর্ণনা সেরূপ নহে—তাহাতে চাঁদ খাঁর স্বীয় স্বভাবানুসারে অকপট সরল সত্য বিবৃত—পূর্ব্বের চিত্র, বোধ হয়, দেশাচারের অনুরোধে বা যে মুন্সি দ্বারা পত্র লেখা, তাহারই মুন্সিগিরি হইবে!)

"সে যাহাহউক, হুজুরের বিপক্ষ পক্ষ হুজুরের অনবস্থিতির সুযোগ পাইয়া রাজ-কর্ণ অধিকারের বিবিধ চেষ্টা পাইল। কিন্তু মহারাজ প্রকৃত গুণবোদ্ধা, তিনি মানুষ চিনেন, হুজুরকে ভালরূপেই চিনিয়াছেন; সুতরাং ঐ সব ঈর্ষাপরায়ণ সভাসদ্গণের কথা কর্ণে লইলেন না—এমন কি, কাহাকে চুপ করিতে, কাহাকে বা সাবধানে কথা বার্ত্তা কহিতে বলিলেন।

"কয়েক দিনের মধ্যেই সংবাদ আইল—এবং এ অধীন সে সমাচার রাজ-কর্ণে তুলিয়া দিবার প্রয়াসে সম্পূর্ণ সফলও হইল—যে, সাহেবের বাহিনী চমৎকার নিয়মবশ্যতা ও শাসন-তন্ত্রানুসারে সুনিয়মে কুচ করিতেছে; সৈনিকগণ অশ্রুতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য ধীরতা ও স্থিরতার সহিত চালিত হইতেছে; গ্রাম, নগর, ক্ষেত্র, উদ্যান, যেখান দিয়াই তাহারা যাইতেছে, তাহার কোন স্থলেই কোনরূপ অত্যাচার, উপদ্রব কি বলপ্রকাশ ঘটিতেছে না; কাহারো কোনরূপ অনিষ্ট বা অপচয় দেখা যাইতেছে না, যে সব শস্য ক্ষেত্রাদির অল্প অপচয় নিতান্তই অপরিহার্য্য, তাহাও এত অল্প যে, এদেশে এরূপ কুচের সময় এত সামান্য ক্ষতি আর কখনই ঘটে নাই; আবার ইহাও রাষ্ট্র যে, সেই সামান্য অপচয়ের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রজারা উচিত মূল্যও ধরিয়া পাইতেছে; যদি কুত্রাপি কোন দুশ্চরিত্র সৈনিক কর্ত্তৃক অত্যাচার হওয়া প্রকাশ পায়, সাহেব বাহাদুর তৎক্ষণাৎ তাহার সমুচিত শাসন ও দণ্ড করিতেছেন।

"এই সংবাদে মহারাজা মহা সন্তুষ্ট হইয়া রাজা ধ্যান সিংহের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন 'কেমন রাজাজি, এমন সুধারা আমার নিজের কুচেও তো হয় না! জুলীনের বিস্তর গুণ, আমি ইচ্ছা করি, আমার সব কর্ম্মচারী এমনি সাহসী ও সদ্বিবেচক হয়!' এই কথায় অনেকের মুখ চূণ, কিন্তু হুজুরের বন্ধু পক্ষ যে কত সুখী হইলেন, তাহা কি বলিব!

"কয়েক দিন পরেই হুজুরের প্রতি দুর্বৃত্ত দুরাত্মাগণের আক্রমণের কুসংবাদ আইল।* হুজুরের নিজের প্রেরিত এতালা আসিয়াও পৌঁছিল। মহারাজ অত্যন্ত কুপিত হইলেন। কিন্তু হুজুরের বৈরিপক্ষ বুঝাইতে চেষ্টা পাইল যে, এ কেবল সাহেবের একটা ছল মাত্র—বাস্তবিক উহা সত্য হইতে পারে না! মহারাজার মুখ যেন আরো আঁধার হইয়া উঠিল! কিন্তু তিনি তদুত্তরে কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন না। যদি এ অধীনের বিচার-শক্তির প্রতি

হুজুরের বিশ্বাস থাকে, তবে নিশ্চিত জানিবেন, ক্রূর কপটীদের ঐ কথায় তাদের নিজের অনিষ্ট বৈ অভীষ্ট সিদ্ধি ঘটে নাই!

"ধর্ম্মাবতার যখন কোট কাংরার সমীপবর্ত্তী হন, এখানে জনরব উঠিল, সাহেব দুর্গ-দ্বার মুক্ত পাইবেন না—সহস্র চেষ্টা ও প্রাণপণে সাহস বীরত্ব দেখাইলেও সে ফটক খোলাইতে কি নড়াইতে পারিবেন না—যেরূপ প্রফুল্ল বদনে গিয়াছেন, তদ্বিপরীতে রোদন-নয়নে ফিরিতে হইবে—কেবল গতাগতি আর মাতামাতিই সার হইবে! লোকে কোন একজন বড় লোকের (হুজুর বস্‌রাই ফুল তো জানেন? সেই) নাম করিয়াও বলিতে লাগিল যে, তিনি যখন দণ্ডবর সিংহের সহায়, তখন সাহেবের সাধ্য কি সফল হন?

"ক্রমে এই জনরবের সর্ব্বাঙ্গীণ তথ্য রাজগোচর হইল। (গোলামও সে পক্ষে প্রধান মন্ত্রী!) মহারাজ শুনিয়া ফকিরজীর প্রতি নিভৃতে যে আদেশ করিয়াছেন, বোধ করি, তাহা এই বাহকের পূর্ব্বে যে রাজদূত গিয়াছে, তাহার গমন প্রয়োজনেই সুবিদিত হইয়াছে। কিন্তু সেই দূত প্রেরণের অভিপ্রায়টী মহারাজ প্রকাশ্য দরবারে প্রকাশ করেন নাই। তৎপরিবর্ত্তে তৎপর দিবসীয় সভায় রাজাজীর প্রতি যে হাব ভাব প্রকাশ করেন, তাহা আশাতিরিক্ত—তাহাতে সভাশুদ্ধ চমকিয়া উঠিয়াছে—তাহার প্রত্যেক বর্ণ হুজুরের জ্ঞাতসার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, এজন্য অধীন তাহার আদ্যোপান্ত স্মরণে গাঁথিয়া রাখিয়া এক্ষণে নিবেদন করিতেছে, শ্রবণাজ্ঞা হউক;—

"রণজিৎ সিংহ স্বীয় প্রধান মন্ত্রীর সহিত সচরাচর যে ভাবে কথোপকথন করিয়া থাকেন, অদ্য প্রাতে তদপেক্ষা অধিকতর গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'রাজাজি! অনেক দিন হইল, তোমার জায়গিরগুলি দেখি নাই—তোমার আতিথ্য গ্রহণও বহুকাল হয় নাই; আমার বাসনা, কল্যই যাত্রা করিব—প্রস্তুত হও, সকলকে প্রস্তুত হইতে আদেশ কর।'

"এই আদেশে রাজা ধ্যান সিংহকে কিঞ্চিৎ চিন্তাকুল জ্ঞান হইল। কিন্তু যাহারা তাঁহাকে বিশেষ জানে, তাহারা ভিন্ন অন্য কেহ সে চিন্তাকুলতা লক্ষ্য করিতে পারে নাই--তাহারাও আবার অতি অভিনিবেশময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ব্যতীত ধরিতে পারে নাই—গোলামের নাকি তেমন সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা দেখা অভ্যাস আছে, এই জন্য নিঃসন্দিগ্ধরূপেই জানাইতেছি যে, ঐরূপ

গুপ্ত চাঞ্চল্যের সহিত রাজাজী সবিনয় মৃদু মধুর স্বরে নিবেদন করিলেন 'রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য, কিন্তু—বড়—উত্তাপ—'

"এই কিন্তুর আরম্ভ হইতে না হইতেই রণজিৎ ব্যস্ত হইয়া দৃঢ় ভাবে বলিলেন 'না, রাজাজি, কোন আপত্তি তুলিও না—অদ্য তাহা শুনিব না! আমি জানি, এখন বড় রৌদ্র—আমি জানি, গম্য স্থানও বহুদূরে—কিন্তু তোমার স্থানগুলি তো শীতল; গুরুজীর প্রসাদে একবার গিয়া উপস্থিত হইতে পারিলেই পথকষ্টের প্রচুর পরিশোধ পাওয়া যাইবে! সেনাপতি কোর্টনী সাহেবকে বলিয়া পাঠাও, তাঁহার নিজের আর খোসালের চতুরঙ্গিণী যেন অদ্যই প্রস্তুত হইয়া বাহির হয় এবং এমন ব্যবস্থা কর, যেন অদ্য রাত্রে তৃতীয় পাহারার সময় যাত্রা করিতে পারি। পেস্‌খানাও অদ্যই চালান দেও।'

"যে আজ্ঞা, বলিয়া রাজাজী উঠিয়া গেলেন। তৎকালে মহারাজের ওষ্ঠাধরের কোণ যেন ঈষৎ বক্র—যেন একটু কম্পনশীলও দেখা গেল। কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য বাহ্য দৃশ্যে কে বলিতে পারিবে যে, তাঁহার অন্তঃকরণ কিঞ্চিৎ মাত্রও বিচলিত হইয়াছিল! তৎক্ষণাৎ স্বাভাবিক স্থৈর্য্য গাম্ভীর্য্য সহকারে অন্যান্য বিষয় ব্যাপারে লিপ্ত হইতে কিছু মাত্র ত্রুটি হইল না!

"ধর্ম্মাবতার! আমি অবহিত চিত্তে নিজ স্থানেই ছিলাম—শীকারান্বেষী বাজপক্ষীর ন্যায় সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এবং সব্বগ্রাহক শ্রুতি-সাহায্যে সকলই তন্ন তন্ন দেখিতে শুনিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার প্রাত্যহিক রীত্যনুসারে নীরব ছিলাম, একটীও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করি নাই।

"রাজাজীর সঙ্গে আরো তিন চারিজন প্রধান সহকারী উঠিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই ধ্যান সিংহ ফিরিয়া আসিলেন। ঐ সহকারিগণ আরো বিলম্বে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাজাজীকে জানাইল 'সকলই প্রস্তুত করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।'

"তখন ধ্যান সিংহ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক করযোড়ে (সচরাচর তিনি এরূপ যোড়করে কথা কহেন না) রাজসমক্ষে নিবেদন করিলেন 'এ দাস সরকারের কেনা গোলাম; এ দাসের 'আমার' বলিতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই মহারাজের; মহারাজই নিজ দয়া গুণে এ দাসকে ধূলি হইতে পর্ব্বতে তুলিয়াছেন; এ দাসের কিম্বা দাস-ভ্রাতাগণের জায়গির বলিয়া মহারাজ যে সমস্ত প্রদেশ চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে মহারাজার যে পদার্পণ হইবে, তদপেক্ষা

সৌভাগ্য কি? কিন্তু অধীনকে চরিতার্থ করিতে গিয়া সরকারের যে প্রচুর ভ্রমণ-ব্যয় হইয়া যাইবে, এ দাস তাহা কখনই সহ্য করিতে পারিবে না। ভাগ্যবলে আমাদের তিন ভ্রাতার জায়গিরেই এবৎসর আশাতিরিক্ত উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব মহারাজের ভ্রমণ-ব্যয় সাহায্যার্থ এ দাসেরা নয় লক্ষ মুদ্রা পেস্‌কস্ স্বরূপ প্রদানের ইচ্ছা করিতেছে ; সদয় চিত্তে গ্রহণাজ্ঞা হয়!'

"তাঁহার বাক্য সমাপ্ত হইতে না হইতেই বাহক-শ্রেণী ভারে ভারে অর্থ আনিয়া রাজসভায় উপস্থিত করিল। মহারাজা মুদ্রার চাক্‌চিক্যময় মূর্ত্তি দেখিতে কেমন ভালবাসেন, বোধ হয়, এ অধীন হুজুরের সমক্ষে পূর্ব্বে তাহা নিবেদন করিয়াছে! ভারের উপর ভার দেখিয়া মহারাজার একাক্ষি যেন জ্বলিতে লাগিল! তিনি সহর্ষে প্রধান কোষাধ্যক্ষ বেণীরামকে ইঙ্গিত পূর্ব্বক কহিলেন 'বেণী মিশ্র! যাও গণিয়া লও গে!'

"বেণী ও ভারশ্রেণী চলিয়া গেলেই রাজা ধ্যান সিংহ কহিলেন, 'সরকারের বিশ্বাসী সুযোগ্য ভৃত্য কর্ণেল ডুলীনের প্রতি কি মহারাজার কোন বিশেষ আদেশ আছে? আমি তাঁহার নিকট এই মর্ম্মের লিপি সহিত দ্রুতগামী দূত পাঠাইতেছি যে, তিনি যেন কোট কাংরা নির্ব্বিবাদে অধিকার পাইয়া শাসনভার গ্রহণ করিবা মাত্র সে সংবাদটী রাজগোচর করেন—'

"মহারাজ প্রসন্ন বদনে কহিলেন, 'হাঁ, ডুলীনকে লিখিয়া পাঠাও, আমাদের ছাউনির নিমিত্ত একটী মনোরম সুশীতল স্থান মনোনীত করিয়া রাখে। যদিও এখন বুঝিতেছি, এত প্রখর রৌদ্র ও এত অসহ্য গ্রীষ্ম থাকিতে আমার পর্য্যটন ও সাম্রাজ্য পরিদর্শন না ঘটিতে পারে, তথাপি কোন্ দিনে পূর্ব্বাঞ্চল গমনের প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তাহার ঠিক কি?'

"রাজাজী সভামণ্ডপ হইতে উঠিয়া গিয়া অদূরে দাড়াইয়াই উপদেশ দিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে উপবিষ্ট হইলেন। অবিলম্বেই দপ্তরখানা হইতে একজন দূত সজ্জিত হইয়া আসিয়া রাজসমক্ষে অভিবাদন করিয়া একটা তেজস্বী অশ্বারোহণ পূর্ব্বক চলিয়া গেল। সকলেই স্পষ্ট বুঝিল, প্রধান মন্ত্রীর দূত কোট কাংরায় গমন করিল।

"অদ্যকার রাজসভায় মহারাজা ও রাজাজীতে ঐ যে সব ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য হুজুরকে খুলিয়া বলা বাহুল্য ; তথাপি মনের চাঞ্চল্য বশতঃ কিঞ্চিৎ আভাস না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

"কেনই বা মহারাজ প্রথমে রাগত ও পরিভ্রমণে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন? কেনই বা রাজাজী নব লক্ষ মুদ্রা মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রদান করিলেন? কেনই বা তিনি সাহেবের প্রতি মহারাজার কোন আদেশ আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন? কেনই বা মহারাজা পর্য্যটন-সংকল্প স্থগিত রাখিলেন? ইত্যাদি ব্যাপার সমূহের কারণ আর কিছুই না—হুজুরকে কাংরা দুর্গাধিকার না দেওয়াতে রাজ-প্রেরিত প্রিয় কর্ম্মচারীকে অবহেলন, সুতরাং রাজাজ্ঞার বিরোধী হওয়া বৈ আর কি বুঝায়? ইহা সামান্য বুকের পাটা নয়! এই জন্যই মহারাজা মনে মনে বিচলিত ও কুপিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন, স্বয়ং গিয়া সমুচিত শাস্তি দিয়া আসিবেন। ধ্যান সিংহ তাহা সম্পূর্ণরূপেই বুঝিতে পারিয়া তন্নিবারণ ও নিতান্ত বশ্যতা জ্ঞাপন উদ্দেশে ভ্রমণ-ব্যয়চ্ছলে নয় লক্ষ মুদ্রার উপহার দিয়া প্রভুর ক্রোধ শান্তি করিলেন! হয় তো কাংরায় রাজা গোলাপ সিংহ যাহা করিতেছেন, ধ্যান সিংহ তাহা মূলেই জানিতেন না; কি হয় তো সেরূপ কাজ তাঁহার অনুমোদিত নয়; কি হয় তো জানিতে পারিলে পূর্ব্বাহ্নেই তাহা নিবারণ করিতেন; সুতরাং সেই কাজে মহারাজার সন্দেহ ও ক্রোধভাজন হওয়া এবং (অল্প নয়) নয় লক্ষ মুদ্রা দণ্ড দেওয়ার দায়ে বাঁচিয়া যাইতেন! মহারাজাও স্পষ্ট বুঝিলেন, ধ্যান নিজে দোষী নন, সুতরাং নয় লক্ষ তঙ্কা জরিমানা করিয়াই ক্ষান্ত ও সন্তুষ্ট হইলেন—অধিক দণ্ড আর দিলেন না!

"ধ্যান সিংহ দেখিলেন, জরিমানা গৃহীত হইল, মহারাজার মনও সুস্থপ্রায় হইয়া উঠিল; অমনি বিরাগ-বহ্নিকে নিঃশেষে নির্ব্বাপিত করণার্থ 'কাংরাস্থ সাহেবের প্রতি কোন আদেশ আছে কি না?' ইত্যাদি প্রশ্নরূপ শীতল জল শেষকালে ঢালিয়া দিলেন! প্রকারান্তরে এই জানানো হইল যে, সাহেবকে আর আমার ভ্রাতা বাধা দিবেন না—সাহেব নির্ব্বিবাদে, নির্ব্বিঘ্নে কাংরার প্রভু হইবেন—তাঁহার স্বহস্তের লিপি আনাইয়াই তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিব!

"মহারাজ তাহা সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে পারিয়া 'হাঁ শীতল স্থান ঠিক করিয়া রাখিতে লিখ' ইতিভাবের যে উত্তর দিলেন, সেটী আর কিছুই না, প্রকারান্তরে এই জানানো হইল যে, 'সাবধান! পূর্ব্বাঞ্চলে জায়গির দিয়া তোমাদিগকে প্রতাপান্বিত করিয়া দিয়াছি বটে, কিন্তু দেখিও যেন এরূপে আর মদ-গর্ব্বিত হইয়া উঠিও না; তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ স্বয়ং গিয়া সর্ব্বনাশ-রূপ দণ্ড দিয়া আসিব—এবার মার্জ্জনা করিলাম—এ যাত্রা আর গেলাম

না—এ যাত্রা রক্ষা পাইলে!' ইহাই যে তাঁহার মনোগত ভাব, তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল।

"বান্দানমাজ! এইরূপে অদ্যকার ভয়ানক অগ্নি নিবিয়া গিয়াছে। কিন্তু মনে ঠিক জানিবেন, রাজাজীর ঐ যে নয় লক্ষ তঙ্কা গিয়াছে, উটী আপনার নামেই খরচ লেখা থাকিল! হুজুর যদি চতুর হন, তবে কোন কৌশলে গোপনে ঐ নয় লাখ পরিশোধের ইচ্ছা জানাইয়া কার্য্যতঃ ক্রমে ক্রমে তাহা শোধ দিতে থাকিবেন! নতুবা পঞ্জাবের সর্ব্ব প্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান পুরুষ কয়জনকে ঘোর বৈরী যে করা হইল, ইহা এক প্রকার স্থির-সিদ্ধান্ত! যত দিন তাহা না পারিবেন, তত দিন অধীনের মিনতি এই যে, হুজুর যেন সর্ব্বদাই বিশেষ সাবধানে কালযাপন করেন—সর্ব্বদাই সশস্ত্র ও সুসজ্জিত থাকেন—সর্ব্বদাই বিশ্বাসী শস্ত্রপাণি লোক নিকটে রাখেন—সর্ব্বদাই এরূপ স্থির নিয়মে চলেন যে, অপরিচিত আগন্তুক মাত্রেরই শরীর ও বস্ত্রাভ্যন্তর পরীক্ষা না করিয়া সমীপবর্ত্তী হইতে না দেন!*

"এ অধীন এ দিক্ দেখিতে নিযুক্ত রহিল, হুজুর ওদিক্ দেখিবেন—প্রিয় ভ্রাতা আলিবর্দ্দিকেও দেখিতে অনুমতি করিবেন! আপাততঃ আর অধিক বলিবার সময় নাই; কেননা রাজাজীর দূত পৌঁহুছিবামাত্র আমার এই পত্র হুজুরের হস্তগত হওয়া উচিত! হুজুরের বিশেষ আদেশ ছিল যে, কোন বিশেষ ঘটনার উপস্থিতি মাত্র ডাক-সওয়ারি পাঠানো হয়, তদনুসারেই কার্য্য করিলাম।" ইত্যাদি।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিদায় গ্রহণ।

দুলীন, চাঁদ খাঁর পত্র পাঠ সমাপ্ত করিয়া কিয়ৎক্ষণ গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন রহিলেন। চাঁদ খাঁর বহুভাষিতায় বিরক্ত না হইয়া বরং সন্তুষ্টই হইলেন।

* পাঠক স্মরণে রাখিবেন, কে এই পত্র লিখিতেছে! রাজা ধ্যান কি তাঁহার ভ্রাতারা দুলীনকে ঘৃণা করিতে অথবা তৎপ্রতি রাগত হইতে পারেন, কিন্তু তাহা বলিয়া নীচাশয় নন্দ সিংহের ন্যায় দুলীনের বধ-চেষ্টা করিবেন, ইহা কদাচই সম্ভবপর নয়। এ কেবল চাঁদ খাঁর নিজের দূষিত কল্পনা-জনিত আশঙ্কা বলিয়াই অনুমিত হওয়া উচিত।

এত বহুভাষিতা ব্যতীত অত প্রয়োজনীয় সমাচার তত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কি জানিতে পারিতেন ? এই বহুভাষিতার গুণেই যেন স্বয়ং রাজসভায় বসিয়া সে সমস্ত দেখিতে শুনিতে পাইতেছেন, এমনি বোধ হইল ! চাঁদ খাঁর নিজের ভাষা পড়িতে জানিলে পাঠক মহাশয়ও সে সব হয় তো তেমনি প্রত্যক্ষবৎ ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পরিতেন—আমাদের অপূর্ণ অনুবাদে তত কি সম্ভব হয় ? ফলতঃ চাঁদ খাঁ সুশিক্ষিত না হইলেও তাহার স্বাভাবিক বর্ণনা-শক্তি বিলক্ষণ তেজস্বিনী! ভাগ্যে আমাদের প্রিয় বন্ধু পূর্ব্বেই পারসিক ভাষা শিখিয়াছিলেন, এবং পঞ্জাবে আসিয়া অত্যন্ত মনঃসংযোগে তাহার বিশেষ উন্নতি সাধন করিতেছিলেন, নচেৎ তাঁহাকে চাঁদ খাঁর অমন বর্ণনা ভাষান্তরের অপরিহার্য্য দোষে কদর্য্যরূপেই শুনিতে হইত এবং গোপনীয় বিষয় অপরকে পড়িতে না দিলে চলিত না। যে রাজ্যে যিনি শাসক, তদ্রাজ্যের ভাষাজ্ঞান তাঁহার পক্ষে এতই অসীম উপকারক ! দুঃখের বিষয়, আমাদের ইংরাজ শাসকেরা তাহা জানিয়াও কার্য্যতঃ তৎপ্রতি সম্পূর্ণরূপে তাচ্ছিল্য কবিয়া থাকেন।

সে যাহাহউক, চাঁদ খাঁর পত্র পড়িয়া দুলীন বহুক্ষণ চিন্তামগ্ন রহিলেন। বুঝিলেন, প্রবল ঝঞ্ঝাময় বাত্যান্দোলিত সাগরেই জীবন-পোতকে ভাসাইয়াছেন ! কিন্তু তিনি অদূরদর্শী অনিপুণ কর্ণধার নহেন—এ সকল বিপদ-বাত্যা তাঁহার আশাতীত ঘটনাও নহে—যে কেহ যে সমাজে রাজ-প্রসাদ-ভাজন হইতে যত্ন করে, রাজসভার চক্রান্ত ও ঈর্ষাদির জন্য তাহার প্রস্তুত থাকা উচিত। দুলীন তাহা জানিতেন, সুতরাং এ সংবাদে মনে মনে কিঞ্চিৎ চিন্তা ও কিংকর্ত্তব্য, এ বিচার উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু বিস্ময় ও নৈরাশ্য জন্মে নাই! জন্মিবেই বা কেন ? কোন আশাতীত আকস্মিক ঘটনা তো ঘটে নাই ; যাহা ঘটিয়াছে, সেরূপ কিছুই যে ঘটিবে, তাহা এক প্রকার সিদ্ধান্তই ছিল !

"কিং কর্ত্তব্য ?" প্রশ্নের উত্তরে, পূর্ব্বে এবম্বিধ সন্দেহের সঙ্কট অবস্থায় প্রশ্নের যেরূপ মীমাংসা করা তাঁহার অভ্যাসের তলে পড়িয়াছে, অদ্যও তাহাই স্থির হইল—"এ মহাসাগরে যত কেন প্রতিকূল বাত্যা প্রবাহিত হউক না, আমি ধর্ম্মরূপ হা'লকে শক্ত করিয়া ধরিব—কিছুতেই ছাড়িব না এবং কর্ত্তব্যরূপ পা'লকে সত্য ও ন্যায়রূপ গুণবৃক্ষে যথা বুদ্ধি, যথা জ্ঞান, যথা যোগ্যতা, নানা কৌশলে নানাদিকে ফিরাইয়া ঘুরাইয়া দিব—কিছুতেই শিথিল-হস্ত হইব না ! সর্ব্বপাতা পিতার কৃপায় তাহাতে অবশ্যই বিপদের ঊর্ম্মি হইতে ত্রাণ

পাইব, কিম্বা তাঁহার ইচ্ছা হয়, অবশ্যই মগ্ন হইব, কিন্তু তথাপি নিষ্কলঙ্ক ও নিষ্পাপ হৃদয়ে মনুষ্যের যথা-কর্ত্তব্য করিয়াছি বলিয়া তো আত্ম-প্রসাদ সহিত সগৌরবে ডুবিতে পারিব !

"তবে মনে তো লাগিতেছে, ডুবিব না—কর্ত্তব্যে অবিচলিত থাকিলে কেহই তো ডুবে না—সুতরাং আমিও ডুবিব না ! আমি স্বেচ্ছায় যাঁহাকে প্রভু বলিয়াছি, সেই মল্লরাজার এবং তিনি কৃপাপূর্ব্বক যে লক্ষ লক্ষ প্রজার ধন, মান, প্রাণ, স্বাধীনতা, সুখ প্রভৃতি আমার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন—বিদেশী, অপরিচিত, অজ্ঞাত-কুলশীল হইলেও অত্যল্প আলাপেই এবং স্বীয় অন্তরঙ্গ-বর্গের অনিচ্ছাতেও ন্যস্ত করিয়াছেন—সেই দুই পক্ষের মঙ্গল যাহাতে হয়, প্রাণপণে তৎসাধনই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য ; আমি তাহাই করিব—আমার অন্যদিকে যাইবার কি দেখিবার প্রয়োজন নাই—সভাসদেরা যেমন দলে দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পরে ঘোর বৈরনির্য্যাতনে, কেবলই স্বপক্ষ সমর্থনে ও নিয়ত স্বার্থসাধনে নিযুক্ত থাকে—এক পক্ষ একরূপ মন্ত্রণা ও চক্রান্ত করে, অপর পক্ষ তাহার গুপ্ত সন্ধান লইয়া প্রতিচক্রান্ত করিতে ব্যস্ত থাকে—আমি সে সব কিছুই করিব না—আমি এ দল, ও দল, কোন দলেই মিশিব না—আমি কেবল ন্যায়, দয়া, সারল্য ও কৃতজ্ঞতার দলেই রহিব। আমার এক মাত্র অবলম্বন প্রভুভক্তি ও প্রজাবাৎসল্য—আমার লক্ষ্য ধর্ম্মের পর কেবল প্রভু ও প্রজারঞ্জন—ইহাদের কাছে কোন চক্রান্ত, কোন শাত্রবতা স্থান পাইবে না ! আমি উৎকোচ দিয়া পদ-রক্ষা চাহি না ! উৎকোচ দিলেই উৎকোচ লইতে হইবে, নতুবা ঘোর প্রজাপীড়ন আবশ্যক হইবে, তদ্ভিন্ন এত টাকা কোথা হইতে আসিবে ! ধিক্ ধিক্ ! দয়াকে, ধর্ম্মকে ছাড়িয়া একান্তই নির্দ্দয় নির্ম্মম হইয়া রাজত্ব করা ! এমন শাসন-কর্ত্তৃত্ব চাই না—ভাগ্যে যাই থাকুক ! কিন্তু কে যেন হৃদয়ে হাত বুলাইয়া সাহস বাক্যে বলিয়া দিতেছে 'ভয় কি ? সত্যের পথে—ন্যায়ের পথে থাক, কোন চিন্তা নাই ! যদিই শত্রুরা অপবাদ-মেঘে চরিত্রকে আবরণ করে, তাহা কতক্ষণ ? সূর্য্যকে মেঘে কি চিরকালই ঢাকিয়া রাখিতে পারে ? সত্য শেষ প্রকাশ পাইবেই পাইবে !' তবে সহসা অতর্কিত ভাবে আবৃত না করে, সে জন্য সাধ্যমত সতর্ক থাকা চাই !"

সমস্ত দিবসের অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, নানা ঘটনা ও নানা বিষয়িণী চিন্তায় অতি ক্লান্তি বশতঃ গভীর রজনীর ঐ সংকল্পের সহিত নিদ্রাদেবী তাঁহাকে

স্বীয় বিনোদ অঙ্কে আশ্রয় দান করিলেন! অমনি কুহকিনী স্বপ্নদেবী তাঁহার কল্পনা-চক্ষুর নিকট স্বকীয় মোহন মুকুরখানি ধরিলেন,তাহাতে দেখিলেন কি? দেখিলেন, ভাবী সৌভাগ্য; দেখিলেন প্রজানুরক্তি; দেখিলেন রাজানুগ্রহ! সে সঙ্গে এ আবার কি? সে সঙ্গে এ অদৃষ্টপূর্ব্ব অপূর্ব্ব চিত্রখানি—এ সুমধুর সুমোহিনী বালামূর্ত্তিখানি কাহার? তুলীন তাহা বুঝিতে পারিলেন না—পাঠকও আর কিয়দ্দূর আমাদের অনুগমন না করিলে বুঝিতে পারিবেন না!

ইহা কোন্ রজনীর বর্ণনা, তাহা যেন স্মরণ থাকে—যে রাত্রে দুর্গাধিকার, এ তাহার পর রজনী—সে রাত্রে দণ্ডবর অতিথি, তখনও দণ্ডবর কাংরা ছাড়িয়া যান নাই—প্রভাতেই যাইবেন।

প্রভাত হইল, তুলীন সুখ-স্বপ্নের শয্যা ত্যজিয়া উঠিলেন। দণ্ডবরের সম্মানার্থ তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্কন্ধাবার পর্য্যন্ত যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তদাভাস পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সে স্থলে একটী কথা বলা হয় নাই—"উপযুক্ত স্থলে বলিব" ইহা বলিয়াই রাখিয়াছি। সেই উপযুক্ত স্থল এই;—

অর্থাৎ যে অংশে তুলীন পাঁচশত সহচর সঙ্গে দুর্গারোহণ করিয়াছিলেন, দণ্ডবর দুর্গ ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে সেই অংশটী একবার ভালরূপে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তুলীন পরমাহ্লাদে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া আপনিই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। উপর হইতে পর্ব্বতগাত্র ও তলভূমি পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক তুলীন-সৈন্যের উত্থান-কৌশল শুনিয়া দণ্ডবর ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া বলিলেন "আপনি যে কার্য্য করিয়াছেন, নিতান্তই অসমসাহসিক ও অদ্ভুত চাতুর্য্যপূর্ণ—(সহাস্যে) 'চৌর্য্য' বলাও অসঙ্গত হইতে পারে না! সেরূপ চৌর্য্য চাতুর্য্য ভিন্ন শুদ্ধ সাহাসিকতায় কদাচই সিদ্ধ হইতে পারিতেন না। একথা কেন বলিতেছি, আসুন, এই দৃষ্টি করুন।" এই বলিয়া দুর্গাভ্যন্তরস্থ নানা কল কৌশল ও আক্রমণ নিবারণের উপায় সকল দেখাইলেন৷

তুলীন দেখিলেন, দুর্গের বুরুজের উপরে স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ পাষাণখণ্ড এরূপে সাজানো এবং তত্তাবৎ নিক্ষেপ করিবার ও গড়াইয়া দিবার জন্য এমন সকল কল কৌশল করিয়া রাখা হইয়াছে যে, শত্রুরা যখন আরোহণ করিবে, তখন আর আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োজন নাই; সেই পাষাণ গড়াইয়া

ফেলিলেই আরোহণকারীদের যমভবন দর্শন নিশ্চিত! আবার মনে করুন, ঐ সব পাষাণ-পতনাঘাতেও যদি কতক লোক বাঁচে এবং গোলা গুলি, তীরের হস্তেও নিস্তার পাইয়া উপরে উঠিতে পাবে, তখন হাতাহাতি নিকট-যুদ্ধের প্রয়োজনে শুদ্ধ অসির উপরই দণ্ডবরের নির্ভর ছিল না, ছোট বড় বাঁশের খোঁচা ও বংশ-দণ্ডের অগ্রভাগে ফলক ও বহুসংখ্যক ত্রিশির-কণ্টকাদি-বিশিষ্ট নানা মূর্ত্তির ভয়ঙ্কর ভল্লবিশেষ বিস্তর প্রস্তুত রহিয়াছে! তাহাতেও পার পাইলে দুর্গাভ্যন্তর প্রবেশের পথে পথে গভীর গর্ত্ত সকল গুপ্ত কূপবৎ বিদ্যমান—তাহাদের আচ্ছাদন এক প্রকার পাতলা চেটাই, তাহা আবার তৃণদ্বারা আবৃত—বেগবান বৈরিপক্ষকে অনায়াসেই সেই সব ফাঁদে পড়িয়া হয় গতাসু নয় হড়ুপি-বদ্ধ সর্পাকারে বন্দী হইতে হয়। কিন্তু হায়! দণ্ডবরের অদৃষ্ট-চক্র এত বক্র হইয়া উঠিল যে, এত ভীষণ উদ্যোগেও বিপক্ষ দলকে পেষণ না করিয়া তাঁহার নিজ দলকেই দলন করিল!

সে যাহাই হউক, এই সব দেখিয়া ডুলীন বিস্মিত হইলেন এবং এত বিপদের একটীতেও যে তাঁহার একটীও লোক পতিত হয় নাই, এবং যে পথে ঐ সকল কূপ ছিল, সে পথ দিয়া বনভূমি হইতে তাঁহার দল যে নিষ্ক্রান্ত হয় নাই, তজ্জন্য সর্ব্বরক্ষক শুভঙ্করের দয়াময় নাম স্মরণ পূর্ব্বক মনে মনে কৃতজ্ঞতা পুষ্পে পূজা করিলেন!

দণ্ডবর তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন "সাহেবের ভাগ্য এখন সম্পূর্ণ সুপ্রসন্ন, তাই দুরাশয় নন্দ সিংহের কপট মিত্রতার কথায় নিতান্তই প্রতারিত হইয়া আমি ফটকের দিকেই বেশী মনোযোগী হইয়াছিলাম—আমার কপালে অযশ লেখা আছে, এই জন্যই আমার প্রধান সহকারী সেই বিশ্বাসঘাতকের সহিত কথাবার্ত্তা চালাচালি করিয়াছিল। সে দুরাত্মা যদি মিথ্যা সংবাদ না পাঠাইত এবং দুর্ভাগ্যবশে তাহাতে যদি পূর্ণ প্রত্যয় স্থাপন না করিতাম, তবে পূর্ব্বে যেমন সর্ব্বদিকেই সমানভাবে সতর্ক ছিলাম এবং ঐ প্রত্যয়ের পরেও সর্ব্বক্ষণ যেরূপ সতর্ক থাকাই উচিত ছিল, তাহাই থাকিতাম, সুতরাং সাহেব কদাচই সফল হইতে পারিতেন না!"

ডুলীন দেখিলেন, তাঁহার প্রতি নন্দের ব্যবহার সম্বন্ধে দণ্ডবরের একটী ঘোর ভ্রান্ত সংস্কার জন্মিয়াছে—দণ্ডবর ভাবিয়াছেন, নন্দ যাহা করিয়াছে, সমস্তই সাহেবের ইচ্ছায়—সকলই সাহেবের মন্ত্রণায়—সকলই সাহেবের

হিতোদ্দেশে—এবিষয়ে সাহেবই যেন নন্দের দীক্ষাগুরু! দুলীন তৎক্ষণাৎ প্রকৃত অবস্থার সমুদয় আনুপূর্ব্বিক পরিচয় দিয়া শেষে বলিলেন "অতএব দুরাত্মা আপনার প্রতি প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতিতা করে নাই, আমার প্রতিই বিধি মতে করিতেছে—এবারে সে নিজে প্রতারিত হইয়াছে, কাজেই আপনিও হইয়াছেন! তাহার বিশ্বাসঘাতিতা ও গুপ্ত বিদ্রোহিতা দিন দিন এত বাড়িতেছে যে, আর সহ্য হয় না। অধিক কি, কয়েক বার আমার প্রাণ-হননের চেষ্টাও যে করিয়াছে, তাহাও তো শুনিলেন; বোধ হয়, পুনর্ব্বার তাহার সুযোগ সন্ধানেও আছে। বিশেষ তাৎপর্য্য না থাকিলে, বিরলে এই দীর্ঘ পরিচয় শ্রবণের কষ্ট আপনাকে দিতাম না! আপনি সরলপ্রকৃতি, সদাশয় ও মহৎ, আপনি অবশ্যই রাজধানী ও রাজসভায় গমনাগমন করিবেন; এইরূপ অসহনীয় দুর্ব্বৃত্ততা ও অসম্ভব (সহকারীর পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত) বিশ্বাসঘাতিতার জন্য যদ্যপি আমাকে কদাপি তাহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিতে হয় এবং সেই উপলক্ষে যদি ছল ধরিয়া তাহার আত্মীয়গণ রাজগোচরে বা অন্যত্র আমার কুৎসা ঘোষণা করে, তবে তৎকালে আমার হইয়া দুইটা কথা না বলিয়া আপনার সাধু স্বভাব কথনই পরিতৃপ্ত থাকিতে পারিবে না—আপনি তাহার দুষ্কৃতি প্রত্যক্ষ করিয়া যাইতেছেন!"

অশ্বারোহণে পার্শ্বাপার্শ্বি চলিতে চলিতে উভয়ের এবম্বিধ বহুতর কথোপ-কথন, ভাবাভিপ্রায়ের বিনিময় এবং বিবিধ শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপ হইতে হইতে দণ্ডবরের সেনা-নিবাস পর্য্যন্ত তাঁহাকে রাখিয়া দুলীন প্রত্যাগমন করিলেন।

ফটকে চৈতন আটক করিয়া বলিলেন, "হুজুর! কাংরা রাজ্যের কতক-গুলি বড় বড় লোক এসেছেন—তাঁদের দরবার ঘরে বসিয়ে এসেছি—হুজুর! মাপ ক'র্ব্বেন, ও দিক্‌দে যাবেন না; এই দিক্ দে আসুন; পেছনের সিঁড়ি দে উপরে উঠুন; মহারাজ যে খেলাত দিয়েছেন, সেই পোষাকটী পরুন; আগে নকিব আর আশা, সোঁটা, বল্লম, পশ্চাতে আমি, আমার পশ্চাতে আর্দ্দালি পাইক—হুজুর, মাপ করুন—ও দিক্‌দে যাবেন না।" ইত্যাদি বিবিধ!

কিন্তু চৈতনের কি মনস্তাপ! নূতন শাসনকর্ত্তা হাসিতে হাসিতে নিষিদ্ধ দিক্ দিয়াই একবারে দরবার-গৃহ-দ্বারে গিয়া অবতরণ করিলেন! সেই বেশেই "রাজ্যের বড় বড় লোকদের" মধ্যে গিয়া তাঁহাদের সেলাম, সেলামী;

রামরাম, ঝমরাগী প্রভৃতি নজরানা গ্রহণ ও মিষ্ট বচনে সম্ভাষণ, আলাপ ও বিদায় দানাদ তাবৎ কর্ম্মই করিয়া ফেলিলেন!

দশম পরিচ্ছেদ।

নব শাসনকর্ত্তা।

স্বভাবতঃই শ্রমশীল ও অধ্যবসায়ী, তাহাতে স্কন্ধে এখন অতিশয় গুরু ভার, সুতরাং দিবা নিশি দুলীনের আর বিশ্রাম নাই। সেনাপতি ও অধিপতি, উভয়ই তিনি—মনোমত সুশিক্ষিত সহকারীর সাহায্যেও বঞ্চিত; তদ্বিপরীতে বিশ্বাসঘাতক সহকারীর সাহচর্য্য ও সাহায্য গ্রহণে বাধ্য—কখন্ কি সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া তুলে, কিছুই ঠিক নাই! তবে সৌভাগ্য বটে যে, আর আর তাবৎ কর্ম্মচারীর অধিকাংশই বিশ্বাসী ও অনুগত—অনেকেই আন্তরিক প্রেমানুরাগের সহিত প্রভু-ভক্ত—প্রভুর নিমিত্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত! আরো সুবিধা, দুর্গের ভিতরে বাহিরে—জয়ন্তীর উপরে, জয়ন্তীর পদতলস্থ কাংরা নগরে, জয়ন্তীর চতুর্দ্দিকে কাংরা প্রদেশে—সর্ব্বত্রই সুরব—সর্ব্বত্রই সাহেবের বুদ্ধি-প্রাখর্য্য, রণচাতুর্য্য, সাহস, বিক্রম, ক্ষমতা, যোগ্যতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, ন্যায়পরতা, সচ্চরিত্রতা এবং "দুর্জ্জন দমন সুজন পালন" প্রভৃতি অসাধারণ গুণমাহাত্ম্যের কথা যথা তথা নিয়তই জল্পিত ও ব্যাপ্ত হইতেছে! সর্ব্ব কার্য্যেই, বিশেষতঃ যুদ্ধচালন ও রাজ্যশাসন পক্ষে নাম ডাক সামান্য সহায় নয়!

নব শাসনকর্ত্তার প্রতিদিনের ব্যবহারেও সে সুখ্যাতির আরো প্রতিপত্তি বাড়িল। তিনি দণ্ডবরকে বিদায় দিয়া আসিয়া অবধি অনবরতই কর্ত্তব্য-বিষয়িণী চিন্তায় ও কর্ত্তব্য সাধনেই অভিনিবিষ্ট হইলেন। প্রথমেই অধীন রাজ্যখণ্ড ও তদধিবাসী প্রজাপুঞ্জের স্বরূপাবস্থার প্রগাঢ় অনুসন্ধান ও যথাযোগ্য কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন প্রভৃতি আশু-প্রয়োজনীয় বিষয়ে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম ও যত্ন করিতে লাগিলেন। সহসা পূর্ব্ব ব্যবস্থাদির কিছুই পরিবর্ত্তন করিলেন না—উৎকট উন্নতি-প্রিয় ব্যবস্থাপক-বৃন্দের ন্যায় বলপূর্ব্বক নূতন সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন না—অতি সাবধানে নানা সূত্রে ভৌগোলিক, ভৌতিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক বর্ত্তমান অবস্থা ও পূর্ব্ববৃত্তান্ত তন্ন তন্ন

রূপে জ্ঞাত হইতে লাগিলেন। তিনি তজ্জন্য (স্বাস্থ্য জন্যও বটে,) প্রত্যহ সকালে বিকালে অভিজ্ঞ ও বিশ্বাসী বিজ্ঞ ব্যক্তিগণে পরিবৃত হইয়া ভ্রমণে বহির্গত হইতেন—বাহ্য-শোভাবৰ্দ্ধক বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞাপক জাঁকজমক জন্য কতকগুলা আড়ম্বরের লোক সঙ্গে নয়! স্থল বিশেষে কখন অশ্বে, কখন পদব্রজেও যাইতেন!

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কাংরা প্রদেশ পার্ব্বত্য ও বন্য। কিন্তু পার্ব্বত্য বলিয়া সমগ্র দেশটাই পর্ব্বতময় নয়; মধ্যে মধ্যে রীতিমত গ্রাম, উদ্যান ও ক্ষেত্রাদি সমন্বিত সুপ্রসারিত সমতল ভূখণ্ডও বিস্তর। কেবল এই বুঝিতে হইবে যে, সমষ্টির তুলনায় পার্ব্বত্য ও বন্য অংশাবলীই বেশী। সেই সকল গিরি কাননের মধ্যেও বহু লোকালয় আছে—অধিত্যকা ও উপত্যকাদির অভ্যন্তরে যেখানে যেখানে সুবিধা ও সুগম বোধ হইয়াছে, মনুষ্য সেই সেই স্থলেই বাস্তু-ভূমি স্থাপন বা জনপদ পত্তন পক্ষে ত্রুটি করে নাই। আক্ষেপ এই, একে তো অগম্য ও মনুষ্য-বাসের অযোগ্য গিরিকানন ভাগ অনেক, তাহাতে সমতল ভূমির অনেক অংশও (যথায় পূর্ব্বে লোকালয় ছিল, তাহাও) মনুষ্যের অত্যাচারে গহন বন তুল্য হইয়া পড়িয়াছে! অল্পানুসন্ধানেই দুলীন জানিতে পারিলেন, যবনাগমনের পূর্ব্বে অর্থাৎ আর্য্য জাতির স্বাধীনাবস্থায় সে সকল স্থলে সুন্দর জনপদ ছিল। অধিক কি, কাংরা রাজ্য শিখ-সাম্রাজ্যভুক্ত হইবার পূর্ব্বে যখন ক্ষত্র-কুলোদ্ভব সংসারচাঁদ কাংরার স্বাধীন রাজা ছিলেন, তখনও যে সব স্থান গ্রাম নগরাদি পদে বাচ্য হইত, দুলীনের পূর্ব্ববর্ত্তী কুশাসকগণের কুশাসনে সে সবও বন-ভূমি-প্রায় হইয়া উঠিয়াছে বা উঠিতেছিল। তবেই বুঝা যাইতেছে, শিখ শাসনকর্ত্তারা মহারাজার, প্রধান মন্ত্রিগণের এবং আপনাদের স্বার্থ দেবতার পৃথক্ পৃথক্ মহা পূজায় অত্যধিক তৎপর থাকিতেন—তাহাতে প্রজাদের দশা কি হইল, সে সামান্য কথাটার প্রতি তত মনোযোগ দিতেন না—পেট চিরলে এককালে অসংখ্য ডিম্ব পাইবেন, হাঁস বাঁচে কি মরে, তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই!

যদি রাজ্য মধ্যে কুশাসন ও পীড়ন জন্য রাজাই দায়ী, সুতরাং কাংরার কুপালন জন্য রণজিৎকেই দোষী বলা যায়; তথাপি যথার্থ বিচার করিলে, সে ত্রুটি যে তাঁহার ইচ্ছাকৃত নয়—কেবল সচ্চরিত্র সুশাসক অভাবেই ঘটিত, তাহা দুলীনের নিয়োগেই বুঝা যাইতেছে। কুশাসনে কাংরার প্রজাবর্গ

প্রপীড়িত হইয়া পৈতৃক বাস পর্য্যন্ত পরিত্যাগে বাধ্য হইতেছে, এই কুসংবাদ শুনিয়া অবধি রণজিৎ তৎপ্রতিকারার্থ ব্যাকুল ছিলেন, এমন সময় তুলীনকে পাইবা মাত্র তাঁহার গুণবোদ্ধা হৃদয় "যোগ্য পাত্র পাইয়াছি" বলিয়া অহ্লাদিত হইল—মহারাজ শুদ্ধ সেই হৃদয়ের কথাতেই (স্বীয় মন্ত্রীবর্গের অনিচ্ছাতেও) অল্প-পরিচিত অপরীক্ষিত হস্তে অনায়াসে শাসন-ভার অর্পণ করিলেন—আশা যে, এ ব্যক্তির দ্বারা অবশ্যই কাংরার দুর্গতি দূর হইয়া তত্রত্য জনশূন্য জনপদ পুনর্ব্বার জনপূর্ণ ও সুখসমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারিবে! সে আশা-লতা ফলযুতা হয় কি না, শীঘ্রই জানা যাইবে।

সে যাহাহউক নব শাসনকর্ত্তা স্বচক্ষে দেশের অবস্থা দেখিতে লাগিলেন—সুগম স্থানে হয়ারূঢ়, দুর্গম স্থলে পদব্রাজক, দূরস্থানে অশ্বশকটে পর্য্যটক! কোন্ পর্ব্বতে, কোন্ বনে, কোন্ উপত্যকায় কোন্ পথাপথ দিয়া যাইতে আসিতে হয়; কোন্ গুপ্ত গিরিপথ দিয়া স্বীয়াধীন দেশে শত্রু প্রবেশ করিতে পারে—কিসে তাহা নিবারিত হয়; কোথায় কি কি নৈসর্গিক পদার্থ ও নৈসর্গিক ব্যাপার—যথা, কোথায় কোন্ কোন্ হ্রদ, নদ, নদী, নির্ঝর, উৎস, প্রস্রবণ, প্রপাত ও গুহা প্রভৃতি আছে (মানচিত্রও সামান্যরূপে প্রস্তুত করিয়া লইলেন); কোন্ লোকালয়ে, কোন্ পর্ব্বতে, কোন্ বনে, কোন্ ভাগে কি কি আহার্য্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় ও চেষ্টা করিলে হইতে পারে; কি প্রকার পশু পক্ষ্যাদি কোথায় জন্মে ও বাস করে; কোন্ ভাগের জল বায়ু কিরূপ; দেশের খনিজ, ক্ষেত্রজ, উদ্ভিজ্জ, শিল্পজ, কীটজ প্রভৃতির প্রকার ও অবস্থা কীদৃশ; দেশস্থ লোকের অশন, বসন, আচার ব্যবহারাদি কি প্রকার; ইত্যাদি সুসভ্য জ্ঞানী শাসনকর্ত্তার জ্ঞাতব্য তাবদ্বিষয়েই দর্শন-শ্রবণ-শক্তিকে (অন্যান্য কর্ত্তব্যের সঙ্গে) প্রগাঢ়রূপে ও নিরালস্য ভাবে ব্যাপৃত রাখিলেন। তাঁহার প্রবেশিকা সূক্ষ্ম বুদ্ধি অল্পদিনেই এ সমস্ত-বিষয়ক জ্ঞান আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইল—যেখানে ঐকান্তিক ইচ্ছা, সেখানেই পন্থা!

ফলতঃ তাঁহার সর্ব্ব সামঞ্জস্য-কারিণী প্রবৃত্তি; প্রজা সাধারণের প্রতি বাৎসল্য; আশ্রিতগণে কারুণ্য; দুষ্টে কাঠিন্য; শিষ্টে সৌজন্য; কর্ত্তব্যে আসক্তি; কার্য্যে পটুতা ও তৎপরতা; পরিশ্রমে অশ্রান্তি এবং সর্ব্ব বিষয়ে যেমন আগ্রহ, তেমনি ধীরতা—যেমন অধ্যবসায়, তেমনি আশুস্ত দৃষ্টি ইত্যাদি অসাধারণ গুণচয় দর্শনে তাবল্লোকেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। মিত্রপক্ষের

সেই বিস্ময়—আনন্দ, প্রীতি ও ভক্তি সহকৃত! শত্রুপক্ষের (সৌভাগ্যক্রমে অত্যল্প সংখ্যক) সেই বিস্ময়—বিষাদ, ভয় ও ঈর্ষা মিশ্রিত! অপরাপরের সেই বিস্ময়—আশা, ভরসা ও অনুরাগ সম্পৃক্ত!

বস্তুকর্তৃক, ইতিপূর্ব্বে আর কোন শাসনকর্ত্তা বা সর্দ্দারকে এরূপ ভাবাপন্ন কেহ কখনই দেখে নাই। সর্দ্দারেরা বেলায় উঠেন; আরো বেলায় দরবারে বার দেন; তাকিয়া ঠেস দিয়া চক্ষু বুজিয়া আলবোলা টানিতে টানিতে কয় দণ্ড মাত্র দরবারে অবস্থিতি করেন; লোকের আর্দ্দাশ ও আমলাগণের এতালা যৎকিঞ্চিৎ শুনেন কি না শুনেন; তোষামোদকারীরা যেমন বুঝাইয়া দেয়, তেমনি বুঝেন; যাহা হয় একটা হুকুম দিয়া বসেন—হয় তো আর্দ্দাশকারীর বড় দুঃখের কথাতেও কর্ত্তার ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া মোসাহেবেরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে, কর্ত্তা বড় খুসি হয়েন! নয় তো বড় বিলাপজনক অভিযোগ উৎকোচগ্রাহীদের কুচক্রে পড়িয়া অগ্রাহ্য করেন—অভিযোক্তাকে দুর্ব্বাক্যে তাড়াইয়া দেন—প্রায়ই চক্রান্তকারী প্রবলের গ্রাসে দুর্ব্বলের সর্ব্বনাশ ঘটিয়া উঠে—ন্যায়ান্যায়ের প্রতি দৃষ্টিই নাই, কেবল নজরানা, জরিমানা, রাজস্ব আদায়, বাব আদায় ও প্রভুত্ব বজায়, এই সকলের দিকে দেখিবার জন্যই শেষনাগের দৃষ্টি ধারণ করেন!

এইরূপ অপরূপ দরবার উর্দ্ধতঃ দশ দণ্ড বেলা পর্য্যন্ত। তখন ভৃত্যেরা গন্ধ তৈল লইয়া আইসে—হয় তো সেই স্থলেই স্থূলোদরে মর্দ্দন করিয়া দেয়! তৎপরেই স্নান ভোজন। ভোজনান্তেই শয়ন। অপরাহ্নে বা সায়াহ্নে উঠিয়া পুষ্পোদ্যানাদি ভ্রমণ (কাংরা দুর্গে উত্তম পুষ্পোপবন ও ফলোদ্যান ছিল) অথবা বহু পারিষদ সমভিব্যাহারে ধীরেধীরে কিয়ৎক্ষণ বাহিরে (কিয়দ্দূর মাত্র) পদচারণ। রজনীতে তৌর্য্যত্রিকাদি উৎসব ও অন্য বিবিধ দূষিত বিলাসানুষ্ঠান। বহু রাত্রি জাগরণ হেতু তরুণ অরুণচ্ছটা কস্মিন কালেই দেখিতে পান না—এত যে সঙ্গীত ভালবাসেন, কলকণ্ঠ বিহঙ্গমের প্রভাতী কূজনতান কখনই কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে পায় না!

কিন্তু নূতন শাসনকর্ত্তার ধরণ ধারণ, চলন চালন সকলই বিপরীত। ইনি অতি প্রত্যূষেই উঠেন; বহু দূর বহু ক্ষণ পদব্রজে বা অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ করেন; প্রত্যাগমনের পরই স্নান ভোজনান্তে দরবারে বসেন; এ দরবার আর সে দরবার বিস্তর বিভিন্ন—ইহাতে আলবোলা তাকিয়া নাই—ইহাতে মেজ

কেদারা; লোক বিশেষের জন্য কেদারা, বেঞ্চ, ঢালা বিছানা, সবই আছে, কর্ম্মচারীদের স্থান নিকটেই নির্দ্দিষ্ট; প্রত্যেক হিসাব, প্রত্যেক এতালা, প্রত্যেক প্রস্তাব, প্রত্যেক প্রার্থনা, প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের পর্য্যায়ক্রমে তন্ন তন্ন দর্শন, আন্দোলন, মীমাংসা, আদেশ; ধনী দরিদ্র নাই, আপন পর নাই, স্বার্থ পরার্থ নাই, দূষিত প্রকারের উপরোধ অনুরোধ নাই, রাগ দ্বেষ নাই, তোষামোদের ব্যাপার নাই—কেবলই বিষয় বুঝিয়া ব্যবস্থা—কেবলই ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ, যুক্তিসঙ্গত, লোকসঙ্গত সত্যানয় সদ্বিচার, সুতরাং সর্ব্ব-সন্তোষকর সিদ্ধান্তই দেখিতে পাওয়া যাইত!

নব শাসকের বিলাসিতা নাই, কিন্তু এক কার্য্যে দুই তিন বার আহার আছে! প্রায়ই আটটা হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত দরবার, তৎপরে গ্রন্থাদি পাঠ, অপরাহ্নে সৈনিক শিক্ষা, পরীক্ষা ও পরিদর্শন—সে পক্ষে কখনই ত্রুটি নাই! সায়াহ্নের পূর্ব্বাহ্নে আবার পর্য্যটন—প্রাতঃকালিক, সান্ধ্য, উভয় কালিক পর্য্যটন উপলক্ষেই সর্ব্বপ্রকার প্রজার সহিত আলাপ, পরিচয়, সম্ভাষণ, তত্ত্বাবধান ইত্যাদি। সন্ধ্যার পর সৈনিক বিভাগেরই বিজ্ঞাপনাদি শ্রবণ ও কর্ত্তব্যাদেশ এবং দুর্গ রক্ষণের প্রাত্যহিক ব্যবস্থাদি বিধান। তৎপরে কিঞ্চিৎকাল সঙ্গীতামোদ; প্রথম যামান্তেই শয়ন। ইহাই তুলীনের প্রায় প্রাত্যহিক সাধারণ কার্য্য-নিয়ম—প্রয়োজন-মতে তাহার রূপান্তর বা ব্যতিরেক ঘটিত মাত্র।

শিখ সর্দ্দারেরা যখন বাহিরে যাইতেন, তখন গজ, বাজী, রথ, রথী, অশ্বারোহী, পদাতিক, পতাকা, আশা সোঁটা প্রভৃতি কতই সঙ্গে যাইত—কতই ধুমধাম ঘোর ঘটা বাধিত! ছত্রধারী, চামরধারী, ময়ূরপুচ্ছধারী, পানবরদার, আল্‌বোলা বা হুঁকাবরদার, নল-বরদার প্রভৃতি সঙ্গে সঙ্গে যাহার যে কাজ করিতে করিতে যাইত—হুজুর পর্য্যাণে বা আমারিবরে বা তাঞ্জাম নামা চতুর্দ্দোলে হেলান দিয়া উভয় পার্শ্বস্থ পারিপার্শ্বিকদের সহিত হাস্যালাপে কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে, সুগন্ধ তাম্রকূট টানিতে টানিতে, মৃদু মন্দ গতিতে গাম্ভীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মদমাৎসর্য্য দেখাইতে দেখাইতে চলিয়া যাইতেন—বিলাসের আবেশ নয়ন যুগলে প্রকাশমান—আলস্য, ঔদাস্য, আত্ম-মহত্ত্ব-ভাণ মূর্ত্তিমান—সর্ব্ব মানবশ্রেণী যেন তাঁহারই ক্রীতদাস, এই সংস্কারের অসীম প্রভুত্ব দেদীপ্যমান! হুজুরের এরূপ গমনে যে পল্লী—যে পথ ধন্য হইত, তত্রত্য তাবৎ অধিবাসী ও বর্ত্মবাহী লোক তাঁহার পথের দুই ভিতে দুই শ্রেণীতে দাঁড়াইত—জ্যৈষ্ঠ ঝড়ে

মাঠময় ধান্য-চারা যেমন নত হইয়া পড়ে. তেমনই অবনত ভাবে সকলেই কুর্ণিস করিত! সে পক্ষে যদি কোন দুর্ভাগার তিলমাত্র ত্রুটি ঘটিত, তবে আর রক্ষা থাকিত না—মহল্লার কোতোয়াল ঐ সূত্রেই তৎপ্রতি ঘোর পীড়ন ও তাহার নিকট (তৎসাধ্যাতীত) পূজা গ্রহণ না করিয়া ক্ষান্ত হইত না!

এমন প্রভুর ভুজাশ্রিত চিহ্নিত অনুচর হওয়া কি সৌভাগ্য নয়? সুচতুর সহচর ও কর্ম্মচারী মাত্রেই অল্প কালেই প্রচুর ধনের ঈশ্বর হইয়া উঠিতে পারে! তদ্ব্যতীত "প্রভুত্ব" নামে সর্ব্ব মনুষ্যের লোভনীয় একটি অদ্ভুত পদার্থ যে আছে, সেটীর প্রাপ্তি পক্ষেও কোন অপ্রতুলতা থাকে না!

কিন্তু নূতন শাসনকর্ত্তা তো সে প্রভুর সর্দ্দার নন—তেমন ধরণে দরবার করেন না—তেমন জাঁকজমকে বাহির হন না—যাহার তাহার সঙ্গে স্বয়ংই কথা কন—যেখানে সেখানে থপ্ থপ্ করিয়া যান—নজরানা ব্যতীত এবং আর্দ্দালি অবধি দেওয়ান পর্যন্ত অনেককে তুষ্ট করা ব্যতীত যাহারা সর্দ্দারের নিকট আসিতে পারিত না, এখন সেই সর্দ্দার সাহেব স্বয়ংই তাহাদের গ্রামে গ্রামে—দ্বারে দ্বারে গমন করেন! শুদ্ধ কি গমন? তাহাদের বৈষয়িক ও সংসারিক ভাল মন্দ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করেন; সুতরাং তাহারা আর কর্ম্মচারিগণের খোষামোদ বা তাহাদিগকে উৎকোচ দান করিবে কেন? কাজেই কর্ম্মচারীবর্গের প্রাপ্তি গণ্ডা প্রায় সমস্তই উঠিয়া গেল!

এই সকল বিবিধ প্রবল হেতুতে কর্ম্মচারীমণ্ডলে অসন্তোষ জন্মিয়া উঠিল—প্রথমে ভয়ে ভয়ে কাণাকাণি; পরে সমবেত পরামর্শে দুই তিন জন প্রধানকে সকলের প্রতিনিধি স্বরূপে নব শাসনকর্ত্তাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া পূর্ব্ব ধরণে আনিবার জন্য নিযুক্ত করা হইল।

তাহারা সকলেই সাহেবকে ভালবাসিত। তাহাদের সংস্কার এই যে, সাহেব বিদেশী, এদেশের রীতি, নীতি, কার্য্যপদ্ধতি প্রভৃতি বড় একটা জানেন না, কেবল এই জন্যই এমন আচরণ করিতেছেন। তাঁহাকে শিখাইয়া বুঝাইয়া তৈয়ার করিয়া লওয়া উচিত!

ফলতঃ এ বিষয় এত গুরুতর বোধ হইয়াছিল যে, সাহেবের বিশ্বাসী লোকও কেহ কেহ এ দলে ছিল—তাহারা ভাবিত, এতদ্রূপ ব্যবহারে প্রভুর পদমর্য্যাদার গুরুত্ব রক্ষা হইতেছে না।

নন্দ সিংহ প্রভৃতি কুচক্রী বৈরিপক্ষ এই অসন্তোষ-বহ্নিতে ফুৎকার দিতে

লাগিল—বিদ্রোহিতার ইঙ্গিত দিতেও ত্রুটি করে নাই। কিন্তু তাহাদের তদাভাস কেহই গ্রাহ্য করিল না। বরং তদ্রূপ কুমন্ত্রণা "আর যদি মুখাগ্রে আনিবে, তবে সমুচিত শাস্তি পাইবে," এমন প্রত্যুত্তরও কেহ কেহ দিয়াছিল।

সে যাহা হউক, ঐ প্রতিনিধিরা মহেবের সুস্থ সময়ের সুযোগ বুঝিয়া যথার্থ হিতৈষী ভৃত্যের ভাব ভঙ্গীতে—অতি কুণ্ঠিতের ন্যায়—কতক স্পষ্ট বাক্য, কতক আকার ইঙ্গিতে—এক দিনে নয়, মাঝে মাঝে—এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিত, যথা ;—

"হুজুর যে জাঁকজমক ব্যতীত বহির্গত হন—একাকী বা অল্প সঙ্গীমাত্র সঙ্গে যথায় তথায় ভ্রমণ করেন, অধীনদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় তাহা বড় ভাল দেখায় না। তাহাতে লাভই বা কি? হুজুর যে কেন এরূপ করেন, হুজুরের গোলামেরা তা ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে না!"

"অধীন দেশের ও অধীন প্রজাবর্গের প্রকৃত অবস্থাদির প্রত্যক্ষ সম্যক্ জ্ঞান ভিন্ন সুশাসন সম্ভবে না—এরূপ পর্য্যবেক্ষণে মহোপকার" ইত্যাদি ভাবের কথা তুলীন বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, তথাপি তাহারা প্রবুদ্ধ না হইয়া বিনীত ভাবে নিম্নলিখিতরূপ প্রতিবাদ, যুক্তিবাদ ও পরামর্শবাদ উপস্থিত করিল—

"দেশের আর প্রজার অবস্থা জানা! তা এরূপে কেন? হুজুর গদিতে বসিয়া থাকিবেন, আমরা সমুদয়ই বিদিত করিব। এই সামান্য কাজের জন্য হুজুরের এত কষ্ট স্বীকার আবশ্যক কি? হুজুর এক চাক্‌লার রাজা, কোথায় হুজুরের পাদপদ্ম দর্শন জন্য লোকে তপস্যা করিয়া মারবে, তাহা না হইয়া আপনি তাহাদের দ্বারে দ্বারে গিয়া দেখা দিতেছেন, ইহাতে যে হুজুরকে কত হাল্কা হইতে হয় তা আর আমরা কি বলিব, হুজুর মনে মনে ঠাহরিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন! প্রজার প্রতি দয়া আর তাদেরই হিত জন্য হুজুর যে এরূপ করিতেছেন, তা কি কেউ বুঝ্‌বে? সেই প্রজারাই তা বুঝে কি না, সন্দেহ!

তুলীন কহিলেন "অবশ্যই বুঝিবে—বুঝিবে কেন, বুঝিয়াছে—ইতি মধ্যেই আমাকে পিতার তুল্য ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেছে—তাহাদের সুখ দুঃখের কথা অকপটে জানাইতেছে—তাহাদের উন্নতি উদ্দেশে যে সব আদেশ উপদেশ দিতেছি, বশীভূত পুত্রের ন্যায় পরমোৎসাহে তৎসমুদয় পালন করিতেছে। আমি

যখন গ্রামে গ্রামে যাই, তখন যদি তোমরা গিয়া স্বচক্ষে তাহাদের ভাব দর্শন কর, তবে জানিতে পার তোমাদের কত ভুল—তাহা হইলেই বুঝিতে পার, এই অল্প কালেই তাহাদের হৃদয় মধ্যে আমার প্রতি কি ভাব দাঁড়াইয়াছে! তোমরা আমার নিতান্ত হিতেচ্ছু, কিন্তু পুরাতন প্রথার পক্ষপাতে নিতান্ত ভ্রান্ত, এই জন্যই এত কথা কহিয়া তোমাদের ভুল দেখাইতে চেষ্টা পাইতেছি, নতুবা 'কিছু দিনে আমার প্রবর্ত্তিত নব পদ্ধতির সৎফল প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাদের ভ্রান্তি আপনারাই বুঝিবে,' শুদ্ধ এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইতাম!"

প্রতিনিধিরা ঘাড় নাড়িয়া সসম্ভ্রমে যুক্তকরে পুনশ্চ নিবেদন করিল, "হুজুর্ যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা সত্য হইতে পারে; কিন্তু তথাপি তাহাতে অনিষ্ট আছে; কেননা, হুজুরের শত্রুরা এই সূত্রে একটা শক্ত ছল ধরিয়া মহারাজার কর্ণ ভারি করিতে পারে!"

তুলীন সবিস্ময়ে বলিলেন "কর্ণ ভারি করিয়া দিবে! ইহাতে সুখ্যাতি বৈ নিন্দার ছল কি?"

তাহারা অবনত বদনে দুঃখের একটু মৃদু হাসি হাসিয়া কহিল "হুজুর অতি মহাত্মা ব্যক্তি, এদেশের ধূর্ত্ততা ও দুষ্ট ব্যবহার সম্পূর্ণ জ্ঞাত নন। হুজুরের দেশে যে কাজে যশ, এ দেশে সে কাজে অযশ ও সন্দেহ। হুজুর যে ব্যবহারকে প্রজাবাৎসল্য, সুতরাং রাজা প্রজা উভয় পক্ষেরই হিতজনক কাজ ভাবিতেছেন, কুচক্রী সভাসদেরা সেই সৎকার্য্যেকেই এমন মূর্ত্তিতে গড়িয়া মহারাজার কর্ণে তুলিয়া দিবে যে, তিনি ভাবিবেন প্রজার নিকট সাহেবের এত অধিক প্রিয় হইবার কোন নিগূঢ় দুরভিসন্ধি অবশ্যই থাকিবে! নতুবা প্রজাবর্গকে এতদূর বশীভূত করিবার চেষ্টা কেন? আরো ভাবিয়া দেখুন, হুজুর যতই নিঃস্বার্থ ভাবে প্রজাপালক ও প্রজারঞ্জক হইবেন, দুষ্ট সর্দ্দারেরা ততই আপনার ঘোর বৈরী হইয়া উঠিবে—তাহারা ততই ভয় পাইবে যে, এ ব্যক্তির বর্ণ যেমন আমাদের চেয়ে বহুগুণে শাদা, ইহার কার্য্যও যদি তদ্রূপ শাদা হয়, তবে তো আমাদের শাসন-প্রণালীর কৃষ্ণবর্ণ শতগুণে আরো অধিক কাল দেখাইবে! এই ভয় প্রযুক্ত আপনার প্রতি তাহাদের ঘোর ঈর্ষা জন্মাইবে। ঈর্ষা হইতে ঘৃণা; ঘৃণা হইতে মর্ম্মান্তিক শত্রুতা জন্মে কি না এবং তদ্রূপ শাত্রবতা হইতে অনিষ্ট চেষ্টা কতদূর সম্ভবে, তাহা আর বিজ্ঞ সাহেবকে এই

ক্ষুদ্রবুদ্ধি অধীনগণ কি বুঝাইয়া দিবে? তখন তাহারা সকলে একদল হইয়া হুজুরকে যে মিথ্যা ষড়চক্রে ফেলিবে, আশ্চর্য্য কি? আমাদের দেশে একটা কথা আছে, 'দশচক্রে ভগবান ভূত!' ভগবান মরে নাই, তাহাকে সকলেই স্ব স্ব চক্ষে দেখিতে পাইতেছে, তথাপি দশজনে চক্র করিয়া সে দেশের রাজার নিকট তাহাকে ভূত করিয়া তুলিল—ভূত বলিয়া সমস্ত লোক পলাইল—রাজাও পলাইলেন! হুজুরের প্রতি মহারাজার অতিশয় স্নেহ এবং বিশ্বাস থাকিলেও দশচক্রে না হয় কি? তাহাদের ষড়চক্রে দুই একজন বিদেশী সাহেবকে পূর্ব্বে অপদস্থ হইতেও দেখিয়াছি! গুরুজি এমন না করুন, কিন্তু ষড়যন্ত্রে পড়িয়া মহারাজাকে বুঝিতেই হইবে যে, হুজুর বুঝি প্রজা বশ করিয়া কাংরা অঞ্চলে স্বাধীন রাজা হইবার চেষ্টায় আছেন! আমরা হুজুরের একান্ত অধীন—শুধুই পদের অধীন নই—হুজুরের অসীম সদ্বিবেচনা ও করুণা গুণে (বিশ্বাস করুন বা না করুন, কিন্তু সত্য বলিতেছি) আমরা মনে প্রাণে জন্মের মত শ্রীচরণের অধীন হইয়া পড়িয়াছি—হুজুর ছাড়িলেও আমরা ছাড়িব না—হুজুরের মঙ্গলেই আমাদের মঙ্গল—হুজুর বাড়িলে আমরাও বাড়িব—হুজুরের ব্যাঘাত ঘটিলে আমারাও মজিব! অতএব দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমাদের এই সব কথাকে বে-আদবী বা কেবল মুখের আত্মীয়তা জ্ঞান করিবেন না, আমরা বিনীত ভাবে নত মস্তকে চরণে ধরিয়া এই প্রার্থনা করি, হুজুর বুঝিয়া চলুন—সর্দ্দারদের রীতি নীতি হইতে বেশী দূরে যাইবেন না এবং এত বড় উচ্চ পদ পাইয়া মিছামিছি কষ্ট করিয়া বেড়াইবেন না!"

প্রতিনিধিদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, সে তখন পূর্ব্ব বক্তার প্রতিপোষক স্বরূপ অতি গম্ভীর ভাবে বলিল—

"ধর্ম্মাবতার! অধিক টানাটানি করিয়া ধনুকের গুণ দিলে, হয় ভাঙ্গে, নয় ছিঁড়ে! অতএব বেশী প্রজাবাৎসল্য উচিত নয়! শরীরকেও অধিক কষ্ট দিবেন না—দু চারি দণ্ড বৈ গদিতে কাজ করিবেন না! যেমন বয়স, আর যেমন পদ, তারির মতন সুখভোগ করুন! ভাল দেখিয়া একটী পঞ্জাবী মুসলমানী কন্যাকে বিবাহ করুন! জীবন পদ্মপাতার জল, টল্ টল্ করিতেছে, এই বেলা সুখের মুখ দেখিবেন না তো কবে আর কি হইবে?"

তুলীন হাসিয়া বলিলেন "আমি গরীব—আমাকে ভাল লোকে মেয়ে দিবে কেন? আর দিলেই বা এখন আমি সংসার চালাই কিসে? সবে এই কর্ম্মে

বসিয়াছি মাত্র—কিছুকাল না গেলে তো সঞ্চয় হয় না। তার আবার, তোমরা যেরূপ বলিতেছে, তাহাতে এ কর্ম্ম কবে আছে কবে নাই!"

সকলেই একবাক্যে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল "গরিব! কাংরার শাসনকর্ত্তা গরিব! আজ্ঞা করুন, নজরানা আর নূতন বন্দোবস্তিতে দুই এক মাসের মধ্যেই নিদেন লাখ টাকার উপায় করিয়া দিই! হুজুর সে দিকে কিছুই করিতেছেন না, অমনি অমনি প্রায় রিক্ত হস্তেই লোকে বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেছে—যা যৎকিঞ্চিৎ সেলামি দিতেছে, তাকে রিক্তহস্ত বলাই ন্যায্য! এই সকল দেখিয়াই তো অধীনেরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া হুজুরকে দেশের রীতি নীতি পদ্ধতি জানাইবার জন্য সাহস করিয়া আসিয়াছে—চিরকাল কাংরার হিন্দু রাজারা, তার পরে শিখ সর্দ্দারেরা যাহা করিয়াছেন, হুজুর তাহা না করেন কেন?"

তুলীন পুনর্ব্বার হাসিয়া স্নেহ অথচ গাম্ভীর্য্য সহকারে শেষ উত্তর দিলেন "আমার প্রতি তোমাদের আন্তরিক আনুরক্তি এবং আমার মঙ্গলের নিমিত্ত তোমাদের অকপট যত্ন দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট ও বাধিত হইলাম—তজ্জন্য তোমাদের যাহাতে ভাল হয়, সে ভার আমার উপর রহিল। কিন্তু তোমাদিগকে পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতেছি ও বলিয়া রাখিতেছি, অন্যায় বা পীড়ন দ্বারা অর্থ শোষণ বা স্বার্থ সাধন আমার সরকারে হইবে না—তোমাদিগকেও তাহার ছন্দাংশে যাইতে দিব না। অতএব সকলকেই ভাল করিয়া বলিয়া দিবে যে, আমার অনুযাত্রী অধীন কর্ম্মচারীদের মধ্যে যে কেহ সেরূপ উপার্জ্জন করিবে, সে আমার পরমাত্মীয় হইলেও, তৎক্ষণাৎ উচিত দণ্ড সহিত বিদায় অব্যর্থ। আমি জানি, তাহারা পূর্ব্বহারে যে বেতন পায় তাহা অত্যল্প, তাহাতে ভদ্রলোকের সংসার চলিতে পারে না—পদোচিত মান মর্য্যাদা রাখা তো দূরের কথা—আমি শীঘ্রই তাহার প্রতিকার করিব; কার্য্যোপযোগী ও গুণানুযায়ী যথেষ্ট বেতন (সরকারের অবস্থানুসারে), সকলেরই বাড়াইয়া দিব—কেহ অসন্তুষ্ট থাকিবে, কি চলে না বলিতে পারিবে, এমন জো রাখিব না। কিন্তু আমার অজ্ঞাত বা অনভিমত কোনরূপ উপায়ে—কোন সূত্রে—কোন ছলে—'প্রজারা স্বেচ্ছায় দিয়াছে' বলিয়াও কোন শ্রেণীর প্রজা, অর্থী, প্রত্যর্থী, ব্যবসায়ী বা পর্য্যটক প্রভৃতির নিকট কেহই এক কপর্দ্দকও লইতে পারিবে না। আমি সত্বরেই এই মর্ম্মে রাজ্যমধ্যে এক ঘোষণা প্রচার করিব।

"ভাবিয়া দেখ, বেতন বৃদ্ধির এই নূতন প্রথা প্রচলন দ্বারা কেবল আমিই একাকী ক্ষতিগ্রস্ত হইব—রাজকোষে যাহা পাঠাইবার, তাহার বৃদ্ধি বৈ ন্যূনতা হইবার নয়। সুতরাং এই নব প্রণালীতে প্রতি মাসে যে অর্থরাশি ব্যয়িত হইবে, তাহা আমারই যাইবে। বল দেখি, কি জন্যে এত ক্ষতি স্বীকার করিতেছি? একি কেবল অন্যায়, অধর্ম্ম আর পীড়ন নিবারণ উদ্দেশে নয়? তোমরা আপনারাই তো বলিলে, আমি পূর্ব্ব-রীত্যনুসারে প্রজার অর্থাকর্ষণ করিলে কেহই আমার নিন্দা করিত না, প্রজারাও অতুষ্ট হইত না, রাজ-সভাসদেরাও অনুরাগ ও সহানুভূতি বৈ বিরাগ ও শত্রুতা দেখাইত না। অতএব নিজের স্বার্থনাশ বৈ স্বার্থ সাধনার্থ যে ইহা আমি করিতেছি না, ইহা কে না বুঝিবে?

"এ কথা শুনিয়া তোমাদের অন্যায্য প্রাপ্তি গণ্ডার হানি হইল বলিয়া কেহই আর শোক, দুঃখ, অসন্তোষ অনুভব করিতে পার না। যেহেতু তোমাদের ন্যায্য প্রাপ্তি যে বেতন, ক্রমে ক্রমে তাহার তো প্রচুর বৃদ্ধি হইতে চলিল। তাহাতেও পূর্ব্বাপেক্ষা যদি তোমাদের আর কিছু কম বোধ হয়, তবু প্রধানের এত অসীম ক্ষতি স্বচক্ষে দৃষ্টি করিয়া তোমাদের যৎকিঞ্চিৎ লভ্যা-হানিতে ক্ষুব্ধ হওয়া ভদ্রের উচিত নয়।

"অতএব শেষ কালে সার কথা এই যে, এরূপ বিচার বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে কাজ করিতে না পারিবে, সে আমার সহচর থাকিবার অযোগ্য—সে নিতান্ত অধার্ম্মিক ও স্বার্থপরায়ণ, লোভী ও নিষ্ঠুর, সুতরাং এমন পাপাসক্ত কর্ম্মচারী আমি চাই না—সে অন্যত্র চলিয়া যাউক। যে ব্যক্তি আমার অধীনতায় থাকিয়া স্বীয় উন্নতির বাসনা করিবে, তাহাকে আমার আচরণকেই আদর্শ করিয়া সন্তোষে কাল কাটাইতে হইবে —পূর্ব্ব প্রথা ও পূর্ব্ব প্রভুকে তাহার স্মরণ হইতে ভুলিয়া ফেলিতে হইবে! তোমরা আর সকলের প্রতিনিধি, তোমরা আমার এই অবিচলিত অভিপ্রায় এবং এই অখণ্ডনীয় নিয়ম অতি পরিষ্কার রূপে সকলকেই জানাইবে ও আপ-নারাও জানিবে—দৃঢ়রূপে ইহার অব্যর্থ ভাব তাহাদের ও তোমাদের মনে অঙ্কিত করিয়া রাখিবে।

"আর তোমরা যে আমীর ও সর্দ্দারগণের শাত্রবতার ভয় করিতেছ—মহা-রাজার কুসংস্কারের ভাবনা ভাবিতেছ, তাহা আর ভাবিও না। ন্যায় আর দয়ার

পথে থাকিয়া যদি বিপদ ঘটে—যদি সহস্র সহস্র শত্রু জন্মে—যদি নূতন প্রভুর ক্রোধোদয় হয়, আমি তাহাতেও ভয় করি না—আমি তজ্জন্য কর্ত্তব্য হইতে তিলমাত্র শিথিল হইব না! যাও, তোমাদের নূতন প্রভুর প্রকৃত মন তো জানিয়া গেলে, এখন তদনুসারে অথবা দয়া ও ধর্ম্মের উপদেশানুসারে যাহার যাহা কর্ত্তব্য, তৎপালনে অবিচলিত থাক গে!"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নবশাসন।

পাঠক! এ পরিচ্ছেদের কিয়দংশ নীরস হইলেও পড়িবেন। কেনন্য, কাজে লাগিবে।

ভুলীন এইরূপে দার্ঢ্য আর দয়া, ভয় আর মৈত্রতা মিশ্রণ পূর্ব্বক অচিরেই সিদ্ধ-মনোরথ হইলেন। সর্ব্ব বিভাগেই সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। যোগ্যতা ও বিশ্বসনীয়তা অনুসারে ভবিষ্যতে ক্রমে ক্রমে আরো বৃদ্ধি হইতে পারিবে, তাহার সোপান-বদ্ধ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিলেন। তাহাতে অসন্তোষবহ্নি নির্ব্বাপিত হইল—ক্রমে প্রায় তাবল্লোকই তাহার মহদভিপ্রায়ের মর্ম্মাবধারণে সমর্থ হইয়া পরম সন্তোষ ও যশোগান সহিত কার্য্য করিতে লাগিল।

বিশ্বাসী, অনুগত, সুদক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ লোক বাছিয়া তাহাদের হস্তে শান্তি-কার্য্যের (পুলসের) ভারার্পণ করিলেন; শান্তিরক্ষা ও অন্যান্য সুশাসন উদ্দেশে সমস্ত প্রদেশকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া লইলেন। প্রত্যেক ভাগের মধ্য হইতে সচ্চরিত্র, সম্ভ্রান্ত ও সুযোগ্য ধনী ভূম্যধিকারী বাছিয়া তাহাদিগকে তত্রত্য অবৈতনিক ফৌজদার রূপে নিযুক্ত করিলেন—শান্তি সম্বন্ধীয় লঘু ও সামান্য বিচার তাঁহারা করিবেন—গুরুতর বিষয় তাঁহারা তদারক করিয়া চূড়ান্ত মীমাংসার নিমিত্ত সদরে পাঠাইবেন। এক এক জন বৈতনিক কোতয়াল তাঁহাদের আংশিক তত্ত্বাবধানের অধীনতায় নিযুক্ত হইল। সেই তিন জন নিম্ন কোতয়ালের উপর বন্নুকে প্রধান সদর কোতয়াল ও ধন্নুকে তৎসহকারী করিলেন। ঐ সকলের সহকারী, অনুচর ও গ্রাম্য প্রহরী প্রভৃতির বিশেষ উল্লেখ বাহুল্য। ইতিপূর্ব্বে বিবিধ শান্তিভঙ্গ ও দস্যু তস্করাদির উপদ্রব অসহ্য পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিয়া পার

পাইত; বিশেষ দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার ঘোরতর বাড়িয়াছিল। এক্ষণে অল্পকাল মধ্যেই সে সকলের তিরোভাব ও সর্ব্বতোভাবে নিরাপদ অবস্থার আবির্ভাব দেখিয়া প্রজালোক যার পর নাই আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ স্থানে স্থানে জঙ্গলাদি কাটিয়া নানা প্রকারের ক্ষুদ্র বৃহৎ নূতন রাজপথ সমূহ নির্ম্মাণ করাতে গমনাগমন, বাণিজ্য ব্যবসায় ও দস্যুাদি দমনের সম্পূর্ণ সুবিধা ঘটিয়া প্রজালোকের আরো সুখ-সন্তোষের কারণ হইল।

কাংরা রাজ্য প্রবেশের কয়টী প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য বর্ত্ম শিরে কয়টী ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয় দুর্গ ছিল। ভুলীন আতি সত্বর তাহাদের জীর্ণসংস্কার সাধন পূর্ব্বক প্রত্যেকটাতে কামান ও অল্প বিস্তর সৈন্য রাখিলেন। বিশ্বাসী ও উপযুক্ত সৈনিক কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন পূর্ব্বক তাহাদিগকে ঐ পথ-সীমার দুর্গরক্ষক পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি যেমন দণ্ডবরের সময়ে বিনা বাধায় দুর্গদ্বার পর্যন্ত আসিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার বা মহারাজার কোন বিপক্ষ সহসা সেরূপ না আসিতে পারে, এই জন্যই ঐ ব্যবস্থা হইল।

ভুলীন মধ্যে মধ্যে মৃগয়ায় যাইতেন। ভূম্যধিকারীদের মধ্যে যে কয়জন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন, তাঁহারা সময়ে সময়ে স্ব স্ব অধিকারে মৃগয়ার্থ শাসন-কর্ত্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন। সেই উপলক্ষে এবং দূরস্থান সকল পরিদর্শনার্থ যখনই কয়েক দিনের নিমিত্ত অন্যত্র গমনের প্রয়োজন পড়িত, তখনই তিনি সর্ব্বপ্রকারে সুযোগ্য হাকিম সিংহের হস্তে দুর্গভার ন্যস্ত রাখিয়া আবশ্যকমত সহচর সমভিব্যাহারে যাত্রা করিতেন। কখন বা কোন দুর্দ্দান্ত বন-দস্যুপতির সন্ধান পাইলে এবং শান্তিরক্ষক-দল-কর্ত্তৃক তাহার দমন অসাধ্য হইলে, তদুচ্ছেদ সাধন জন্য সৈন্য সহিত তাঁহাকে সসজ্জ হইয়া নিজেও যাইতে হইত। তৎকালে তদ্রূপ বন-দস্যুর সংখ্যা ও উৎপাত অত্যাধিক—তাহারা মৃগয়া-বধ্য হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও নিষ্ঠুর ও ক্রূর-কর্ম্মা ছিল।

ভুলীন এক বৎসরের মধ্যেই সেই সব ভীষণ দস্যু তস্করের হস্ত হইতে কাংরা রাজ্য নিরুপদ্রব করিয়া তুলিলেন। তজ্জন্য ও সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠান জন্যই প্রজারা মনের সহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ফলতঃ সুশাসনের সৎফল এমনি আশ্চর্য্যরূপে শুভ যে, কিয়ৎকাল পূর্ব্বে যে সকল জনপদ জনশূন্য শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যবৎ বা বিরল-বসতি হইয়া উঠিয়াছিল, ঐ বৎসরৈকের মধ্যেই সে সব স্থান পুনর্ব্বার প্রজাপুঞ্জে পরিপূর্ণ, কণ্টকাকীর্ণ

ক্ষেত্র সকল পুনর্ব্বার শস্যপূর্ণ এবং সর্ব্বস্থলই ব্যবসায় বাণিজ্যের কোলাহলে নিনাদিত হইয়া উঠিল! পূর্ব্বে যাহারা পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া অন্যাধিকারে পলাইয়া গিয়াছিল, তাহারা তো এখন পূর্ণানন্দে প্রত্যাবৃত্ত হইলই, অধিকন্তু চতুর্দ্দিকস্থ অন্যান্য অধিকার হইতেও তথাকার নিপীড়িত মানবসংঘ স্ত্রী পুত্র লইয়া দলে দলে কাংরার সুখাধিকারে আসিয়া ভূমি লইয়া বাস ও কৃষি বাণিজ্যাদি করিয়া পরম সুখী হইল।

ক্রমে চাঁদ খাঁর বহু পত্র আইল—বহু উত্তর গেল। দরবারের সহিত লেখালেখি অধিক চলিল না। সাধারণতঃ দুলীনের সকল অনুষ্ঠানই মহারাজার অনুমোদনীয় ও আন্তরিক সন্তোষোৎপাদক হইল।

মহারাজার মনের কথা ফকিরজী যেমন জানিতেন, এমন আর কেহই না। রাজান্তঃকরণ জানিবার জন্য ফকিরজীর গোপনীয় পত্রই অমোঘ উপায়। দুলী-নের প্রতি ফকিরজী নিতান্তই অনুকূল—পঞ্জাবের উচ্চপদস্থ সচিবশ্রেণীর মধ্যে আজিজুদ্দিনের ন্যায় বিচক্ষণ মন্ত্রী এবং তেমন নিঃস্বার্থ রাজ-হিতৈষী রাজ-বন্ধু আর কেহই ছিলেন কি না সন্দেহ; সুতরাং দুলীনের ন্যায় ন্যায়পরায়ণ, বিশ্বাসী, কৃতজ্ঞ, চাটুকারিতা-শূন্য, সুদক্ষ কর্ম্মচারী দ্বারা ভূপতি ও প্রকৃতিপুঞ্জ উভয় পক্ষেরই যে অশেষ ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা, তাহা তিনি (দিব্য চক্ষে দেখিবার মত) বুঝিতে পারিয়াছিলেন; কাজেই তেমন সৎভৃত্যের পৃষ্ঠরক্ষা রূপ মহৎ কার্য্যকে তিনি আপনার অবশ্য-প্রতিপাল্য কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য করিয়া লইলেন। বিশে-ষতঃ সদাশয় মহদন্তঃকরণ, সদাশয়ের প্রতি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হয়। তদনুসারে প্রথম আলাপ অবধি দুলীনের প্রতি আজিজুদ্দিন প্রেমাকৃষ্ট ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে কাংরায় যে সব গোপনীয় পত্র প্রেরণ করিতেন, তাহাতেই তাহা প্রকাশ পাইত। সে পত্রগুলি সেই পূর্ব্ব-বর্ণিত সাঙ্কেতিক অক্ষরে লিখিত—সে সঙ্কেত আজিজুদ্দিন এবং দুলীন ব্যতীত আর কেহই জানিত না, সুতরাং অন্য কাহারো হস্তে পড়িলেও রহস্য উদ্ভেদের শঙ্কা মাত্র ছিল না।

দুলীন যে কয়খানি তদ্রূপ পত্র পাইয়াছিলেন, সকলগুলিই তাঁহার কার্য্যা-নুমোদক—সকলই অনুরাগ-ব্যঞ্জক—সকলই উৎসাহ-বর্দ্ধক। পত্র গুলির সাধারণ ভাব এই;—"যেরূপ করিতেছেন, উত্তম হইতেছে, তাহাই করিবেন; ধর্ম্ম ও নেমকের চাকরের জয় অবশ্যই জানিবেন—অচিরাৎ ইহার পুরস্কার পাইবেন; ইহাতে সন্দেহ করিবেন না! ইত্যাদি।"

সে সময় তেমন হস্তের তেমন লিপি দুলীনের পক্ষে বড় কার্য্যকারী ও বলপোষক হইয়াছিল। তিনি যেরূপ ধর্ম্মপথে থাকিয়া প্রাণপণে কেবল মহারাজা ও প্রজার মঙ্গলোদ্দেশেই অসাধারণ আয়াস করিতেছিলেন, তাহাতে মহারাজা তাঁহার গুণের পরিমাণ বুঝিতে না পারিলে তাঁহার মর্ম্মান্তিক দুঃখাভিমান হইত। তদ্রূপ দুঃখ হইতেই মনুষ্যের হৃদয় ভগ্নোৎসাহ ও নিরাশ্বাস হইয়া পড়ে। সুতরাং দুলীনেরও হইত। ভগ্নহৃদয় হইলে তাঁহা হইতে আর তেমন সকল মহৎ কার্য্যানুষ্ঠান কদাচই সম্ভাবিত হইত না। সুতরাং শত্রুদল ছল পাইয়া সকলই বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিত।

কিন্তু তদ্রূপ পত্র আসাতে কি হইল? দুলীন জানেন, ফকিরজীর প্রতিষ্ঠাও যা, মহারাজারও তা! অতএব গুণগ্রাহক প্রভু-কর্ত্তৃক স্বকীয় ব্যবহারের মর্ম্মাবধারণ ঘটিতেছে, এই যে একটী সংস্কার, ইহাই তাঁহার পরিশ্রমকে সার্থক বোধ করাইতেছে—ইহাই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পুরস্কৃত করিতেছে এবং আর আর দিকে দ্বেষ হিংসার এত যে প্রতিকূলতা, তাহা তাঁহার স্মৃতি হইতে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহার উৎসাহকে শতগুণে বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে!

আমরা অনেকক্ষণ আলিবদ্দির কথা তুলিতে সুযোগ পাই নাই—সে গুরু বিষয় বর্ণনায় আর শৈথিল্য উচিত নয়।

যথাকালে আলিবর্দ্দি ফিরিয়া আসিয়াছে—রিক্ত ভাবে নয়—বিফল হইয়া নয়! সপ্তজন কয়েদী—সেই নদীপুলিনের (নালার ধারের) আক্রমণকারী সপ্তজনকে ধৃত করিয়া লইয়া আসিয়াছে। তাহারা প্রথমে সমস্তই অস্বীকার করিয়াছিল, শেষে খয়রাতালির চতুরতায় এবং আলিবদ্দির ভয় মৈত্রতা কৌশলে মুক্তকণ্ঠে সকলই ব্যক্ত করিল এবং প্রকাশ্য বিচার স্থলেও ব্যক্ত করিতে সম্মত হইল। কিন্তু এত অল্প কথায় এ বিষয় সারিয়া দিলে চলিবে না—কি আশ্চর্য্য কৌশলে আর কি অসাধ্য সাধনে তাহাদিগকে ধরিল ও তৎসূত্রে কি কি ঘটনা ঘটিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাঠক মহাশয়কে উপহার দেওয়া উচিত। অতএব আলিবর্দ্দি যে মৌখিক বিজ্ঞাপন দিয়াছিল, দুলীনের দৈনিক পুস্তক হইতে তাহার সারসংগ্রহ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

এই সাত জনই চৌর্য্যাদি বহুতর দুষ্কার্য্য-ব্যবসায়ী। তন্মধ্যে চারিজন জাতিতে ইতরাপেক্ষাও ইতর—হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়—তাহারা যে কি, তাহা তাহারা আপনারাও জানে না। ফলতঃ তাহারা কোন ধর্ম্মেরই ধার

ধারে না—কেবল দস্যুতা, লুঠ, নরহত্যাদি পাপে বাল্যাবধি অভ্যস্ত। যাহা-দিগকে ইংরাজীতে "Criminal Tribe" বলে, তাহারা তাই। অপর তিন জনের কেহ গুজ্জর,কেহ কঞ্জর,কেহ চামার। রাষ্ট্রবিপ্লব, বিগ্রহ ও বিদ্রোহাদির কালই তাহাদের অভ্যুদয় পক্ষে সুসময়! কোনরূপ কুচের সুযোগ বা গোল-যোগ দেখিলেই তাহারা গোলেমালে দলে মিশিয়া যায়। তদনুসারে সাহেবের কাংরা-বাহিনীতে মিশিয়াছিল। তাহাদের দর্শন-শক্তি স্বভাবতঃ বা অভ্যাস বশতঃ অতি তীব্র—অল্প কালেই সাহেবের এবং প্রধান কর্ম্মচারিগণের ভাব-গতিক জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া লইল—কে বা সাহেবের প্রিয়, কে বা নয়, ইত্যাদি সহজেই উপলব্ধি করিল। সুতরাং সাহেবের প্রতি নন্দের যে ভাব, তাহা বুঝিতেও তাহাদের অধিক সময় লাগে নাই। তাহারা যুক্তি করিল, তবে তো নন্দের দলে মিশিলে কাজ হইতে পারে—সাহেবের বিশ্বাসী দলের কেহই যে তাহাদিগকে বিশ্বাস করিবে না ও কাছে ঘেঁসিতে দিবে না, তাহা তাহারা জানে! অতএব নন্দ-পক্ষে ঘেঁসিতে লাগিল!

একদা তাহারা নন্দের অনুগত মহম্মদ সা নামা সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষের মুখে এমন ইঙ্গিত শুনে যে, জনকত সাহসী লোক যদি একটা বিশেষ গুপ্ত কাজ করিতে পারে, তবে অনেক টাকা পুরস্কার পায়। তৎক্ষণাৎ খোলাখুলি—তৎক্ষণাৎ পাঁচশত মুদ্রা চুক্তি! ষড়যন্ত্রে সর্ব্ব শুদ্ধ যোল জন প্রবেশ করিল। তন্মধ্যে চারিজন কাংরা প্রদেশের লোক—তাহারা পথ ঘাটের তাবৎ সন্ধান জানে—তাহাদের উপদেশ ক্রমেই নালার গণ্ডটী হত্যার সংযোগ স্থল রূপে নির্ণীত হয়। কিন্তু উপযুক্ত অধ্যক্ষ অভাবে বন্দোবস্তটী সর্ব্বাগ-সুন্দর হইতে পারে নাই—নিয়োগকর্ত্তারা নিজে তো তত নিকটে গিয়া তত্ত্বাবধান করিতে সাহসী হইল না এবং হত্যাকারীরা দুর্ব্বৃত্ত বটে, কিন্তু বস্তুকর্ত্তৃক ভীরু ভাবা-পন্ন। এই জন্যই ঈশ্বরানুকম্পায় ধর্ম্মে ধর্ম্মে সে দিন রক্ষা হইয়াছিল!

দুরাত্মারা স্বপ্নেও ভাবে নাই, এরূপে ধরা পড়িবে—একে বন, তায় অন্ধ-কার, চিনিবার কি দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা কি? বিশেষ তাহারা পদচিহ্ন লুকাইবার জন্য যেরূপ কৌশল করিয়াছিল—একবার নদী পার, পূর্ব্ব পদাঙ্কের উপর পা দিয়া পুনর্ব্বার নদী পার, স্কন্ধে ঘোটক বহনাদি ব্যাপার (যাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে) এবং নিম্নে বর্ণনীয় যেরূপ অদ্ভুত উপায়াবলীর শরণ লইয়া-ছিল, তাহাতে ধরা পড়িবার আশঙ্কা হইতেই পারে না।

গোড়-গোয়েন্দাদের জন্য ভয় ছিল, কেননা সে দেশে সেরূপ গোয়েন্দা যে আছে, ও তাহাদের দ্বারা দুর্ব্বৃত্তগণ যে সর্ব্বদা ধরা পড়ে, তাহা তাহারা জানিত। 'কিন্তু দুর্জ্জনের যমদূত রূপী অমন নিপুণ "গোড়গোয়েন্দা" যে চমূ মধ্যেই রহিয়াছে, এবং হনুমান যেমন রাম-গত প্রাণ, সাহেবের সেইরূপ ভক্ত আলিবর্দ্দি যে ঐ গোয়েন্দাদের অবিশ্রান্ত ও একান্ত পরিচালক হইবে, তাহারা তাহার অণুমাত্রও আভাস পায় নাই! ফলতঃ খয়রাতালি ও ওয়াবালি যে অসাধ্য সাধন করিয়াছে, কোন সুশিক্ষিত "গ্রে হাউণ্ড" কুকুরও তেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পলাতকের গন্ধানুসরণ করিতে পারে না! এবং আলিবর্দ্দিও যে অধ্যবসায়, সাহস ও সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছে, তাহা অঞ্জনানন্দনের সীতা অন্বেষণ হইতেও নিম্নতর শ্রেণীর বলা যায় না! আবার তাহার দৃষ্টান্তে ও পারিতোষিকের লোভে (প্রভুভক্তিতেও বটে) তৎসহচর সৈনিকগণও সামান্য সহকারিতা করে নাই!

কিন্তু শিকারী কুকুর যেমন চতুর, পলাতক শৃগালও তেমনি ধূর্ত্ত! ঐ সাত জন চোর তাহাদের পদানুসারী দলকে যে কষ্ট দিয়াছে, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না! অনুগামী দল কতবার মনে করিত, এইবার ধরিলাম—অদ্যই ধরিব—কিন্তু হায়! ঠিক মরীচিকার ন্যায় দুর্ব্বৃত্তেরা আবার দূরবর্ত্তী হয়—যেন হাত পিছ্‌লিয়া পলায়! অধিক কি, যেখানে রন্ধন করিয়াছে, কতবার তেমন স্থলে গিয়া দেখিয়াছে, তখনও চুল্লির অগ্নি সম্পূর্ণ নিবিয়া যায় নাই—তবে তাহারা কখনই অধিক দূরে যাইতে পারে নাই—অমনি আপনারা বিনা আহারে, বিনা বিশ্রামে, অনুসরণে দৌড়িয়াছে, তথাপি দুষ্টেরা আয়ত্ত হয় নাই! পার্ব্বত্য ও বন্য দেশের পথ অধিক জানে বলিয়াই হউক, কি প্রাণের ভয়ে অধিক দ্রুতগামী হইত বলিয়াই হউক, অথবা অনুগামীদের দলে বেশী লোক জন্যই হউক, কিম্বা পায়ের চিহ্ন দেখিয়া দেখিয়া যাইবার বিলম্ব বশতঃই বা হউক, দস্যুরা ধরা পড়িয়াও পড়িত না—এই হেতুতেই কার্য্যসিদ্ধি হইতে এত দীর্ঘ সময় লাগিয়াছিল।

পদচিহ্নের অপহ্নব জন্য দুরাত্মারা কত অসামান্য কৌশল অবলম্বন করিত—কতক দূর গাছে গাছে, ডাল বাহিয়া বাহিয়াও পলায়ন করিয়াছে! কিন্তু খয়রাতালি ও ওয়াবালি ভুলিবার লোক নয়—এ ব্যবসায়ে তাহারা সুপণ্ডিত—স্বয়ং চাণক্য! যেখানে আর কেহ কোন চিহ্নই দেখিতে পায় না,

তাহারা—বিশেষ খয়রাতালি—তেমন স্থলেও ভৌতিক দৃষ্টির ন্যায় অদ্ভুত দর্শন-শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে!

আলিবর্দ্দি পরিচয় দিল "একদা, হুজুর, ভাবিলাম, আর কেন? সমুদয় পরিশ্রমই পণ্ড হইল। অতএব নৈরাশ্যের ক্রোধে খয়রাতালিকে গালি দিয়া বলিলাম 'আর কেন মিছা ঘুরাচ্ছিস, মিথ্যাবাদী বজ্জাৎ জুয়াচোর? কৈ, মা'নুষের পা'র দাগই তো আর নাই—তবে আর কি ছাই দেখে পিছু লা'গ্‌বি?' খয়রাতালি হাসিয়া 'কি দেখে? এই দেখ!' বলিয়া একটা দাগ দেখাইল—সে মনুষ্যের পায়ের দাগ হইতেই পারে না, সুতরাং আরো রাগিয়া বলিলাম 'তুই গাধা, এ যে ভল্লুকের পায়ের দাগ!' খয়রাত উত্তর দিল 'বটে খাঁ সাহেব! ক্রমে আপনি যখন এ কর্ম্মের আরো কিছু ভাব বুঝিতে পারিবেন, তখন আর খয়রাতালির কথায় এত অবিশ্বাস করিবেন না—এ কি ভল্লুক? একি সেই আঙুল-যোড়া খোঁড়া বেটার পা নয়? সেই বেটাই এদের কুলমুষল হইয়াছে—দুবার দুবার তারির দোষেই ইহাদের রাস্তা চিনিতে পারিয়াছি! আপনি কি দেখেন নাই, সেই নালার ধারেই আমরা তাদের প্রত্যেকের পায়ের গড়ন আর মাপ টাপ সব ঠিক ঠাক করিয়া লইয়াছিলাম। এদের দলে খুব চালাক লোকই আছে, কেবল এই বোকা খোঁড়া বেটা মনে করে, মাঝে মাঝে পাখানাকে মুচ্‌ড়ে সুচ্‌ড়ে গোলালো করিয়া ঠকাইব! কিন্তু খয়রাতকে সে জানে না—সে যদি তাহার পা আকাশে তুলিয়া মাথা দিয়া চলিয়া যায়, তবু খয়রাত তাহাকে ধরিতে পারে!' ইত্যাকারের বচনের পর যাহা বুঝাইয়া দিল, তাহার ভাব এই ;—

"একটা বাঁশবনের নিকটস্থ হইয়া (তত নিকট নয়, যথা হইতে মানুষে বাঁশের গোড়ায় উঠিতে পারে) ঐ খোঁড়া বেটা ভল্লুকের মতন পা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, একে একে আর ছয় জন দূর হইতে লাফ দিয়া দিয়া তাহার ঘাড়ে উঠিয়া হাত বাড়াইয়া বাঁশ ধরিয়া শেষে খোঁড়াকেও তুলিয়া লইয়া বাঁশের ঝাড়ের উপর পথ করিয়া বহুদূর যায়! মনে করিয়াছিল, তাহাতে আর তাহাদের কোন চিহ্নও রহিল না। অমন আশ্চর্য্য ক্ষমতাবান গোড়-গোয়েন্দা না হইলে, হুজুর, সত্যই আর কোন চিহ্ন ধরিবার উপায় ছিল না!

"হুজুর! এই রূপে তো যাই—পাহাড়, বন, নদী, নালা, অপথ, কুপথ, কাঁটা, ঝোপ—কখন দৌড়, কখন লাফ, কখন গুড়ি গুড়ি, কখন জলে,

কখন গাছে—আহার, নিদ্রা, বিশ্রামের কথা হুজুর সকলই বুঝিতেছেন! মানুষের বুদ্ধিতে যত ফিকির হইতে পারে, বোধ হয়, তাহারা সব খাটাইয়াছিল। অধিক কি হুজুর, এক স্থানে তাহারা সকলেই পাশাপাশি উপুড় ভাবে শুইয়া পেটে হাঁটিয়া অনেক দূর গিয়া একের পীঠে আর এক জন, তার পীঠে অপরে, এম্নি ভাবে তথা হইতে ঝাঁপ খাইয়া জলে পড়িয়াছিল—তাৎপর্য্য, পায়ের দাগ মোটেই থাকিবে না! কখন বা সাঁতার দিয়া স্রোতে বহু দূর গিয়া তবে উঠিয়াছে! কখন বা উঠিয়া উল্টা পাল্টা গিয়া গণ্ডগোল বাঁধাইয়াছে! কখন কখন খয়রাত ও ওয়াব সমস্ত দিনে কিছুই ঠিক করিতে পারে নাই; কখন বা দুই দলে ভিন্ন দিকে গিয়া আবার মিলিয়াছে! কত আর এতালা করিব—তন্ন তন্ন বলিতে গেলে হুজুরের অনেক সময়-নষ্ট হইবে।

"শেষের দুই দিন সাতজনেরই পায়ের দাগ স্পষ্ট দেখিতে দেখিতে চলিলাম—বোধ হইল ক্লান্ত হইয়াছে, আর পারে না। আহারাভাবেই হউক, আর যে জন্যই হউক, শেষে বন ছাড়িল। নন্দনপুর নামে একটা ছোট সহরে গিয়া পড়িল। খয়রাত এবং ওয়াব সহরের চতুর্দ্দিক্ ঘুরিয়া বলিল 'আর যায় কোথায়? বেটারা প্রবেশ করিয়াছে, বাহির হয় নাই।'

"তৎক্ষণাৎ প্রত্যেক ফটক লোক দ্বারা আটক করিয়া সহরের মধ্যে গেলাম। তথায় পায়ের চিহ্ন পাওয়া অসম্ভব, সুতরাং থানায় গেলাম। খুব ভড়ং করিয়া থানাদারকে হুকুমের মত বলিলাম, এই সহরে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সাতজন খুনে বদমায়েস আসিয়াছে, বাহির করিয়া দাও। থানাদার গরম মেজাজ দেখাইল, এ অধীনও আরো অধিক দেখাইতে ত্রুটি করিল না। বলিলাম 'আচ্ছা সিংজী, তোমার যেমন ইচ্ছা; কিন্তু বোধ করি তুমি জান না আমি কে? মহারাজার সর্ব্বাপেক্ষা পেয়ারের শাসনকর্ত্তা কর্ণেল দুলীন বাহাদুরের আমি এক জন অতি বিশ্বাসী প্রধান কামদার। দুরাত্মারা সেই কাংরার অদ্বিতীয় প্রতাপান্বিত শাসনকর্ত্তার প্রাণ হরণে উদ্যোগী হইয়াছিল।'

"সিংজী অমনি তটস্থ হইয়া বলিল 'একথা আগে বল নাই কেন? আমার মনিব লেনা সিং বাহাদুর হুকুম দিয়াছেন, কর্ণেল দুলীন সাহেব যখন যাহা করিতে বলিবেন, যখন যে হুকুম পাঠাইবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা করিবে। তুমি ঠাণ্ডা হইয়া বিশ্রাম কর, এ সহরে যদি দুষ্টেরা থাকে, তবে এখনি পাইবে।'

"আমি বলিলাম জ্বালামুখী কটকে আমি দলে বলে আছি, সেখানে

আগে তো রসদ পাঠাইবার হুকুম দাও—ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আমরা মর মর—রসদের মূল্য দিব, সে বিষয়ে আমাদের সাহেবের কড়া হুকুম! আর এক কথা—এই লও,সাত জোড়া পায়ের মাপ লও, ইহাতে তোমার তল্লাসের খুব সুবিধা হইবে। এই পা যাহার, তাহার খোঁড়া বাঁ পায়ের আঙুল যোড়া; আর এই মাপ যাহার, তাহার দুইটা পদই মোচ্ড়ানো; সকলেই খুব জের-বার হইয়া থাকিবে, কেননা বহু কাল তাড়া খাইয়া আসিতেছে, আর পেট ভরিয়া বড় কিছু খাইতেও পায় নাই!

"এই বলিয়া বিদায় লইয়া জলামুখীর কটকে আসিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম মাত্র করিয়া আহার করিতে যাই, ইহারই মধ্যে থানাদার কার্য্য সিদ্ধি করিয়া হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি, পীঠমোড়া বাঁধা, সেই সাত বেটাকে স্বয়ং আনিয়া উপস্থিত। ধরিতে বিলম্ব হয় নাই, কারণ অমন ক্ষুধার্ত্ত চেহারা সহরে আর কাহারই সম্ভবে না!

"আনিবা মাত্র খয়রাতালি লাফাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'সত্য কও বাছারা, এই ন্যাংড়া জোয়ানের কাঁধে চড়িয়া বাঁশ বন দিয়া অশ্বত্থ গাছে উঠিয়াছিলে কি না?' কিন্তু হায়! দুরাত্মারা কি তখন, হুজুর, পরিহাস রসের রসিক হইতে পারে? না উত্তরে 'হাঁ' দিয়া আপনাদের দোষ আপনারা স্বীকার করিয়া লইতে পারে?"

ফুলীন বলিলেন "উহাদিগকে খাইতে দিয়াছিলে তো?" আলিবর্দ্দি যোড়-হাতে উত্তর দিল "হুজুর! আপনার গোলাম হইয়াও কি আ'জো এত নিষ্ঠুর রহিব যে, অমন ভুকা জাবগুলোকে খেতে দিব না!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিচার ও তৎফল।

পঞ্চায়েতের সাহায্যে প্রকাশ্য দরবারে বসিয়া শাসনকর্ত্তা তাহাদের বিচার করিলেন; কিন্তু দরবার গৃহমধ্যে নয়। ফুলীনের ইচ্ছা, সৈনিক প্রভৃতি সকলেই এই বিচারটী দেখে। তজ্জন্য দুর্গস্থ রাজপুরীর সম্মুখে মুক্ত স্থানে বিচারাসন এবং সম্ভ্রান্ত দর্শকদিগের আসন স্থাপিত হইল। এ বিচারে উচ্চ পদস্থ লোক লইয়া টান পড়িবার সম্ভাবনা, পাছে সে জন্য কোনরূপ গোল বাঁধে, একারণ ফুলীন পূর্ব্বাহ্ণেই তন্নিবারক বিধানস্বরূপ হাকিম সিং,

আলিবৰ্দ্দি ও বন্নু খন্নুকে সতর্ক থাকিতে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন—তাহারা স্ব স্ব অধীন দলেবলে সুসজ্জিতাবস্থায় বিচারস্থলের চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতে লাগিল। যথা সময়ে সাতজন কয়েদী বিচারস্থলে আনীত হইল। আকার প্রকার দর্শন মাত্রেই তাহাদিগকে বদ্‌মায়েস বলিয়া সকলেরই বোধ জন্মিল। বিচারারম্ভে আসামিগণকে অপরাধ শুনাইয়া প্রত্যেককে একে একে জিজ্ঞাসা করা হইল—"তুমি দোষী, কি নির্দ্দোষী?" কেহ কেহ ঘাড় নাড়িয়া দোষ স্বীকার করিল—একজন যুবা স্পষ্ট "হাঁ" বলিয়া মাপ চাহিল—"প্রাণ রাখুন, এমন কর্ম্ম আর করিব না" এই বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং প্রশ্ন মত তন্ন তন্ন তাবদ্বিবরণ ধারাবাহিকরূপে স্পষ্ট বলিল! তাবল্লোক শুনিয়া অবাক্! কয়েকজন পাকা দুর্ব্বৃত্ত হাঁ, না, কিছুই বলিল না—ঘাড় গুঁজিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—কেবল ঐ যুবকের রোদনকালে কোপনয়নে খট্‌মট্‌ করিয়া তাহার পানে চাহিল! সে যাহা হউক, অধিকাংশ অপরাধীর স্বীকৃত বচনে এবং অন্যান্য অকাট্য সাক্ষ্য দ্বারা নন্দ সিং যে তাহাদের নিয়োগকর্ত্তা ও পুরস্কর্ত্তা এবং মহম্মদ সা ও বৃদ্ধ মোহন সিং যে প্রধান যোগাড়দার এবং সরবরাহকার, তাহা পরিষ্কাররূপেই সপ্রমাণ হইল। সুতরাং সেই তিন জনকেও অভিযুক্ত পদে স্থাপিত করা হইল—নন্দ সিং আসীন, অপর দুইজন দণ্ডায়মান রহিল।

সংসারে তেজীয়ান পাপীর উত্থান সময়ে তাহার পাপাচরণ প্রদর্শনে কেহই সাহসী হয় না, কিন্তু পতন কালে সকলেই (সুহৃদ্গণও) এবং সকল অবস্থাও প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। নন্দের আ'জ্‌ তাহাই হইল! যাহারা তাহার পরম সহায় ছিল—যাহারা বিরুদ্ধবাদী হইবে বলিয়া স্বপ্নেও সে ভাবে নাই, তাহারাও গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া দিল!

কেবল মোহন সিং মাত্র নন্দের নেমকের কাজ করিল—নন্দকৃত ষড়যন্ত্র ও নিয়োগ এবং নিজকৃত অপরাধ মাত্রই প্রথমে কিছুতেই স্বীকার করিল না—বরং বিস্ময় সহকৃত নির্দ্দোষিতার ঘৃণাই দেখাইল! কিন্তু যখন বিচারস্থানের পশ্চাতে একটী পর্দ্দা উঠাইয়া তাহার ঘোড়াটী—যে ঘোড়া মরিয়াছে বলিয়া সে ও তাহার প্রভু নন্দ বিজ্ঞাপন দিয়াছিল, সেই ঘোড়াটী—দেখান হইল, তখন সে চমকিয়া উঠিয়া করযোড়ে কাতরস্বরে বলিল "দোহাই খোদাবন্দ, আর আমার কিছুই বলিবার নাই—এ নিতান্তই ধর্ম্মের কল! কেবল এই মাত্র নিবেদন যে, এ গোলামকে দুষ্টলোক মিছা কথায় ভুলাইয়া

ছিল—হুজুরকে ঘোর অত্যাচারী বিধর্ম্মী রাক্ষস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিল! আমার নিতান্তই দুর্ভাগ্য,তাই নন্দ সিং আর মহম্মদের কথায় তখন ভুলিয়াছিলাম—তারপর আপনার সদ্ব্যবহার দেখিয়া তাহাদের মিথ্যা কথা ও নষ্টামি বুঝিতে পারিয়া তদবধি কেবল 'হায় হায়' রবে বিরলে অনুতাপ করিয়াছি! আমার এখন আর কোন কথাই নাই—এখন আর কোন আপত্তিই নাই, হুজুরের বিচারে যাহা ভাল হয় করুন—পেটের কথা সমস্তই খুলিয়া বলিলাম, দয়া করেন ভালই, নচেৎ যেমন কর্ম্ম তেমন ফল ভাবিয়া মরিতে প্রস্তুত আছি! তবে কিনা সহজেই আর বেশী দিন বাঁচিবার বয়স নয়, দয়াতে এই টুকু যদি মনের কোণে স্থান দেন তো যথেষ্ট হয়!"

নন্দ সিংকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, তোমার কিছু কথা আছে? কেন তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করিব না, তৎপক্ষে তোমার আত্মসমর্থন কি?

তখন নন্দ একবার সগর্ব্বে দৃষ্টিপাত করিল মাত্র। অর্থাৎ "আমি আবার এই বিচারকদের কাছে আত্মসমর্থন করিব!" কিন্তু মহম্মদ সা যখন তাহারই স্কন্ধে সমুদায় দোষারোপ পূর্ব্বক নিজের দোষোদ্ধারের চেষ্টা পাইল, তখন নন্দের ওষ্ঠাধর ঈষৎ কম্পিত ও নয়ন যুগল কিঞ্চিৎ চঞ্চল দৃষ্ট হইল—তাহাও ক্ষণিক—সেই গর্ব্বিত ও উদ্ধত ভাব তখনি আবার দেখা গেল! নন্দ সিংহের তাৎকালিক ভাব যদি কোন নবাগত ব্যক্তি দেখিত, তবে তাহাকে অপরাধী বলিয়া কখনই স্থির করিতে পারিত না—অত্যাচার-পীড়িত ব্যক্তিই জ্ঞান করিত! দুষ্ট নন্দের এরূপ ভাব ভঙ্গী প্রকাশের গূঢ় তাৎপর্য্যও ছিল, তাহা তখনই প্রকাশ পাইল—বিচার সমাধা হইতে না হইতেই কতকগুলি সৈনিক প্রথমে গালাঘুষা, শেষে সুবিচারার্থ চীৎকার করিতে লাগিল—যেন সুবিচার হয় নাই!

এরূপ হওয়া স্বাভাবিক। নন্দ সিংহ অন্য জাতীয় নয়, শিখ; ল্যান্সার রেজিমেণ্টের অধিকাংশই তাহার স্বজাতীয়; নন্দ তাহাদের নায়ক; নন্দের ভ্রাতা ও স্বসম্পর্কীয়গণও সেই দলভুক্ত ছিল এবং তাহাদের আত্মীয় ও আশ্রয়দাতার মধ্যে অনেকে রাজসভায় গণ্য মান্য।*

* অধুনা ইংরাজ বিচারালয়ে প্রায় এই রূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে। জেতৃজাতীয় অতি সামান্য পদের লোক হইলেও তাহাকে দণ্ডিত করা দূরের কথা,সে কেবল বিচারাধীন হইলেও আর রক্ষা থাকে না—অমনি ইংরাজদলে নানা ভাবের চীৎকার উঠে! নন্দ সিংহের ন্যায় সে ব্যক্তি স্পষ্ট অপরাধী হইলেও সাহায্যের অণুমাত্র ত্রুটি ঘটে না।

সুতরাং সাহেবের হৃদয় উৎকণ্ঠাবেগে কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইল—যখন পঞ্চায়েত সভ্যগণ একবাক্যে নন্দ-প্রমুখ সকল আসামীকেই "সম্পূর্ণ দোষী" বলিলেন, তখন (নন্দের) সমুচিত দণ্ডদানে দুলীনের মন কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু সে চঞ্চল ভাব—সে ইতস্ততঃ ভাব ক্ষণকালের নিমিত্ত! তখনই ন্যায়তঃ কর্ত্তব্য পালনের প্রতিজ্ঞা স্মরণে আসিল—তখনই মনে মনে স্থির করিলেন, বাহাই বটুক, আততায়ীর প্রাণদণ্ড অত্যাবশ্যক—একবার নয়, পুনঃ পুনঃ আততায়ী—পুনঃ পুনঃ বিশ্বাসঘাতক বিদ্রোহী!

তদনুসারে দণ্ডাজ্ঞা দিলেন যে, ঐ নয়জন সহকারী দুরাত্মাদের বাম স্কন্ধোপরি "খুনে" ও দক্ষিণ স্কন্ধোপরি "বদ্‌মায়েস" শব্দ দাগিয়া দেওয়া হইবে; প্রত্যেকে দুইশত সংখ্যক কশাঘাত পাইবে এবং লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ বেড়ি পায় চিরজীবন কারাবাস পূর্ব্বক .চারের খাটনি খাটিবে। মোহন সিংহ বৃদ্ধ বলিয়া কশাঘাত পাইবে না। নন্দ সিংহ প্রধান অপরাধী, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে!"

আজ্ঞানুযায়ী একটা ফাঁসি কাষ্ঠ নির্ম্মিত ও নয়টা খুঁটী পোতা হইল। বিদ্রোহিতা বা কোনরূপ উচ্চ বাচ্য গোলযোগ না হইতে পারে, তৎপ্রতিবিধানোপযোগী গোপনীয় বন্দোবস্তের কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না। আয়োজনগুলি ধীরে সুস্থে নিস্তব্ধ ভাবেই হইল, আড়ম্বরে নয়। পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সৈন্য শ্রেণীর মধ্য দিয়া সসভাসদ্ শাসনকর্ত্তা স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রথমে নয়জন অপরাধীর স্কন্ধে দাগ দেওয়া ও আট জনের পৃষ্ঠে কশাঘাত হইয়া গেল।

নন্দকে সম্মুখে আনিতে আদেশ হইল। নন্দের মুখ বিবর্ণ, কিন্তু ভয় বা বিশেষ কোন চাঞ্চল্যের চিহ্ন নাই, বরং অধিক মাত্রায় অহিফেণ সেবন জন্য আরো উগ্রতর পাশব মূর্ত্তি। অশ্বারোহী ও পদাতিক প্রভৃতি শ্রেণীবদ্ধ, দণ্ডায়মান: দুলীন তাহাদের, বিশেষতঃ ল্যান্সার রেজিমেণ্টের সম্মুখে, নন্দের নিকটস্থ হইয়া ধীরে, উন্নত স্বরে, পাপিষ্ঠের নানা পাপাচারণ অল্প কথায় স্পষ্ট স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়া শেষে বলিলেন, "এমন হিংসাকারীকে একটা করারে এখনও মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত আছি; সে করারটা এই—এই দুষ্কর্ম্মে যদি কেহ উহার প্রবর্ত্তক বা উৎসাহদাতা থাকে, তবে সেই পশ্চাদ্বর্ত্তী লোকের অপরাধের প্রমাণ সহিত নাম ধাম অর্পণ করুক, তাহা হইলে নিজে বাঁচিতে পারিবে, নচেৎ নয়!"

নন্দের নয়নতারা যেন ব্যাঘ্র-চক্ষুবৎ জ্বলিতে লাগিল—কহিল "কখনই নয় রে, কাফের কুত্তা, কখনই নয়! তুই অপবিত্র, বিধর্ম্মী, ম্লেচ্ছ, তোর কাছে

মাপ! তা কখনই হবে না! তুই আমায় হাতে পেয়েছিস, তাই তুই আমার হাতে বেঁচে গেলি, কিন্তু তোর মৃত্যু-বাণ প্রস্তুত রয়েছে—নিশ্চয় জানিস্, তোর কাল ঘুনিয়েছে! তুই আমার এই তুচ্ছ দেহটাকে নিয়ে যেমন যা ইচ্ছা কর্চ্ছিস, ওরে বোকা ফিরীঙ্গী! তেম্নি তোর শরীরের মাংসও শীঘ্র যাতে প'চে প'চে হাড় থেকে খ'সে খ'সে পড়ে, তার উপায় ক'রে গেলাম!"

হয় তো আরো কত বলিত, কিন্তু ছুলীন যথেষ্ট শুনিয়াছেন বোধ করিয়া, ইঙ্গিত দিয়া চলিয়া গেলেন। নিমেষ মধ্যে একটী বন্দুকের আওয়াজ—সাহেবের বাম স্কন্ধে গুলির আঘাত! সহস্র সহস্র কণ্ঠ হইতে হাহাকার শব্দ! আঘাতকারীকে তৎক্ষণাৎ শত হস্ত ধৃত করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত! কিন্তু পতনের পূর্ব্বেই সাহেব তাহা নিবারণ করিলেন! সাহেব দাঁড়াইয়া থাকিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন; বন্নু ও আলিবর্দ্দি প্রভৃতি দৌড়িয়া আসিয়া ধরিল; কিন্তু সাহেবের চক্ষু ঘুরিতেছে, আর দাঁড়াইতে পারেন না! তথাপি যখন আঘাতকারীকে হিঁচ্ড়িয়া টানিয়া আনিল,তিনি চিনিতে পারিলেন নন্দের ভ্রাতা। সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছাড়িয়া দিতে—দূর করিয়া দিতে হুকুম দিলেন। বলিলেন "ও পাগল! শক্রর যোগ্য নয়—কাংরা হইতে চালান দেও!"সে চলিয়া যাইবার কালে ব্যঙ্গ ভাবে সেলাম করিয়া কহিল "ফিরীঙ্গী আবার দেখা হবে!"

শোণিতধারা বেগে পড়িতেছিল—বন্নু উষ্ণীষ খুলিয়া বাঁধিতেছিল—সাহেব ক্রমে ক্ষীণ হইতেছেন, চক্ষে দেখিতে পান না, মাথা ঘুরিতেছে, আর দাঁড়াইবার শক্তি নাই, তথাপি চতুর্দ্দিকস্থ নৈরাশ্য-দুঃখ-পীড়িত প্রিয় সৈনিকগণকে মৃদুস্বরে বলিলেন 'তোমাদের মত না লইয়া নন্দসিংকে আমি ফাঁসি দিতাম না—তোমরা বুঝিতে পার,এক স্থানে দুই প্রভু—এক শৃঙ্গে দুই সিংহ—সম্ভবে না! বিশেষতঃ সাধু আর সয়তান! আমি যত ভালর চেষ্টা পাইব, ও সব উল্টাইয়া দিবে! কাংরা হইতে আমার চলিয়া যাওয়াও ভাল,তবু অমন পাপাত্মার সঙ্গে স্বর্গসুখও কিছু না! উহার আত্মমুখেই আত্ম-দোষ স্বীকার করিল। আমি আর দাড়াইতে পারি না—আমার জ্ঞান আর থাকে না, কিন্তু আমি মনে করিলে এখনই উহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িতে পারি—সে ক্ষমতা, সে অধিকার আমার আছে! কিন্তু আমি তাহা করিলাম না—উহার উচিতদণ্ডের ভাঁর তোমাদের উপরেই দিয়া চলিলাম।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর যেন বলিতে পারেন না—তথাপি অর্দ্ধ উচ্চারিত কয়েকটী কথা বদন হইতে বহির্গত হইল।

কথা কয়টা এই;—"তোমরা মনোনীত কর—হয় আমাকে, নয় নন্দকে—নন্দকে চাও তো, আমার আর চিকিৎসা করিও না—আপনিই হইবে! আমাকে চাও তো—" এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে চৈতন্য হারাইয়া বন্নুর বক্ষে পড়িয়া গেলেন!

সকলে একবাক্যে তখনই মনোনীত করিল—সাহেবের শোকে ও নন্দের প্রতি ঘোর ঘৃণা আর ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ নন্দ সিংকে ধরিয়া অর্দ্ধ মৃতবৎ টানিয়া লইয়া জল্লাদ দ্বারা ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইল—এত সহস্র সহস্র লোক, রব নাই—নিস্তব্ধ ভাবে বহুক্ষণ থাকিয়া হাকিম সিংহের আদেশানুসারে সকলেই স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল!

জ্ঞানী দুলীন পূর্ব্ব হইতেই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, দ্বিতীয় আদেশ প্রচার না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার অনুপস্থিতি, পীড়া বা মৃত্যু ঘটনাতে হাকিম সিংহ তাঁহার স্থলে প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা ও প্রতিনিধি প্রধান সেনাপতি হইবেন। তদনুসারে কর্ম্মচারীবর্গের প্রার্থনায় হাকিম পরম দুঃখিতান্তঃকরণে প্রতিনিধিত্ব ভারগ্রহণে কাল ব্যাজ করিলেন না—পাছে কর্ত্তা অভাবে ক্ষণমধ্যেই কুতন্ত্র ও কুচক্র বল করিয়া উঠে, এই জন্যই ত্বরা।

কিন্তু কুচক্রের বিষদন্ত ভাঙ্গিয়াছে—ক্রূর কালীয় নাগ অভাবে কালিন্দী হ্রদ নির্ব্বিষ হইয়াছে! যদিও দুই একজন থাকে, এখন তাহারা বিষ হারাইয়া শিষ্ট শান্ত ঢোঁড়া হইয়া উঠিয়াছে! ল্যাম্সারের অধিকাংশ নন্দের স্বজাতীয় ও আত্মীয় বলিয়াই যাহা কিছু সপক্ষতা দেখাইয়াছিল; কিন্তু ক্রমে তাহার দুরাচরণের পরিমাণ বুঝিয়া এবং সর্ব্ব বিভাগীয় সৈনিক ব্যূহের ঘোরতর ঘৃণা ও কোপ দেখিয়া তাহাদেরও সম্পূর্ণ ভাবান্তর ঘটিল! সুতরাং হাকিম সিংহ বা আলিবর্দ্দি ও বন্নু ধন্নু প্রভৃতিকে গুরুতর দায় কিছুই পোহাইতে হইল না! তদ্বিপরীতে বরং সমগ্র বাহিনী, সমগ্র কর্ম্মচারী, সমগ্র ভৃত্যবর্গ, সমগ্র কাংরাবাসী মহা শোকাকুল—নিরাশায় নিমগ্ন—দলে দলে বিষণ্ণ বদনে কুশল জিজ্ঞাসায় দুর্গাগত! অধিক কি, ঘরে ঘরে কয় দিন যথার্থই রোদনরোল উঠিয়াছিল!

এক্ষণে আমাদের আহত প্রিয়বন্ধুর কীদৃশ অবস্থা দেখা উচিত—এ সব কথায় থাকিলে আর চলে না!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

লীলা।

রোদন-রোলের কারণ—তুলীন সপ্তাহকাল মৃতবৎ অচৈতন্য—অবস্থা নিতান্তই সংশয়াপন্ন! অষ্টম দিবসের সায়ংকালে তিনি চক্ষু খুলিলেন। তুলীনের দৈনিক লিপি-পুস্তকে লিখিত আছে ;—

আমার চৈতন্য হইল—বিকৃত ভাবাপন্ন স্বপ্ন হইতে ঘুম ভাঙ্গিল—তখনও মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ নয়—জ্ঞান, বুদ্ধি, স্মৃতি শিশুর অপেক্ষাও দুর্ব্বল—এরা কেহই স্বকার্য্য সাধনে সম্যক্ সমর্থ নয়—আমি কোথায় আছি, কি করিতেছি, কিছুই অনুধাবন করিতে পারিতেছি না! কর্ণে যেন মৃদু মধুর বামাস্বর অল্প হিল্লোলে প্রবেশ করিতেছে—চক্ষু যেন একখানি সুমোহিনী বালা-মূর্ত্তি দেখিতেছে, স্পর্শেন্দ্রিয় যেন সেই কমনীয় মূর্ত্তির নবনীত সদৃশ কর-সঞ্চালন অঙ্গে অনুভব করিতেছে এবং ক্ষণপরে যেন সেই সুকোমল হস্তের মন্দ মন্দ সঞ্চালিত ব্যজন স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইতেছে! ইহাতে জ্ঞান, বুদ্ধি ও স্মৃতির আরো বিপর্য্যয় ঘটিল—কিছুই স্থির হইল না—এ কি স্বপ্ন, না মোহকরী যাদু বিদ্যা? কথঞ্চিৎ এই তর্কাভাষ মনে উঠিল! আবার চক্ষু বুজিলাম—আবার যেন ঘুমাইলাম!

বোধ হইল, আমি এক পর্ব্বত গহ্বরে—চতুর্দ্দিকে নানা দেশস্থ লোক—কাটাকাটি, মারামারি, গুলি গোলা তীর ছোড়া, শিরোপরি অসির ঝন্‌ঝনা শব্দ! দৌড়িলাম, পারিলাম না, মস্তকে অসির আঘাত—মূর্চ্ছা! রমণীর রমণী-হস্তে জল-সিঞ্চনাদি শুশ্রূষা; এক দৈত্য কর্ত্তৃক সেই অলোক-সামান্যা দেব কন্যাকে বল পূর্ব্বক হরণ—রমণীর চীৎকার স্বরে রোদন! আমিও চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিলাম! পিপাসায় কণ্ঠৌষ্ঠ-রসনা শুষ্ক—দগ্ধপ্রায়—মৃদুস্বরে জল চাহিলাম! কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ঝরিতেছে—সর্ব্ব দেহ কাঁপিতেছে! মোহিনী বালামূর্ত্তি শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া গেল—বন্ধু সত্বরে সরবতের পানপাত্র মুখে ধরিল! পানে স্নিগ্ধ হইয়া দেখিলাম, অর্দ্ধ-মুক্ত-দ্বারে চৈতনের মস্তক ও মুখ—চৈতনের গণ্ডদ্বয় বাহিয়া অশ্রুধারা! পেস্‌খেজ্‌মৎ ত্রস্ত হস্তে রমণী-ত্যক্ত ব্যজনী লইয়া বীজন করিতেছে!

বন্ধুর হস্ত-সঞ্চালন-জনিত ইঙ্গিতে চৈতন দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

সুমিষ্ট সরবত পানে স্থসংস্থ হইয়া জিজ্ঞাসিলাম "আমি কোথায়? কি হইয়াছে? এ সব কাহারা?"

বন্নু সজল নয়নে স্বীয় মুখে অঙ্গুলি দিয়া বলিল, "চুপ করুন, হুজুর চুপ করুন—এখন বেশী কথা না—আপনি বড় কাতর ছিলেন, দয়াময়ের দয়ায় বিপদ্ কাটিয়াছে! এখানে সকলেই সাঁচ্চা বন্ধু—সকলেই সাহেবের পরম-হিতৈষী—কোন চিন্তা নাই—বন্নু গোলাম কাছে আছে!"

নিতান্তই নিঃশক্তি—চুপ করিতে—নীরব থাকিতেই হইল। পুনর্ব্বার তন্দ্রা আসিল—ক্রমে গাঢ় নিদ্রা—কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত সুখস্বপ্নের সুনিদ্রা! অধিক রাত্রে জাগিলাম, এবার শরীর অনেক সুস্থ—মনোবৃত্তি অনেক প্রকৃতিস্থ!

এবার জাগরিত হইবার সঙ্গে স্মরণ ও জ্ঞানও জাগরিত হইল। উঠিয়া বসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। বন্নু ও পেস্খেজ্মৎ ধীরে ধীরে ধরিয়া তুলিতে লাগিল, তদবসরে সেই মনোহারিণী তরুণী পুনরুদিতা হইয়া উপাধান গুলি এরূপে সজ্জিত করিয়া দিল যে, বসিলে আমার কষ্ট না হয়। আমাকে ঠেস দিয়া বসানো হইলে সেই নবতরুণীও শয্যার এক পার্শ্বে বসিল—স্মিত-বদনে বীজন করিতে লাগিল। আমাকে সুস্থ দেখিয়া পবিত্র চন্দ্রাননখানি হর্ষে বিকশিত হইল! আহা, কত স্নেহশীল—ঠিক যেন আমার সহোদরাভগ্নী!

আশ্চর্য্য হইয়া মুখ পানে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, বয়স অনুমান চতুর্দ্দশ কি সার্দ্ধ চতুর্দ্দশ বর্ষ; কৃশোদরী—স্বর্ণলতা! দেহ খানি না স্থূল, না ক্ষীণ—দিব্য সুস্থ ও নবযৌবন-রসে পরিপুষ্ট! সর্ব্বাঙ্গের গঠন কি চমৎকার! করপদ্ম ও পাদপদ্ম তুলনা রহিত—করাঙ্গুলি চম্পককলি! হস্ত পদের গঠন বর্ত্তুল-গোল। হৃদয়ের পীনতা অধিক নয়, অথচ ক্ষীণ মধ্য হইতে কি সুডৌলে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে—আচ্ছাদক ঘন বসনাবলীও সে মনোহারিত্ব গোপন করিতে সমর্থ হইতেছে না! গ্রীবা দেশ খর্ব্ব নয়, বরং সলজ্জ-বাক্য-বিন্যাস কালে ঈষৎ বক্রভাবে দীর্ঘ দেখায়, তাহাতে কম্বু-রেখান্বিত সুগোল স্তর কি মনোহর! বদন ও মস্তকের স্বতন্ত্র বর্ণনা করিব না—বর্ণনার সাধ্যও নাই—যে অংশের জন্য যে উপমা মনে আইসে, কিছুই যথেষ্ট নয়—কিছুই যোগ্য বোধ হয় না! সামান্যতঃ এই বলিতে পারি, তেমন চন্দ্রানন আর কখনো দেখি নাই! চক্ষু আকর্ণ বিস্তৃত নয়—তত দীর্ঘল চক্ষু দেখিলে আমার মনে যেন কেমন কেমন লাগে, আমার যেন ভয় করে। আমার এই মনো-

মোহিনীর নেত্রযুগল তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হওয়াতে ও গভীর কৃষ্ণতারা দুটী সলজ্জ মৃদু জোতিঃ ধারণ করাতে, কি যে এক প্রকার মুগ্ধকর স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকে. তাহা বাক্যে বলিয়া উঠিতে পারি না! সে মধুর দৃষ্টিতে বিলাসলালসার নিদর্শন মাত্র নাই—তাহাতে কেবল শান্ত প্রকৃতি, ধীর বুদ্ধি ও শীলতা-মাখা স্নেহানুরাগ সমুজ্জ্বল ভাবেই দৃষ্ট হয়! নাসিকা, গঠনে তিলপুষ্পবৎ নহে—মসৃণতা ও কোমলতায় বটে! গঠনে সরলোন্নত—উচিত মত উন্নত—অত্যুন্নত নয়! নাসিকায় একটী দোষ (বা গুণ) আছে—অগ্রভাগে অতি ক্ষুদ্র এক বিন্দু তিল—নোলক নথ কিছুই নাই—তাহাই যেন ভূষণ! কপাল—আমরি, কি প্রশস্ত, কি উজ্জ্বল, কি সুন্দর! যেন সৌন্দর্য্যরাশির ফলকখানি—দেখিলেই তেজস্বী ক্ষাত্রয় কুলোদ্ভবার তেজোদ্দীপ্ত ললাটপাট বলিয়া বোধ হয়—তজ্জন্য পরিচয়ের প্রয়োজন নাই! ভ্রূযুগল যেন যথার্থই তুলিতে আঁকা—দেখিলেই দেবী প্রতিমা স্মরণ হয়! সুগঠিত সুগোল মস্তকের ঘন কৃষ্ণ কেশেরই বা কি শোভা! তখন কবরীতে বদ্ধ—কবরীর স্থূলতা দর্শনেই বুঝা যায় এবং পরেও দেখিয়াছি যে, মুক্ত করিয়া দিলে প্রায় আজানু প্রলম্বিত হয়—সুরভি বনপুষ্প সে কেশের কি মনোলোভা শোভা বিস্তারই করিতেছে! আবার সেই সুবেষ্টিত মাল্যবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া কতক কেশ অংশযুগে অবিন্যস্ত ভাবে ইতস্ততঃ চঞ্চল! কণ্ঠে এক ছড়া হীরক-কণ্ঠী ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গে কোন অলঙ্কারই নাই; কিন্তু মস্তকের ন্যায় কর্ণে, কণ্ঠে, হস্তে পুষ্পাভরণের প্রাচুর্য্য দৃষ্টে সহসা বনদেবী বলিয়াই ভ্রম হয়! তখনও সে মধুরাস্যের সুস্পষ্ট হাস্য দেখি নাই, কিন্তু হিঙ্গুল-রাগ-রঞ্জিত সুগঠন সূক্ষ্ম ওষ্ঠাধর স্বভাবতঃই যেন সদা সহাস্য! ফলতঃ কি অনুপম আনন—কি মনোরম গোলাপী গণ্ড! সর্ব্বত্রই সুকোমল কৈশোর লাবণ্য ঢল ঢল করিতেছে—দেহের ঈষৎ-আরক্তিম শুভ্র বর্ণই বা কি চমৎকার! আমি বহু সভ্যতম দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, এমন রূপবতী কন্যা কুত্রাপি দেখি নাই! বিবিধ শ্রেণীর, বিবিধ প্রকারের সুন্দরী দর্শন করিয়াছি, কিন্তু এ প্রণালীর রূপরাশি কখনই চক্ষে পতিত হয় নাই! প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলনা করিলে কোন কোন বিষয়ে অনেক রূপসী হয় তো অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ হইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ অথবা সর্ব্ব-সমঞ্জসীভূত দৃশ্য পক্ষে এই বরাননার মুখমণ্ডলে কেমন যে একটী অবর্ণনীয় মনোহর শ্রী ছাঁদ দেখিলাম, তেমনটী আর কখনো

দেখিয়াছি বলিয়া তো স্মরণে আইসে না! ইউরোপীয় নিতান্ত শুভ্রকান্তির সৌন্দর্য্য ইহার কাছে দাঁড়াইতেই পারে না—আমার চক্ষে এ এক নূতন মূর্ত্তি!

কোন সন্দিগ্ধ-হৃদয় পাঠক ডুলীনের এই শেষ বর্ণনা পাঠে বলিতে পারেন, তিনি যে অবস্থায়, যে সময়ে এবং যে গৃহে সহসা সেই রূপসী কন্যাকে দেখিয়াছিলেন, তাহাতে সামান্যকেও অসামান্য উপলব্ধ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ কথা সত্য, কিন্তু যদি সেই এক মুহূর্ত্তের দর্শন-লাভেই পরিচয়ের পর্য্যবসান হইত, তবে বটে তাহা সম্ভব হইতে পারিত। ডুলীন বলেন, তিনি তৎপরে সেই যুবতীকে যতই দেখিয়াছেন, ততই তাহার প্রথম দিনের সংস্কার আরো বহুগুণে বৃদ্ধি বৈ হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই! যাউক, সে কথা এখন নয়!

ডুলীন অনিমিষ নয়নে কেবল চাহিয়া দেখিতেছেন, আর বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছেন, এ অসামান্য বনদেবী কে? পাছে সুতরুণীর কষ্ট হয়, এই ভয়ে সপ্রীতি মৃদুস্বরে বীজন নিবারণ পূর্ব্বক কহিলেন "তুমি কে?"

ধীরে, সলজ্জভাবে, অথচ নির্ভয়ে সরল-হৃদয়া বালা-যুবতী সাহেবের মুখপানে চাহিয়া বীণা-স্বরে কহিল "আমার মা এখনি সাহেবকে দেখিতে আসিবেন—আ! আ'জ্ তিনি কি আনন্দই পাইবেন!"

বলিতে বলিতে গাম্ভীর্য্য-দীপ্তি-শালিনী এক বয়োধিকা রমণী একটী ঔষধ-পাত্র হস্তে সুধীর গতিতে গৃহ-প্রবেশ করিলেন—"হা! এই যে আ'জ্ দয়াময়ী দয়া ক'রেছেন!" এই বাক্যটা উচ্চারণ করিয়া উৎসাহোৎফুল্ল নয়নে শয্যা-পার্শ্বে আসিয়া সাহেবের মুখে সেই রৌপ্য-পাত্র ধরিয়া কহিলেন, "বাবা! পান কর।" সাহেব বিনা সন্দেহে—বিনা জিজ্ঞাসায়—তখনি পান করিলেন্!

রমণীকে দেখিবামাত্র সম্ভ্রান্তবংশীয়া বলিয়া ডুলীন বুঝিতে পারিলেন—তিনি যে কিছু কাল পূর্ব্বে অসামান্যা রূপলাবণ্যবতা ছিলেন, অদ্যাপি তাহা বুঝা যাইতেছে এবং তিনিই যে তরুণীর জননী, তাহা উভয়ের মুখশ্রী দৃষ্টে না বলিতেই বুঝা গেল!

রমণী বলিলেন "ভগবান দিন দিয়াছেন—সাহেব আ'জ্ অনেক ভাল! দেখিতেছি, আমাদের এখানে দেখিয়া সাহেবের আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে—পরিচয় পাইবার জন্য মনে ব্যগ্রতাও জন্মিয়াছে! কিন্তু এখনও আপনার সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন। অতএব আ'জ্ কেবল অল্প কথায় কিছু জানাইতেছি; আর একটু সুস্থ হইলে আরো জানিতে পারিবেন।" এই বলিয়া

নম্রভাবে গৃহাঙ্গনস্থ গালিচার উপর বসিলেন। তাঁহার কন্যা যেখানে ছিল, সেই খানেই রহিল। বন্নু ও হাঁসনালি সসম্ভ্রমে দূরে অবস্থিতি করিল। রমণী ক্ষণচিন্তার পর বলিতে লাগিলেন ;—

"সামান্যতঃ আমাদের অবস্থা এখন এ দেশে অসামান্য বলা যায় না—এমন দশা অনেকেরই ঘটিয়াছে। তথাপি মনের আগুন তুলিতে বুক ফাটিয়া যায়! কিন্তু বৎস! তোমার পীড়ার সময়, অধিক কথা উচিত নয়—এই অভাগিনী এই কাংরা রাজ্যেরই রাজরাণী ছিল—এই যে আপনার শয্যায় বসিয়া কোমল লতিকাটী দেখিতেছেন, ইটি এই কাংরা বৃক্ষেরই চারা!"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বহু চেষ্টাতেও তিনি চক্ষুর জল রাখিতে পারিলেন না—দরদরিত ধারা আপনা হইতেই প্রবাহিত হইতে লাগিল! ছুলীন নিতান্ত ব্যথিত হইয়া হস্ত সঞ্চালন দ্বারা গল্প বন্ধ রাখিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। রাজকন্যা দ্রুত আসিয়া অঞ্চল দ্বারা জননীর অশ্রু মোচন ও বাহুদ্বারা কণ্ঠ বেষ্টন করাতে যথার্থই পরিবর্দ্ধিত যূঁই-তরু-গুচ্ছে নবীনা মাধবীলতার বেষ্টনবৎ দেখাইল! রাজ্ঞী প্রচুর আয়াসে শোকাবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক তনয়াকে তদ-বস্থাতেই অঙ্কপার্শ্বে ধারণ করিয়া সকরুণ স্বরে পুনর্ব্বার কহিলেন ;—

"না, বলিয়া ফেলি! আমার শ্বশুর সংসার চাঁদ বহুকাল এবং তৎপরে আমার স্বামী অনুহ্রাদ চাঁদ কয়েক বৎসর তাঁহাদের পুরুষানুক্রমিক এই প্রাচীন পার্ব্বত্য দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সাহেব জ্ঞানী; অবশ্যই শুনিয়া থাকিবেন, কিরূপে কাংরা এবং শতদ্রু হইতে আটক পর্য্যন্ত পার্ব্বতীয় অন্যান্য বহু রাজ্য সর্ব্বগ্রাসকারী রণজিতের করতলস্থ হইয়াছে! না শুনিয়া থাকেন তো পরে শুনিবেন, তাহা বলিতে গেলে অধিক রাত্রি হইয়া আপনার পীড়া বাড়িবে। অতএব সংক্ষেপে দুই চারি কথা বলিব।

"আমার স্বামী নিদারুণ অধীনতা-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া নিতান্তই অস্থির হইয়া উঠিলেন। শেষে শত্রুরা এই (রাজকুমারীকে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক)প্রসূনটী হরণ করিবার চেষ্টা করিল! কাহার জন্য? যদি কোন যোগ্য বরের নিমিত্ত হইত, হানি ছিল না। তাও তো লোকে সম্মানপূর্ব্বক প্রার্থনা করে। এ তা নয়, একপ্রকার জোরপূর্ব্বক আধুনিক রাজোপাধি-প্রাপ্ত দুরাশয় ধ্যানসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিমিত্ত আমার কন্যাকে চাহিল—অভিপ্রায়, প্রাচীন রাজ-বংশাবলীর সহিত কুটুম্বিতা ঘটাইতে পারিলে রাজকুলে গণ্য মান্য হইয়া

উঠিবে! 'সেই স্পর্দ্ধার প্রস্তাবে দস্যুরাজ রণজিৎ অবশ্যই সম্মতি দান করিল—কোন কথাই শুনিল না। যদিও ধ্যান সিংহেরা ক্ষত্রিয় বটে, কিন্তু তাহাদের দোগড় বংশ কিছুতেই আমাদের করণীয় ঘর নয়—তেমন নীচু ঘরে এবং অন্যান্য অনেক কারণে সুচেৎ সিংহকে কন্যাদান কিছুতেই উচিত ও উপযুক্ত বোধ হইল না। অথচ পলায়ন ভিন্ন আর কন্যা-হরণ নিবারণের অন্য কোন উপায় রহিল না।

"তাহাই ধার্য্য হইল। অগত্যা ইংরাজাধিকারে বাস করিবার অভিপ্রায়ে আমরা আপনাদের রাজতক্ত ও সমস্ত ঐশ্বর্য্য ত্যাগপূর্ব্বক পলাইলাম। হঠাৎ গমনের প্রয়োজন হওয়াতে কোন উদ্যোগ করিতে এবং অধিক সংখ্যক রক্ষক সঙ্গে লইতে পারিলেন না—বিশেষ, পলাতকের পক্ষে বেশী সমারোহ সম্ভবে না। আর এক দিন হইলেই ইংরাজ-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া নিরাপদ হইতাম, এমন সময়ে অনুসরণকারী বহু সংখ্যক অশ্বরোহী আসিয়া আক্রমণ করিল। ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল—জয়ের সম্ভাবনা কাহেই কপাল পুড়িল—(সজল নেত্রে) কাংরা-রাজ গতাসু হইলেন! সর্ব্ব আশা ভরসা চুকিয়া গেল! শত্রুরা সঙ্গিগণকে নির্দ্দয়রূপে কাটিয়া ফেলিল; আমার বুক হইতে এই হৃদয়-ধন কাড়িয়া লইল; এবং আমাকে দূর করিয়া দিল! নরপিশাচগণের তাৎকালিক নিষ্ঠুর বাক্য এখনও কাণে যেন বাজিতেছে—বলিল 'এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাও!' প্রাণাধিকা কুমারীর সঙ্গে আমাকেও লইয়া যাইতেএত বিনয় করিলাম—পায় পর্য্যন্ত ধরিলাম—তথাপি তাহা করিল না! এককালে দুইটী হৃদয়-সর্ব্বস্ব হারাইয়া ভগ্নহৃদয়ে—নৈরাশ্য-সাগরে ভাসিতে ভাসিতে কাংরায় ফিরিয়া আসিলাম! জয়ন্তী মঠে মোহন্ত প্রদত্ত নিভৃত আশ্রমে আশ্রয় লইলাম! ঐ দয়াশীলা (খট্টার পশ্চাদ্দিকে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক)রমণী অল্পকাল হইল প্রাণের লীলাকে পুনর্ব্বার আনিয়া দিল—বিধির কৃপায় তাই সেই হারানিধি এই আবার পাইয়াছি!"

তুলীন পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখেন, এক প্রাচীনা জানু-শিরা হইয়া বসিয়া আছে—তাহার আকার প্রকার বেশ ভূষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধাতুর। দেখিয়া তুলীন বলিয়া উঠিলেন "এ যে কাঞ্চনী দেখিতেছি?"

লীলার জননী কহিলেন, "হাঁ সাহেব, প্রায় তাই বটে, কিন্তু আপনি চঞ্চল হইবেন না—কথা কহিবেন না—আ'জ্ আর আপনাকে বেশী শুনাইব

না। কেবল এই মাত্র বলিতে চাই যে, আপনার স্থায় সদাশয় গুণজ্ঞ ব্যক্তি অবশ্যই জানেন যে, সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের মধ্যেই ভাল মন্দ আছে—গেরুয়া বসনধারী সম্প্রদায়েও এমন দুর্জ্জন আছে যে, দস্যুদলেও তেমন নাই। দুর্ভাগ্য ও ঘটনাবশে গুলাপী কাঞ্চনী হইয়াছিল বটে, কিন্তু এমন মহৎ অন্তঃকরণ আর এত গুণ, বনচারিণী তপস্বিনীতেও আছে কিনা সন্দেহ! (গুলাপীর প্রতি) আয় না, গুলাপি! সাহেবকে আসিয়া বল্ না, কিরূপে তোর কি হইয়াছিল—কিরূপে এখানে আইলি, কিরূপে আমাদের আত্মীয়তা ঘটিল! ভাল কথা,সাহেব, আহা! আপনার কথাতেই মত্ত, গুলাপীই যে আপনার প্রাণদাতা—গুলাপীই যে আপনার চিকিৎসক হাকিম, তাহা কোথায় অগ্রে বলিব, না, সাহেব যে আগুন তুলিয়া দিলেন, তাহাতেই ব্যস্ত হইয়া আর সব ভুলিয়া গেলাম!"

বন্নু কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সেলাম পূর্ব্বক নিবেদন করিল, "হুজুরকে এই স্ত্রীলোকের গুণের কথা অধিক কি বলিব, আমাদের কাহারো মনে হুজুরের প্রাণের আশা (এস্থলে বন্নুর দেহ ঈষৎ কম্পিত হইল) তিল মাত্রও ছিলনা, কেবল গুলাপীর অদ্ভুত ঔষধ এবং অবিশ্রান্ত-চিকিৎসা ও তদারকের গুণেই—"

তুলীন ত্রস্ত হইয়া গুলাপীর দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক উঠিতে উদ্যত—গুলাপী দ্রুতপদে আসিয়া সাহেবের অতি দুর্ব্বল ও অতি কৃশ হস্ত ধারণ ও সসম্ভ্রমে নম্রভাবে চুম্বন পূর্ব্বক কহিল "হুজুর! যথেষ্ট হইয়াছে, আমি সম্পূর্ণ রূপেই পুরস্কৃত হইলাম! কিন্তু কথা বার্ত্তা আ'জ্ আর না—আ'জ্ কেবল আর একবার আর একপ্রকার চূর্ণ ঔষধ সেবন পূর্ব্বক আপনাকে নিদ্রা যাইতে হইবে—দুই তিন দিন পরে অভাগিনীর ইতিহাস সমস্ত শুনাইব!"

রোগীর গৃহে চিকিৎসকের আজ্ঞাই বলবৎ—সুতরাং সে দিন বিশ্রাম! কিন্তু ইত্যবসরে, কাংরা সম্বন্ধীয় কতিপয় ঐতিহাসিক প্রকৃত ঘটনার কথা পাঠক মহাশয়কে আমরা শুনাইয়া ফেলি।

কাংরাধিপতি সংসার চাঁদ আপনিই খাল কাটিয়া লোণা জল আনিয়াছিলেন—আপনিই আপনার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। একদা তিনি প্রবল শত্রু গুর্খা-সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। তৎকালে অন্য উপায় না দেখিয়া অগত্যা রণজিতের সাহায্য ভিক্ষার্থ স্বীয় পুত্র অনুরুদ্ধকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। রণজিৎ এমন সুযোগ কি ছাড়েন? অতএব অবিলম্বে সসৈন্যে স্বয়ং অনুরুদ্ধের সহিত যথায় গুর্খারা রণ-রঙ্গভূমি পাতিয়াছিল, সেই পর্ব্বতমালা-

সান্নিধ্যে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার আগমনে গুর্খারা ভয় পাইয়া অন্তর্হিত হইল। বিপদুদ্ধারক মহারাজ অমনি কাংরা দুর্গাভিমুখে চলিলেন। কিন্তু সংসারচাঁদ ততদূর সর্ব্বনেশে মিত্রতার প্রত্যাশা করেন নাই! তিনি বিলক্ষণ বুঝিলেন, যিনি রক্ষক বেশে আসিয়াছিলেন, তিনি এখন ভক্ষক হইতে আসিতেছেন! সুতরাং তেমন ভয়ানক বন্ধু ও সর্ব্বগ্রাসক অতিথির অভ্যর্থনার্থ দুর্গদ্বার মুক্ত রাখিতে সাহস করিলেন না! কিন্তু তাঁহার পুত্র তখন রণজিতের হস্তে—এক প্রকার বন্দী ছিলেন! ধূর্ত্ত রণজিৎ জানেন যে, যে সৈন্য মধ্যে পুত্র আছে, তৎপ্রতি পিতা কখনই প্রকৃত প্রস্তাবে গোলা চাহাইতে পারিবে না। অতএব সুযোগমতে হঠাৎ একদিন দুর্গদ্বারাভিমুখে ধাবমান হইয়া প্রবেশ পূর্ব্বক সংসারের রক্ষীবর্গের পরিবর্ত্তে দুর্গরক্ষার্থ নিজ সৈনিক দল স্থাপন করিলেন।

সংসারচাঁদ অকস্মাৎ জালবদ্ধবৎ নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। কাজেই রণজিতের অভিপ্রায়মত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইতে বাধ্য হইলেন। তাহাতে এই হইল, রাজ্য মধ্যে সৈন্য রক্ষা ও পররাষ্ট্র বিভাগীয় কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার আর কোন ক্ষমতাই থাকিল না—সে কার্য্য লাহোরের দরবারাধীন হইল। সংসার কেবল আধুনিক ভারতবর্ষের সাক্ষীগোপাল স্বাধীন রাজা-নামধারী ভূপালবর্গের ন্যায় রণজিৎকে বার্ষিক নজরানা দিবার অঙ্গীকারে নিজ রাজ্যের কর-সংগ্রহ, বিচার ও কোতায়ালি কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন! তাহাতেও কার্য্যতঃ পূর্ণ স্বাধীন রহিলেন না, কেননা রণজিতের সৈনিক কর্ম্মচারী নামা দুর্দ্দান্ত প্রতিনিধির ভয়ে সদাই তটস্থ—সদাই তাহার অনুগ্রহ-প্রার্থী—সদাই তাহাকে সদয় রাখিতে চেষ্টাবান্—ঠিক যেন এখনকার রেসিডেন্সি ব্যাপার!

এত অপমানে দুর্ভাগা সংসারচাঁদের মৃত্যু ঘটিতে অধিক বিলম্ব হইল না! পিতার পরলোকে অনুহ্রাদ সিংহাসনে বসিলেন এবং হারানিধি স্বাধীনতাকে পুনর্ব্বার পাইবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তৎফল স্বরূপ কিছু কাল নজরানা না লইয়া খাস দখলের ভয় দেখাইয়া দোর্দ্দণ্ড রণজিৎ শীঘ্রই তাঁহাকে শিক্ষা দিলেন! অনুহ্রাদ অবশেষে অবনত হইয়া নজরানা ব্যতীত এক লক্ষ টাকা জরিমানা দিয়া আপাততঃ পরিত্রাণ ক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন।

দুই তিন বৎসর এইরূপে যায়। শেষে তাঁহার প্রাণ-প্রতিমা অনুপমা রূপবতী কন্যার নিমিত্ত পূর্ব্ববর্ণিত রূপে পলায়িত ও হত হইলেন। তৎক্ষণাৎ কাংরা রাজ্য পঞ্জাব সাম্রাজ্যভুক্ত হইল!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রকুমারী।

আমরা যাহাকে মন্দ ভাবি, তন্মধ্যেও ভাল লুক্কায়িত থাকে, অল্প বুদ্ধি জন্য বুঝি না। ডুলীন সঙ্কট-শয্যায় শয়ান থাকাতে এই একটী বিশেষ উপকার হইল যে, তাঁহার প্রতি সমস্ত শ্রেণীরই সৈনিকগণের আনুরক্তি ও সহানুভূতি আরো অধিক সম্বর্দ্ধিত হইল এবং রাজ্যস্থ কৃষক হইতে ভূম্যধিকারী ও বাহক হইতে ধনী ব্যবসায়ী পর্য্যন্ত তাবল্লোকই আরো ভক্তি, আরো প্রীতি প্রকাশ করিতে লাগিল। তাঁহার অভাবে তাঁহার গুণ-স্মরণ আরো দীপ্ত হইল। অতএব যেই মাত্র রব উঠিল, সাহেবের সংশয়াবস্থা অতিক্রান্ত হইয়াছে—সাহেব চৈতন্য লাভ করিয়াছেন, অমনি স্বচক্ষে একবার দেখিয়া আসিবার জন্য কাংরাস্থ প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিনিধি ও সম্ভ্রান্ত জমীদারগণ আসিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখা না করিয়া এবং সেলাম সহকৃত দুই পাঁচটা হৃদয়ের উচ্ছাস-ভাব ব্যক্ত না করিয়া কেহই প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না! তাহাতে পীড়ার যন্ত্রণা বৃদ্ধি না হইয়া বা বৈরক্তি না জন্মিয়া বরং আন্তরিক সুখজনিত উপকারই হইল—সেই মানসিক তৃপ্তি, গুলাপীর চিকিৎসা-কার্য্যে সাহায্যই করিল!

এদিকে ডুলীন, সেই অপূর্ব্ব চিকিৎসকের পূর্ব্ব-জীবন এবং কি সূত্রে কাহার দ্বারা সে তাঁহার গৃহে আনীত হইল; বিশেষ রাজরাণী ও রাজনন্দিনীই বা কিরূপে দুর্গাগতা; এ সব জানিবার নিমিত্ত মহা ব্যস্ত হইলেন। রমণীত্রয় প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী ও অশেষ বিশেষরূপে শুশ্রূষাকারিণী আছেন—তাঁহাদের এই দয়া দেখিয়া দয়ালু ডুলীনের মন কৃতজ্ঞতা রসে গলিতেছে। বিশেষতঃ স্থিরা সৌদামিনীবৎ সরলহৃদয়া লীলাকে দেখিয়া অবধি তাঁহার অন্তর মধ্যে কি এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় অভিনব ভাব যে উদিত হইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না—সে ভাব স্নেহ, কি দয়া, কি প্রেমানুরাগ, কি সবই, তাহা তাঁহার হৃদয় চিরিয়া ভাল করিয়া দেখিবার শক্তিও হইতেছে না—কেবল ইহাই অনুভব করিতেছেন যে, যে ভাবই হউক, তাহা অতি পবিত্র!

স্বভাবতঃ লীলার হাব ভাব ও চরিত্র যেরূপ পবিত্র, তাহাতে অতি নিদা-

রুণ দুর্জ্জন পুরুষের মন না হইলে আর অপবিত্রতার পথে যাইতে পারে না! লীলার সকল কার্য্যই কি মিষ্ট! আহা! কি সুমধুর সরল ভাবে মনে যখনি যাহা উদয় হয়, তখনি তাহা খপ্ করিয়া হাস্যাধরে বলিয়া ফেলে! সে সকল ভাবের একটীও তো দূষ্য নয় যে প্রকাশ্য কি না ভাবিবে! সুতরাং বলিয়া ফেলা সহজ কথা! আবার কেমন সুমধুর সরল ভাবে খপ করিয়া এটী ওটী সেটী আনিয়া যোগায়। কেমন খপ্ করিয়া রোগীর অভাব ও মনের ভাব বুঝিয়া ঔষধ, পথ্য, শয্যাদি সম্বন্ধে সকল সেবা—সকল কাজ—কেহ বুঝিতে না বুঝিতে—কেহ করিতে না করিতে—অতি পরিচ্ছন্ন প্রকারে সম্পন্ন করিয়া তুলে। কেমন সুন্দর ভঙ্গীতে নীরবে আইসে, নীরবে যায়—কেমন সুন্দর মধুর দৃষ্টিতে চায়! সে সব দেখিলে শুনিলে হৃদয়হীন বর্ব্বরের আত্মাও আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না—এ তো অমন হৃদয়বান্ সুসভ্য দুলীন! ফলতঃ সেই মধুরিম মাধুরী ও তেমন সস্নেহ স্নিগ্ধ দৃষ্টি তাঁহার পক্ষে মহা ভেষজের কার্য্য করিল! লীলা যখন গৃহে না থাকে, তখন তাঁহার মহা অসুখ হয়!

লীলা যাহা করে, লীলার স্নেহবতী জননী কিছুতেই বাধা-দান বা বাঙ্-নিষ্পত্তি করেন না—লীলার সব কাজই তাঁহার চক্ষে ভাল—সকলের চক্ষেও তাই—তাঁহার চক্ষে তো শতগুণে আরো! সাহেবের গৃহে লীলার মাতা গালিচার এক পার্শ্বে বসিয়া গুলাপীর সহিত কথোপকথন করেন—সাহেবের নিকটে ও শয্যায় প্রায় লীলাই থাকে! বন্নু আর এখন সর্ব্বদা আসিতে পারে না—বাহিরের কর্ত্তব্যে তাহাকে বেশী নিযুক্ত থাকিতে হয়। হাঁসনালি সর্ব্বদাই হাজির, কিন্তু প্রায়ই ঘরের বাহিরে। চৈতন নিশ্চিন্ত নহেন, দণ্ডে দণ্ডে আসিতেছেন, চুপে চুপে হাঁসনালিকে বাহির হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতেছেন—কিন্তু দণ্ডে দণ্ডে! কখন বা দ্বারের একখানি কবাট কিঞ্চিৎ খুলিয়া সজল নয়নের দৃষ্টিতে এক একবার মাথা গলাইয়া দেখিয়া যাইতেছেন।

সাহেবের চক্ষুর সহিত যদি তাঁহার চক্ষুর মিলন ঘটিল এবং সাহেব সহাস্যে "ওয়েল, চৈতন?" বলিলেন, অমনি হাত খানি বারত্রয় একটু উঠাইয়া নামাইয়া, ভঙ্গীতে যেন ইহা বলা হয় "থাকুন থাকুন, বেস, বেস!" অথবা ঊর্দ্ধ দৃষ্টির সহিত যুক্ত-হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া ভঙ্গীতে ঈশ্বরোদ্দেশে প্রার্থনা জ্ঞাপন পূর্ব্বক যেন ইহাই বলা হয় যে "দেবতা অবশ্যই মঙ্গল করিবেন!"

জুলীনের চৈতন্য হইবার দু তিন দিন পরে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে, যখন বাহিরের কাহারো আর আসিবার সম্ভাবনা নাই, এমন সময় জুলীন গুলাপীকে বলিলেন "বুড়া মা! আর কেন? এখন তো অনেক সুস্থ হইয়াছি, এখন আর আমার বাসনা পূরণে বিলম্ব কেন? তোমার অঙ্গীকৃত পূর্ব্ব কথা বর্ণন কর?"

গুলাপী কহিল "এ অভাগিনাকে কয় দিন হুজুর দয়া করিয়া 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন. কিন্তু এ পাপিয়সী সে অনুগ্রহের যোগ্য পাত্রী নয়! যাহউক, যখন নিজ গুণে এ কৃপা করিয়াছেন, তখন যত কাল প্রাণটা থাকিবে, তত দিন এই বৃদ্ধ দেহ হুজুরের সেবার জন্যই রহিল!

"হুজুর! পরিচয় কি দিব? এককালে এই হেয় কাঞ্চনীকে মা বলিবার হৃদয়ধন একটা ছিল, সেই সাহসা সুন্দর যুবাকে পাপিষ্ঠ শিখ রাক্ষসেরা নষ্ট করিয়াছে—একবার তাদের ফাঁসিকাষ্ঠ থেকে কাংরার রাজা সংসারচাঁদ বাচাইয়াছিলেন, শেষবারে আর সে সুযোগ ঘটিল না! কিন্তু কাংরা রাজ-বংশের সে গুণ জন্মে ভুলিব না, সেই ঋণের কিয়দংশ পরিশোধের জন্যই প্রাণের লীলাকে প্রাণপণে আনিয়া দিয়াছি! নরপিশাচ শিখদের কথাও এই বুকে (বক্ষে সবলে চপেটাঘাত) শেল বিঁধিয়া রহিয়াছে—তাহাও ভুলিবার নয়—কতক শোধ দিয়াছি, আরো দিবার জন্যই বাঁচিয়া আছি!"

কাঞ্চনীর রক্ত-চক্ষু, উন্মত্তার ন্যায় হস্ত প্রসারণ ও স্বীয় বক্ষে আঘাতাদি ভঙ্গী দর্শনে জুলীন বিস্মিত ও লীলা ভীত হইলেন!

ক্ষণেক নীরব রহিয়া বৃদ্ধা আবার কহিতে আরম্ভ করিল, "যাউক, সে কথা এখন থাকুক, আগে তো আমাদের আসিবার সূত্র বলি। ঐ যে লোকটা দুয়ারে মাথা গলাইয়া দেখিয়া গেল, হুজুরের ঐ নেমকের চাকর চৈতনই আমাদের আনিবার কর্ত্তা!"

জুলীন সবিস্ময়ে কহিলেন "চৈতন?—কিরূপে?"

গুলাপী উত্তর দিল "যখন হুজুর প্রথমে কাংরায় আইসেন ও দণ্ডবরের সহিত যুদ্ধ করেন, তখন হুজুরের দেওয়ানজী ঐ চৈতন জয়ন্তী মঠে দেব কাজের জন্য থাকিতেন। তিনি সর্ব্বদা এই রাণীজীর পবিত্র আশ্রমে যাই-তেন এবং সর্ব্বদা হুজুরের শত শত গুণানুবাদ যেন শত মুখেই করিতেন। সেই সুখ্যাতি করিতে করিতে হুজুরের জন্যই এই বলিয়া ভাবনা করিতেন

যে, 'ভগবতী মুখ রক্ষা করিলে হয়—এখানে না ডাক্তার, না ভাল হাকিম, না কবিরাজ, না ঔষধ, কিছুই নাই! সাহেব তো কথা শুনিবেন না, কেবল গোলা গুলির সম্মুখেই বেড়াইবেন, যদি দৈবাৎ একটা গোলা গুলি লাগে, তখন কি উপায় হইবে?' সেই চিন্তার কথা শুনিয়া রাণীজী আমার চিকিৎসার প্রশংসা করেন। পথে এক দিন, এক সিপাহী ভয়ানকরূপে আহত হইলে চৈতন তাহাকে এক আম্র বাগানে রাখিয়া আমাকে ডাকিয়া লইয়া যান। ভগবানের কৃপায় আমার ঔষধে সে এবং তাহার পর অনেকে আরাম হয়।

"তদবধি চৈতন আমার চিকিৎসার তথ্য জানিতেন—আমার চিকিৎসা আর কি, গাছ্‌গাছ্‌ড়া; কিন্তু গুমোর করিয়া বলিতে পারি, সেই সামান্য গাছ গাছ্‌ড়ায় যে কাজ করে, বড় বড় হাকিম বৈদ্যতেও তা পারে না! সে যাহা হউক, তার পর সে দিন সাহেবের নিজের এই বিপদ ঘটাতে চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল—কে কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারে না। কিন্তু চৈতন একবারে দৌড়িয়া গিয়া আমাদের বাড়ীতে পড়েন। ভাগ্যক্রমে আমি তখন বাড়ী ছিলাম—বনে পর্ব্বতে গাছড়া কুড়াইতে যেমন নিত্যই যাই, সে দিন যাই নাই—আমি অমনি ছুটিয়া আসিয়া চিকিৎসার ভার লইলাম।

"চৈতন্যের গুণের কথা শতমুখ হইলেও বলিয়া উঠিতে পারি না। চৈতন সেই অবধি কত পূজা, কত স্বস্ত্যয়ণ যে করাইয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই! আবার একতিলের তরেও হুজুরের নিকট হইতে চৈতন আমাকে ছাড়িয়া দিলেন না—পায় পর্য্যন্ত গড়াইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার ভত করা বাড়ার ভাগ, হুজুরের ক্ষত স্থান পরিষ্কার করিতে গিয়া কক্ষের কাছে যে চিহ্ন দেখিলাম, তদ্দর্শনে আমি অবাক্‌ হইয়া পুনঃ পুনঃ আপনার মুখ দেখি আর কাঁদি! হায়! সেই চিহ্ন চক্ষে পড়াতে কত পূর্ব্ব কথা—কত যুগান্তের শোক উথলিয়া উঠিল—যাহা হইবার নয়, যাহা নিতান্তই অসম্ভব, তাহার আশাও মনে উদিত হইয়া পাগলিনীর হৃদয়কে আরো পাগল করিল! কিন্তু সে কথা এখন না—আরো দুদিন পরে বলিব! এখন যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি—

"একে আপনার গুণে রাজ্যশুদ্ধ মুগ্ধ, এ দুঃখিনীও সেই দলভুক্ত, সুতরাং আপনার এমন অমূল্য প্রাণ রক্ষার জন্য সহজেই ঘোর প্রবৃত্তি ছিল, তাহাতে ঐ অদ্ভুত চিহ্ন দর্শনে—মিথ্যা আশার প্রলোভনেই হউক অথবা অন্য কোন অলৌকিক কারণেই হউক—একবারে সন্তানের প্রতি (বে-আদবি কথা

মাপ করিবেন!) মায়ের যেমন বাৎসল্যভাব, হুজুরের প্রতি তেম্নি অগাধ স্নেহভাবেই অভাগিনীর মন প্রাণ ডুবিয়া গেল! তাই বলিতেছিলাম যে, চৈতনের পায় ধরা আর কান্নার প্রয়োজন ছিল না, আমি আপনার প্রাণের ব্যথাতেই যত্ন করিতাম। তবে সমস্ত রাত্রি দিন এখানে থাকিবার পক্ষে একটা বিশেষ বাধা ছিল। সে বাধা অন্য কিছুই না, কেবল রাজনন্দিনী লীলার জন্যই ভাবনা, পাছে আমি রাণীর আশ্রমে না থাকিলে দুরাত্মারা আবার কোন বিপদ ঘটায়! আহা! সকল ঘুচাইয়া তবু পোড়া মন শেষ দশায় এই ননীর পুতুলিকে পাইয়া অবধি তাহাকে না দেখিলে বাঁচে না—যেখানে থাকি দিনান্তে আসিয়া এ চাঁদমুখখানি একবার দেখিবই দেখিব এবং সারা রাত্রি অর্দ্ধ ঘুমন্ত, অর্দ্ধ জাগ্রত থাকিয়া পাহারা দিবই দিব! হুজুর, একবাগা মনের রোগই এইরূপ—তায় বুড়া বয়সে!

"চৈতন আমার আপত্তি শুনিবা মাত্র আমাকে আশ্বাস দিয়া ছুটিয়া রাণীজীর নিকটে গেলেন—অনুনয় বিনয় চরণ ধারণ পূর্ব্বক সম্মত করিয়া যান বাহন লইয়া গিয়া তাঁহাদিগকে এখানে আনিলেন! রাণীজী যদিও সাহেবের অশেষ গুণ গরিমার কথা শুনিয়া হুজুরের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমতী ছিলেন, তথাপি দুর্গমধ্যে পুরুষমণ্ডলীতে—বিশেষ যেটী তাঁহারই নিজপুরী, কেবল দুষ্টের ছলনায় যে ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিতা হইয়াছেন, সেই শোকের পুরীতে এই কন্যা লইয়া আসিতে যে সম্মতা হইয়াছেন, ইহাতেই বুঝিবেন, চৈতন কিরূপ অসাধারণ লোক এবং চৈতন কিরূপ অসাধ্য সাধন করিতে সমর্থ!"

চৈতনের গুণ শ্রবণে তুলীনের নয়ন যথার্থই বাষ্প-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল! ক্ষেপা চৈতন তাঁহার দৃষ্টিতে তখন তাহার প্রাণদাতা দেবতাবৎ প্রকাশ পাইল! মনে করিলেন, যদি বাঁচিয়া উঠি, তবেই এ অপরিশোধ্য ঋণের (অন্ততঃ) কিয়দংশ পরিশোধ করিয়া ধন্য হইব! এই মনোগত চিন্তা ও সংকল্পের পর বলিলেন, "তার পর, বুড়ী মা, কি বলিতেছিলে বল?"

বুড়ী মা বলিল, "রাণী চন্দ্‌কুনেয়ার (চন্দ্রকুমারী) স্বীয় কন্যার সহিত আসিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া—বিশেষ, আমার মুখে ঐ চিহ্নের পরিচয় অর্থাৎ চিহ্ন দর্শনে আমার মনে যে ভাব জন্মিয়াছে, সেই কথাটী শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ে, সন্দেহে ও ভবিষ্যতের আশাতে এবং বর্ত্তমানে হুজুরের প্রাণের আশঙ্কাতে ব্যাকুল হইয়া, চৈতনের সকাতর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন

না! অর্থাৎ দুর্গমধ্যে তাঁহাদের পূর্ব্ব অন্তঃপুরে অবস্থান করিতে সম্মত হইলেন এবং আপনাদের পদমর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়া ঠিক যেন হুজুরের আপনার মা ও ভগ্নীর ন্যায় পরম স্নেহে রোগের শুশ্রূষার কাজে আমার সঙ্গে যোগ দিলেন! দেওয়ানজী এবং বন্নু প্রভৃতি সকলেই তাঁহাদের অবস্থান পক্ষে যাহাতে কোন গোলযোগ ও কোন কষ্ট না হয়, সৰ্ব্বতোভাবে তাহার তদ্বির করিয়া দিয়াছেন—তাঁহাদের জন্য উপযুক্ত পরিচারিকা সকলও নিযুক্ত করিয়াছেন এবং রাজরাণী ও রাজনন্দিনীর উপযুক্ত যে সব দ্রব্য সামগ্রীর প্রয়োজন, সে সকল শয্যা সজ্জাদি কোন বিষয়ে সংগ্রহের ক্রটি করেন নাই!"

তুলীন সাশ্রুনয়নে গদ্গদস্বরে উত্তর দিলেন "আ! একজন ভিন্ন দেশীয়—ভিন্ন জাতীয়ের প্রতি এত দয়া! মহতের স্বভাবই এই বটে! এ গুণের আর এ ঋণের প্রতিদান কিরূপে হইতে পারে, তাহা জানি না—প্রতিশোধ হইবারও নয়! কেবল এই মাত্র প্রার্থনা যে, যেমন মা ভগ্নীর উপমা দিলে, তাঁহারা যেন এই মাতৃহীন ও ভগ্নীহীন অনাথের প্রতি দয়া করিয়া যথার্থই তাহার মা ভগ্নী হন—আমি অদ্যাবধি আপনাকে তাঁহাদের পুত্র ও ভ্রাতা বলিয়া জানিলাম—অদ্যাবধি একের সন্তান, অপরের সহোদর প্রকৃত প্রস্তাবেই হইলাম, তাঁহারা যেন কোন অংশে একদিনের নিমিত্তও আমাকে তদ্ভিন্ন অন্য ভাবে না ভাবেন!"

রাণীজী সরোদনে বলিলেন "তোমার যদি দয়া থাকে, তবে বাবা আমরা কদাচ অন্য ভাবে ভাবিব না! এ দুখিনী অনাথিনীদের এজগতে আর কেহই নাই—চারিদিকে শত্রু—চারিদিকে দুর্জ্জন দুষ্ট শত্রু—আত্মীয় বন্ধু কুটুম্ব সবই মারা পড়িয়াছে—যাহারা আছে, তাহারাও রাজ্যহারা, বনবাসী বা আমাদের ন্যায় পথের কাঙাল হইয়া বেড়াইতেছে—সর্ব্বভক্ষক রাক্ষসদের গ্রাসে এই বৃহৎ পার্ব্বত্য দেশের রাজ্যগুলি গ্রাসিত হইয়াছে—বহুরাজ্যের মধ্যে প্রায় কোনটাই ত্রাণ পায় নাই—পরশুরামের ন্যায় এ অঞ্চলকে একবারে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া তুলিয়াছে বলিলেও হয়!"

তুলীন ব্যগ্রভাবে বলিলেন "মা! আর না; ক্ষান্ত হউন; যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে; ফিরিবার নয়! এখন, মা, আপনাকে আপনি আর অপুত্রক ভাবিবেন না, ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা—যতদিন তুলীনের প্রাণ থাকিবে—যতদিন এই হস্ত অসি ধরিতে সমর্থ হইবে, ততদিন আপনারাই

আমার সব ! এখন আর একটা শুনিলেই আমি নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাই—"

রাণীজী। কি বাবা ?

দুলীন। সেই চিহ্নের কথা ? (গুলাপীর প্রতি) বুড়ী মা ! তোমার কথায় আমার অন্তঃকরণ ভয়ানক উদ্বেলিত হইয়াছে—আমার অঙ্গে চিহ্ন দেখিয়া কেন তুমি এত বিস্ময়ান্বিত এবং কি আশায় আশান্বিত হইলে ? কেনই বা সে আশা সফল হওয়া অসম্ভব বোধ করিলে ? এই কাণ্ডটা আমাকে ভালরূপে বুঝাইতে হইবে !

গুলাপী। আ'জ্ না হুজুর, আর না—ক্রমে রাত্রি হইয়া উঠিল—এ অবস্থায় আ'জ্ আর কোন কথা না—কা'ল্ সব শুনাইব।

দুলীন। তা হবে না. বুড়ী মা, আ'জ্ বলিতে হইবে—না শুনিলে সারা রাত্রি ছট্‌ফট্ করিব—তিলেকের জন্য নিদ্রা সুখানুভব করিতে পারিব না ! এ কথায় আমার মনে তুমি যে কি আগুন জ্বালিয়া দিয়াছ, তাহা এখন কি বলিব, তোমার কথা শেষ হইলে তবে বুঝাইতে পারিব ! একথা শুনিবার পক্ষে বিশেষ গুপ্ত কারণ আছে, পরে জানিতে পারিবে !

গুলাপী। বাবা, সে কথা কি একটু যে, খপ্ করিয়া এখনি বলিয়া ফেলিব ! অতএব আ'জ্ মাপ কর—একটী রাত্রি অপেক্ষা করিয়া থাক—বলিব বলিয়াই তো সূত্র তুলিয়াছি, আমাদের মনেও আগুন জ্বলিতেছে ! কিন্তু কি করি, আ'জ্ কোন মতেই পারি না ! হুজুর তো নির্ব্বোধ নন—এখনও রোগের আপদ বিপদ সম্পূর্ণ কাটে নাই ! আ'জ্ আপনাকে ধৈর্য্য ধরিতেই হইবে !

দুলীন। বুড়ী মা, হুজুর টুজুর আর বলিও না—তবে কি আ'জ্ নিতান্তই নয় ?

গুলাপী। না বাবা, আ'জ্ নয়—কা'ল্।

আমারাও দেখিতেছি, সে কথা এ অধ্যায়ে আর হইবার নয়, পর অধ্যায়ে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

গুলাপী।

পরবর্ত্তী সায়ংকালে গুলাপী কথা আরম্ভ করিল—পাঠক মহাশয় স্মরণ রাখিবেন, এই জীবনী মধ্যে এক চৈতন ভিন্ন অন্য যত পাত্র পাত্রীর উক্তি প্রত্যুক্তি, সকলই ভাষান্তরিত; সুতরাং নাটকের ন্যায় যে যেমন পাত্র, তাহার মুখে তদুপযুক্ত উক্তি প্রত্যুক্তি না হইয়া সে সব স্থলে ইতিহাস-লেখকের নিজের ভাষাই ব্যবহৃত হইতেছে। তদনুসারে গুলাপীর পরিচয়ও সংক্ষিপ্ত করিয়া কথোপকথন প্রণালীর পরিবর্ত্তে সরল ঐতিহাসিক রীতিক্রমে নিজের ভাষায় বর্ণনা করা যাইতেছে।

মজঃফরাবাদের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে সুদান নামে একটী গিরি-প্রধান রাজ্য আছে। রাজ্যটী ক্ষুদ্র নয়—বৃহৎ পদ-বাচ্যও হইতে পারে। তাহাতে চৌহান বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজগণ বহুকালাবধি রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। পার্ব্বতীয় ভূপালবর্গের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরে অনৈক্য ও বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিয়া তাঁহারা নিম্ন-দেশস্থ পঞ্জাবের মিসল সমূহের সহিত সংশ্রব সাধনে ও তাঁহাদের সাহায্যাদি গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন। পরস্পরের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ঘরাও বিগ্রহ চলিলেই আভ্যন্তরিক ক্ষীণতা ও দুরবস্থা অনিবার্য্যরূপে ঘটিয়া থাকে।

সুচতুর রণজিৎ সেই গোলযোগে দুই একবার মিশিতে পাইয়াই তাঁহাদের সেই দুর্ব্বলতার বিষয় বিলক্ষণ অনুধাবন করিলেন। আর কি তাঁহার ভূ-লোলুপ নিজের প্রবৃত্তি ও মন্ত্রীগণ চুপ করিয়া থাকিতে পারে? ক্রমে ক্রমে সুযোগ মতে তিনি বা তাঁহার সেনাপতিরা দুই একটী করিয়া প্রায় সমুদায় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাজ্যগুলি হয় সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ, নয় তো করদাতা অধীন প্রদেশ রূপে পরিণত করিতে লাগিলেন।

বিশেষতঃ ধ্যান সিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা গোলাপ সিংহ সেই পার্ব্বত্য অঞ্চলে—কতক বা নিজের নিমিত্ত, কতক বা প্রভুর জন্য—ভয়ানক দৌরাত্ম্য সহিত অধীনতা শৃঙ্খল পরাইতে লাগিলেন। দৌরাত্ম্যের প্রধান হেতু ও উপলক্ষ এই যে, মহা তেজস্কর প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতি—সহস্র দুর্দশা ঘটিলেও—সহজে কাহারো বশ্যতা স্বীকার বা অধীনতা রূপ শৃঙ্খল পরিবার ব্যক্তি

নহেন—সুতরাং তাঁহাদের অসম-সাহসিকতা-জনিত বিপক্ষতায় গোলাপ সিংহকে তদীয় দিগ্বিজয় রূপ পর-রাজ্যাপহরণের কার্য্যে কখন কখন এত ব্যতিব্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত যে, বহু লোকবল বা ছল কৌশল উপায়ে শেষে যখন তিনি জয়ী হইয়া উঠিতেন, তখন পূর্ব্ব কষ্টের প্রতিশোধ স্বরূপ বর্ণনাতীত অত্যাচার ও নৃশংস ব্যবহার করিতেন।

তন্মধ্যে সূদানের যুবা রাজা বিক্রমজিতের নিকট গোলাপ সিংহ যেমন ঠেকিয়াছিলেন, এমন আর কুত্রাপি নয়। বিক্রমজিৎ যথার্থই সিংহ বিক্রমে অপেক্ষাকৃত অল্প সৈন্য সাহায্যে বার বার গোলাপের অধিক সৈন্যকে পরাস্ত ও নানারূপে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছিলেন! চিতোরের অমর-কীর্ত্তি মহারাণাগণ—বিশেষতঃ বীর-চূড়ামণি প্রতাপ যেরূপ মোগল সম্রাটের অতুলিত ভুজপ্রতাপকে লজ্জা দিয়াছিলেন ও মোগল-রক্তে মিবারের গিরি-পথ আপ্লুত করিয়াছিলেন—ধন-জন-রাজ্য-ভ্রষ্ট বনচারী হইয়াও পরাধীন ও নত হয়েন নাই; বিক্রমজিৎ প্রায় তদ্রূপ শৌর্য্য, বীর্য্য ও স্থির প্রতিজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন! তজ্জন্য সঙ্কীর্ণ-চেতা গোলাপ যার পর নাই জাতক্রোধ হইয়া উঠেন। অবশেষে যখন বহুতর সৈন্যাদি সাহায্যে বিক্রমের রাজ্য ও রাজধানী হস্তগত করিতে সমর্থ হইলেন, তখন আহা! তাঁহার ভয়ানক নিষ্ঠুরাচরণের কাণ্ড নিতান্তই অনির্ব্বচনীয়! কথিত আছে যে, দ্বাদশ সহস্র সূদানবাসীকে ধরিয়া আনিয়া কতক লোকের মস্তক কাটিয়া; কতক লোকের পা ভাঙ্গিয়া, জন্মের মত তাহাদিগকে খোঁড়া করিয়া এবং কত শত বীরের গাত্র-চর্ম্ম—পাঁটা ছাড়াইবার ন্যায়—ছাড়াইয়া লইয়া নিতান্তই অমানুষিক পৈশাচিক আচরণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন!*

যখন রাজ্য রক্ষা পক্ষে পরকীয় প্রবল আনুকূল্য ব্যতীত আর কোন উপায়ই রহিল না, তখন বিক্রমজিৎ স্বীয় মাতুলালয় দণ্ডী রাজ্যে পলায়ন করিতে

* স্যার হেনেরি লরেন্স লিখিয়াছেন,—"He has over-run the whole district between Kashmir and Attok and inflicted such terrible vengeance on the people of Soudan (a large district south-east of Muzufferabad) cutting up, maiming and flaying to the amount, it is said, of 12,000 persons, that the men of Dundi and Satti, two adjoining territories, sent in their submission, *but begged not to see his face.*"

বাধ্য হইলেন। তৎপরেই ঐ নিষ্ঠুর ঘটনা। দণ্ডী রাজ্য সুদানের নিকটবর্ত্তী ও সুদানাপেক্ষা ক্ষুদ্র। যাহার পরাক্রমে সুদানই পরাজিত ও শ্রীভ্রষ্ট হইল, সে প্রবল শত্রুর প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া দণ্ডীর কর্ম্ম নয়। বিশেষতঃ সুদানের ঘোর দুর্দ্দশার দৃষ্টান্ত দেখিয়া দণ্ডীরাজ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে গোলাপের ভীষণ বদনখানি সন্দর্শন করিতে না হয়, পূর্ব্বাহ্লেই তৎপ্রতিবিধান স্বরূপ দূত দ্বারা নজরানা প্রেরণ ও অধীনতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু গোলাপ সিংহ তন্মাত্রেই সন্তুষ্ট হইবার নন—তাহাতে তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ধনতৃষ্ণা চরিতার্থ হইলেও পূর্ব্ব সঞ্চিত ক্রোধ ও প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির শান্তি হয় কৈ? বলিয়া পাঠাইলেন, "যদি ভাল চাও তো বিক্রমজিৎকে আমার হস্তে দান করিয়া কার্য্যতঃ জানাও যে যথার্থই অধীনতা স্বীকার করিলে!" একে শরণাগত আশ্রিতকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য-পালনীয় ধর্ম্ম—সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইলেও তাহা করিতে হইবে—তাহাতে সর্ব্ব গুণাধার শূরাগ্রগণ্য বিক্রমজিৎ তাঁহার ভাগিনেয়. সুতরাং সে নীচ কাজ কি দণ্ডীরাজ করিতে পারেন? অতএব জনৈক বিজ্ঞ মন্ত্রীকে গোপনীয় ঋজু পথ দিয়া অতি শীঘ্র স্বয়ং মহারাজ রণজিতের নিকট ক্ষমা ভিক্ষার্থ পাঠাইলেন। কিন্তু রাজসভায় রাজা ধ্যান সিংহের প্রভুত্ব ও চক্রান্ত কিরূপ প্রবল, তাহা পাঠক পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছেন। সুতরাং দণ্ডীরাজের বিজ্ঞ মন্ত্রীর কোন মন্ত্রণাই তথায় খাটিল না; তিনি অতি-দ্রুতগামী দূত যোগে বিক্রমকে আপাততঃ পলায়নার্থ পরামর্শ দিলেন। সেই যে কর্ণেল ডাউলিন গোশকটে হীরক-মণ্ডিত এক পত্রাংশ প্রাপ্ত হন, তাহাই এই পত্রের অংশ। তদনুসারে দুর্ভাগ্য সুদানরাজ স্বীয় স্ত্রী পুত্র লইয়া অতি অল্প সংখ্যক অনুচর সমভিব্যাহারে ইংরাজ-রাজধানী কলিকাতা অভিমুখে ও ইংরাজানুকূল্য উদ্দেশে সঙ্গোপনে পলায়ন করিলেন। আমরা ঐ সব বড় বড় ঘটনা শৃঙ্খলাবদ্ধ-রূপে বলিবার অনুরোধে গুলাপীর পূর্ব্ব-জীবনের কথা ছাড়িয়া আসিয়াছি, এখন তাহা বলিবার সময়। অতএব নীচে যাহা লিখিতেছি, তাহা ঐ সব বৃহৎ ঘটনার বহু পূর্ব্বকার কথা।

গুলাপীর পিতা ও ভ্রাতা, সুদানরাজের প্রজা ও সৈনিক; গুলাপীর মাতা, বিক্রম-জননীর প্রিয় পরিচারিকা এবং তৎসূত্রে গুলাপীও বাল্যাবধি তাম্বুল-করঙ্কবাহিনী পদে নিযুক্তা ছিল। গুলাপী পরিচারিকা ছিল বটে, কিন্তু রূপ গুণ খুব ভাল থাকাতে ভাল ঘরে বরেই অর্পিতা হইয়াছিল।

পার্ব্বত্য দেশের প্রথানুসারে তত্রত্য মহিলারা যথা তথা ভ্রমণে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনা; তাহাতে গুলাপী উচ্চ শ্রেণীর ভদ্র-কন্যা নয়, সুতরাং যথেচ্ছা গমনাগমন পক্ষে তাহার তত বাধা ছিল না। অতএব গুলাপী যখন লাবণ্যবতী যুবতী, তখন একদা সমবয়স্কাগণ সঙ্গে পুষ্পচয়ন ও বনবিহার সুখে মগ্না ছিল, এমত কালে কতিপয় দুর্জ্জন অলক্ষিত ভাবে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। দুরাত্মারা আর কাহাকে বড় কিছু বলিল না, গুলাপীকেই বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া চলিল। সঙ্গিনীরা চঞ্চল-পদে পল্লীমধ্যে সংবাদ দিল। গুলাপীর স্বামী ও ভ্রাতা সশস্ত্র অতিত্রস্ত ধাবমান হইয়া গুলাপীর চিৎকার শব্দানুসারে নিকটস্থ হইয়া গুলাপীর উদ্ধার উদ্দেশে অপহারক দলকে আক্রমণ করিল। কিন্তু দুর্বৃত্তেরা সংখ্যায় অনেক বেশী—অল্পক্ষণ মধ্যেই গুলাপীর স্বামী ও ভ্রাতা উভয়েই পড়িল—স্বামীর মৃত্যু গুলাপী স্বচক্ষে দর্শন করিয়া বজ্রাহতের ন্যায় চৈতন্য হারাইল, পতিত ভ্রাতাও আর উঠিল কি না, জীবিত কি মৃত অবস্থায় রহিল, তাহাও অভাগিনী জানিতে পারিল না—দুরাত্মারা মূর্চ্ছিতা অবলাকে লইয়া ক্ষণ বিলম্ব ব্যতীত পলায়ন করিল।

এই অপহারক দল, দস্যু নয়—দস্যু হইলে বন-বিহারিণী তাবৎ তরুণীর অলঙ্কার অপহরণ করিয়াই পলায়ন করিত। ইহারা, পাপিষ্ঠ শিখসর্দ্দার জয় সিং বাংঘীর লোক—তাহারা এইরূপ ঘোর অত্যাচারের কাজেই অনবরত নিযুক্ত থাকিত। পার্ব্বতীয় অঞ্চলের যুবতীরা স্বভাবতঃ সমধিক সুস্থা, বলিষ্ঠা ও সৌন্দর্য্যশালিনী, তজ্জন্য পাপমতি সর্দ্দার একদল ভীষণকর্ম্মা নারী-অপহারককে বহু পুরস্কার দানে পুষিত; তাহারা সুন্দরী যুবতীর সন্ধানে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ছদ্মবেশে বেড়াইত; যে দুর্ভাগা রূপসী তাহাদের মনোনীত হইত, তাহাকে সুযোগমতে বলে ছলে হরণ করিয়া লইয়া যাইত—প্রায়ই পিতা, ভ্রাতা, স্বামীর হত্যাও সেই সঙ্গে ঘটিত।

গুলাপী সেই মূর্চ্ছাতে—সেই নিদারুণ শোকে মরিল না—বাঁচিয়া উঠিল। তাহার নির্ম্মলতা, সরলতা ও অল্পবয়সের নৈরাশ্য-যাতনা দেখিয়া পাপাত্মা জয় সিংহের মনে কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইল না; তদ্বিপরীতে বরং সেই নির্ম্মলতা, সরলতা ও অল্প বয়স, ঘৃতাহুতিবৎ তাহার পাপপ্রবৃত্তি রূপ হুতাশনকে আরো উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল! আহা, গুলাপী প্রতিনিয়ত কত কাঁদিল, কত স্তুতি

মিনতি করিল, কত পায় ধরিল, "ধরমের বাপ" পর্য্যন্ত বলিয়া সম্বোধন করিল, তথাপি নর-পিশাচ ক্ষান্ত হইল না। গুলাপী অনাহারে রহিল; বলপূর্ব্বক খাদ্য সামগ্রী তাহার গলাধঃকরণ করিয়া দিতে লাগিল! গুলাপী আত্মহত্যার চেষ্টা পাইল, কিন্তু এমনি সতর্ক প্রহরী ছিল যে, সে চেষ্টাও বিফল হইল। যাহারা যে কাজে ব্যবসায়ী, বহুদর্শী ও অভ্যস্ত, তাহাদের নিকট সরলা বালার প্রতিকার প্রয়াস কোন্ কাজের? তাহাদের অধ্যবসায় ও চাতুর্য্যের পাশে দুর্ব্বলা অবলার প্রতিজ্ঞা কতক্ষণ? পাঠক বুঝিতেছেন, যাহা ঘটিল!

কিন্তু হায়! পূর্ণ যৌবনাবস্থা হইতে না হইতেই নবতরুণীতে গুলাপী নিতান্তই ভগ্ন-হৃদয়া, নিতান্তই নৈরাশ্য-মগ্না, নিতান্তই আত্ম-জীবনে ধিক্কার-বিশিষ্টা নিকৃষ্টা রমণীর পরাকাষ্ঠা হইয়া উঠিল—সুপবিত্র দাম্পত্য ও সাংসারিক সুখোৎসাহ রূপ পারিজাত কুসুমোদ্গমের সময়েই বিষাক্ত কীট দংশনে তাহার জীবন মরুক্ষেত্রবৎ নিষ্ফল ও হেয় হইয়া পড়িল!

কতবার পলায়নের সংকল্প মনে মনে উদিত হইয়াছে, কিন্তু সাধ্য কি যে, প্রহরীতা-পিঞ্জর ও অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে এক পদও অগ্রসর হয়? যদিও বা দৈবানুগ্রহে সেই অসম্ভব সুযোগের সম্ভাবনা ঘটিত, তথাপি কোন্ মুখে আর পিতার পবিত্র ভবন অপবিত্র করিতে যাইবে, এই মর্ম্ম-বিদারক চিন্তা-তাপে সে সংকল্প ম্লান হইয়া যাইত!

কালবশে অসহ্যও সহ্য হইয়া উঠে—গুলাপী ক্রমে ক্রমে স্বীয় দুর্ভাগ্যের প্রতি উদাসীন এবং অদৃষ্টলিপি অনিবার্য্য ভাবিয়া তাহার বশ্যতা স্বীকার করিল; ক্রমে সে জঘন্য জীবন অভ্যাসাধীন হইয়া পড়িল! কাজেই যথার্থ সুখ না হউক, একপ্রকার স্বচ্ছন্দতা ও শান্তিভোগে রহিতে সমর্থা হইল!

কিন্তু ভাগ্য যাহার প্রতি বাম, তাহার পক্ষে দূর্ব্বাবনেই বাঘ! গুলাপীর পোড়াকপালে সেই শান্তি-ভোগ-টুকুও বেশী দিন সহিল না। দুরাত্মা জয় সিংহের লালসাগ্নি কিছুদিনেই নির্ব্বাপিত হইল—ভোগজনিত অবসাদ ঘটিল—লম্পটদিগের নূতন ভোগেচ্ছা জাগরিত হইল—অধীন তস্করেরা আবার কোন গৃহের সর্ব্বনাশ করিল—অন্য এক রূপবতী নবীনাকে আনিয়া দিল! সুতরাং পাপাশয় নির্দ্দয় সর্দ্দার জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় গুলাপীকে পরিত্যাগ করিল! করুক; ভালই তো; ছাড়িয়া দিলে গুলাপী তো বাঁচে—অমূল্য হারানিধি সতীত্বকে তো আর পাইবেই না, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় স্বাধীনতা পাইলেও যথেষ্ট!

দুরাত্মা যদি তাহাকে সেই স্বাধীনতার পথে ছাড়িয়া দিত, তবে কি না করিত! কিন্তু নীচাশয় ক্রূর জয় সিংহ তাহা করিল না—সেদিকেও গেল না—এক কাঞ্চনীর সর্দ্দার্ণীর নিকট বিক্রয় করিল! কোথায় পুরস্কার এবং চিরজীবন কষ্ট না পায়, এমন মসহরা দিবে, না তদ্বিপরীতে গুলাপীকে বিক্রয় দ্বারা নিজেই উপার্জ্জন করিল—নিজে পুরস্কৃত হইল—যেন পাঁটা পোষণের খরচা তুলিয়া লইল! তাহাও অন্যত্র নয়, সাক্ষাৎ রাক্ষসী-রূপিণী এক সর্দ্দার্ণীর হস্তে সমর্পণ করিল! সে দেশে এরূপ (ছুকৃরী) ক্রয় বিক্রয়ের জঘন্য প্রথা প্রবল ছিল, সুতরাং গুলাপীর মর্ম্মাঘাতী রোদন ও আপত্তি খাটিল না!

সে তো সর্দ্দার্ণী নয়, সাক্ষাৎ সয়তানী! প্রকৃত প্রস্তাবেই অভাগিনী গুলাপী তাহার ক্রীতা দাসী হইল! হা রাম! ক্রীতা দাসীও তো সামান্য কথা—সে দাস্যপণা বৈ তো নয়—সে দাস্যপণা এর চেয়ে সহস্র গুণে ভাল—রাজবাটীর পরিচারিকার বলিষ্ঠা কর্ম্মিষ্ঠা কন্যা তাহাতে কি ডরায়? এ যে যার পর নাই হেয় পদবীর ক্রীতা দাসী হইতে হইল!

কি ঘটিল—প্রিয় পাঠক—বুঝিয়া লউন! বাহ্য সৌষ্ঠবে সৌষ্ঠবান্বিতা—রেসমী, পশ্‌মিনা, স্বর্ণ, হীরা, চুণি, পান্নাতে বিভূষিতা—মজ্‌লিসে নানা দূষিত গৌরবে গৌরবান্বিতা ও নানা বিভৎসময় আদরে আদৃতা—প্রকাশ্যে হাস্য-তরঙ্গ-নৃত্যরঙ্গময়ী নর্ত্তকী, ভিতরে ভিতরে অভিন্ন মাকাল ফল—দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণায় যার পর নাই প্রপীড়িতা! কষ্ট ও অপমানের সীমা সংখ্যা নাই! এত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাহার কড়া ক্রান্তিতেও নিজের অধিকার নাই—উঠিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে নীচের প্রভুত্ব-রাহু-গ্রস্ত ও বাক্যবাণে দগ্ধ, তিলেকের তরেও স্বস্তি নাই—বহু কাঞ্চনী-সমন্বিত সংসারের সামান্য দাস্যপণা কার্য্যেও নিযুক্ত হইতে হইত, অথচ দেশাচার ও রাজনিয়মানুসারে কিছুমাত্র প্রতিকারের উপায়ই ছিল না!

রাজধানী লাহোর নগরে গুলাপী একজন প্রসিদ্ধ নর্ত্তকী হইয়া উঠিল—সর্ব্বদাই সর্দ্দারদের ও মহারাজার মজ্‌লিসে নাচিতে যাইত—স্বয়ং রণজিতের প্রিয়তমা কাঞ্চনী হইতে পারিল! রণজিতের রাজ-যোগ্য বহু গুণ পূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি, কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলা আবশ্যক যে, উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে—বারুণী ও তরুণী-সহকৃত-বিলাস ব্যাপারে তিনি ও তাঁহার পারিপার্শ্বিকগণ নির্লজ্জ পিশাচবৎ ছিলেন। সে ঘোর অঘোরপন্থি চক্রের—সে অশ্রোতব্য অতি

দুষ্য কাণ্ডের কিঞ্চিন্মাত্রও বর্ণনা করিয়া আমাদের নিষ্কলঙ্ক লেখনী কলঙ্কিত হইতে চাহে না!

গুলাপীর প্রতি রণজিতের এত কৃপা-দৃষ্টি যে, গুলাপী মনে করিলে নিজের একখানি জায়গির পর্য্যন্ত করিয়া লইতে পারিত! পাঠক স্মরণ করিবেন, রণজিৎ তখন যুবক। কিন্তু জায়গির লইবে কে? প্রকৃতি দেবী গুলাপীকে মহৎ হৃদয় দান করিয়াছেন—সে হৃদয় কি সেরূপ জঘন্য নারী-জীবন-ক্ষেপণে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? স্বভাব তাহাকে উচ্চ স্বভাব দিয়াছেন, সে স্বভাব কি নীচ নারকী ব্যবসায়ের উপার্জ্জন দ্বারা স্বার্থ সাধনে সম্মত হয়? গুলাপী অনিচ্ছাতেও যখন সুরা রূপী হলাহল পানে আত্মাহারা হইত, তখনই যাহা কিছু সদালাপ বা কদালাপাদিতে মনস্তুষ্টি জন্মাইত; নতুবা সহজ অবস্থায় স্বগৃহে (সর্দ্দার্ণীর গৃহে) সর্ব্বদাই অনুতাপানলে পুড়িত—সর্ব্বদাই তাহার বদন ভারি থাকিত—কিছুই তাহার ভাল লাগিত না! এই দোষে কত তিরস্কার—কত প্রহার পর্য্যন্ত ভোগ করিয়াছে।

তথাপি বহু বর্ষ পর্য্যন্ত এই নরক-যন্ত্রণা সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কতবার পলায়নের পন্থা দেখিয়াছে, কতবার ধৃত ও তজ্জন্য ভয়ানকরূপে শাসিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছে। গুলাপী বলে "এততেও কিরূপে আমার কঠিন প্রাণ বাঁচিয়া ছিল, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না।"

কিন্তু "চোরের পাঁচ দিন, সাধুর এক দিন!" "যেখানে ইচ্ছা আর ঐকান্তিকতা, সেই খানেই উপায় আর পন্থা!" অবশেষে কোন সুযোগে গুলাপী পুরুষ বেশ ধরিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইল—পাছে রণজিতের রাজ্যে থাকিলে পুনর্ব্বার ধৃত হইয়া সয়তানীর নিকট আনীত হয়, এই ভয়ে এককালে ইংরাজাধিকৃত লুধিয়ানায় গমন করিল। সঙ্গে স্বীয় বহুমূল্য আভরণাদি ছিল, তাহারই একখানা বিক্রয় দ্বারা নিভৃত স্থলে বাসা লইয়া কিছু দিন গোপনে কাটাইল।

কিন্তু অল্পকালেই স্বদেশের মায়ায় প্রাণ উচাটন হইল। পিতা মাতা ভ্রাতা ও স্নেহকারী রাজ-পরিজনগণকে দেখিবার নিমিত্ত প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। "কপালে যাহা থাকে হইবে, জন্মভূমি ভিন্ন অন্য স্থানে মন তিষ্ঠে না, অবশ্যই যাইব" এই প্রতিজ্ঞারূঢ়া হইয়া বহু উপায় কৌশলে ও বহু কষ্ট আয়াসে সুদান নগরে প্রত্যাগমন করিল।

আসিয়া দেখিল, পিতা মাতা কালকবলিত! ভ্রাতা নিরুদ্দেশ—গুলাপীর

অপহারকদের আঘাতে সেই ভ্রাতা বাঁচিয়াছিল এবং গৃহে প্রত্যাগত হইয়া বহুকাল পিতা মাতার সহিত রাজ সেবায় নিযুক্ত ছিল, কিন্তু পিতা মাতার মৃত্যুর পর নিরুদ্দেশ! কেহ বলে শিখ হস্তে বন্দী হইয়াছে, কেহ বলে গুলাপীর সংবাদ পাইয়া ছদ্মবেশে লাহোরে তাহার অনুসন্ধানে গিয়াছে। পিতৃগৃহ এককালেই জনশূন্য—জীর্ণাবস্থায় পতিত। গুলাপী প্রতিবাসীদের ভবনে বসিয়া বিস্তর কাঁদিল। শেষে সকলের প্রবোধবাক্যে ভ্রাতার পুনরাগমনের প্রত্যাশায় এই স্থির করিল যে, জীর্ণ পিতৃভবনের সংস্কার সাধন পূর্ব্বক অগ্রজের প্রতীক্ষায় কাল হরণ করিবে। কিন্তু রাজবাটীতে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া সে সংকল্পের রূপান্তর ঘটিল। পূর্ব্ববৎ প্রিয় পরিচারিকার কর্ম্ম পাইল, সুতরাং রাজবাটীতেই অবস্থান করা ধার্য্য হইল।

তখন রাজপুরীর অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; মহারাজার স্বর্গারোহণে বিক্রমজিৎ কয়েক বৎসর সিংহাসনে বসিয়াছেন। গুলাপী বিক্রমজিৎকে বালক দেখিয়া গিয়াছিল, এক্ষণে সেই বিক্রমজিৎ পার্ব্বত্য অঞ্চল মধ্যে একজন মহা-বিক্রমশালী যুবা, সর্ব্বগুণাকর সর্ব্বপূজ্য কেশরী তুল্য পরাক্রান্ত মহীপাল—তাঁহার সুপালনে ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে স্হদান যেন রামরাজ্য হইয়া উঠিয়াছে। আরো সুখের বিষয়, বিক্রমজিৎ বিবাহ করিয়া রূপে গুণে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-স্বরূপিণী এক রাজকন্যাকে গৃহে আনিয়াছেন। গুলাপী আসিয়া দেখিল, সেই পট্ট মহিষী পূর্ণগর্ভা। তাঁহার স্নেহশীলা শ্বশ্রূ (পূর্ব্ব রাজরাণী) সেই গর্ভিণী বধূর বিশেষ সেবা শুশ্রূষা নিমিত্ত পুরুষানুক্রমিক কিঙ্করী-বংশজাতা গুলাপীকে নিযুক্ত করিলেন। গুলাপীর রূপলাবণ্য ও সহৃদয়তা প্রভৃতি গুণাবলীতে সকলেই সন্তুষ্ট—তাহার জঘন্য জীবনের তথ্য প্রাচীনা রাণী বৈ আর কেউ বড় জানিতে পারিল না। বৃদ্ধা রাজ্ঞীও যৎকিঞ্চিৎ যাহা শুনিলেন, তাহা গুলাপীর দোষ বলিয়া জানিলেন না, তাহার দুরদৃষ্টের ফল বলিয়া তাহাকে গোপনে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া লইলেন। অতএব গুলাপী আসিয়া মহা সুখী হইল ও সকলকেই সুখী দেখিল।

কেবল একটা মানুষিক উৎপাত উপস্থিত হইয়া রাজ্যময় সকলকেই চিন্তাকুল করিয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর অতি সামান্য সূত্রে বা বিনা কারণেই দুর্দ্দান্ত গোলাপ সিংহ গর্ব্বিত শিখ সৈন্য লইয়া স্হদান আক্রমণ ও কোন কোন ভাগ ছার খার করিয়াছিল। বীর বিক্রমজিৎ যদিও অসামান্য শৌর্য্য ও সমর-

চাতুর্য্য বলে সেবার শত্রুকে পরাজিত ও বিদূরিত করিয়াছেন, কিন্তু বৈরিপক্ষ যেরূপ শাসাইয়া গিয়াছে, তাহাতে শীঘ্রই যে আবার অধিক আয়োজনে আসিবে এবং সর্ব্বনাশ বাঁধাইবে, সে পক্ষে সন্দেহ বড় ছিল না।

দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাই ঘটিল। এ দিকে অপূর্ব্ব একটী রাজকুমার জন্মিয়াছে বলিয়া জাত কর্ম্মাদিতে এবং অন্নপ্রাশনোপলক্ষে কয় মাস ধরিয়া রাজ্য মধ্যে মহোৎসব চলিতেছিল, ও দিকে শত্রুগণ বিভিন্ন ভাগ হইতে বিভিন্ন দলে আসিয়া বিভিন্ন ধাতুর আক্রমণ ও উৎপাত আরম্ভ করিল। তাহার ফল পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে। তাহাতে যেরূপে মাতুলালয় দণ্ডীরাজ্যে বিক্রমের আশ্রয় গ্রহণ ও তথা হইতে কলিকাতাভিমুখে পলায়ন হয়, তাহা পাঠক পূর্ব্বেই পাঠ করিয়াছেন।

এই পলায়ন আরো বিলাপজনক, যেহেতু তৎপূর্ব্বেই নানা মনস্তাপে উৎকট রোগগ্রস্তা হইয়া বৃদ্ধা রাজমাতা পরলোক গমন করিয়াছেন!

গুলাপী রাজকুমারের পালয়িত্রী রূপে রাজা ও রাজরাণীর সঙ্গিনী হইয়াছিল—গুলাপীর ন্যায় বিশ্বাসী ও সর্ব্বগুণে গুণবতী পরিচারিকা আর কেহই ছিল না।

ত্রিভুজ নামে বহু কর্ম্মঠ এক শঠ ব্যক্তি কর্ম্মাধ্যক্ষ রূপে রাজা বিক্রমজিতের সঙ্গে চলিল। ত্রিভুজের নিবাস কোথায় এবং পূর্ব্বে সে কি কর্ম্ম করিত, তাহা কেহ জানিত না। গুলাপী সুদান-রাজপুরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিল, সে প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম কর্ম্মচারী হইয়া উঠিয়াছে। রাজা সর্ব্বদাই তাহাকে ডাকেন, সকল কর্ম্মেই তাহার সহিত পরামর্শ করেন—ভাবে বোধ হইত, রাজা ভাবিতেন ত্রিভুজের তুল্য সর্ব্ব-কর্ম্ম-পারদর্শী ও সর্ব্ব-বিষয়জ্ঞ লোক আর কেহই নাই। কিন্তু বৃদ্ধ মন্ত্রীবর্গ প্রভৃতি পুরাতন রাজহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই এই নবাগত ত্রিভুজের স্বভাব চরিত্রের প্রতি সন্দিহান হইতেন—রাজা ভাবিতেন, ইঁহারা ঈর্ষার বশে এরূপ সন্দেহ করেন। রাজপুরীতে গুলাপীর আগমনের পর যখনই ত্রিভুজের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইত, তখনই যেন গুলাপীর প্রতি ত্রিভুজ সপ্রণয় দৃষ্টিপাত ও প্রেম-শরবিদ্ধ নায়কের ন্যায় কোমল ভাবের মধুর সম্বোধনাদি বিন্যাস করিত। গুলাপী তখন আর নব্যা বালিকা নয়—বহুদর্শী—সে কি আর খলের ছলচাতুর্য্যে ভুলে? সুতরাং সে অনুরাগের বিরুদ্ধে বিরাগ প্রকাশ বৈ কখনই উৎসাহদান করে নাই; তথাপি ত্রিভুজ ক্ষান্ত হইত না,

বরং অধিক ছলে বলে, অধিক কৌশলে, অধিক গুণপণায়, দুর্গাক্রমণে অধ্যবসায়ী হইল। গুলাপী এক এক বার ভাবিত, "রাজরাণীকে বলিয়া দিই," আবার ভাবিত, "একে আমি নিজে দোষী, তাহাতে ত্রিভুজ যেরূপ অতিশয় চতুর ও বহুরূপী ভাবাপন্ন লোক এবং প্রভুর যেরূপ অতি প্রিয় কর্ম্মচারী, সে অনায়াসে ছলে কৌশলে বিপরীত ঘটাইয়া আমাকেই অপরাধিনী করিয়া তুলিতে পারে ; অতএব কাজ কি ? ও কেন অমন করিয়া মরুক না—আমি এতই কি সতী সাবিত্রী যে, এরূপ মিষ্ট কথায় ও বাঁকা দৃষ্টিতে গলিয়া পচিয়া যাইব ? নিজে সাবধানে থাকিলেই যথেষ্ট !"

কলিকাতাভিমুখে পলায়নের পর পথিমধ্যে ত্রিভুজ একজন অতিরিক্ত দ্বারবান ও বেহারা নিযুক্ত করিল—প্রভুকে বুঝাইল, তাহারা তাহার পূর্ব্বপরিচিত অতি বিশ্বাসী ও সাহসী লোক, সঙ্গে রাখা ভাল। ফলতঃ রাজা বিক্রমজিৎকে ত্রিভুজ এমন বশ করিয়া লইয়াছিল যে, সে যাহা করিত প্রায় তাহাই হইত এবং সে নহিলে তাঁহার এক দণ্ড চলিত না। ক্রমে ঐ দুই নূতন ভৃত্যের আচরণ ও প্রভুভক্তি দেখিয়া রাজা মহা সন্তুষ্টই হইলেন।

পথিমধ্যে গুলাপীর প্রতি ত্রিভুজের প্রণয়-চেষ্টার বহুগুণে বৃদ্ধি বৈ হ্রাস হয় নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ত্রিভুজ সর্ব্বগুণে গুণবান পুরুষ ; অধিকন্তু শ্রীমানও বটে। তেমন সুনিপুণ যোদ্ধার পুনঃ পুনঃ বিবিধরূপ আক্রমণে ক্ষীণ-প্রাণা অবলার হৃদয়-দুর্গ কত দিন আর অভেদ্য থাকিতে পারে ? বিশেষ তাহারা যখন রাজপুরীতে ছিল, তখন দেখা সাক্ষাৎ বা আলাপের সুযোগ অত্যল্পই ঘটিত ; এখন অহর্নিশি অতি নিকট—মধ্যাহ্ন ভোজনের পরক্ষণ হইতে পান্থশালা বা চটিতে প্রায় নিষ্কর্ম্মাবস্থায় সর্ব্বদাই একত্রে অবস্থান—রাজকুমারকে কোলে লইয়া গুলাপী যখন বৈকালে বেড়াইত, তখন সুযোগ আরো বেশী। ত্রিভুজ কি এরূপ সুযোগকে বিফলে কাটাইবার লোক ? ক্রমে সে গুলাপীর হৃদয়াধিকারে সম্পূর্ণরূপেই সমর্থ হইল—ক্রমে গুলাপী তৎপ্রতি এমন অসম্ভব অনুরাগবতী হইয়া উঠিল যে, যেন তাহাকে নিতান্তই মন্ত্রমুগ্ধা—যেন একান্তই বশবর্ত্তিনী আজ্ঞানুসারিণী কিঙ্করী করিয়া তুলিল ! ধন্য কপটতার কুহক—ধন্য প্রতারণার ইন্দ্রজাল !

একদিন চটিতে অবস্থান সময়ে সন্ধ্যার পর ত্রিভুজ কোথায় যেন গোপনে যাইতেছে, দেখিয়া গুলাপী তাহার অনুসরণ করিয়া দূর হইতে দেখিল, ত্রিভুজ

একটী আম্র-বাগান মধ্যে কয়েক জন সন্ন্যাসীর সহিত গিয়া মিশিল। গুলাপীর হৃদয়ে যে রিষরূপী বিষ জ্বলিতেছিল, তাহাতে মুক্তি পাইল! কাজেই সুস্থ চিত্তে রাজকুমারের লালন পালন ও রাজরাণীর সেবা কার্য্যের নিমিত্ত স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইল। বহুক্ষণ পরে ত্রিভুজ আইলে গুলাপী সন্ন্যাসীদের সহিত সম্মিলনের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে ত্রিভুজ সহাস্যে উত্তর দিল, "সিদ্ধি বটিকার জন্য গিয়াছিলাম।" এই বলিয়া একটী সিদ্ধি বটিকা গুলাপীকে যত্নপূর্ব্বক খাওয়াইল। গুলাপী পূর্ব্বে এককালে অধিক পরিমাণে সুরাপানেও অভ্যস্থ ছিল, সামান্য সিদ্ধির নেশায় তাহার আপত্তি কি? বিশেষ হৃদয়নাথ অনুরোধ করিতেছে, অবিচারভাবে তৎক্ষণাৎ সেবন করিল। কিন্তু কয় দণ্ড অতীত না হইতেই তাহার শরীরের ভাব ভয়ানক হইল—মস্তিষ্ক মধ্যে কি যেন ঘুরিতেছিল—সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া আইল, আর বসিয়া কি চক্ষু চাহিয়া থাকিতে পারিল না—রাজরাণীর নিকট "অসুখ হইতেছে" বলিয়া বিদায় লইয়া শকট মধ্যস্থ স্বীয় কক্ষে গিয়া শয্যায় শয়ন করিল। সর্ব্বশুদ্ধ দুই খানি সুদীর্ঘ গো-শকট ছিল। তাহার প্রধান খানিতে রাজা, রাণী ও রাজকুমার এক প্রকোষ্ঠে এবং তৎপশ্চাতের কামরার মধ্যে গুলাপী ও অপর এক প্রৌঢ়া পরিচারিকার শয়ন-স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। অপর শকটে ত্রিভুজ ও পরিচারকগণের স্থান ছিল। তদ্ভিন্ন কতিপয় পদাতিক পদব্রজেই সহচর ছিল।

গুলাপী ঐ যে শয়ন করিল, সে রাত্রি ও তৎপরবর্ত্তী দিন রাত্রি মধ্যে আর উঠিল না—ঘোর অচৈতন্য, মৃতাবৎ পড়িয়া রহিল—সেই সময় মধ্যে কি হইয়াছে, কিছুই জানিতে পারিল না!

সেই দীর্ঘ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া যখন চক্ষু চাহিল, তখন দেখে এক গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থান—শকটস্থ রাজপ্রকোষ্ঠে সারা রাত্রি যেরূপে আলো জ্বলিত, তাহার চিহ্নমাত্রও নাই এবং দৈবাৎ কোন কারণে সে আলোক যদি নিবিয়া গিয়া থাকে, তথাপি এত গাঢ় অন্ধকারই বা হইবে কেন? বিশেষ ইহা তো সেরূপ শয্যা নয়—চতুর্দ্দিকে হস্ত বুলাইয়া দেখে, পাষাণ তুল্য কঠিন ও শীতল স্থান, শকটস্থ শয্যার ভাব কিছু মাত্র নয় এবং নিকটে প্রৌঢ়া পরিচারিকাও নিদ্রিত নাই! তখন ভয় হইল—প্রথমে মৃদুস্বরে বলিল "এ কি? কোথায় আমি? গরু বা লোকজন কাহারই বা কোন শাড়া শব্দ নাই কেন?" কোন উত্তর না পাইয়া উঠিয়া বসিল—এদিক্ ওদিক্ হাত বাড়াইয়া আবার

ভালরূপে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল! বুঝিল, ইহা একটী কারাগার, কি পর্ব্বত গুহা!

ত্রিভুজ সেই ভীষণ পর্ব্বত-গহ্বরের অন্যত্র শয়ান ছিল, চীৎকার শব্দে জাগরিত হইয়া "ভয় কি? ভয় কি?" বলিতে বলিতে নিকটে আসিয়া গুলাপীকে আশ্বাস দিল, কিন্তু নিঃশঙ্ক করিতে পারিল না। রাজরাণী, রাজকুমার ও মহারাজ কোথায়—তাহারা সেরূপ জনশূন্য ভীষণ স্থানে কেন, ইত্যাকারের ঘোর আশঙ্কা ও চিন্তায় গুলাপী উন্মাদিনীবৎ হইয়া বিস্ময়ে ও ভয়ে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। ত্রিভুজ যাহা বুঝাইল,তাহাতে গুলাপীর হৃদয় কিছুতেই প্রবুদ্ধ ও পরিতৃপ্ত হইল না—গুলাপী অজস্র কেবল রোদন করিতে লাগিল। ত্রিভুজ বুঝাইল;—"আমাদের প্রণয়-ব্যাপার রাজা জানিতে পারিয়া গত রাত্রে তুমি সিদ্ধির নেশায় অভিভূতা হইয়া পড়িলে,আমাকে ডাকিয়া যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন—এমন কি, প্রহার পর্য্যন্ত করিতেও উদ্যত। পুনঃ পুনঃ বলিলেন, তোরা দুই জনেই চলিয়া যা—তোদের মুখ আর দেখিতে চাই না। আমি প্রথমে লজ্জায় ও ঘৃণায় অবনত মস্তকে ছিলাম; পরে বিস্তর কাকুতি মিনতি করিয়া ক্ষমা চাহিলাম; তাহাতেও তিনি ক্ষান্ত না হওয়াতে ভাবিলাম, এখন স্থানান্তরে যাই, পরে যাহা হয় হইবে। এই সংকল্পে দূরে অবস্থান করিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে আর তোমাকে দূর করিয়া দিতে আদেশ দিলেন। দাস দাসীরা বোধ হয়, আমাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল, একারণ আজ্ঞামাত্রেই অপমানের সহিত আমাকে তাড়াইয়া দিল এবং তোমাকে ধরিয়া চটির প্রান্তে ফেলিয়া দিয়া আইল। তখন করি কি? চটির দোকানদারেরা সকলেই নিদ্রিত—কেহই উঠিল না। ভাগ্যবলে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলাম, তাহাদের অগ্নির নিকটে তোমাকে লইয়া রাত্রি কাটাইলাম, নতুবা বাঘে খাইয়া ফেলিত। প্রভাতেও তোমার চৈতন্য হইল না; তোমাকে সেই আম্রবনে রাখিয়া রাজ-সমীপে পুনর্ব্বার ক্ষমা ভিক্ষা জন্য গেলাম: গিয়া দেখি তাঁহারা রাত্রি সন্ধেই চলিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসীরা বন্ধুভাবে বলিলেন 'আমাদের সঙ্গে আইস।' তাহাই করিলাম, তোমাকে বুকে তুলিয়া আমার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া চলিলাম। লজ্জায় লোকালয়ে না গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে বনে বনে বহুকষ্টে সমস্ত দিন কাটাইয়া শেষে এই খানে আইলাম। তোমাকে খাওয়াইবার অনেক চেষ্টা করিলাম,সরবৎভিন্ন আর কিছুই খাওয়াইতে পারিলাম

না। আপনি কিঞ্চিৎ আহার করিয়া দ্বারে পাথর চাপাইয়া শুইয়া পড়িলাম। সন্ন্যাসীরাও এই গুহায় ছিলেন; বোধ হয় রাত্রি শেষ হওয়াতে এবং আমাদিগকে অচৈতন্যবৎ নিদ্রিত দেখাতে না বলিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, একটু পরেই প্রভাত হইবে, হইলেই আমরাও যাইব—বল তো কলিকাতার দিকে তাঁহাদেরই পশ্চাতে যাইব। কিন্তু আমি তো রাজার যে ভাব দেখিয়াছি, তাহাতে সে আশা আর বৃথা! আমার বিবেচনায়, আর তাঁহারা আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন না—করিলেও সেই পূর্ব্ব মান এবং পূর্ব্ব বিশ্বাস আর পাওয়া যাইবে না—অতএব চল, কোন ভাল সহরে গিয়া দুই জনে পরম সুখে ঘরকর্ণা করি গে!

ষোড়য পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব কথা—বিদ্যাশিক্ষা—উৎসব।

তুলীন এতক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ ভাবে শুনিতেছিলেন, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না! শেষটা শুনিতে শুনিতে হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস ঘন ঘন নিঃসৃত হইতে লাগিল! তাঁহার ভাব দর্শনে সমবেদনশীলা লীলা মহা ভীতা হইল—রাণীচন্দ্রকুমারী হস্তের ইঙ্গিতে গুলাপীকে আর বলিতে নিষেধ করিলেন—গুলাপী সাহেবের মর্ম্ম বুঝিল, নিরস্ত হইল!

বহুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর, বিষাদ-গদ্‌গদ গম্ভীর স্বরে তুলীন কহিলেন "কৈ? চিহ্নের কথা তো কিছুই বলিলে না?"

গুলাপী বলিল "হুজুর! তাহাই বলিতেছিলাম। সেই যে চন্দ্রতুল্য রাজকুমারকে প্রায় চতুর্দ্দশ মাস এই দগ্ধ বুকে রাখিয়া লালন পালন করিয়াছিলাম, তাহার কক্ষদেশের পাশে পদ্ম ফুলের ন্যায় আরক্তিম জড়ুরের দাগ যেমন দেখিতাম, হুজুরের অঙ্গেরও ঠিক তেম্নি স্থলে অভিন্ন তেম্নি আকারের পদ্মজড়ুর দেখিয়াছি! তাই দেখিয়াই আপনার মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া অবাক হইয়াছি—বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রাণীজীকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, কোথায় বিলাতী সাহেব, আর কোথায় বা সেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সুদানরাজ-শিশু! কিন্তু সেই অমূল্য হারানিধির চিহ্ন আর আপনার শ্রীঅঙ্গের চিহ্নে কিছু

মাত্র যে প্রভেদ নাই, তাহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি! মুখের আকৃতির তুলনা যদিও এত যুগযুগান্তে তত ঠিক করিয়া বলা যায় না—বলিলেও কেহ প্রত্যয় করিবে না—কিন্তু আমার মনে তিলেকের তরেও সন্দেহ নাই! আহা, সেই মুখ, সেই চক্ষু, সেই নাক, সেই কপাল, সেই সব যেন কেহ তুলিয়া আনিয়া ডাগর করিয়া আপনার শরীরে দিয়াছে! আমার একটী প্রবল প্রমাণ আছে; সেইটী এখন আমার স্মরণ হইল। সেই রাজপুত্রের দক্ষিণ পদের কনিষ্ঠাঙ্গুলি বামপদের কনিষ্ঠাঙ্গুলির অপেক্ষা কিছু বড় ছিল—তজ্জন্য স্দান-রাজমহিষী কতই অসুখী হইতেন—বলিতেন, 'বিধাতা বুঝি জগতে কিছুই নিখুঁত করিয়া গড়েন না, নতুবা আমার বাছার সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণভাবে সুগঠন করিয়া এখানেই বা একটু খুঁত করিয়া দিবেন কেন?"

এই সময় লীলাবতী ব্যস্তা হইয়া সলজ্জ মৃদুস্বরে বলিয়া ফেলিলেন "আপনার পা খুলিয়া কেন দেখুন না! আমরা নয় ওঘরে যাই—" বলিয়াই উঠিতে উদ্যতা। তুলীন সস্নেহে হাত ধরিয়া বসাইয়া অস্পষ্ট স্বরে কহিলেন "খুলিয়া দেখিতে হইবে না, আমার জানাই আছে, সেইরূপই বটে!"

পুনর্ব্বার গৃহটী নিস্তব্ধ—সকলেই নীরব। তুলীন স্বীয় রুমাল লইয়া মুখ ঢাকিলেন—বীর তুলীন কাঁদিতে লাগিলেন—স্ত্রীগণ সমক্ষেই কাঁদিতেছেন—হৃদয়ের উচ্ছ্বাস-তরঙ্গ ভয়ানক—সে বেগ সম্বরণ কাহার সাধ্য!

রাণী চন্দ্রকুমারীও নীরবে কাঁদিতেছেন—কাহারো দুঃখ তাঁহার সহে না! লীলাও কাঁদিতেছে—কেন তা জানে না! গুলাপী কাঁদিতেছে না—গুলাপী যেন শুষ্ক কাষ্ঠবৎ অসাড়—কেন তাহা মনোস্তত্বজ্ঞ বুধেরাই বলিতে পারেন, আমরা জানি না!

কাঁদিতে কাঁদিতে চন্দ্রকুমারী উঠিলেন; ধীরে ধীরে গিয়া তুলীনের হাত ধরিয়া মৃদু-মধুর রবে বলিলেন "বাবা! তোমার ন্যায় মহাপুরুষের চক্ষে জল দেখিয়া বুক ফাটিয়া যায়! বৎস! ক্ষান্ত হও—তোমার ন্যায় মহাপুরুষ যে রাজপুত্র হইবেন, বিচিত্র কি? রাজবংশে জন্ম না হইলে কি এমন সুশাসন—এমন প্রজাপালন—এমন রামরাজ্য করিতে পারিতে? গুলাপী যা বলিতেছে, আমরা কয়দিন যা অনুমান করিতেছি, তা যদি সত্য হয়, তবে ভালই তো—সে জন্য এত দুঃখই বা কি? তোমার কিসের অভাব—লোকবল, বাহুবল, রণ-কৌশল, সবই আছে; পিতৃরাজ্য দূরে নয়; দুষ্ট দুষ্‌মনেরা ভোগ করি-

তেছে—ছারখার করিয়া ফেলিতেছে! নিজ ভুজপ্রতাপে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া সুখে রাজত্ব কর! আমাকে যে এত অনাথিনী কাঙালিনী দেখিতেছ, এখনও কাংরার লোক আমাকে এত ভক্তি করে, আর তোমার উপর তাহাদের যে শ্রদ্ধা, তাহাতে আমি আর তুমি এক কথা বলিলেই তৎক্ষণাৎ তোমার জন্য তাহারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইবে—যেখানে বলিবে সেই খানেই যাইবে—তুমি মনে করিলে আর আমি বলিলে কা'লই তুমি কাংরার স্বাধীন রাজা হইতে পার, তাহার পর পিতৃরাজ্য উদ্ধার তো তোমার পক্ষে সহজ কথা!”

ফুলীন রুমালে চক্ষু মুছিয়া রুমাল তুলিয়া চাহিয়া দেখেন, লীলার চক্ষে জলধারা! আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া বসিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন “ছি, দিদি, আর কেন? এই দেখ, আমি হাসিতেছি!”

লীলাও চক্ষু মুছিল—লীলাও হাসিল!

ফুলীন রাণীজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন “না, মা, ওরূপ কথা আর মুখে আনিবেন না—আমি বিশ্বাস-ঘাতক বিদ্রোহী হইব না—যাঁহার রুটি খাইতেছি, তিনি যাহাই হউন, তাঁহার দয়ার পরিবর্ত্তে অকৃতজ্ঞতা দেখাইব না—আশীর্ব্বাদ করুন, সে প্রবৃত্তি যেন তোমার সন্তানের মনে কখনো উদয় না হয়! আমি মা, রাজ্য কি রাজত্বের জন্য কাঁদি না—আমার রোদনের, মা, বড় নিগূঢ় কারণ আছে—এখনি তা শুনিতে পাইবেন—আপনি আমার মা, লীলা আমার প্রাণের ভগ্নী, গুলাপী আমার প্রাণদাতা দ্বিতীয়া জননী, এখন এ পৃথিবীতে আপনাদের মত ব্যথার ব্যথী হিতৈষিণী আর আমার কেহই নাই—আপনাদের নিকট কোন কথাই গোপন করিব না—আমার মর্ম্মান্তিক দুঃখের কান্না তোমাদের কাছে কাঁদিব না তো কাহার নিকট কাঁদিব! গুলাপী যত কথা কহিল, আমার মনে প্রাণে সমস্তই সত্য বোধ হইল—যদি ঘুণাগ্রে বুঝিতাম যে, সিদ্ধি বটিকার কথা মিথ্যা এবং সেই ভয়ানক রাত্রের ঘটনায় সে লিপ্ত ছিল, তবে আর কথা কওয়া দূরে থাকুক, এতক্ষণ কি কাণ্ড বাঁধাইতাম, তাহা দেখিয়া তোমরাও অবাক্ হইতে—ভয়ে কাঁপিতে! কিন্তু ধর্ম্ম আর ঈশ্বর জানাইয়া দিতেছেন, গুলাপী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী—সে যাহা বলিল, তদ্ভিন্ন অন্য আর কিছুই জানে না! তাহা না হইলে—সে আপনাকে মনে মনে দোষী বলিয়া জানিলে, আমার অঙ্গের চিহ্ন দেখিয়া এরূপ ব্যবহার করিত না—কিছুই প্রকাশ করিয়া বলিত না, বরং চিকিৎসার ছলে আমাকে মারিয়া ফেলিত!

অতএব যদিও গুলাপী একজন নর-রাক্ষসের প্রতারণা জালে পড়িয়া তাহার সহিত পাপ করিয়াছে, কিন্তু সে পিশাচের নিদারুণ পৈশাচিক বৃত্তির সহকারিণী বা ভাগিনী হওয়া দূরে থাকুক, তাহার অমানুষিক স্বভাব ও ভয়ানক ভাব সে কল্পনাতেও অনুভব করিতে পারে নাই! তাহার আর ত্রিভুজের পরবর্ত্তী ইতিহাস আমি শুনিতে চাই না—কিয়ৎকাল ভোগতৃপ্তির পর সে নারকী নর যে উহাকে নির্দ্দয়রূপে বর্জ্জন করিয়া গিয়াছিল অথবা উহার প্রতি আরো কোনরূপ অসম্ভব নিষ্ঠুরাচরণ দেখাইয়াছিল, তাহা আর পরিচয় দ্বারা জানিতে হইবে না! তৎপরে গুলাপী যে অনুতাপে দগ্ধা-হরিণীবৎ অর্দ্ধ উন্মাদিনী ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—সাধ্যমতে লোকের হিতই করিতেছে, তাহাও কেহ না বলিয়া দিলেও বুঝিতে পারিতেছি! ভুল ভ্রান্তি সকলেরই হয়—যাহার মহদন্তঃকরণ, সে সেই ভুল বুঝিবামাত্র পুনর্ব্বার পবিত্র পথে যাইতেই চেষ্টা করে! গুলাপীর হৃদয় মহৎ, দুরাত্মাদের দৌরাত্ম্যে স্থানভ্রষ্ট ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছিল মাত্র—অশেষ যন্ত্রণার পর শেষে সুযোগ পাইবা মাত্র আবার সেই মহৎ হৃদয় সুদান-রাজসংসারে আসিয়া মহৎ পথেই দাঁড়াইয়াছিল! এ সংসার সয়তানপূর্ণ, পুনর্ব্বার এক সয়তান তাহাকে সয়তানি-চক্রে ফেলিয়া পেষণ করিল; তথাপি হৃদয়ের মহত্ত্বগুণে গুলাপী সম্পূর্ণ চূর্ণ না হইয়া আবার মহত্ত্বের পবিত্র মন্দিরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে! অতএব আমি এত অবোধ নই যে, এমন মহৎ হৃদয়-বতী দুর্ভাগা কামিনীকে অমন সয়তানের সহযোগিনী ভাবিব!"

দুলীন এই বক্তৃতাটী রাণী চন্দ্রকুমারীকে সম্বোধন করিয়াই বলিতে আরম্ভ করেন—প্রথম স্তবক পর্য্যন্ত তাহাও করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষের স্তবকটী অন্যমনস্ক ভাবে যেন স্বগত রূপেই ব্যক্ত করিলেন। অতি ধীরে বলাতে দীর্ঘ সময়ও লাগিল।

গুলাপী যে কষ্ঠ-পুত্তলিকা ছিল, তাহাই রহিল! বক্তৃতা কালে লীলার নয়ন যেন নির্নিমেষ হইয়া দুলীনের (রোগে শোকে শীর্ণ ও বিবর্ণ) মুখ পানে এক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল—লীলার ললাটে, গণ্ডে, নেত্রে ও মধুরাধরে বক্তার প্রতি অনুরাগ যেন মাখা রহিয়াছে, ইহাই প্রকাশ পাইল!

চন্দ্রকুমারী পুনশ্চ বলিলেন "বাবা! রাজা বিক্রমজিৎ আমার শ্বশুরের পরম বন্ধুর পুত্র—বিক্রমের পিতার সহিত আমার শ্বশুরের সখ্য এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধই

ছিল! সেই জন্যই আমার স্বামী অনুত্রাদ চাঁদকে রাজা বিক্রমজিৎ দাদা এবং এ অভাগিনীকে বিক্রম-মহিষী দিদী বলিয়া ডাকিতেন! হায়, কত পুরাতন নির্ব্বাপিত আগুন আ'জ্ আবার দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিতেছে! সেই প্রিয় ভগ্নী নর্ম্মদাসুন্দরী পুত্রবতী হইলে আর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ ঘটে নাই—পুত্রের পৃথিবী দর্শনের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদিগকে বিপদে ঘেরিয়াছিল—আমাদিগকে তখনও ঘিরে নাই! আহা বৎস! তবে যথার্থই কি তুমি সেই ভু-দেবী নর্ম্মদাসুন্দরীর পুত্র? তুমি কি তবে এত কাল এ পরিচয় জানিতে না? তবে কি তাঁহাদের ক্রোড়ে তুমি পালিত হও নাই? তবে কি অকস্মাৎ তাঁহাদের কোন দৈব বিপাক ঘটিয়াছিল? না, কোন অনির্ব্বচনীয় অনিবার্য্য কারণে কোন সাহেবের হস্তে তুমি সমর্পিত হইয়াছিলে? বল, বল, বাবা, মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে! প্রিয় ভগ্নী-পুত্র—প্রিয় সখী-পুত্র—প্রিয় দেবর-পুত্র বলিয়া তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে প্রাণ যেন ব্যগ্র হইতেছে—একবার মাত্র একটী 'হাঁ' বলিয়া সন্দেহ ভঞ্জন কর!"

তুলীন দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত "হাঁ মা তাই!" বলিয়া ত্রস্ত হইয়া হিন্দু-প্রথানুসারে উঠিয়া মাতৃ-সখীর (বাঙ্গালী হইলে মাসী-মা বলিতেন) চরণ বন্দন করিলেন—মাতৃ-সখী অমনি যেন হারাধন পাইয়া সজল নেত্রে আলিঙ্গন ভাবে ধারণ পূর্ব্বক শিরোশ্চুম্বন করিয়া দুর্ব্বল রোগীকে পুনর্ব্বার শয়নার্থ অনুরোধ জানাইলেন—তুলীন সে অনুরোধ রাখিবার পূর্ব্বে সত্বর পদে লীলাকে "ভগ্নি, ভগ্নি" বলিয়া ধারণ ও শিরোশ্চুম্বন কারলেন—তখনই অমনি গুলাপীর কোলে ছুটিয়া গিয়া বাহুদ্বারা কণ্ঠ-বেষ্টন পূর্ব্বক বাষ্প ভারাক্রান্ত স্বরে বলিলেন "মা! এই বুকে বৎসরাধিক মানুষ হইয়াছি—সাহেবি ধরণ দূর হ—গর্ভধারিণীকে দেখিয়া জন্ম সার্থকতো করিতে পাইবই না, তুমি দ্বিতীয়া জননী—প্রাণরক্ষাকারিণী, আ'জ্ তোমাকে পাইয়াও কতক দুঃখ নিবারণ হইল!"

গুলাপী কাষ্ঠ বা লৌহপুতলী ছিল, এখন গলিল—কেবলই অশ্রুধারায় পালিত পুত্রের সর্ব্বাঙ্গ ভিজাইয়া দিল—দেশ, কাল, পাত্র ভুলিয়া যেন সেই পদ্ম জড়ুর-বিশিষ্ট শিশুকেই আবার কোলে পাইয়াছে, এই ভাবে পুনঃ পুনঃ বদন চুম্বন করিল এবং ভয়ানক বিভ্রম-জনিত মোহে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বিলাপ-স্বরে প্রলাপ বকিতে লাগিল! প্রলাপের ভাব এই:—"আহা, বাছা, দুষ্ট লোকে আমার কাছ থেকে তোমায় কাড়িয়া লইয়া গিয়াছিল—আহা, বাছা, তোর চাঁদ মুখ-

খানি মনে পড়িত, আর বুক ফাটিয়া যাইত—আহা, বাছা, যেখানে যে ভাল খেলেনাটী পাইয়াছি, তোর জন্যে রাখিয়াছি—আহা, বাছা, অমুক স্থানে, অমুক সময়ে, অমুক অবস্থায়—” ইত্যাদি! সেই সকরুণ প্রলাপের মধ্যে গুলাপীর ত্রিভুজাধীন জীবনের এবং তৎপরবর্ত্তী সময়ের বহু বহু ঘটনাবলীর বিবরণ শ্রুত হইল! ক্রমে সে প্রলাপ বিষম হইয়া উঠিল—শ্রোতৃগণের ভয় হইল, বুঝি বা গুলাপী এই সূত্রে জ্ঞান হারাইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে বাতুল হইয়া উঠে!

ডুলীন অনেক বুঝাইলেন—লীলার মা অনেক বুঝাইলেন—শেষে লীলা তাহার গলা জড়াইয়া যখন কাঁদিতে লাগিল, তখন কিছু সুস্থা ও প্রকৃতিস্থা হইতে পারিল! রাত্রি অধিক হইয়া উঠিল, ডুলীনের পিতা মাতার শেষাবস্থার কথা সে দিন আর হইল না। রাণী চন্দ্রকুমারী ডুলীনের পীড়াবৃদ্ধির ভয়ে শঙ্কিতা হইয়া তাঁহাকে শয়নার্থ অনুরোধ করিয়া মায়ে ঝিয়ে গুলাপীকে ধরিয়া লইয়া আপনাদের অন্তঃপুরে গেলেন। ডুলীনের গৃহ হইতে অন্তঃপুর অতি নিকট—একটী বারাণ্ডা ও একটী ছাদ পার হইলেই যাওয়া যায়। তথায় গিয়া গুলাপীর মস্তকে তৈল জল প্রদানাদি বিস্তর সেবা শুশ্রূষা ও ঔষধ পথ্য বিধান দ্বারা শেষ রাত্রে তাহাকে ঘুম পাড়াইলেন—রাণী কন্যাকে শয়নে পাঠাইয়া স্বয়ং গুলাপীর নিকট বসিয়া প্রহরিতা করিতে লাগিলেন।

পর দিন রজনীতে ডুলীন গামছা-মোড়া-কর্ত্তৃক আপন পিতা মাতা প্রভৃতির লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপার এবং আপনি যেরূপে কর্ণেল ড্বোলীন সাহেব কর্ত্তৃক লালিত পালিত হইয়াছিলেন এবং কাহারা আগমন পর্য্যন্ত স্বীয় জীবনের তাবৎ বৃত্তান্ত—কতক বাহুল্যে, কতক সংক্ষেপে—বর্ণনা করিলেন। শ্রোতৃত্রয় কখন হা হতোস্মি, কখন রাগ, কখন বিস্ময়, কখন হর্ষ, কখন বিষাদ, কখন ঘৃণা ইত্যাদি যখনকার যে ভাব সঙ্গত, তাহা প্রকাশ পূর্ব্বক ক্রমে যেন আরো অধিক পরিমাণে ডুলীনের ব্যথার ব্যথী হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ সেই দীর্ঘ ইতিহাস আকর্ণনে লীলা নিতান্ত অধীরা আত্ম-হারা হইয়া মহাকবি সেক্ষপীয়রের দেস্‌দেমোনার ন্যায় আপন অজ্ঞাতসারে ওথেলো রূপী ডুলীনের গুণপক্ষপাতিনী ও তৎপ্রতি যার পর নাই অনুরাগিণী হইয়া পড়িল! সরলা বালা যদি নিজ হৃদয় পরীক্ষা করিতে জানিত, তবে হয় তো আপন অবাধ্য হৃদয়কে জন্মের মত বিক্রীত হইতে দেখিয়া পরিণাম-ভয়ে মহা ভীতা হইত!

সকলের সব বলা ও শুনা হইয়া গেলে ডুলীন জিজ্ঞাসিলেন, “বুড়ী মা!

সুচেৎ সিংহের দুর্ব্বৃত্ত রক্ষিগণের হস্ত হইতে প্রাণের ভগ্নী লীলাকে কিরূপে উদ্ধার করিলে ?"

বুড়ী মা বলিল "বাবা! সে অনেক কথার কথা ; কেবল এইটী বলিলেই বুঝিতে পারিবে যে, শিখ জাতি বড়ই নরাধম, বড়ই পামর, বড়ই কৃতঘ্ন, বড়ই বিশ্বাস-ঘাতক—তাহারা স্বার্থই বুঝে—তাহারা অর্থ পাইলে না পারে আর না করে এমন কর্ম্মই নাই! পরম ভাগ্য যে, আমার কাছে কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল। দুরাত্মারা যে পথ দিয়া লীলাকে লইয়া যাইতেছিল, সেই পথের ধারেই আমার বাস। তৎসন্নিহিত সহর মধ্যে গাছ গাছড়া ঔষধাদি বিক্রয় দ্বারা এবং রোগ ভাল করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতাম, একটা পেট বৈ তো নয়, সে পক্ষে যথেষ্ট হইয়া ও গরীব দুঃখীকে কিছু কিছু সাহায্য করিয়াও টাকা বাঁচিত—নিকটস্থ বনের মধ্যে তাহা পুতিয়া রাখিতাম।

"একদা ঐ বনে গাছড়া কুড়াইতেছি, দেখি রোদনবতী লীলাকে লইয়া তিন চারি জন সৈনিক ও এক শিখ কর্ম্মচারী (গোল্লায় যাউন!) বিশ্রামার্থ তন্নিকটে বসিল। আমার ঐ কর্ম্মচারীর সহিত, পূর্ব্বে যখন লাহোরে ছিলাম, তখনকার আলাপ ছিল। অন্য সময় হইলে দেখা দিতাম না, পলাইতাম। কিন্তু লীলাকে দেখিবা মাত্র চিনিলাম—চিনিবা মাত্র শরীর লোমাঞ্চ হইল। তখনই মনে মনে উদ্ধারের উপায় স্থির করিয়া দুরাত্মাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া ফল মূল জল আনিয়া দিলাম। তাহারা মহা সন্তুষ্ট হইল এবং নিকটে ডুলি বেহারা পাওয়া যায় কিনা জিজ্ঞাসা করিল। কর্ম্মচারী আমাকে চিনতে পারিয়া আমার দুরবস্থার নিমিত্ত আপশোষ করিতে লাগিল।

"আমি তাহাকে গোপনে লইয়া বিনয় পূর্ব্বক বলিলাম 'তুমি যদি দয়া কর, তবে আমার দুরবস্থার অবসান হয়। আমার কিছু টাকা আছে, কয় জনে তাহা লইয়া যদি এই বালিকাটীকে আমায় দেও, তবে উহাকে কাঞ্চনী করিয়া আপন দুঃখ দূর করি!' বাবা! লীলার পবিত্র নামের সঙ্গে অপবিত্র কাঞ্চনী নামটা যুক্ত করাতে আমি যেন কত পাপ করিলাম এম্নি বোধ হইল—আমার জিহ্বা যেন পুড়িতে লাগিল—সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু কি করি—সে ছল ভিন্ন অন্য উপায় তখন পাইলাম না।"

দুলীন। সে যাহা হউক, তাহার পর কি হইল ?

গুলাপী। প্রথমে পাপাত্মারা সম্মত হয় না, শেষে অনেক বলাতে এবং

কেহই ইহা জানিতে পারিবে না. বুঝাইয়া দেওয়াতে ধন-লোভী বিশ্বাসঘাতকেরা পরামর্শ পূর্ব্বক হো হো করিয়া হাসিয়া বলাবলি করিতে লাগিল যে, "মন্দ নয়, কাংরার রাজকন্যা নাচনেওয়ালী হবে, এ কাব্য মন্দ নয়!" পাপিষ্ঠেরা এইরূপে হাস্য পরিহাস করিবার পর আমাকে বলিল, "দে তবে এক শত টাকা দে—এক পয়সা কমে হবে না।" দুরাত্মাদের পরিহাস শুনিয়া সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতে লাগিল। কি করি, বনে গিয়া টাকা তুলিয়া গণিয়া দেখি, সাত টাকা কম হইল। তাহাই দিয়া হাতে পায় ধরিয়া প্রাণময়ী লীলার উদ্ধারে সমর্থ হইলাম। আর এক স্থানে আরো কিছু পোতা ছিল, তাহা আর পাপিষ্ঠদের দেখাইলাম না। গমন কালে দুর্জ্জনেরা শাসাইয়া গেল, "যদি এ কথা প্রকাশ হয়, তবে তোরে আর ওরে এক খাদে পুতে ফেলব!" আমি গোপন রাখিবার জন্য বার বার শপথ করিলে দুরাত্মারা চলিয়া গেল। তখনি তথা হইতে লীলাকে লইয়া পলাইলাম, কিছু কাল গোপন রাখিয়া সুযোগমতে বিশ্বাসী লোকের শকটে করিয়া মায়ের কাছে আনিয়া দিলাম।"

* * * * * * *

দুলীন ক্রমে সুস্থ ও সবল হইতে লাগিলেন। কিন্তু শরীরের এত শোণিতক্ষয় হইয়াছিল ও তজ্জন্য এত দৌর্ব্বল্য ঘটিয়াছিল যে, প্রায় দুই মাস কাল বাহির হওয়া কিম্বা কাজকর্ম্ম করা সম্ভব হইয়া উঠিল না। কেবল পুরী মধ্যে থাকিয়া যতদূর তত্ত্বাবধান ও কর্ত্তব্য বিধান সম্ভব—বিশেষতঃ দেহের পুষ্টি-বিধায়িনী গুলাপী ও মনের পুষ্টি-বিধায়িনী লীলা যত টকু করিতে দিত—তত দূরই হইত!

ভিন্নাবস্থায় এই দুই মাস কাল গৃহমধ্যে অবস্থান দুলীনের পক্ষে কত কষ্টকর হইত, তাহা পাঠক বুঝিতেই পারিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় সেই দীর্ঘ কালের রুগ্ন-শয্যা সুখ-শয্যাই হইয়াছিল! কখন বা গুলাপীর মুখে নানা প্রদেশের, নানা লোকের, নানা ঘটনার কথা শুনিতেন; কখন বা রাণী চন্দ্রকুমারীর মুখে জানিয়া লইতেন, কিরূপে দুষ্ট শিখেরা ছলে কৌশলে কোট কাংরা হস্তগত করে, ছল ভিন্ন এ দুর্ভেদ্য দুর্গ শুদ্ধ বল-প্রকাশে কখনই লইতে পারিত না—অধিক কি, স্বয়ং দিল্লীশ্বর আক্‌বর কাংরা দুর্গ এক বৎসর অবরোধে রাখিয়াও বিফল হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন! কিরূপে বাহুবল অপেক্ষা কেবল মন্ত্রণা, গৃহভেদ ও উৎকোচাদি দ্বারাই কুচক্রী রণজিৎ পার্ব্বত্য অঞ্চল বশীভূত করিয়াছে, ইত্যাদি বিবিধ দুঃখের গল্প

দৃষ্টান্ত সহিত শুনিতেন; কখন বা (ইহাই অধিক) লীলার সহিত বহুবিধ মনোহর সদালাপে মুগ্ধ হইয়া কোথা দিয়া সময় কাটিতেছে, জানিতেও পারিতেন না! মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত বিষয়ে সুশিক্ষিতা গুলাপীর গান শুনিয়া সুখী হইতেন এবং মধ্যে মধ্যে অশিক্ষিতা কিন্তু কোকিল-কণ্ঠী লীলার মধুমাখা গানে বংশী-স্বরাহত কুরঙ্গের ন্যায় অবশ হইয়া পড়িতেন! লীলার হাব ভাব ও সরল সৌন্দর্য্যের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুতরাং তেমন শ্রীমুখের স্নেহানুরাগ-মিশ্রিত সরল সঙ্গীতের নিকট স্বয়ং উর্ব্বশীর গানও দুলীনের কর্ণে যে অকিঞ্চিৎকর, তাহাও কি আর বলিয়া দিতে হইবে?

সেই দুই মাস মধ্যে আর একটী বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য কার্য্য হইল, অথবা কাজটী আরব্ধ হইয়া নিয়মিতরূপে প্রাতনিয়ত চলিতে লাগিল—লীলার বিদ্যাভ্যাস! লেখা পড়া শেখা অতি কর্ত্তব্য, লীলার মাতাকে দুলীন বুঝাইলেন—লীলাও এই উপলক্ষে সর্ব্বদা গুরু মহাশয়ের কাছে থাকিতে ও কথা শুনিতে পাইবেন, অন্তরের এই গুপ্ত আহ্লাদেই কর্ত্তব্য বলিয়া প্রথমে বুঝিলেন! ক্রমে অধ্যাপকের সরস অধ্যাপনা ও অধীত বিদ্যার প্রতিও সমভাবে আসক্তি দেখাইতে লাগিলেন! প্রথমে উর্দ্দু আরব্ধ হয়, কিন্তু তাহাতে দুলীনের মনোমত পাঠ্য গ্রন্থ না থাকাতে বিশেষতঃ তাঁহার অবলম্বিত অদ্বৈতবাদ ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা-সাহায্য হয় না দেখিয়া দুলীন আকুল হইলেন। তিনি যৎকালে কলিকাতায় থাকিতেন, তখন আর্য্য-গৌরব রাজা রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা হইয়াছিল—সুযোগমতে সর্ব্বদাই একত্রে ধর্ম্মালোচনা করিতেন। এক্ষণে স্মরণ হইল যে, লীলাকে বাঙ্গালা শিখাইতে পারিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা সহজেই হইতে পারিবে। অতএব প্রথমে চৈতনকে শিক্ষক করিবার প্রস্তাব তুলেন, লীলা অসম্মতা হওয়াতে নিজে হস্তাক্ষর বর্ণমালাদি প্রস্তুত করিয়া শিখাইতে লাগিলেন এবং রাজা বাহাদুরকে প্রথম শিক্ষণীয় বর্ণমালা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় যত ভাল পুস্তক হইয়াছে, তত্তাবৎ পাঠাইবার নিমিত্ত কলিকাতায় পত্র লিখিলেন। তজ্জন্য লুধিয়ানায় তাঁহার লোক অপেক্ষা করিয়া রহিল। রাজা রামমোহন স্কুলবুক-সোসাইটী-কর্ত্তৃক নবপ্রকাশিত পাঠ্য পুস্তকাবলী ও অন্যান্য উচ্চতর এবং স্বীয় লেখনীপ্রসূত সমস্ত গ্রন্থনিচয় মহানন্দে প্রেরণ পূর্ব্বক ক্রমশঃ আরো পাঠাইবার বিধান করিয়া দিলেন। তাহাতেই লীলা বিদ্যাবতী ও নবধর্ম্মে দীক্ষিতা হইতে লাগিল!

ডুলীন সেই দুই মাসে সম্পূর্ণ সবল হইয়া উঠিলেন ; তথাপি তেমন দেববাঞ্ছিত পবিত্র সুখ ফেলিয়া শীঘ্র বাহির হইতে তাঁহার প্রাণ বড় ইচ্ছুক নয় ! কিন্তু কি করিবেন, প্রত্যহ নানা গোলযোগের সংবাদ, সুতরাং সুখের আলস্যে কাল কাটাইতে আর সক্ষম হইলেন না !

যে দিন বাহির হইবেন, তাহার পূর্ব্ব রাত্রে হাকিম সিংহকে আদেশ দিলেন, প্রাতে সর্ব্ব সৈন্য যথা রীতিক্রমে দণ্ডায়মান হয়, তিনি সামরিক অভিনয় পরিদর্শন করিবেন। সকলেই পরমোৎসাহে আর পরমাহ্লাদে শ্রেণীবদ্ধভাবে ভাগে ভাগে যার যে স্থানে দণ্ডায়মান হইল। ডুলীন আসিবা মাত্র যার পর নাই আগ্রহে প্রাণ ভরিয়া জয়-ধ্বনিতে বার বার কাংরা দুর্গ নিনাদিত করিল ! ডুলীন সহর্ষে পদানুসারে সকলের সহিত প্রীতি-পূরিত সম্ভাষণাদি করিলেন। দেখিলেন, ইতর ভদ্র, ছোট বড়, সমস্ত সৈনিকগণই তাঁহাকে সুস্থ শরীরে পুনর্ব্বার পাইয়া যথার্থই অপরিমেয় পুলক প্রাপ্ত হইয়াছে— সকলেরই উৎসাহের সীমা নাই—যাহারা মনে মনে দ্বেষ-হিংসা-পরায়ণ, তাহারাও তখন সাধারণ আনন্দে যোগ না দিয়া থাকিতে পারিল না ! ডুলীন তাহাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই চিনিতেন, সুতরাং তাহাদিগের কপটোৎসাহ তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টির অগোচর রহিল না। সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের সংখ্যা তখন অতি অল্প।

পরিদর্শন হইয়া গেলে ডুলীন হর্ষোৎফুল্ল বদনে প্রকাশ করিলেন, তাঁহার স্বাস্থ্য-লাভোপলক্ষে অদ্য রজনীতে সকলকেই একটী মহা ভোজ দিবেন এবং সৈনিক ও ভৃত্যবর্গ তাবতেই সেই আমোদে আমোদী হয়,ইহাই তাঁহার ইচ্ছা !

এই নিমন্ত্রণ শুনিবা মাত্র পুনর্ব্বার জয়নাদ উচ্চারণ পূর্ব্বক সকলেই মহানন্দে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল।

রজনীতে ঘোর ঘটা—দীয়তাং ভোজ্যতাং—কেবলই দেও দেও, খাও খাও, আর চাই আর চাই, আর চাই না আর চাই না, এইমাত্র কলরব ! পোলাও, কাবাব, পুরী, তরকারী, মিঠাই, লাড্ডু প্রভৃতির ঢালাঢালি, ছড়াছড়ি বলিলেও বলা যায় ! নৃত্যগীতামোদেরও ত্রুটি হইল না ! যে যত আমোদ পায়, সে ততই সাহেবের নিমিত্ত নিজ প্রাণদানের প্রতিজ্ঞা করিতে থাকে—এইরূপ চলিল ! "পেটে খেলেই পীঠে সয়" কথাই আছে !

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ভাবী বিপদ—উদ্যোগ।

পাঠক পাঠিকা! এক্ষণে কি আপনারা রাজ-দরবারের সংবাদ—বিশেষতঃ নন্দ সিং ও দলীন সম্বন্ধে তথায় কি কি হইতেছে, তদ্বার্ত্তা শুনিতে ইচ্ছা করেন না? অবশ্যই করেন। কিন্তু সে সব সমাচার চাঁদ খাঁর প্রেরিত পত্রাবলীতে যেমন সুচারুরূপে প্রকাশ, এমন আর কাহারও নিকট পাওয়া যাইবে না। অতএব চাঁদের আরজী গুলী হইতে সার উদ্ধৃত হইতেছে;—

"হুজুরের অমূল্য জীবন যে রক্ষা হইয়াছে এবং শিখকুত্তা নন্দ যে সমুচিত প্রতিফল পাইয়াছে, তজ্জন্য আল্লার পবিত্র নাম গৌরবান্বিত এবং গোলামের অন্তঃকরণ পুলকপূর্ণ হইয়াছে! কিন্তু দুরাত্মাকে প্রকারান্তরে লোকান্তরে পাঠাইতে পারিলেই ভাল হইত!"* এরূপে ষাঁড়ের দল না ক্ষেপাইয়া কার্য্য-সাধন পক্ষে শতবিধ গুপ্ত উপায় ছিল! আপনাদের দেশের মত দোষীকে প্রকাশ্য দণ্ড দেওয়াতে এই ফল হইয়াছে যে, যে দুরাচার নিজের নামের পর 'সিং' বসাইতে পারিয়াছে, সেই বেটাই নন্দের রক্তের বদলে সাহেবের রক্ত চাহিতেছে—বিচার বিচার করিয়া চেঁচাইতেছে! দুর্জ্জন নন্দের যে বহু বন্ধুজন আছে, হুজুর তাহা জানেন এবং তাহারা যে হুজুরের সর্ব্বনাশ পক্ষে সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতেছে ও করিবে তাহাও হুজুর বুঝিতে পারিতেছেন! যথার্থ খালসা মতাবলম্বীরা গোহত্যাকে যেরূপ অতিপাতক বলিয়া জানে এবং গোহত্যা দেখিলে কি শুনিলে যেমন শিহরিয়া উঠে, নন্দের বধকার্য্যকে ঠিক তাহারা সেইরূপ অমার্জ্জনীয় মহা অপরাধ বলিতেছে ও হুজুরের প্রতি ঘৃণা ও রাগে ফুলিতেছে!

"মহারাজা নিজে এখনও আপনার অটল বন্ধু আছেন; কিন্তু এত কুসংস্কার, কুতর্ক ও বিরাগের বেগে পড়িয়া ধৈর্য্য রাখিতে পারেন কি না, সেই ভয়ে গোলাম সর্ব্বদাই কাঁপিতেছে! যেরূপ গোলযোগ, তাহাতে গোলামের লাহোরে অবস্থান হুজুরের পক্ষে বড় আবশ্যক ও হিতজনক বোধ না হইলে

* চাঁদ খাঁ এবং আফগান জাতীয় অনেকের নীতিশাস্ত্রানুসারে শত্রুকে বাঘ বা সাপের মতন যেন তেন প্রকারে ইহলোক হইতে অবসৃত করিয়া দিতে পারিলেই হইল—তাহাতে কোন দোষ নাই!

একশত চাঙ্গা সোয়ার সঙ্গে গোলাম এতক্ষণ কোন্‌কালে শ্রীচরণ সমীপে গিয়া উপস্থিত হইত।

"সময়টী পড়িয়াছে বড় বিপরীত, বড় মন্দ, বড় কঠিন। রোগ হইলে উপশম করা যাইবে, ইহা না ভাবিয়া যাহাতে রোগ জন্মিতে না পারে, পূর্ব্বাহ্ণে তচ্চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। এই বিবেচনাতেই কি শত্রু, কি মিত্র, সকলকে মিষ্ট কথার সহিত আর্থিক পূজা দিতে গোলাম ত্রুটি করিতেছে না! যদি শত্রুকে নিরস্ত্র করা যায়, তবে আর মিত্রকে বড় দরকার করে না এবং মিত্রদলকে সুসজ্জিত করিয়া রাখিতে পারিলেও শত্রুকে নিরস্ত্র করা বড় একটা বেশী ভার বোধ হয় না!"

চাঁদের দার্শনিক ও নৈতিক পাণ্ডিত্য পড়িয়া দুলীন দুঃখের মধ্যেও কৌতুকের হাসি না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না! হাসিয়া আবার পড়িতে লাগিলেন ;—

"সে যাহা হউক, অধীনের বিনীত প্রার্থনা, হুজুর যেন একতিলও অসতর্ক বা অপ্রস্তুত না থাকেন—বিপক্ষেরা চতুর্দ্দিকে টাকা ঢালিতেছে—সর্ব্বোচ্চ বিপক্ষও নাকি এই সুযোগে কাংরার শাসনভার আপনাদের হস্তে আনিবার বিশেষ চেষ্টায় আছে—অধিক কি সুচেৎ সিংহ চুপে চুপে সসৈন্য হুজুরের দিকে চলিতেছে এবং বড়টীর নামে নানা দিক্ হইতে সৈনিক বিভাগ সকলকে কাংরা অঞ্চলে গিয়া তাহার সহিত মিলিবার আদেশ পাঠাইতেছে—অভিপ্রায়, কাংরায় পৌঁছিতে পৌঁছিতে এ দিকে তাহার দাদা মহাশয় মহারাজকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া বা ছল বল করিয়া হুজুরের অপমানজনক রোকশোধের পরওয়ানা বাহির করিতে পারিবেন!

"এখনই তাহার সূত্রপাত হইতেছে। অদ্য সভা ভঙ্গের পূর্ব্বে যখন আর সকলে উঠিয়া গেলেন, কেবল বিশ্বাসী মন্ত্রী প্রভৃতি জনকত উচ্চ পদস্থ লোক মাত্র ছিলেন, তখন গৃহের বাহির হইতে আমরা উচ্চরবের তক্‌রারাদি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। শেষে মহারাজ ইহা পর্য্যন্ত বলিলেন যে, সাহেব যাহা যাহা করিতেছে, সব ঠিক কাজ, কেবল এইমাত্র ভুল যে, পূর্ব্বাহ্ণে আমাকে এত্তালা করিয়া পাঠায় নাই। যাহা হউক, আমার এমন গুণের চাকর যদি সকলে হয়, তবে সৌভাগ্য বলিয়া মানি—যে ব্যক্তি সকলের প্রতিই সমান বিচার করে, যে ব্যক্তি হস্ত-পদ-নাসা-কর্ণচ্ছেদের নিষ্ঠুর দণ্ডাজ্ঞা দেয় না

এবং যে ব্যক্তি দণ্ডদানচ্ছলে কাহারো সর্ব্বস্ব লুটিয়া পুটিয়া লয় না, এমন কর্ম্মচারী আবার মন্দ ?'

"মহারাজার স্বর উচ্চ ও উত্তেজিত। মন্ত্রিগণও প্রায় সেইরূপ উগ্রভাবে কথা কহিতেছিল।* ধ্যানসিংহ রাগতভাবে মহারাজকে ইঙ্গিতে এমনও বলিল যে, তিনি স্বজাতীয়ের রক্ষক না হইয়া বরং বিশ্বাস-ভঙ্গকারী হইলেন! এরূপে বিধর্ম্মীর সন্তোষার্থ স্বধর্ম্মীর অনিষ্টকারী হওয়া কি তাঁহার উচিত ? রণজিৎ সে কথা যেন শুনিতে পান নাই, এমনি ভাব জানাইয়া কহিলেন 'সাহেব যদি ক্ষমতা বহির্ভূত কার্য্য করিয়া থাকে, তবে শীঘ্রই তাহার জরিমানা করিব!'

"হুজুর! দরবারে এখন এরূপ কাণ্ড প্রায় প্রত্যহ ঘটিবে। তাহার ফল-স্বরূপ শেষকালে একখানা পরওয়ানার বাহির হইবে। পরওয়ানার হুকুম হইবা মাত্র এ গোলাম কাংরায় ছুটিবে—পরওয়ানার পূর্ব্বেই সদলে নিকট পৌঁছিতে পারিবে, এমন ভরসা আছে। কিন্তু খোদাবন্দ! সাবধান! কদাচ সে পরওয়ানা মত কার্য্য করিবেন না! ইটী যেন স্মরণে থাকে যে, সে হুকুম মহারাজার আন্তরিক নয় এবং হুজুর যে নিজ পদ ত্যাগ করেন, ইহা তাঁহার নিতান্তই অনিচ্ছা! অতএব অমন সহস্র হুকুমনামাকেও গ্রাহ্য করিবেন না। দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি তা করেন অথবা কুচক্রীরা সেই দলিলানুসারে আপনার নিকট হইতে কাংরা যদি কাড়িয়া লইতে পারে, তবে নিশ্চিত জানিবেন আপনার প্রাণ আর তিলেকের তরেও নিরাপদ নয়! কেননা, হুজুরের মৃত্যুও যা, তাহাদের স্বার্থ সিদ্ধি হওয়াও তা, সুতরাং তৎসাধনপক্ষে তাহারা কোন উপায়াবলম্বনেই ক্ষান্ত হইবে না! পরে শত শত সাক্ষ্যদ্বারা প্রমাণ করাইবে যে, আপনি প্রকাশ্যরূপে রাজ-বিদ্রোহী হইয়া যুদ্ধ করাতে সেই যুদ্ধে গতাসু হইয়াছেন!

"অধিক আর লিখিব না—কেবল আমার আত্ম-সম্বন্ধে আর একটী গুরুতর কথা বলিলেই হয়। পাপিষ্ঠেরা আমাকেও ঘুস দিয়া কিনিতে চেষ্টা পাইয়া-

---

* কাপ্তেন অসবরণ লিখিয়াছেন, রণজিৎকে তাঁহার মন্ত্রীরা রাগের কথা কহিতে অথবা অযথা বিদ্রূপ করিতেও সাহসী হইত, তাহাতে তিনি ক্রোধ করিতেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেন "That in 1825, when Ranjit Singh refused to join the confederacy against the British at the time of the Second Bharatpnr Seige, his Sirdars brought him woman's apparel. In Durbar, there is often a license of speech that would astonish a European subject."

ছিল—তাহারা নাকি নিজে বিশ্বাসঘাতক, তাই ভাবিয়াছিল আমিও তাই! হুজুর মাফ করিবেন, পূর্ব্বে ঐ চোর জাতির প্রতি আমার যতটুকু ঘৃণা ও দ্বেষ ছিল, এখন এই কাজে ও আর আর ব্যবহারে আরো বাড়িয়া উঠিতেছে! দুরাত্মারা আপনারা যেমন, সকলকেই তেম্নি ভাবে—বড় দুঃখের কথা, পাঠানকে পণ্য দ্রব্য ভাবিয়াছিল—ধূর্ত্তেরা ইটি জানেনা যে, পাঠান জাতিকে যে মনিব বলপূর্ব্বক কাজ করায়, তেমন মনিবের কাজেই আমরা পণ্য দ্রব্য হই, কিন্তু যিনি কৌলিক সুতরাং স্বাভাবিক প্রভু, আর যিনি প্রাণের ভালবাসার প্রভু, তাঁহার কাজে প্রাণ দিয়া থাকি—সোণার পর্ব্বত আনিয়া ঘুস দিলেও তাঁহার নেমখারামি করি না! ইতি।"

চাঁদখাঁর সমস্ত কথাই যে সত্য এবং সে নিজে যে পরম বিশ্বাসী, ইহা ডুলীনের হৃদয়ঙ্গম হইল। কিন্তু কি বিপজ্জনক সংবাদ! সকল দিকেই গোলযোগ—সকল দিকেই বিভ্রাট! বহুক্ষণ চিন্তার পর "দেখি রাজাজী ও ফকিরজী কি লিখিয়াছেন?" এই বলিয়া ডুলীন প্রথমে রাজা ধ্যান সিংহের পত্রখানি উন্মোচন করিলেন। তাহাতে লেখা এই;—

"পরম সাহসী,পরম জ্ঞানী,কর্ণেল ডুলীন সাহেবের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল হউক! প্রিয় বন্ধুকে দেখিবার নিমিত্ত নয়ন-চাতক তৃষাতুর হইয়াছে—একবার সাক্ষাৎ হওয়া বড় আবশ্যক! সাহেবের বন্ধু মাত্রেই তাঁহার দীর্ঘস্থায়ী পীড়ার সংবাদে নিরানন্দ ছিল, অধুনা উপশমের শুভ সমাচারে তেমনিই সুখী হইয়াছে! যদি জল বায়ুর পরিবর্ত্তন এবং শীতল স্থানে অবস্থান প্রয়োজন হয়—বোধ করি, বিলাতীর পক্ষে তাহা আবশ্যক—তবে জম্বু ও চাম্বা প্রভৃতি যে সব স্নিগ্ধকর স্থান এ হিতৈষী মিত্রের অধিকারে আছে, তন্মধ্যে যেটী মনোনীত করিবেন, তদ্দণ্ডেই তাহা মিত্রবরের বাস-জন্য নির্দ্দিষ্ট ও সেবার্থ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবে।

"নন্দ সিংহের আকস্মিক মৃত্যু ঘটনাটী বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়—সে কি সত্যই বিদ্রোহী সৈনিকগণের হাতে হত হইয়াছে? বিজ্ঞ বন্ধু অবশ্যই পরিষ্কার রূপে সে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিবেন! কিন্তু আপাততঃ মহারাজার হৃদাকাশ কিছু মেঘাচ্ছন্ন আছে; এবং শ্রীশ্রীযুত জানিতে ইচ্ছা করেন, নন্দের হত্যাকারীদের প্রতি কি দণ্ড বিধান হইয়াছে?"

ডুলীন মৃদু মৃদু হাসিয়া স্বগত বলিলেন "হা! ধূর্ত্ত বন্ধু! তুমি কি 'বিলাতীকে' এমনই বোকা বুঝিয়াছ যে, সে ইচ্ছা পূর্ব্বক বাঘের গহ্বরে মাথা গলা-

হবে ! ভুলীনকে কি এমনি কাঁচা লোক পাইয়াছ যে, সে জানিয়া শুনিয়া তোমার জম্বু নামক শীতল ফাঁদে পা দিয়া আর আর বন্দীর সহিত জন্মের মত শৃঙ্খল ধারণ করিবে ? তাহা তো প্রাণ থাকিতে হইবে না—যদিই বা তোমার কর-কবলিত হইতে হয়, তাতো সজীবাবস্থায় নয়, সশস্ত্র অনেক লড়িয়া—অনেক কাটিয়া কুটিয়া যখন পড়িব, তখন সেই শব লইয়া যাহা ইচ্ছা করিও—জম্বু, চাম্বা, যথা ইচ্ছা পাঠাইয়া দিও !"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ফকিরজীর পত্র খুলিলেন, স্বস্তি বাচনাদির পর তাহার পাঠ এই :—

"এ অধীন বন্ধু নিতান্তই সাধ্য হীন দীন—কীটানুকীট—কিন্তু সাহেবের হিতান্বেষী ! এ প্রযুক্ত, কেবল এই মাত্র ইঙ্গিত দানে সমর্থ যে,নন্দসিংহের প্রাণ-দণ্ড ব্যাপারটী জ্ঞানী সাহেবের পক্ষে বড় সুবিবেচনার কার্য্য হয় নাই, তদ্ধেতু ভবিষ্যৎ-মঙ্গলের ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা ! এই প্রণয়গর্ভ পত্রী চাঞ্চল্য ও বৈরক্তি উৎপাদন উদ্দেশে নয়, সতর্ক করিয়া দিবার নিমিত্ত—পাছে অতর্কিত অবস্থায় আরো অধিক অহিত ঘটিয়া উঠে ! মহামহিমান্বিত নরসিংহ মহারাজা তাঁহার প্রিয় কর্ম্মচারী ও বিশ্বাসভাজন প্রতিনিধিকে বিশেষ অনুগ্রহ এবং বিশেষরূপেই বিশ্বাস করেন । তজ্জন্য এ দীনের দ্বারা পূর্ব্ব রাজাদেশ আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন—তাঁহার ইচ্ছা, এই লিপি পাঠ মাত্র আপনি সেই সর্ব্বাদেশ-পূর্ণ ও উপদেশ-গর্ভ পত্র খানি পুনর্ব্বার একবার বাহির করিয়া তাহার প্রত্যেক স্তবক, প্রত্যক ছত্র ও প্রত্যেক শব্দ পুনর্ব্বার পাঠ এবং তাহার প্রকৃত ভাবের প্রতি যথোচিত চিন্তার্পণ করেন ! জ্ঞানীই উন্নত—বিশ্বাসীই পুরস্কৃত—কৃতজ্ঞই সুখী হয়—আব কি বলিবার আছে ? প্রিয় বন্ধুর সর্ব্বপ্রবেশক ও সর্ব্বগ্রাহক সূক্ষ্ম বুদ্ধির পক্ষে এতাবন্মাত্রই যথেষ্ট !"

ভুলীন ভাবিতে লাগিলেন "আঃ ! এ তো প্রহেলিকা—সম্পূর্ণ না হউক, আংশিক বটে ! প্রবোধ এই যে, মহারাজার প্রথাই এই—যা শত্রু পরে পরে ! প্রকাশ্য পরওয়ানা দ্বারা পদ-ত্যাগের আদেশ ; অথচ তাহা অমান্য করিবার ভার ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ ! লক্ষ লক্ষ বিপক্ষ 'বিদ্রোহী' বলিয়া চীৎকার করিবে—'কৃতঘ্ন, বিশ্বাসদ্রোহী' বলিয়া গালি দিবে ; নির্ব্বান্ধব দেশে নিঃসহায়ের পক্ষে সামান্য সঙ্কট নয় ! সম্রাট্ শিরোমণি আক্‌বর বলিতেন 'সোজা পথে কেহ পথ হারায় না !' আমার ইচ্ছাও সেই সোজা পথে যাই ; কিন্তু যাঁহার অধীন, তিনি

যাইতে দিবেন না—নিজেও যাইবেন না! উঃ! কতই ষড়যন্ত্র—কতই চক্রান্ত! নবাবিষ্কৃত বাষ্পীয় যন্ত্রের ন্যায় এ রাজ্যতন্ত্রে চক্রের মধ্যে চক্র, তন্মধ্যে উপচক্র, অপচক্র, বড় চক্র, ছোট চক্র, কেবলই চক্র! হায়, আমার ভাগ্য কি বক্র! কিন্তু এত চিন্তাই বা কি? চির সংকল্পানুসারে যে যাহা করে করুক,নিজে ঠিক থাকিলেই হইল—ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাসী আর নিয়োগকর্ত্তা প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিয়া যথা-জ্ঞান-কর্ত্তব্য পালন করিব—কর্ম্ম-ফল, সর্ব্বফলদাতা ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর!"

পত্র কয়খানি পুনর্ব্বার মোড়ক মধ্যে রাখিতে গিয়া দেখেন, চাঁদখাঁর মোড়ক হইতে এক টুক্‌রা ক্রোড় পত্র বাহির হইল। ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। তন্মর্ম্ম এই;—"আমি এই মুহূর্ত্ত সঠিক সংবাদ পাইলাম যে, পরওয়ানার হুকুম হইয়াছে—সুচেৎ সিংহের প্রতি ভারার্পণ হইয়াছে—হুজুর আর কাংরার শাসন কর্ত্তা নহেন' অন্যান্য সকলই মূলপত্রে লিখিয়াছি—বাহকের বিলম্ব ভয়ে আর লিখিলাম না—হুজুরের মঙ্গল হউক—গোলাম নিকটে পৌঁছিতে ব্যস্ত—অনুমতির অপেক্ষা মাত্র।"

চাঁদের মূল পত্র ও অপর দুই লিপি পাঠে এ প্রকার ঘটনার জন্য ইতি-পূর্ব্বেই প্রস্তুত ছিলেন, সুতরাং বিস্ময়ান্বিত, কি ব্যস্ত, কি ভীত, কিছুই হইলেন না। ক্ষণেক ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, লৌকিকতা ও ভব্যতা আর রাখিব না—ধ্যান সিংহের বিপক্ষদলকে এবং যাহারা তাঁহাদের না বিপক্ষ না সপক্ষ, এমন মধ্যাবস্থ সকল সর্দ্দারকে হস্তগত করিবার চেষ্টাই এখন কর্ত্তব্য—আর কেন বাহ্য আত্মীয়তা রক্ষার বিফল আয়াসে সময় ও অর্থ নষ্ট করা যায়? বিশেষ ধ্যানসিংহ ও তাঁহার ভ্রাতারা শুধু তাঁহার প্রতিই বিনা কারণে—বিনা দোষে শত্রুতা করিতেছেন না—এখন জানিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার পিতারও ঘোর বৈরী ছিলেন—আ! ইঁহাদের হইতেই জনক বিক্রমজিৎ রাজ্য, পদ, ধন, মান,প্রাণ সকলই হারাইয়াছেন—ইঁহাদের অনির্ব্বচনীয় নিষ্ঠু-রাচরণ রূপ একমাত্র হেতুতেই তাঁহাকে অতি শৈশবেই অমন পিতা মাতার স্নেহময় লালন পালনে বঞ্চিত এবং বিদেশীয় লোকের করুণাশ্রয়ে মানুষ হইতে হইয়াছে! ইঁহারা পিতার সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার তত দুঃখ নাই, কেননা জয় পরাজয় ভূপতি মাত্রেরই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে; কিন্তু পিতার রাজ্যাপহরণ করিয়াও ক্ষান্ত না হইয়া জীবন-হরণ উদ্দেশে শেষে শৃগাল

কুক্কুরের ন্যায় তাড়াতাড়ি পর্য্যস্ত করিয়া, আহা, তাঁহাদের নিরাশ্রয় নির্ব্বাসনের হেতু হইয়াছিলেন !

এমন হৃদয় শূন্য নির্দ্দয় শত্রুর সহিত আবার বাহ্যিক মিত্রতার যত্ন ? যদি রণজিতের প্রতি স্বামী-ধর্ম্ম-নিগড়ে বদ্ধ না থাকিতেন এবং তাঁহারই রুটী খাইয়া তাঁহারই সৈন্য লইয়া ক্ষমতাশালী হইতে পারিয়াছেন, এ ধর্ম্ম ভয় না থাকিত, তবে এখনও পার্ব্বত্য অঞ্চলে যাঁহারা অধীন রাজা আছেন, দুলীন অনায়াসে তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়া এবং তাঁহাদের পরিচালক হইয়া বিপক্ষ পক্ষকে সম্পূর্ণ শিক্ষা দিতে ও পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার পূর্ব্বক দোর্দ্দণ্ড পার্ব্বতীয় রাজা হইতে পারিতেন। কিন্তু ধর্ম্মভীত দুলীন তাহা করিবেন না ! যদি ধর্ম্মরক্ষার সহিত পৈতৃক অধিকারের পুনঃ প্রাপ্তি ঘটে, এমন কোন সুযোগ বা উপায় উপস্থিত হয়, তদবলম্বনে অবশ্যই প্রস্তুত আছেন ! কিন্তু মনুষ্যের দৃষ্টি-শক্তির সীমা যতটুকু, তদনুসারে সেরূপ ঘটনার সম্ভাবনা তো এখন দেখা যায় না !

আপাততঃ যে পদে যে অবস্থায় স্থিত, সেই পদে থাকিয়াই বিপক্ষ ভ্রাতাত্রয়কে শিক্ষা দিবার কোন উপলক্ষ পাইলেও কিয়দংশে তাঁহার মন সন্তুপ্ত হয়। বিশেষ পাপমতি গোলাপ সিংহকে কোন সূত্রে কবলে পাইতে পারিলেও ধন্য হন। দুঃখের বিষয় নূতন পরওয়ানা তাঁহার অনুকূলে না হইয়া সুচেতের নামে হইয়াছে। তথাপি আনন্দ যে, তিনজনের একজনকেও তো পাইবেন—এক জনকে শিক্ষা দিলেই তিন জনকে শিখানো হইবে !

অতএব তন্মুহূর্ত্তেই চাঁদখাঁকে লিখিলেন "তুমি কি পাগল যে, এই ভয়ানক গোলযোগের সময় যথায় থাকিলে প্রকৃত কাজ হইবে, তুমি সে স্থান ত্যাগ করিয়া যথায় আসিবার প্রয়োজন নাই, তথায় আসিতে চাহিতেছ ? কদাচ এমন প্রস্তাব স্বপ্নেও আর তুলিও না ! তোমাকে কে বলিল যে, আমি আর কাংরার শাসনকর্ত্তা নই ? সে সব জল্পনার কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া যাহা করিতেছ, তাহাই করিবে—আমার প্রসন্নতা ও প্রত্যয় সম্পূর্ণরূপেই তোমাতে আছে ও থাকিবে—ভরসা করি থাকিতে দিবে। সে যাহাহউক, এখন রাম সিংহ ও গোবিন্দরাম, এই দুই সম্ভ্রান্ত ভ্রাতার সহিত যাহাতে আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও হৃদ্যতার বৃদ্ধি হয়, তৎপক্ষে সম্পূর্ণরূপেই চেষ্টাবান রহিবে ; ফতে সিংহ মান এবং খোসাল সিংহকে আমার অভিবাদন জ্ঞাপন পূর্ব্বক বলিবে তাঁহারা আমাকে যেন ভিন্ন না ভাবেন—তাঁহাদের সহিত সম-হৃদয়তা ও

আনুকূল্যের বিনিময় আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা; এবং উতারি ও স্যান্দনওয়ালা সর্দ্দার প্রভৃতির প্রতিও তদ্রূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিবে।" ইত্যাদি।

তৎক্ষণাৎ দ্রুতগামী অশ্বারোহী দ্বারা ঐ পত্র এবং অন্য লিপিদ্বয়ের যথোচিত উত্তর প্রেরণ পূর্ব্বক অদূরবর্ত্তী স্থানবাসী পণ্ডিত প্রবর লেনা সিংহ মাজিতাকে দুলীন নিম্ন ভাবার্থক একখানি পত্র স্বহস্তে লিখিয়া পাঠাইলেন—

"শ্রীযুক্ত লেনা সিংহ বাহাদুরের নাম যশঃ পঞ্জাবেই আবদ্ধ নয়, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য্য রূপে ভারতময় ব্যাপ্ত আছে এবং ভারত-সীমা অতিক্রম করিয়াও ভারতের প্লেটো বলিয়া বহু পশ্চিমের (ইউরোপের) লোক জানিয়াছে! আপনার অনুরাগী এ হিতৈষী বন্ধু বিদেশী ও নির্ব্বান্ধব—কেবল নিষ্পাপ-হৃদয় ও সবল-হস্ত-ধৃত অসির উপরই তাহার নির্ভর। সেই সঙ্গে পঞ্জাবাধিপতির নিজের ও পঞ্জাবের কোন কোন ধর্ম্মনিষ্ঠ প্রধানের ন্যায়পরতা ও গুণগ্রাহিতার প্রতি তাহার বেশী আশা ভরসা! কিন্তু তন্মধ্যে লেনা সিংহের ন্যায় ধনে, মানে, জ্ঞানে, সাহসে, সদ্বিবেচনায় ও সুমন্ত্রণায় কোন্ সচিব শ্রেষ্ঠ? কাংরার বিগত ঘটনা ও তৎসম্বন্ধে ছলগ্রাহিগণ-কর্ত্তৃক আমার বিরুদ্ধে যে ঝঞ্ঝা-বাত্যা উত্থিত হইয়াছে, তাহা আপনার অগোচর নাই। আমার প্রতি আপনার পূর্ব্ব দয়া স্মরণ করিয়া এই দুঃসময়ে শরণপ্রার্থী হইতে সাহস করিতেছি। সুবর্ণের পরীক্ষা অগ্নিতে—বন্ধুতার পরীক্ষা বিপদ্‌কালে! আপনাকে অকপট বন্ধু বলিয়াই আমার অন্তঃকরণ জানে। সেই হৃৎ-প্রত্যয় বলে বলীয়ান হইয়াই এই সন্ধির প্রস্তাব করিতেছি যে, আমার এই অসময়ে যদি কোনরূপ আনুকূল্য করেন, তবে শপথ সহিত আমার স্বীকার, আপনার প্রয়োজনে সাধ্যমত সাহায্য দানে এ পক্ষে ত্রুটি হইবে না! অদ্য আর অধিক নয়, সদুত্তর প্রত্যাশায় পথ চাহিয়া রহিলাম!"

এইরূপে বাহিরে যা কিছু ব্যবস্থার আবশ্যক ও সম্ভব, তাহা করিয়া তদ্দণ্ড হইতেই দুর্গাভ্যন্তরের ব্যবস্থায় দুলীন ব্যস্ত হইলেন। সীমান্তবর্ত্তী কয়টী ক্ষুদ্র দুর্গ এবং প্রত্যেক চৌকী ও থানা স্বয়ং গিয়া পরিদর্শন করিলেন। যেখানে যেরূপ সতর্কতা ও প্রহরিতা প্রভৃতির প্রয়োজন, তত্তাবতের উপযুক্ত বিধান ও বিশেষ বিশেষ আজ্ঞা দান করিয়া আইলেন। দুর্গমধ্যে বুরুজের উপরিভাগে ও তোরণ দ্বয়ের নিকটে নানা আয়োজনে বহু বহু লোক নিযুক্ত করিলেন—এখানে পরিষ্কার, ওখানে সংস্কার, সেখানে খাদখনন, অন্যস্থানে স্তূপ নির্ম্মাণ

—কোথাও বিস্তৃতি, কোথাও হ্রাসতা, কোথাও বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পাষাণ খণ্ডাদির সংগ্রহ, কোথাও বৃক্ষাদি ছেদন (বিশেষ সেইস্থলে, যথায় আপনি উঠিয়াছিলেন), কোথাও বা তোপ সজ্জা, কোথাও বা যন্ত্র-স্তম্ভাদির রচনা, ইত্যাদি দুর্গের সুরক্ষণ ও দুর্গ হইতে আক্রমণের সর্ব্বাঙ্গীণ উদ্যোগে দিন যামিনী ব্যাপৃত রহিলেন।

দুর্গের সম্মুখ ভাগে, চতুষ্পার্শ্বে ও বাণগঙ্গার তীর প্রভৃতি স্থলে যাহা যাহা করিবার তাহার কিছুতেই ত্রুটি হইল না। জয়ন্তী পর্ব্বতের বাহু যুগলে ও তাহার অন্যান্য অঙ্গে এরূপে তোপ ও যন্ত্রাদি সজ্জিত রহিল যে, তোরণাক্রমণ-কারীদের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। দুর্গমধ্যে একটী বৃহৎ ও দুইটী ক্ষুদ্র বাজার ও বিস্তর বসতি আছে, তাহাকে নগর বলিলেও বলা যায়; তদ্ব্যতীত জয়ন্তীর দক্ষিণ বাহুর দক্ষিণে ও পশ্চাতের পাদদেশে দুর্দ্দশাপন্ন একটী উপনগর ও গঞ্জ পূর্ব্ব হইতেই ছিল, এক্ষণে দুলীনের সময়ে তাহা বিলক্ষণ শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। যাহাতে সে নগরের প্রতি বৈরিপক্ষ বিশেষ কোন উপদ্রব করিতে না পারে, তদুপযুক্ত আয়োজনও হইল—সে কার্য্যের ভার অধিকাংশই বমু ধমুর অধীন নব সৃষ্ট স্থানীয় শান্তিসৈনিকগণের প্রতিই অর্পিত হইল। তদ্ব্যতীত অবৈতনিক স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিকগণও প্রস্তুত রহিল—কার্য্যকালে তাহারা আসিয়া ভারগ্রহণ ও আদেশ পালন করিবে।

দুলীন অন্যান্য সমাবেশের সঙ্গে দুর্গমধ্যে যথেষ্ট খাদ্য সংগ্রহ বিষয়েও বিশেষ মনোযোগী হইলেন—কি জানি যদিই বা দীর্ঘকাল অবরোধে থাকিতে হয়। কিন্তু দুর্গের ন্যায় সেই নগরটীকে দুর্ভেদ্য বা তেমন নিরাপদ করিবার জো নাই, কাজেই পারিলেন না। জয়ন্তীর উপর হইতে যতদূর হওয়া সম্ভব, তাহাই এবং প্রতিদ্বন্দ্বী আক্রমণকারীদের সংখ্যা অসঙ্গতরূপে অধিক না হইলে সম্মুখ-সংগ্রাম, ইহাই মাত্র সুসাধ্য।

দুলীন মধ্যে মধ্যে কর্ম্মচারিগণ সমভিব্যাহারে রাজ্যের নানা ভাগে অশ্বারোহণে ভ্রমণ ও গ্রামপতি প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক (দেশের নাড়ী ধরিয়া দেখার ন্যায়) প্রজাবর্গের মনের ভাব গতিক বুঝিতেন। দেখিলেন ইতর, ভদ্র, ধনী, নির্ধন, তাবৎ লোকই তাঁহার প্রতি অনুকূল এবং সর্ব্বান্তঃকরণে যাহার যেমন সাধ্য তাঁহার আজ্ঞা পালনে প্রস্তুত! তাহার অকাট্য প্রমাণ উপরিলিখিত অবৈতনিক নিয়োগেই প্রকাশ—অস্ত্রধারণক্ষম যুবা মাত্রেই তজ্জন্য মহা ব্যগ্র—অত লোকের অস্ত্র যোগাইয়া উঠা ভার। বিশেষতঃ পাছে

অসঙ্গতরূপে বেশী লোককে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিক পদে নিযুক্ত করিলে ছল-গ্রাহীরা বিদ্রোহিতার রব রটনার সুযোগ পায়, সেই ভয়ে ভুলীন সকলের বাঞ্ছা পূর্ণ না করিয়া প্রত্যেক বিভাগ হইতে সম সংখ্যক লোক বাছিয়া তিনটী বিভাগে তিনটী রেজিমেণ্ট প্রস্তুত করিলেন।

ফলতঃ তাঁহার প্রতি প্রজাপুঞ্জের এইরূপ আন্তরিক অনুরাগ দর্শনে তিনি মনে মনে যতটা নিশ্চিন্ত হইলেন, এমন আর কিছুতেই না। যেহেতু প্রকৃতি-পুঞ্জের হৃদয়-দুর্গে যে ভূপাল স্থান পান, তিনিই কেবল নিরাপদ, নতুবা শুদ্ধ অস্ত্র-বলে বলীয়ান, তেমন রাজার সিংহাসন আর পদ্মপাতায় জল, দুইই সমান!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

আশার সুসার।

দিবা রজনী এই সব উদ্যোগায়োজনে এত ব্যস্ত যে, ভুলীন তাঁহার জীবন-দাত্রী ধাত্রীগণকে এবং নব-জীবন-সঞ্চারিণী লীলাকে বারেক সন্দর্শন করি-বারও সাবকাশ পান না। দিবা ভাগে তো এখন আর তেমন দেখা হইবার সম্ভাবনাই নাই, যামিনীতেও যখন তিনি গৃহে আসিবার অবসর পান, তখন এত রাত্রি যে তাঁহারা অবশ্যই নিদ্রিতা। নিদ্রিতা না হইলেও সে অসময়ে অন্তঃপুরে তাঁহার গমন কি অন্তঃপুর হইতে তাঁহাদের আগমন ভাল দেখায় না! কাজেই বহুদিন সাক্ষাতাভাব।

একদা দিনমান প্রায় অবসান—সে দিন ভুলীনের আরো বেশী শ্রম, বেশী ক্লান্তি হইয়াছে—আর পারেন না, কিয়ৎকাল বিশ্রাম নিতান্তই আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে—সেই অবশ্য-প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও শান্তি লালসায় স্বগৃহে গমন করিলেন। কিন্তু চতুর্দ্দিকে গিরি-বন-বিহারী বিবিধ বিহঙ্গমকুলের সুধাস্রাবী গান এবং চতুর্দ্দিকেই মুগ্ধকর দৃশ্য—তেমন সময় কি গৃহে থাকা যায়? অথচ বাহিরে গেলেই ঝঞ্ঝাট! অতএব আপরাহ্নিক মৃদুমধুর বায়ু সেবনার্থ অন্তঃপুরের দিকে যে বারাণ্ডা, তথায় কিয়ৎক্ষণ পাদচারণান্তে এক-খানি সুন্দর কৌচের উপর অর্দ্ধশায়িত ভাবে অবস্থিত হইলেন।

নানা চিন্তায় চিত্ত অভিনিবিষ্ট, এমত কালে স্বর্গীয় সঙ্গীতবৎ গীত শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন—সে সঙ্গীত লীলার মধু-কণ্ঠ-নিঃসৃত—সে গীত প্রণয়-গীতি

ও করুণ-রসপূর্ণ—গায়িকার স্বরও সবিষাদ, সকরুণ—স্থানটী অতি নির্জ্জন, সে সময় সহসা সেরূপ গান আশাতিরিক্ত; সুতরাং সকল মিলিত হইয়া কল্পনাকে মাতাইল—কি যেন অপার্থিব পবিত্র মোহে কল্পনা মুগ্ধ হইল! ছুলীনের লোমাঞ্চ হইল—বিশেষতঃ সমগ্র গানটীর ভাব শুনিয়া বিস্ময়ে, আশায়, পুলকে দেহ মন দুইই কণ্টকিত হইয়া উঠিল! সে গানটী এই;—

রাগিণী মূলতান। তাল তেতালা।

প্রাণ, আমার কেন এমন করে—না দেখে তাহারে!
যাহারে দেখিতে চাই, সে তো দেখিবারে নারে।

(১)

জীবন হ'লো অসার, রহিতে না চাহে আর,
এ দুখে করিতে পার, যে পারে সে রহে দূরে!

(২)

নিরাশা দহনে যদি, দহিতে রাখিল বিধি,
তবে কেন দিয়ে নিধি, নিদয় হ'য়ে নিল হ'রে!

নিকট গমনে নিতান্ত ইচ্ছা—যাওয়া উচিত কি না ইহাই চিন্তা! উচিত অনুচিত যাহাই হউক, না গিয়া থাকিতে পারিলেন না! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বারাণ্ডার পর ছাদ, ছাদ পার হইলেই শুদ্ধান্তঃপুর। বারাণ্ডা হইতে ছাদে উঠিতে তিনটী ধাপ। যাই কি না যাই, ভাবিতে ভাবিতেই ধাপে ধাপে উঠিলেন—ফিরি কি যাই, ভাবিতে ভাবিতেই ছাদ পার হইলেন—"উঁহু! এখন যাব না" বলিতে বলিতে ধীরে ধীরে নিকটে গেলেন—কে যেন ঠেলিয়া দিয়া ধরিয়া লইয়া গেল!

গিয়া দেখেন, একি! করকমল-যুগলে বদনকমল আবৃত—নতমস্তকে লীলা কাঁদিতেছে—কোলের বীণা কোলেই পড়িয়া আছে! ছুলীন ধীরে ধীরে কাষ্ঠাসনস্থ গালিচার উপর গিয়া বসিলেন। পরম স্নেহে কোমল করকমল ধারণ পূর্ব্বক বদনারবিন্দ হইতে সরাইলেন। তাঁহার আগমন, লীলা জানিতে পারে নাই; সচকিতে বাষ্পাকুল মধুর দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল; সে দৃষ্টিতে হর্ষ নাই, বৈরক্তি—একি! বহুদিনান্তে পুনর্দ্দর্শন; কোথায় উল্লাসের দৃষ্টিতে চাহিবে, তাহা না হইয়া বিরক্তি! মধুর মিষ্ট সম্ভাষণ দূরে থাকুক, ত্রস্ত ভাবে হস্তের প্রত্যাখ্যান! এবং অশ্রু মার্জ্জন করিতে করিতে অধোদৃষ্টিই বা কেন?

"আমার প্রাণের ভগিনী লীলা 'আ'জ্ রোদনশীলা কেন? আমার

লীলার কিসের দুঃখ ? যদি প্রাণ দিলে সে অসুখের—" ফুলীনের এই পর্য্যন্ত বলা শেষ না হইতেই লীলা সেই অধোবদনে সেই তটস্থ ভাবে অস্পষ্টস্বরে বলিল "হুজুর! আমি বালিকা নই—যদিও ছটা আপনার পুরা—তবু এখন আমি একা—আমি গিয়া মাকে পাঠাইয়া দিতেছি!" এইরূপ বাক্য অৰ্দ্ধোচ্চারণ করিতে করিতে লীলা উঠিয়া যাইতে উদ্যতা!

ফুলীন সহাস্যে পুনর্ব্বার হস্ত ধরিয়া বসাইলেন। "কেন কেন, আমার সরলা লীলার বাক্য আ'জ্ বাঁকা কেন? আমার সদানন্দ-হৃদয়ার হৃদয় আ'জ্ বিষাদভরা কেন? আমার বন-কোকিলার মুখে হর্ষ গীতিই বাহির হয়, আ'জ্ কেন বিয়োগ-দুঃখের করুণা-গাথা শুনিলাম?" পুনর্ব্বার এইরূপ স্নেহের প্রশ্ন করিলেন।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস লীলার হৃদয়োদ্ভেদ করিয়া উঠিতেছিল, লীলা চাপিবার চেষ্টা করিল, পারিল না! ছল ছল চক্ষে আরো যেন বিরক্তির সহিত উত্তর দিল "এখানে হুজুরের থাকা উচিত নয়! সত্য, আপনার আশ্রয়ে, আপনার খাইয়া, আপনার অধীনে আছি; কিন্তু অনাথা অনুহ্লাদ চাঁদের কন্যাকে পূর্ব্বে তো সম্ভ্রমই করিয়াছেন!"

ফুলীন কতক বুঝিলেন, বলিলেন "হুজুর! আমার লীলার মুখে এ কর্কশ কথা আ'জ্ যে নিতান্ত নূতন! লীলার জন্য ফুলীন প্রাণ দিতে পারে, তা কি লীলা জানে না? সত্য বল, লীলা! আমার কাছে গোপন করিও না—আমার প্রাণের ভগ্নী লীলা কি কোন সৌভাগ্যবানকে হৃদয় দানে ধন্য করিয়াছে? সে পক্ষে লীলার ভ্রাতা কি সাহায্য করিতে পারে না?"

লীলা সগর্ব্বে উত্তর করিল "রাজপুত-কন্যারা কি অযাচিত হইয়া হৃদয় দান করে?" এই কয়টী কথার অৰ্দ্ধেক বলিতে না বলিতে গর্ব্ব যেন কোথায় চলিয়া গেল—হৃদয়-বেগ কি এক প্রকার হইয়া উঠিল—নয়নে নয়নে মিলিবা মাত্র কিরূপ একটী বা কয়েকটী অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদ্রেক হইল—লীলা আর আত্মসম্বরণে সমর্থ হইল না—বদনমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইয়া অজ্ঞানে খট্টা হইতে পড়িয়া গেল—মোহ হইল!

ফুলীন আপনাকে অপরাধী জ্ঞানে ব্যথিত হইলেন; দ্রুতপদে উঠাইয়া হৃদয়ে তুলিলেন; পুনঃ পুনঃ চুম্বনাদি রূপ ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছিলেন কি না, তাহা তিনিও পরে স্মরণ করিতে পারিতেন না! কিন্তু খট্টায় যে শোয়াইলেন, ইটী নিশ্চিত; কাহাকেও ডাকিলে পাছে গোলমাল হয়, এজন্য দৌড়িয়া স্বগৃহে গিয়া

জল, গোলাপ ও তীব্রগন্ধের শিশি আনিলেন ; পুনঃ পুনঃ জলসেকাদি শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। হা! এই যে নিঃশ্বাস ! এই যে কম্পন ! এই যে সেই মধুর স্বর নিঃসরণ—আধ আধ—অর্দ্ধস্পষ্ট—ক্রমে মৃদু মৃদু পরিষ্কার বচন—কিন্তু সকল কথাই যেন স্বপ্নের কথা ! সে প্রলাপ—সে কথায় হুলীনের হৃদয় নাচিয়া উঠিল—পর পর যত শুনেন, ততই যেন কে তাঁহাকে ভূতল হইতে তুলিতেছে—ততই যেন তাঁহার হৃদয় নাচিতে নাচিতে ধাপে ধাপে স্বর্গের সোপানে উঠিতেছে—ততই যেন কোন স্বর্গাধিষ্ঠিতা দেবী তাঁহাকে দেববাঞ্ছিত পবিত্র সুধা পান করাইয়া অমর ভবনে অমর করিয়া লইতেছেন !

তিনি কি শুনিলেন—কি জানিলেন—কি বুঝিলেন ? শুনিলেন লীলার হৃদয় তাঁহারই—অন্যের নয় ! জানিলেন, লীলার হৃদয়েশ্বর তিনিই—অন্যে নয় ! বুঝিলেন, যে মানবী-রূপিণী দেবীকে তিনি এত কাল ভগ্নী বলিতেন, তাঁহার প্রতি সেই দেবীর চিত্তভাব সোদরাপেক্ষাও গাঢ়তর—শত গুণে প্রিয়তর—সহস্র গুণে মোহকর—লক্ষ গুণে সুখদ ! যদিও তাঁহার নিজের অন্তস্তলে তদনুরূপ গাঢ় ভাব গুপ্তরূপে নিহিত ছিল, কিন্তু সে গরীয়সী ভাবকে মূর্ত্তিবিশিষ্ট করিয়া লইতে সাহস পাইতেন না—পূর্ব্বে সাহেব ছিলেন, আর্য্য-বংশীয়ার চক্ষে সাহেব তো অনার্য্য ! যদিও এক্ষণে ক্ষত্রিয় রাজপুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, তথাপি ম্লেচ্ছান্নপালিত বলিয়া আশাকে প্রসারিতা করিতে ভয় পাইতেন ! ইহাতেই ভ্রাতৃ-স্নেহাপেক্ষা প্রিয়তর অনুরাগ প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইতেন—পাছে রাজকন্যা ও রাজমহিষী অপমান জ্ঞান করেন—পাছে তাঁহারা অভিমান করেন যে, হীনাবস্থা দেখিয়া আর অধীনস্থা পাইয়া অযোগ্য প্রস্তাব করিতেছেন !

এখন সে আতঙ্ক দূর হইল—সে অন্তর্জ্বালা জুড়াইল ! এখন অবাধে প্রাণের বহুদিনের সাধ মিটাইতে পারেন—এখন হৃদয়েশ্বরীকে অবাধে হৃদয়ে তুলিতে পারেন ! অব্যাজে করিলেনও তাই—পুনঃ পুনঃ বুকে তুলিতে লাগিলেন—পুনঃ পুনঃ বদন-বিধু-মণ্ডল, ললাট ফলক ও পবিত্র বিম্বাধর স্বীয় ওষ্ঠাধর দ্বারা ব্যগ্রভাবে স্পর্শ করিয়া শীতল হইলেন এবং উষ্ণ স্পর্শে শীতল করিলেন ! লীলার তখন সম্পূর্ণই চৈতন্য হইয়াছে—লীলার মধুরাস্যে সুখহাস্য যেন লুক্কায়িত রহিয়াছে—লীলা একবার মাত্র পদ্ম-দলোপম নেত্র পত্র উন্মীলন করিয়া মুদ্রিত করিয়াছে—প্রাণেশ্বরের সুখোন্মত্ততাময় আলিঙ্গনে আশাতিরিক্ত হর্ষোন্মত্ততায় হৃদয় মগ্ন রহিয়াছে—অবশ হইতেছে ! জীবিতনাথের পীযূষবৎ নানা প্রেমালাপ,

নানা প্রণয়-প্রলাপ, অনুতাপীবৎ নানা সানুরাগ বিলাপ, সোহাগীবৎ ভবিষ্যতের নানা অঙ্গীকার, লীলা নীরবে আকর্ণন করিতেছে—পূর্ব্বে দুঃখের মোহে মূর্চ্ছিতা হইয়াছিল, এখন সুখের মোহে গলিতেছে!

বহুক্ষণ হইল, পাছে কেহ আইসে, এই ভয়ে লীলা সলজ্জ দৃষ্টির ভঙ্গীতে নিবারণ করিল—উঠিতে চাহিল। যে কথোপকথন হইল, তাহা অতি বিরল—অতি গুপ্ত—কাহাকেও বলা উচিত নয়—সুতরাং বলিলাম না—পাঠক! ক্ষমা করুন, বুঝিয়া লউন!

উভয়ে সুস্থির হইলে, কেন যে এতদিন দেখা সাক্ষাৎ ঘটে নাই, দুলীন তাহা বুঝাইলেন। কিন্তু শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, লীলা তাঁহাকে সর্ব্বদাই দেখিত—দুলীন যে দিন যে সময়ে ভোজন শয়ন করিতেন, তাহা লীলা সকলই জানিত! লীলার অভিমান এই যে, যদিও দুলীন সকল দিন গৃহে আসিয়া ভোজন করিতেন না, তথাপি মধ্যে মধ্যে তো আসিতেন এবং যত রাত্রিই হউক, নৈশ ভোজন ও শয়ন জন্যও তো গৃহাগত হইতেন, তখনই কেন লীলাকে আর লীলার জননীকে আর গুলাপীকে ডাকাইতেন না? কষ্ট! দুলীনের কাছে (যখনই হউক) আসিতে আবার তাঁহাদের কষ্ট! নিদ্রা! দুলীন নিদ্রিত না হইলে কি তাঁহারা কোন দিন শয়ন করিয়াছেন? তাঁহাদের কি আর কেহ আছে? তাঁহাদের কি আর কাহারো কথা এত হয়!

দুলীন অপরাধস্বীকার করিলেন—"এমন আর হইবে না" প্রতিজ্ঞা করিলেন!

লীলা কাঁদিয়া বলিল "আমার জীবনে এখন আর অন্য সাধ কিছুই নাই—কেবল এক একবার তোমাকে দেখিতে পাই, এই হইলেই হইল! তোমার নিকট যেমন থাকিতাম, তেমি থাকিতে পাই—তুমি আমাকে সহধর্ম্মিণীর উচ্চ পদ দেও বা না দেও—তুমি আমাকে ভগ্নী বল, দাসী বল, আর যাই বল, কেবল কোনমতে সেইরূপে আবার তোমাকে দেখিতে পাইলে, তোমার কাছে বসিয়া তেমি করিয়া আবার লেখা পড়া শিখিতে পাইলে, তেমি করিয়া আবার তোমার সেবা শুশ্রূষা করিতে পাইলে, আর মাঝে মাঝে তোমার মুখে মধুমাখা 'লীলা' নামটী শুনিতে পাইলেই জীবন সার্থক জ্ঞান করিব!" আরো কত কি বলিবার ছিল, লীলা বলিতে পারিল না!

দুলীন বাক্যে ইহার উত্তর না দিয়া যেরূপে দিলেন, ভাবুক পাঠক বুঝিতেই পারিতেছেন! শেষে যখন বাক্য ব্যয় করিলেন, তখন কেবল এই

আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন যে, লীলার জননী কি এ সম্বন্ধে সম্মতা হইবেন? —না জানি, মা শুনিয়া কি বলেন?

লীলা সুধাসিক্ত হাস্যের সহিত বলিল "এ পর্য্যন্ত আমার কোন কথাই মার অগোচর নাই—আমার মনের ভাব, কি জানি কিরূপে, তিনি আপনিই বুঝিতে পারিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—আমি লজ্জায় বলিতে পারি নাই, কাঁদিয়াছিলাম—পরে তিনি সকলই জানিয়াছেন! কেবল আপনাদের দুঃখের দশা স্মরণ করিয়াই দুঃখিতা আছেন—'অসম্ভব' বলিয়াছেন—অন্য আপত্তি বা কিছু মাত্র অসম্মতি ব্যক্ত করেন নাই!"

তুলীন সহাস্য গাম্ভীর্য্যে কহিলেন "দুঃখের দশা ভাবিয়া 'অসম্ভব' বলিয়াছেন! তবে কি তিনি আমাকে ধনী রাজপুত্র ভাবিয়াছেন? তিনি কি জানেন না, এ বিষয়ে তাঁহার লীলারও যে দশা, তাঁহার তুলীনেরও সেই দশা! প্রভেদ মাত্র এই, তোমরা স্ত্রীলোক, আমি পুরুষ—আমি খাটিয়া খাইতেছি! নচেৎ তোমরাও রাজ্য হারাইয়াছ, আমিও পৈতৃক রাজত্বে বঞ্চিত হইয়াছি—আ! পালক পিতা যে অতুল বিভব রাখিয়া গিয়াছিলেন, দুর্জ্জনেরা কুচক্র জাল বিস্তারিয়া তাহাও কাড়িয়া লইয়াছে!"

লীলা বিষাদ-পূর্ণ নয়নে স্বীয় হৃদয়নাথের ক্ষাত্র-তেজোপূর্ণ বদনের দিকে কেবল সানুরাগ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, কোন কথাই কহিল না!

তুলীন তদ্দর্শনে লীলার কোমল হস্তখানি স্বীয় হস্তোপরি লইয়া আবার বলিলেন "লীলা! জন্মের মত হৃদয় প্রাণ তোমাতেই সমর্পণ করিয়াছি, কিন্তু দুঃখ এই, তোমার এই পাণিগ্রহণে এখন সম্মত হইতে পারি না—এ কথায় আমার প্রাণের লীলা শিহরিয়া উঠিল, তাও দেখিলাম—এ কথা বলিতে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে—যে অমূল্য রত্নকে রাজরাজেশ্বরও বহু যত্নে পায় না, আ'জ সদয় বিধি সেই অতুল্য নিধিকে অযত্ন-লভ্য করিয়া দিয়াছেন, সে মহা নিধি অবিচ্ছেদে হৃদয়ে ধারণ করিতে হৃদয় যে কি অধৈর্য্য হইতেছে, তাহা যদি দেখাইবার হইত, এখনি বুক চিরিয়া দেখাইতাম, কিন্তু তবু আমার মর্ম্ম-বিদারক এই নিদারুণ কালগৌণের কথা যে বলিতেছি, তাহার বিশিষ্ট হেতু আছে। এখন আমার অবস্থার কিছুই স্থিরতা নাই—যে পদে অবস্থিত, ইহা কখন্ আছে, কখন্ নাই—মহারাজার দয়া আছে সত্য, কিন্তু দেখিতেছি, তাঁহার দুরাচার পারিপার্শ্বিকগণের চক্রান্তে তিনি অব্যব-

স্থিত-চিত্তের ন্যায় কার্য্য করিতে বাধ্য হন—অধিক কি, তাঁহার নিয়োগ-পত্র পাইয়াও তাঁহার কর্ম্মচারীর সহিত ভয়ানক যুদ্ধ করিয়া তবে এই দুর্গাধিকার করিয়াছি এবং বোধ হইতেছে, এই রাজ্যাধিকার (তাঁহার নিমিত্তই) রাখিতে শীঘ্রই আবার তাঁহারই সৈন্য সহ ঘোর সংগ্রাম করিতে হইবে! তাহার ফল কি হয়, কে বলিবে? এরূপ অদ্ভুত শাসন-তন্ত্র আর কখন দেখিও নাই, শুনিও নাই! অতএব এখনও আমি নলিনী-দল-গত জলবৎ টল টল করিতেছি! এ অবস্থায় তোমাকেও কি সেই অস্থৈর্য্যের ভাগিনী করিতে পারি? এমন অর্থ-সঙ্গতিও কিছু করিতে পারি নাই যে, তাহার সাহায্যে তোমাকে কোন নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া সুখে বাস করি! বিশেষ আমার ইচ্ছা, আরো কিছু সময় লইয়া ভালরূপে তোমার মন তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখ—"

এই শেষের কথায় লীলা কাঁদিয়া ফেলিল—বলিল "পরীক্ষা! কিসের পরীক্ষা? অগ্নি প্রবেশে সীতার পরীক্ষা—না হয় তাই করিয়া দেখ!"

ভূলীন অপ্রতিভ হইলেন—লীলার কথায় যত নয়, লীলার ভাব, ভঙ্গী, দৃষ্টিতে প্রকৃত পরীক্ষা পাইয়া মহা অপ্রতিভ হইলেন! সে অভিমান দূর করিতে তাঁহাকে বহু যত্ন, বহু কষ্ট, বহু আদর, বহু বাক্যব্যয় করিতে হইল। সীতার পরীক্ষার সঙ্গে যেন রামেরও অনল পরীক্ষা হইয়া গেল—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার অপেক্ষাও কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধন সাধিতে হইল—সুখের মধ্যে পরিশেষে উত্তমরূপে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া তখনকার মত সমুচিত পারিতোষিক লাভ ঘটিল, ভবিষ্যতের চিরন্তন ছাত্রবৃত্তির আশাও রহিল!

ভূলীন হৃদয়েশ্বরীকে পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে লইয়া—পুনঃ পুনঃ গাঢ় প্রেমালিঙ্গন করিয়া—কার্য্য ব্যপদেশে না গেলে নয়—বিদায় লইলেন—যেন আপনাকে আপনি বলপূর্ব্বক ছিন্ন করিয়া লইয়া গেলেন!

লীলা নাচিতে নাচিতে মায়ের নিকট বলিতে গেল—দুর্ভাগ্য ভূলীনের বলিবার কেহ নাই, তথাপি তাঁহার হৃদয় নাচিতে নাচিতে পরমাত্মীয় আপন আত্মার সহিত চুপি চুপি শুভালোচনা করিতে লাগিল!

সূর্য্যদেব অস্তাচলে গিয়াছেন; অবগুণ্ঠনবতী সন্ধ্যা আসিয়াছেন; নিশানায়ক উদিত হইতেছেন; ভূলীন বেলুনারোহণে দুর্গের প্রায় চতুর্দ্দিক্ ও দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানহীন ভাবে কত দিকেই ধাবমান হইলেন—পরিদর্শন যেন উদ্দেশ্য, কিন্তু কিছুই পরিদর্শন করিলেন না—নয়ন আর মন কোন দিকেই

নয়—সঙ্গী সওয়ারেরা অবাক্ হইল, পরস্পর মুখ চাওয়াচাই করিল, কিছুই বুঝিল না! সেই গতিকে ও সেই গতিতে দুর্গে ফিরিলেন—কাহারো সহিত কোন কথা নয়, কোন বার্ত্তা নয়—শয়নে গেলেন! সারারাত্রি এপাশ ওপাশ—নিতান্ত ক্লান্ত, তথাপি নিদ্রা হইল না! শেষ রাত্রে হইল বটে, কিন্তু ভঙ্গ নিদ্রা! তাহাতে কেবল বিচিত্র বিচিত্র বিবিধ সুখদ স্বপ্ন দেখিলেন—শেষে বোধ হইল কে যেন রুদ্র বেশে গলায় হাত দিতে আসিতেছে, চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন—এক দীর্ঘাকার ছায়া যেন দ্রুতপদে গৃহ হইতে বহির্গত হইল—প্রহরিগণকে ডাকিয়া "কে গেল? কে গেল? ধর, ধর," বলিলেন! তাহারা উত্তর দিল "কৈ? কেহইতো না!"

পর দিন তাঁহার বিশ্বাসী কর্ম্মচারীরা প্রহরীদের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া বিস্তর বিনয় পূর্ব্বক প্রিয় পেস্‌খেজ্‌মৎকে তাঁহার গৃহে শয়নার্থ অনুমতি চাহিয়া লইল! তদবধি তাহাই হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রথম যুদ্ধ।

এইরূপে কিয়দ্দিন গত। লীলা যাহা করে বা করিতে চাহে, কন্যাবৎসলা চন্দ্রকুমারীর চক্ষে অবিচার্য্যরূপে তাহাই গরীয়সী—তাহাই শ্রেয়ঃ। সুতরাং এমন সুপাত্রে ও করণীয় কুলোদ্ভব রাজপুত্রে নন্দিনী যে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, ইহাতে যার পর নাই সুখিনী এবং লীলার জন্য ভাবী ভাবনা যে ছিল, তাহা হইতে নিস্তার পাইলেন—নিশ্চিন্ত হইলেন। গুলাপীর আমোদ তো রাখিবার স্থান হয় না!

তুলীন মহা ব্যস্ত, তথাপি তাঁহাদিগকে—বিশেষ লীলাকে দেখিতে ও শিখাইতে—যেরূপে যখন হউক অবসর করিয়া লয়েন!

এই ভাবে কিয়দ্দিবস গত। এক দিন অতি প্রত্যূষে সংবাদ আসিল, বহু সৈন্য সহিত সুচেৎ সিংহ আসিতেছেন।

ইতিপূর্ব্বে লেনা সিংহ এবং অপর দুই একজন পার্ব্বতীয় সর্দ্দার আনুকূল্য-দানের আশা দিয়াছেন। কিন্তু তুলীন যাঁহার অধীন, সুচেৎ সিংহও তাঁহার কর্ম্মচারী—বিশেষ সুচেৎ রাজাদেশ লইয়াই আসিতেছেন; সুতরাং অগ্রে তাঁহাকে আক্রমণ বা তাঁহার গতি রোধ করা হইতেই পারে না। এজন্য

রাজ্যের প্রান্তভাগস্থ দুর্গাধিকারী প্রভৃতিকে তাহাদের নিরূপিত স্থানে না রাখিয়া কতক জয়ন্তীতে কতক কাংরা দুর্গ মধ্যে আনিলেন। আভ্যন্তরিক শান্তিরক্ষক ও গ্রামপতি প্রভৃতি সকলকেই গুপ্তাদেশ পাঠাইলেন যে, অত্যাচারিত হইলেও অস্ত্র প্রয়োগ করিবে না, অথচ রসদ ইত্যাদি কিছুই দিবে না। বিপক্ষের গতিরীতি সম্বন্ধীয় তাবদ্ব্যাপারের সূক্ষ্মানুসন্ধান ও প্রকৃত সংবাদ যাহাতে প্রতি দণ্ডে পাইতে পারেন, তদ্বিধান করিলেন—প্রজারা বিনা উপদেশেই সে কার্য্য সুন্দররূপে করিতে প্রস্তুত! সুচেতের নামে তাহাদের গায় জ্বর আসে এবং ডুলীনকে তাহারা মনে প্রাণে ভালবাসে, সুতরাং তাঁহার শুভপ্রার্থী ও সাহায্যকারী হইবে, বিচিত্র কি? ডুলীন এইরূপে আগন্তুকদলের যথোপযুক্ত অভ্যর্থনার্থ সমুদয় আয়োজন ঠিকঠাক করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন!

সে অপেক্ষা অধিক দিন নয়—অচিরেই (নানা দিক্ হইতে আগত) দ্বাদশ সহস্র সুসজ্জিত সৈন্য কয়েক সহস্র রেসেলা সহিত কাংরাদুর্গ সমক্ষে উপস্থিত ও উপবিষ্ট হইল। তদ্বিরুদ্ধে ডুলীনের পাঁচ ছয় সহস্র পাকা সৈনিক বৈ নয়; কিন্তু তাহারা সর্ব্বথা উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সুশিক্ষিত ও সম্পূর্ণ রূপে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র শস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত। তদ্ব্যতীত প্রায় তত সহস্র সংখ্যক অবৈতনিক অপক্ক অথচ অব্যবসায়ী সৈনিক এদিক্ ওদিক্ চারিদিকে লুক্কায়িত ভাবে প্রস্তুত আছে —প্রয়োজনমতে নগর রক্ষায় বা প্রত্যেক অধিত্যকা, উপত্যকা, গিরি, বন হইতে তীর ধনু বন্দুক লাঠি প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র লইয়া ভয়ঙ্কর বধ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে। আবার লেনা সিংহ প্রভৃতিও নিশ্চিন্ত না রহিতে পারেন।

শুদ্ধ রাজ্যাধিকারই সুচেতের এক মাত্র উদ্দেশ্য নয়—অপর একটী রত্নাধিকারের প্রয়াসে বৈর-নির্য্যাতনের সম্পূর্ণ সাধও আছে—সে রত্ন "লীলা!"

সুচেৎ সিংহ দেখিতে অতি সুন্দর বীর পুরুষ, সংগ্রামেও সাহসী ও নিপুণ। সুচেৎ বন্ধু গুণে সেনানায়কের যোগ্য, কিন্তু সৈনিক শাসনতন্ত্রতা পক্ষে শিথিল—তাৎকালিক পঞ্জাব সৈন্য মধ্যে এই শিথিলতাই দোষ ছিল—সৈনিকেরা যদৃচ্ছা আচরণ করিয়াও প্রায় দণ্ডিত হইত না। তজ্জন্যই অধীন সৈন্যের নিকট সুচেৎ বিশেষ প্রিয় ছিলেন। এমন পুরুষ রমণীকুলেরও অনুরাগাস্পদ হইতে পারেন। কিন্তু এস্থলে তাহা না হওয়াতে, অর্থাৎ লীলার বিরাগ দর্শনে মহা জাত-ক্রোধ হইয়াছেন এবং যাঁহার প্রতি লীলা অনুরাগবতী

শুনিয়াছেন, তাঁহার প্রতি মর্ম্মাহত ভুজঙ্গের ন্যায় বৈরশোধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আসিয়াছেন! গুপ্তচর দ্বারা লীলা-ঘটিত সমস্ত তত্ত্ব শুনিয়াছেন।

শুভ্র-সন্ধি-পতাকা সহিত সুচেতের দূত কাংরা দুর্গে আসিয়া ফুলীনকে মহারাজার পরওয়ানা দেখাইয়া সৌজন্য অথচ গর্ব্ব সহকারে কাংরা রাজ্য ও দুর্গাধিকার চাহিল। ফুলীনও তদ্রূপ সৌজন্য অথচ গর্ব্বসহকৃত এইরূপ উত্তর দিলেন, "এই পরওয়ানা যে রাজ দরবার-প্রেরিত, তাহাতে সন্দেহ করি না, কিন্তু তথাপি রাজ্য ও দুর্গাধিকার দিতে পারি না; যেহেতু আমার প্রতি মহারাজার বিশেষ আজ্ঞা আছে যে, তিনি স্বয়ং না আইলে আর কাহাকেও অধিকার ছাড়িয়া দিবে না।"

সে উত্তরের প্রত্যুত্তর আইল—পুনর্ব্বার উত্তর প্রত্যুত্তর চলিল—ফুলীনের ঐ একই উত্তর! অবশেষে ফুলীন বলিয়া পাঠাইলেন যে "শতবার চাহিলেও তাঁহার প্রথম উত্তরের মর্ম্মই শেষ উত্তর হইবে; অতএব বৃথা তক্‌রারে সময় ও সৌহার্দ্দকে নষ্ট করা উচিত নয়; বিশেষ রাজাজীর বিপুল সৈন্য কর্ত্তৃক তাঁহার প্রজাবর্গের বিপুল অনিষ্ট হইতেছে, অতএব রাজাজী ইহা স্মরণ পূর্ব্বক প্রতি-গমনে যেন এক তিলও আর বিলম্ব না করেন!"

রাজা সুচেতের ছাউনি দুর্গ-গিরির সম্মুখ ও উভয়পার্শ্বের কিয়দ্দূর বেষ্টন করিয়াছে—জয়ন্তীকে দুর্গ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে—প্রথম আঘাতের দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে লইতে ফুলীনের ইচ্ছা নয়, এই নিমিত্তই সুচেৎ স্বীয় সুবিধা ও স্বেচ্ছামত সেনা-নিবাস স্থাপন করিয়াছেন, কেহই বাধা দান করে নাই। শুদ্ধ তাহাই নহে, ফুলীনের আদেশানুসারে দুর্গস্থ ও নগরস্থ লোক সুচেতের সৈনিকগণের অভদ্রতা ও ঔদ্ধত্য-ব্যবহার বিস্তর সহ্য করিতেছে—অপমানিত হইয়াও কেহ কিছু বলিতেছে না। সুচেতের অনুচরগণ হাটে বাজারে যথায় তথায় যদৃচ্ছা গমনাদি করিতেছে এবং দুর্গ মধ্যস্থ বাজারে যাইতে চাহিলেও নিরস্ত্র ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে অনায়াসে যাইবার অনুমতি পাইতেছে।

সুচেৎকে সাহসী যোদ্ধা জানিয়াই ফুলীন তাঁহার প্রত্যেক গতি রীতির প্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছেন। তাঁহার গুপ্ত চরেরা দিবানিশি সুচে-তের শিবির মধ্যে ছদ্মবেশে গিয়া সকলই দেখিয়া আসিতেছে এবং বোধ হয় দুর্গ মধ্যেও সুচেতের গুপ্তচর সে কাজ করিতেছে—অর্থ দ্বারা উভয়েই উভয়ের অনুযাত্রিগণকে গুপ্তচর করিয়া লইতেছেন! ফটকে ও বিশেষ বিশেষ

স্থলে দোহারা তেহারা পাহারা নিযুক্ত আছে। কামানগুলি পূর্ব্ব হইতেই ভীষণ পথ-রোধক-রূপে সজ্জিত ছিল, গোলন্দাজেরা গুপ্তাদেশে সর্ব্বদাই ছদ্ম-বেশে এদিক্ ওদিক্ পাদচারণ করিতেছে—যেন নিষ্কর্ম্মা দর্শক, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে এরূপে প্রস্তুত। তাহাদের পৃষ্ঠ রক্ষা নিমিত্ত এক রেজিমেণ্ট পদাতিকও সেই ভাবে প্রস্তুত ছিল এবং দুর্গাভ্যন্তরস্থ বৈরী-পক্ষীয় লোক উপযুক্ত সময়ে বাহিরের আক্রমণকারীদের অনুবল হইয়া না উঠিতে পারে, তৎপ্রতিবিধান জন্য বিশ্বাসী সৈনিকদলও প্রতিনিয়ত তাহা-দের প্রতি সতর্ক প্রহরিতা করিতেছে। এবম্প্রকারে সর্ব্ব দিকে সর্ব্বতোভাবে সাবধান হইয়া তুলীন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

মাসটী বৈশাখ—বসন্তের প্রাদুর্ভাব যেমন তেজস্কর, বিবাহ পক্ষেও তেমনি শুভকর। সুতরাং প্রায় প্রত্যহই বাদ্যোদ্যম ঘোর ঘটা সহিত দুর্গতোরণ পার হইয়া "বরাত" আইসে যায়। কিন্তু সুচেতের আগমনাবধি বিনা আদেশে বরাত আসিতে যাইতে পারে না।

বৈশাখী আঁধি চিরপ্রসিদ্ধ—ঠিক সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেইরূপ ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। পথ ঘাট কিছু কর্দ্দমাক্ত, কিন্তু বসন্তের নব শাখাপল্লব ও নব দূর্ব্বাদল নব ধৌত হইয়া কি সমুজ্জ্বল শ্যামল বর্ণ ধারণ করিয়াছে! পক্ষিগণ পুনর্ব্বার নবোল্লাসে বাহির হইয়া শাখী'পরে কি মনোহর পূরবী ও গৌরী তান ছাড়িতেছে! কত সন্ধ্যা-ভারু বিহঙ্গম কিচি মিচি করিতে করিতে অথবা প্রাণাধিক শাবকগণের নিমিত্ত চঞ্চুপুটে আহার্য্য লইয়া সাঁই সাঁই রবে কুলা-য়াভিমুখে অতি ত্রস্ত উড়িয়া যাইতেছে! মানবালয়ে গৃহে গৃহে দীপালোক জ্বলিয়া উঠিতেছে। বিমানে একটী একটী করিয়া নক্ষত্র ফুল ফুটিতেছে। স্বয়ং তারাপতিও দেখা দিতেছেন। এমত সময় বাদ্যোদমে তোলপাড় করিয়া বক্র গিরি-পথ বাহিয়া দুর্গ-দ্বারাভিমুখে বড় জাঁকের এক দল বরাত আসি-তেছে। বোধ হইতেছে খুব বড় ঘরের বর—সঙ্গে বহু পতাকাধারী, বহু বহু মশালধারী, শতাধিক আশা-সোঁটাধারী বরকন্দাজ, লোকগুলি সকলেই খুব জোয়ান—সকলেরই সাজগোজ চমৎকার—নানা বর্ণের বসন ভূষণ, কোমরে বিচিত্র বিচিত্র কোমরবন্ধ, মস্তকে লৌহ শৃঙ্খলযুক্ত বড় বড় উষ্ণীষ, কেবল ঢাল তলবার সড়কী বন্দুক লইয়া যাওয়ার নিষেধ প্রযুক্ত তত্তাবতের পরিবর্ত্তে লোহা-বাঁধানো লাঠি প্রায় সকলেরই হস্তে। পালকী ডুলি চৌপায়া অশ্ব

প্রভৃতি যান বাহনও অনেক। বৈবাহিক মাঙ্গলিক গান গাহিতে গাহিতে সেই অতি-জমকালো বরাতী দল তোরণাভিমুখে উঠিতেছে। পশ্চাতে বিস্তর লোক—তাহারা যেন তামাসা দেখিতে যাইতেছে—সেই সমভিব্যাহারে এখানে সেখানে জনকত সুচেতের সৈনিক যেন রঙ্গদর্শী-ভাবে দলে মিশিয়া চলিতেছে। কিন্তু তখন যদি কেহ তীব্র-দৃষ্টিবান দর্শক উপস্থিত থাকিত, তবে দলস্থ লোককে শুদ্ধ বরযাত্রী ও রঙ্গদর্শী বলিয়া ভাবিত না!

দ্বারপালেরা তোরণের বাহিরে আসিয়া বলিল, "হুকুম বেগর এত লোক যাইতে দিতে পারিব না—এখানেই থাক, আমরা সংবাদ পাঠাই।" বরাতের অধ্যক্ষগণ তাহাদের সহিত বচসা বাঁধাইল। বচসার মধ্যে বরাতী দল ক্রমে বলপূর্ব্বক ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। দ্বাররক্ষকগণের তখন সন্দেহ হইল, তাহাদের প্রধানাধ্যক্ষ সেই সময় তোরণ হইতে তাহাদিগকে গালি দিয়া শীঘ্র ফিরিয়া যাইতে ডাকিলেন। কিন্তু তখন আর ফিরিতে হইল না—চকিতের মধ্যে সেই বরাতিদল "গুরুজীকো ফতে!" বলিয়া ভয়ঙ্কর জয়নাদ ছাড়িল—কতক হুড়মুড় করিয়া দ্বার-প্রবেশ করিল; কতক ডুলি পালকীর ভিতর হইতে অসি লইয়া নিষ্কাশিত হইয়া নির্ব্বোধ দ্বারপালগণের মুণ্ডচ্ছেদন ও তোরণাধিকার পূর্ব্বক তেহারা পাহারার প্রত্যেককে বধ করিয়া বাছা বাছা জোয়ান দ্বারা দ্বারের উভয় পার্শ্বস্থ প্রহরীদের গৃহদ্বয়ও অধিকার করিল! পালকী, ডুলী, চৌদোলা হইতে বন্দুক গুলি প্রভৃতি রাশি রাশি বাহির হইল; পার্শ্বস্থ প্রত্যেক কামরায় বিংশতি জন করিয়া বন্দুকধারী প্রস্তুত রহিল; অবশিষ্ট সৈনিকগণ দুর্গস্থ বা তোরণোপরিস্থ কামানের হাতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ফটকের আড়ালে ও অন্যান্য আবৃত স্থানে লুকাইয়া সসৈন্য সুচেতের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সুচেৎ সিংহও নিশ্চিন্ত নন—দলে বলে অদূরে অশ্বারোহণে প্রস্তুত—প্রথম জয় শব্দ শুনিবা মাত্র অতি প্রচণ্ড বেগে ধাবমান হইলেন।

সেই শব্দে দুর্গাভ্যন্তরে যে সব বিপক্ষ ছিল—যাহারা নানা ছলে ছদ্মবেশে দিবাভাগে ভিতরে আসিয়াছিল—তাহারা পূর্ব্ব সংকেতানুসারে দ্বারাভিমুখে ছুটিতেছিল, কিন্তু তাহাদের পশ্চাতে যাহারা গুপ্ত প্রহরী ছিল, তাহারা দ্বারপালগণের ন্যায় নির্ব্বোধ ও অসতর্ক নহে। তাহারা পলক মধ্যে তাহাদিগকে ও অল্প সংখ্যক দুর্গবাসী-বিদ্রোহিগণকে নিরস্ত্র ও ধৃত করিল।

সেই শব্দে কুলীন নিজে ও তাঁহার, সমুদয় সুযোগ্য বিশ্বাসী কর্ম্মচারীবর্গ

তোরণাভিমুখে ছুটিলেন। তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বেই গোলন্দাজের দল এবং দলপতিরা আপনাপন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে এবং পদাতিক রেজিমেণ্ট প্রভৃতি সৈনিকগণ ও সেনাপতিরা আপন আপন স্থানে প্রস্তুত হইয়াছে।

কয়েক পল মধ্যেই তুলীন সসৈন্য বুরুজ ও প্রাচীরের উপর উঠিলেন। তাঁহার সঙ্কেত মাত্র গোলন্দাজেরা, বন্দুকীরা ও ধানুকীরা গোলা-গুলি-তীর-বৃষ্টির দ্বারা আগত ভীষণ সেনা-প্রমুখ সুচেৎ সিংহকে অভ্যর্থনা করিল! বাড়ের উপর বাড় ঝাড়াতে সুচেতের দল ভয়ানকরূপে পাতলা হইতে লাগিল। তথাপি তাহারা ফটক সান্নিধ্যে যাইবার প্রয়াসে যেমন ধাবমান হইল, অমনি পূর্ব্ব-প্রস্তুতীকৃত নিকট-সন্ধান-যোগ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুপ্ত কামানের গোলা-বর্ষণে ঘোড়া সহিত আসোয়ার সব দলে দলে গড়াগড়ি দিতে লাগিল—তাহাদের শবরাশির বাধাতেই পশ্চাদনুবর্ত্তীরা আর অগ্রসর হইতে পারিল না।

কিন্তু তথাপি সুচেৎ বীর ছাড়িবার লোক নহেন—বহু অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে বেগে দ্বারদেশে গিয়া পূর্ব্বকার ছদ্মবেশী বরযাত্রিগণকে প্রাচীরের কোল ঘেঁসিয়া উভয় দিকে ছড়াইয়া পড়িতে বলিলেন, আপনারা তাহাদের স্থলে তোরণাধিকার করিলেন।

তুলীন ইহারও প্রতীকার জানেন—ইহারও নিমিত্ত প্রস্তুত ছিলেন। তৎক্ষণাৎ ভীষণ শব্দে শেল্ গোলা আসিয়া তাহাদের মধ্যে পড়িল—অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ ছট্ ফট্ করিয়া পতিত হইতে লাগিল—যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ ও রাগের চীৎকার শব্দে তোরণ-দেশ যেন নরকপুরী হইয়া উঠিল—কতক পলাইল, কতক পলাইবার চেষ্টা করিল, পারিল না—অবশিষ্ট সাহসিক দল তাহাদের সাহসী নায়কের উৎসাহে ও দৃষ্টান্তে ভীষণ পরাক্রমে নিম্ন বুরুজারোহণ পূর্ব্বক গোলন্দাজগণকে আক্রমণ করিল। ওদিকে পদাতিকগণ প্রাচীরের কোল ঘেঁসিয়া গিয়া গোলন্দাজদিগের সেই স্থানে উঠিয়া "গুরুজীকো ফতে" শব্দে পশ্চাৎ হইতে ধাবমান হইল—গোলন্দাজেরা সম্মুখ পশ্চাৎ উভয় দিক্ হইতে যুগপৎ আক্রান্ত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু তুলীনের প্রিয় নাজিবেরা নিশ্চিন্ত ছিল না—তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গিয়া সাঙ্গিণাস্ত্রে ঘোর যুদ্ধ বাঁধাইল। তুলীনের শিক্ষিত নাজিবদলের সাহস ও স্থৈর্য্য আশ্চর্য্য—বলিতে যত বিলম্ব, তাহার অর্দ্ধেক সময় মধ্যেই বিপক্ষ দলকে হঠাইল—বাত্যার সম্মুখে যেমন তুলা উড়ে, অভিন্ন সেই রূপেই সুচেৎ-সৈন্য যেন উড়িয়া গিয়া তোরণ

দেশে পড়িতে বাধা হইল—সুচেৎ স্বয়ং স্বল্প আহত হইয়াও যতদূর সম্ভব চেষ্টা পাইলেন, আর অধিক হওয়া নিতান্তই অসাধ্য, কাজেই পশ্চাৎপদ হইলেন।

ডুলীন ক্ষণকালের নিমিত্ত অগ্নি-বৃষ্টি রহিত করিলেন—তাৎপর্য্য, ধোঁয়া-পরিষ্কার হইলে বিপক্ষের স্থান ও অবস্থা দর্শন। সেরূপে লক্ষ্য যেমন নির্দ্দিষ্ট হইল, অমনি কামানের মুখ ফিরাইয়া এককালে কামান ও বন্দুক হইতে গোলা, গুলি ও শেলের ঝাড় ঝাড়া হইল—আবার একবার—আবার একবার—এই বারেই কার্য্য সামাধা হইল—অধিকাংশই পড়িল, অবশিষ্ট কে কাহার ঘাড়ে পড়িয়া কে কোন্ দিকে পলাইবে তাহার ঠিক নাই! দুর্গদ্বার শত্রুহীন হইল!

ডুলীন সদলে তোরণে নামিলেন। স্তূপাকার শবের নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ বিশাল কবাট রুদ্ধ করিতে পারিলেন না—শব অপসারিত করিয়া তবে সে কার্য্য হইল।

দুর্গের অন্যান্য দিকেও আক্রমণ হইয়াছিল, কিন্তু সে অতি সামান্য ও ক্ষীণ, একা হাকিম সিংহের কর্ত্তৃত্বেই সে সব বিপদ কাটিল। সেই দিন বিপক্ষের চারি শত হত, ছয় শত আহত, কিন্তু ডুলীনের বিংশতি জন মাত্র হত ও সেই সংখ্যায় আহত হয়।

সুচেৎ সিংহের কাংরায় আগমনাবধি লীলাতে আর লীলা ছিল না—লীলা ভাবিল, তাহারই নিমিত্ত সুচেতের এই আক্রমণ! ডুলীনের প্রতি লীলা সরোদনে বিস্তর বিনয় করিয়াছিল যে, "সংগ্রামের ফলাফল কিছুই বলা যায় না—ভগবান্ অবশ্যই ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয় বিধান করিবেন—তথাপি যদি কিছু বেগতিক দেখিতে পাও, তবে এইটী স্বীকার কর যে আমাকে তৎক্ষণাৎ সংবাদ পাঠাইবে; আমি পাপিষ্ঠের হাতে পড়িবার পূর্ব্বে স্বীয় বক্ষে ছুরিকাঘাত দ্বারা আত্ম-হত্যা করিব!"

এখন এই তোরণাধিকারের জনরবে লীলা যেরূপ অবস্থায় রহিয়াছে, সহৃদয় পাঠক তাহা কল্পনা করুন! ডুলীন সে অবস্থা সম্পূর্ণ অনুভব, করিয়াছিলেন, অতএব জয়লাভ মাত্র স্বয়ং একবার লীলার নিকট গিয়া, তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া তখনই আবার সৈনিকগণ মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

———

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় যুদ্ধ।

জুলীন ভাবিলেন "আর সৌজন্যে কি কাজ? কয়েক দিন যে উদ্দেশে অপমান সহ্য করিয়াছি, তাহা পূর্ণ হইয়াছে—শত্রু আপনা হইতেই পথ দেখাইয়াছে, এখন সুদ শুদ্ধ পরিশোধ আশু আবশ্যক!"

আবার ভাবিলেন "অদ্যই উত্তম সুযোগ—একে পরাজয়, সৈন্যক্ষয়, তদ্ধেতু সর্ব্ব সৈন্য বিষণ্ণ ও নিরুৎসাহ আছে; তাহাতে এই যুদ্ধের পর আমি যে অদ্য রজনীতেই আবার আর কিছু করিব, ইহা তাহারা কখনই প্রত্যাশা করিবে না।"

মনে মনে এই সংকল্প স্থির করিয়া অন্যের নিকট তাহা গোপন অথচ কৌশলে তৎসাধন জন্য, কর্ম্মচারিগণকে ছল করিয়া বলিলেন "বোধ হয়, বল-গর্ব্বিত সুচেত সিংহ এ অপমানের প্রতিশোধ না লইয়া নিদ্রা যাইতে পারিবে না—আমরা জয়োল্লাসে নিশ্চিন্ত রহিব, অমনি যামিনীযোগে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিবে। অতএব যাহার যে কর্ম্মে সতর্ক থাক, গুপ্তচর প্রেরণ কর এবং খোসাল সিংহের পল্টন, আমার নাজিব ও সোহনলালের ল্যান্সার রেজিমেণ্টকে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত সসজ্জ ও সশস্ত্র থাকিতে বল; তখন আমি আসিয়া পুনর্ব্বার বিচার পূর্ব্বক যাহা হয় আদেশ করিব।"

এই হুকুম দিয়া নিজকক্ষালয়ে গমন পূর্ব্বক ত্রস্ত হস্তে সন্ধ্যার তাবৎ ঘটনা, রজনীর সংকল্প ও যেরূপে যে স্থলে সাহায্যের প্রয়োজন, তৎ প্রার্থনাদি সাঙ্কেতিক পত্র যোগে লিখিয়া অতি সংগোপনে দ্রুতগামী অশ্বে লেনা সিংহের নিকট বিশ্বাসী দূত পাঠাইলেন—একজন নয়, বিভিন্ন পথে তিন জন বিভিন্ন লোক দ্বারা ঐ এক পাঠের বিভিন্ন পত্রত্রয় পাঠাইয়া দিলেন। লেনা সিংহ মৃগয়াচ্ছলে দলে বলে অনতিদূরস্থ এক শৈল-শিখরে অবস্থান করিতেছিলেন।

তখনি আলিবর্দ্দি ও বন্নুকে গোপনীয় পথদ্বারা জয়ন্তী হইতে আনাইলেন—অতি নিভৃতে যথা-কর্ত্তব্যের উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার জয়ন্তীতে পাঠাইলেন। হাকিম ও সোহনলাল প্রভৃতিকে এখনও প্রকৃত কথা না খুলিয়া কেবল বিশেষ সতর্কভাবে তত্ত্বাবধান ও এক প্রাণীও যেন অদ্য

রজনীতে দুর্গ হইতে বাহিরে যাইতে না পারে, পুনঃ পুনঃ তদ্বিষয়ের ভার সমর্পণ করিয়া বিশ্রামার্থ গমন করিলেন।

সোহনলাল জাতিতে কায়স্থ; ব্রিটিস অধিকারস্থ ফরক্কাবাদ নিবাসী; তাহার আকার অতি দীর্ঘ, মুখও তেমনি কদাকার-দীর্ঘ, বাহুযুগলও আজানু-লম্বিত দীর্ঘ, নাসিকাও অসম্ভব দীর্ঘ ও উন্নত; দৃশ্যে বিশ্রী, বলিষ্ঠ ও ভয়োৎপাদক; ভাব ভঙ্গী চলন চালন কিছুই নয়ন-রঞ্জক নহে; কিন্তু সাহসে অতুল্য, সর্ব্বদা প্রফুল্ল, মিষ্টকথার গোলাম! তাহার মেজাজ বুঝিয়া তাহাকে চালাইতে জানিলে তাহার একা দ্বারাই দশের কার্য্য হইতে পারে! যদি বড়র সহিত ছোটর তুলনা অসঙ্গত না হয়, তাহা হইলে ত্রেতাযুগে পবনপুত্র হনু-কর্ত্তৃক রামকার্য্য যে পরিমাণে সাধিত হইয়াছিল, সোহনলালের দ্বারা তুলীনের প্রায় তদ্রূপ উপকারই ঘটিয়াছিল। সোহনলাল শুধু মোটা বুদ্ধির গোঁয়ার নহে, অসাধারণ বাহুবলের সহিত প্রশংসা-যোগ্য বুদ্ধিবল ও সমর-কৌশল-জ্ঞান প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষের উপযুক্ত যোগ্যতাও তাহার ছিল। দোষের মধ্যে ধর্ম্মনীতিতে খর্ব্ব, অসহিষ্ণু ও পানাসক্ত। কিন্তু অন্যান্য অসামান্য গুণাবলীর নিমিত্ত তুলীন ঐ দোষত্রয় উপেক্ষা পূর্ব্বক দয়া-দাক্ষিণ্য-মূলক সস্নেহ ব্যবহার দ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট ও সংশোধিত করিবার চেষ্টা পাইতেন। সন্তুষ্ট সে বিশেষরূপেই ছিল; কিন্তু তেমন বিশেষরূপে যে সংশোধিত হয়, এমন বিশ্বাস কাহারো ছিল না। সমস্ত দিন সুচারুরূপে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিত, কিন্তু রজনীতে সুরাপানে স্তম্ভিতপ্রায় পড়িয়া থাকিত। তজ্জন্য ভয়-প্রদর্শন করিলে, তুলীনকে করযোড়ে বুঝাইত "দিবা রাত্রির তিন ভাগ—পঁয়তাল্লিশ দণ্ড হুজুরের, পনের দণ্ড আমার নিজের হইবে না?" তুলীন হাসিয়া আর কিছু বলিতেন না!

কিন্তু আ'জ্ বলিলেন—শয়নে যাইবার সময় নির্জ্জনে বলিলেন "প্রিয় সোহনলাল! আ'জ্ আর পনের দণ্ড কি অর্দ্ধ দণ্ডও তোমার হইবে না—আ'জ্ মোটেই তোমার সুরাপান সম্ভবে না—আ'জ্ আমার বিশেষ কাজ আছে।" সোহন অম্লানবদনে উত্তর দিল "যো হুকুম! হুজুরের জন্য সোহন সব পারে—সোহন এমন প্রভু কখনো পায় নাই—সোহনকে চিরকাল সকলেই ঘৃণার সহিত নীচু পদে ফেলিয়া রাখিত, হুজুরই তাহাকে সেই তলা হইতে কুড়াইয়া গর্ব্বিত ন্যাস্কার দলের কর্ত্তা করিয়াছেন—নন্দ সিংহের উচ্চ পদ দিয়াছেন—

এমন প্রভুর জন্য সোহন প্রাণ দিতে পারে, এ তো সামান্য কথা!" অসুর বলাক্রান্ত সাহসী সোহনের যে কথা সেই কাজ!

ঠিক মধ্যরাত্রে ভুলীন সসজ্জ হইয়া বেলুনারোহণে দেখা দিলেন। বিশ্বাসী নায়েব ও প্রধান কর্ম্মচারীবর্গকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া তখন তাহাদিগের নিকট আপন সংকল্প জ্ঞাপন করিলেন। সোহন শুনিয়া মহা উৎসাহী—মহা উল্লাসিত হইল। কিন্তু হাকিম সিংহ বিরস মুখে নিবেদন করিল "হুজুর! এ অধীনের ক্ষুদ্র বিবেচনায় ইহা বড় ভয়ানক বলিয়া বোধ হইতেছে—"

সোহন ব্যস্ত হইয়া ভুজাস্ফালন পূর্ব্বক কহিল "ভয়ানক?"

হাকিম উত্তর দিল "অদ্যকার কার্য্যের নিমিত্ত ভয়ানক বলি না—এক তিলও ভাবি না—এখনই দুষ্ট দলকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, কেবল ভবিষ্যৎ চিন্তাতেই—দরবারের ভাবী ভাব ভাবিয়াই 'ভয়ানক' বলিতেছিলাম!

ভুলীন বলিলেন "সে জন্য চিন্তা করিও না—আমি কি আদ্যন্ত না ভাবিয়া কোন কাজ করি? শত্রু বুকের উপর বসিয়া এত দিন এত অসহ্য ঔদ্ধত্য দেখাইতেছিল—এত অপমান করিতেছিল, তবু সে সব সেই ভাবী ভয়ানক চিন্তাতেই সহ্য করিতেছিলাম—ঔদ্ধত্যের বিনিময়ে শিষ্টতা ও অপমানের বিনিময়ে মান দান করিতেছিলাম। কিন্তু আর না, যথেষ্ট হইয়াছে—এখন লোকতঃ ধর্ম্মতঃ ভাবী দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছি—উহারা অগ্রে তরবার খুলিয়াছে বৈ আমি খুলি নাই—উহারা আততায়ী হইয়া আমাকে বধ করিতে আসিয়াছিল, আর আমি ভাল মানুষটী হইয়া বুকে হাত দিয়া চুপ করিয়া থাকিব, ইহাতে কি ভীরুতা, কাপুরুষতা ও আত্ম-গৌরব-হীনতার কলঙ্ক রটিবে না? আঘাতকারীকে প্রত্যাঘাত না করিলে কি সেই দরবারেই আর মুখ দেখাইতে পারিব? অতএব সন্দেহ দূর কর—তাহারা যখন অসি নিষ্কোষ করিয়াছে, তখন যতক্ষণ না তাহাদিগকে আপন অধিকার হইতে তাড়াইতে পারিব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরাও অসির কোষ দূরে ফেলিয়া রাখা উচিত, সঙ্গত ও স্বাভাবিক!"

আর কাহারো সন্দেহাপত্তি রহিল না—হাকিম করযোড়ে এইরূপে তাহার সন্তোষ জানাইল "হুজুর যাহা বলিবেন, আমরা অবিচার্য্য রূপে তাহাই পালন করিব, আমাদের এই পর্য্যন্তই কর্ত্তব্যের সীমা। তথাপি পাছে ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া রাগভরে দরবারের কথা ভুলিয়া যান, তজ্জন্যই মনে করিয়া দিলাম।

এখন যাহা শুনিলাম, তাহাতে সে আশঙ্কাও আর রহিল না। এক্ষণে কোথায়, কাহাকে, কখন্, কিরূপ করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।"

ডুলীন আজ্ঞা করিলেন—সকলের মস্তক টেবিলের উপর মণ্ডলাকারে নত করাইয়া অতি মৃদুস্বরে আক্রমণ-প্রণালীর ব্যবস্থা বলিলেন। প্রথমতঃ রজনী আড়াই প্রহরের সময় খোসালের পল্টন ও নাজিবের এক শাখা, নিঃশব্দে দুটী ফটক হইতে বাহির হইবে; কিয়দ্দূর গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পর পর এক এক দল চোরের ন্যায় গুড়ি মারিয়া সুচেৎ সিংহের নিজের শিবির যে ভাগে, সেই দিকের পাহারার আড্ডার যত নিকটে নিরাপদে যাওয়া সম্ভব, ততদূর গিয়া নীরবে বসিয়া পড়িবে; কতক দল শত্রু শিবিরের প্রান্ত দেশে গিয়া তদ্রূপে উপবেশন করিবে—যেন কোনমতে তাহাদের উপস্থিতি প্রকাশ না পায়; এ দিকে জয়ন্তী গিরি হইতে আলিবর্দ্দীর অধীনস্থ মুলতানী প্রভৃতি ও বন্নুর অধীন সৈনিকগণ অবতরণ পূর্ব্বক তাহাদের নিকটবর্ত্তী শত্রু-শিবিরের দিকে ঐ ভাবে থাকিবে; অপর দিকে লেনা সিংহ যে স্বীয় সৈন্যকে তদ্রূপ গোপনে রাখিবেন, সে ব্যবস্থা হইয়াছে। ডুলীন নিজে নাজিবের অবশিষ্ট শাখাসমূহ ও ল্যান্সার প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া ফটক হইতে বাহির হইয়া দুর্গ-সম্মুখস্থ ছাউনী-বিভাগের আক্রমক হইবেন। শুক্রতারার উদয়ই সকলের পক্ষে সর্ব্ব দিকে যুগপৎ আক্রমণের সময় ও সঙ্কেত ধার্য্য রহিল। এই সুন্দর ব্যবস্থাতে শত্রু-শিবিরকে প্রায় বেষ্টন করাই হইবে।

অব্যাঘাতে সৌভাগ্য সেই রূপই ঘটাইল। শত্রু-সৈনিকগণ সন্ধ্যার সমরাবসাদে, পরাজয়-জনিত নিরুৎসাহে এবং এরূপ কোন বিপদের আশঙ্কা কল্পনায় না আসাতে সুখ-নিদ্রার ক্রোড়ে নিশ্চিন্ত ছিল—অন্য দিন যেরূপ সতর্ক থাকিত, সে দিন ততও না! কেননা অসঙ্গত এত সাহস ডুলীন যে দেখাইবেন, তাহা তাহারা ভাবে নাই। সুতরাং আশা-সিদ্ধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিল।

যখন দিক্‌পঞ্চ হইতে ভয়ঙ্কর সিংহনাদের সহিত ডুলীন-সৈন্য ও লেনা-সৈন্য যুগপৎ আক্রমণ করিল, তখন বেষ্টিত দাবানল-মধ্যস্থ মৃগযূথের ন্যায় সুচেৎ সিংহের বাহিনী মহাত্রাসযুক্ত ও নিরুপায়বৎ নিরুৎসাহ হইয়া উঠিল। অনেকের যেমন জাগরণ, অমনি মরণ! ছাউনি যদি বহু সারিতে পুরু" না হইত, তবে আরো ছারখার ব্যাপার ঘটিত! সুচেতের আর এক সৌভাগ্য, তিনি প্রচুর পরিমাণে অহিফেন-ভোক্তা; সুতরাং নিশা-নিদ্রা জানিতেন না—

প্রায়ই আমোদ আহ্লাদে রাত্রি কাটাইয়া প্রভাতে শয়ন করিতেন। সান্ধ্য সময়ের মনস্তাপে ও আহত-দেহের বেদনা প্রতিকারের উদ্দেশে সে রাত্রে দ্বিগুণ মাত্রায় মৌতাত চড়াইয়া বারুণী ও নর্ত্তকী তরুণীগণ সহ সারা রজনী কাটাইয়া সবে মাত্র শয়নে যাইতেছিলেন, এমত সময় সিংহনাদ। তিনি নিদ্রিত থাকিলে কি সর্ব্বনাশ ঘটিত, বলা যায় না—নিজে হত বা বন্দী হইতেও পারিতেন—জাগ্রত থাকাতে তত দুর্ব্বিপাক ঘটিল না। তখনি অমনি কথঞ্চিৎ প্রকারে সম্ভবমত সুব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তদবসরেই তাঁহার বিস্তর লোক মৃত ও আহত হইল। তাহা হউক, কিন্তু সৈন্য সংখ্যা বিস্তর ছিল, সুতরাং পার্শ্বস্থদল ছিন্ন ভিন্ন হইলেও ছাউনির মধ্য-স্থলস্থ সৈন্যগণকে সজ্জিত করিয়া বহির্গত হইতে পারিলেন। বাহির হইয়াই কামান চালাইতে আজ্ঞা দিলেন। ভুলীন পূর্ব্বাহ্নেই সে কাজ সারিয়াছেন; অর্থাৎ কামান কয়টী অগ্রেই হস্তগত করিয়াছেন! তাহা সুচেৎ জানিতেন না—এখন জানিয়া নিতান্ত নিরাশ হইলেন। এই ঘটনা এবং আক্রমণ-কারীদের অতুল পরাক্রম সহ অগ্নিবৃষ্টি ও অস্ত্র-চালন দর্শনে বুঝিলেন কোনমতে পলায়ন করিতে পারিলেও এখন যথেষ্ট! এই অভিপ্রায় সিদ্ধ্যর্থ প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন —সফলও হইলেন। তাঁহাকে দূরীভূত করাই ভুলীনের উদ্দেশ্য—তাঁহার ধ্বংস-সাধন অভিপ্রেত নয়। সুতরাং সুচেৎকে পলায়ন-পরায়ণ দেখিয়া ভুলীন আর প্রকৃত প্রস্তাবে বাধা দিলেন না, বরং তাহার সুযোগ করিয়া দিলেন। কেবল আপনার সর্ব্ব বিভাগীয় সৈন্য একত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক ভয় প্রদর্শনার্থ পশ্চাৎ তাড়াইয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া সে ভার সোহন লালের উপর অর্পণ পূর্ব্বক আপনি প্রত্যাগমন করিলেন।

শত্রু-পরিত্যক্ত বহুসংখ্যক সুন্দর শিবির; প্রচুর শিবির-সজ্জা; অশ্ব, গো, উষ্ট্রাদি বাহন ও নানা প্রকারের যান; বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র এবং কয়টী কামান প্রভৃতি জয়-লব্ধ হইল। ভুলীন শত্রুশিবিরস্থ আহত ব্যক্তিপুঞ্জের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহাতে তাহারা বিস্মিত ও কৃতজ্ঞ হইল—মনে মনে অনুগতও হইয়া উঠিল! মৃতদেহ জাতি-ভেদে দগ্ধ বা কবরস্থ হইল।

লেনা সিংহ কার্য্যসাধন মাত্র অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই চলিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং ভুলীন প্রত্যক্ষে বাধ্যতা প্রকাশে অসমর্থ হইয়া পরোক্ষে

সে কর্ত্তব্য পরে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। আপাততঃ ঐ সব ব্যবস্থাদি শেষ হইবা মাত্র অতি সত্বরে লীলার সমীপবর্ত্তী হইলেন।

লীলা পূর্ব্বেই সুসংবাদের আভাস পাইয়াছিল, এখন জীবিতনাথকে জীবিত ও অব্যাহত পাইয়া আনন্দে মগ্ন হইল—ডুলীনের প্রসারিত বাহুলতায় বদ্ধ হইয়া সুখানুরাগের কত চিহ্নই প্রদর্শন করিল—কত খেলাই খেলিল—স্বহস্তে ডুলীনের সমর-সজ্জা খুলিয়া বিশ্রাম-শয্যায় শোয়াইয়া পীড়িতাবস্থার ন্যায় বীজনাদি করিতে লাগিল! আহা! সুচেতের আগমনাবধি যে মধুরাধর শুষ্ক হইয়াছিল, তাহা আ'জ্ আবার সরস হাস্যযুক্ত হইল—যে মধুর স্বর মিষ্টতা ও মিষ্ট সঙ্গীত ভুলিয়াছিল, তাহা আবার সুমধুর সুধাস্রোত ঢালিতে লাগিল—যে গণ্ডদ্বয় স্বাভাবিক বর্ণ হারাইয়াছিল, তাহা আবার গোলাপ পুষ্পে পরিণত হইল—যে নয়নে কদিন জ্যোতিঃ ছিলই না, তাহা আবার খঞ্জনের ন্যায় সুখের নাচ নাচিতে লাগিল—যে কোমল হৃদয়, ভয়ে ও সন্দেহে কদিন কেবল কাঁপিতেছিল, তাহা আ'জ্ আবার নির্ভয় ও সুস্থির হইয়া উঠিল!

গুলাপীর সহিত লীলার মাতা আইলেন—অনেক দিনের পর পূর্ব্বভাবে বসিলেন—কত আনন্দ প্রকাশ করিলেন—পূর্ব্ববৎ কত কথাই কহিলেন! গুলাপীও যোগ দিল। কিন্তু বহুক্ষণের পর যখন রাণী ও লীলা চলিয়া গেলেন, তখন গুলাপী গম্ভীর ভাবে ডুলীনকে পরামর্শ দিল, "বাবা! আমি এদেশের ভাব গতিক বেস জানি; এরূপ গোলযোগ সর্ব্বদাই ঘরে বাহিরে ঘটিবে; তোমাকে রণসাজে কোন্ দিন কখন্ বাহির হইতে হয়, কিছুই ঠিক নাই; সে অবস্থায়, এবার যেমন মায়ে ঝিয়ে, বিশেষ লীলা, ভয় ভাবনায় মৃতাপ্রায় হইয়াছিলেন, ভবিষ্যতে তেমনটী আর না ঘটে, তজ্জন্য আমি তোমাকে পরামর্শ দিই, তোমার কোন বিশ্বাসী লোক জনকে ইঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিযুক্ত রাখ—তাহাদের তখন দেখিলে ও তাহাদের নিকট তোমার সংবাদাদি পাইলে তবু অনেক সুস্থ থাকিবেন। তেমন তেমন হয় তো, ইঁহাদিগকে লইয়া তাহারা গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথ দিয়া অনায়াসে কিছু দিন নিরাপদ স্থানে লুকাইয়া রাখিতে পারিবে। আমি যত কেন সাহসী হই না, তবু স্ত্রীলোক—বিশেষ কখন্ কোথায় থাকি স্থির নাই।"

ডুলীন এই উপদেশে মহা সন্তুষ্ট হইলেন। সেই দিনই আলিবর্দ্দীর সহচরদ্বয়—আক্‌রাম ও আক্‌বর খাঁ এবং ধন্নু ও তৎসহচর বজ্র সিংহকে অন্তঃ-

পুরের ও রাণীদিগের বিশেষ রক্ষক ও বিশেষ ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিলেন। তাহাদের সঙ্গে আরো আটজন ছিল, কিন্তু তাহারা কেবল সিফাহির ন্যায় প্রহরী—তাহাদের প্রতি অন্য কার্য্যভার কিছুই রহিল না। প্রথমোক্ত চারিজনের মধ্যে আক্‌রাম্‌ খাঁ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, সাহসী, সুচতুর ও ভদ্র, তজ্জন্য তাহাকেই প্রধান অধ্যক্ষ ও ধন্নুকে তৎসহকারী করিলেন। ধন্নু পাছে অভিমান করে, তৎপ্রতিবিধানার্থ ধন্নুর প্রতি দুর্গের শান্তি সম্বন্ধীয় অন্য একটা অতিরিক্ত ভার দিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

ফাঁদে চাঁদ।

তিন চারি দিন পরে সোহনলাল আসিয়া সংবাদ দিল, কাংরার সীমা-ত্যাগ করিয়া শত্রু চলিয়া গিয়াছে—শীঘ্র যে ইচ্ছাপূর্ব্বক আর আসিবে, এরূপ বোধ হয় না! সোহন, নিশা-যুদ্ধে অসম্ভব শূরত্ব দেখাইয়াছিল এবং এই কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করিয়া আইল, সুতরাং কর্ম্মচারী প্রভৃতির পদোন্নতি ও পুরস্কার দান কালে, সোহন কাপ্তেন ছিল, মেজর পদে উন্নীত হইল। তুলীন নিজে কর্ণেল হইলেও শাসনকর্ত্তা বলিয়া তাঁহার সৈনিক পদোন্নতি দানের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল।

জয়লাভ ও বিপক্ষ দূরীকরণ তো তুলীনের পক্ষে সহজ কাজ, কিন্তু দরবারকে সন্তোষজনক-রূপে বুঝানাই বড় কঠিন ব্যাপার! বিশেষ রাজসভায় যিনি সর্ব্ব-প্রধান—যাঁহার হাতেই বিচার-ভার, তাঁহার সহোদরকেই পরাজিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত করা হইল; সুতরাং তাঁহার প্রতিই অবজ্ঞা-প্রদর্শন ও তাঁহার বিরুদ্ধেই অপরাধ ঘটিল! এ অবস্থায় সুবিচার ও ন্যায়ের আশা করাই বৃথা—এ অবস্থায় তুলীনের পক্ষে কোন ওকালতিই খাটিবে না—এ অবস্থায় সত্যের পরিবর্ত্তে অপ্রকৃত বিজ্ঞাপন বিজ্ঞপ্ত ও প্রচারিত হওনেরই সম্ভাবনা। তুলীন মনে মনে ইহা সম্পূর্ণ অনুধাবন করিলেন।

তথাপি কিছু লেখা কর্ত্তব্য বোধে, স্থূলতঃ কেবল এই মর্ম্মে একখানি সরল এত্তালা পাঠাইলেন যে, "রাজা সুচেৎ সিংহ কাংরাধিকার বাসনায় দুর্গের

উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন ; মহারাজার একবালে এ অধীন তাঁহাকে হঠা-ইতে সমর্থ হইয়াছে। তাঁহার পরিত্যক্ত আহত সৈনিকগণকে সরকারের লোক জানিয়া যথোচিত যত্ন পূর্ব্বক সুচিকিৎসার সহিত রক্ষা করা যাইতেছে।” ইত্যাদি। কিন্তু ফকিরজী ও চাঁদ খাঁকে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে তাবৎ কথা লিখিতে ত্রুটি করিলেন না।

তদুত্তরে রাজা ধ্যান সিংহ ও ফকির আজিজুদ্দিন, উভয়েরই রুক্ষ ভাবের দুই খানি পত্র পাইলেন—প্রত্যেকেরই মর্ম্মার্থ এই যে,“তুমি তোমার নায়েবের প্রতি রাজ্যভারার্পণ করিয়া তিলমাত্র বিলম্ব ব্যতীত দরবারে উপস্থিত হইবে—মহারাজ তোমার সহিত সাক্ষাৎ জন্য অতিশয় ব্যগ্র আছেন—অতএব ত্বরা করিবে, কদাচ অন্যথা না হয়।

কিন্তু চাঁদ খাঁর পত্রের ভাব অন্যরূপ,—

“হুজুর আচ্ছা করিয়াছেন—বাঃ! কি সাফাই কাজই হইয়াছে! মহারাজা মনে মনে যারপর নাই তুষ্ট হইয়াছেন! তাঁহার চক্ষে আনন্দের জ্যোতিঃ—মুখে বলুন আর নাই বলুন! কিন্তু ধ্যান সিংহের মুখ আঁধার—সিংহের কেশর কাঁপিতেছে : সিংহ ক্রোধে ফুলিয়া ফুলিয়া গর্জ্জন করিতেছে! দুঃখের বিষয়, ফকিরজীকে হাত করিয়াছে—ফকিরজী দুর্দ্দান্তদিগের পরাক্রম-ভয়ে ভীত হইয়াই বশীভূত হইয়াছেন—হুজুরের পক্ষ ত্যাগ করিয়াছেন! কিন্তু ভরসা করি কিছুতেই হুজুর ভয় পাইবেন না—কিছুমাত্র করিবেন না—কাহারও আদেশ উপদেশাদি গ্রাহ্য করিবেন না—হয় তো হাজির হইবার পরওয়ানা অদ্য যাইতেছে, তাহা মান্য করিবেন না—মহারাজার নিজের মুখের হুকুম ভিন্ন অন্য কোন কথাই শুনিবেন না! হুজুর নিশ্চিত জানিবেন, আপনার হস্ত হইতে কোট কাংরা তিন-ভ্রাতার গ্রাসে পতিত হয়, ইহা রণজিৎ সিংহের তিলেকের তরেও ইচ্ছা নয়!

“পুনর্ব্বার হুজুরের চরণে ধরিয়া প্রার্থনা করি, এ দাসকে হুজুরের নিকটে যাইতে ও হুজুরের অপূর্ব্ব বীর-কার্য্যের কিঞ্চিৎ অংশী হইতে অনুমতি দিয়া দাসের জীবন সার্থক করুন! আমার এখানে নিরাপদে থাকা দিন দিন দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে—প্রলোভন অতি প্রবল—কার্য্যের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর হইতেছে—দাসের মস্তিষ্ক অপেক্ষা হস্ত সবল—কি জানি, না বুঝিয়া অথবা দুষ্টদলের চক্রান্তে পড়িয়া চাঁদ খাঁ যদি একটা ভুলের কাজ কি অন্যায় কাজ

অনিচ্ছাতেও করিয়া ফেলে, তবে সে আফ্‌শোষ আর সে কলঙ্ক ইহ জন্মে ঘুচিবে না। এই জন্যই চরণ সমীপে গমন ভিক্ষা চাই।" ইত্যাদি।

তুলীন চাঁদ খাঁর লিপির প্রথমাংশে যেমন সন্তুষ্ট, শেষাংশ পাঠে তেমনি চিন্তিত হইলেন। চাঁদ খাঁ লাহোরে থাকাতে কত যে উপকার, তাহা বলা বাহুল্য; একারণ তাহাকে কাংরায় আনিতে তুলীনের ইচ্ছা নয়। কিন্তু লাহোরে থাকিতে চাঁদ খাঁ পুনঃ পুনঃ অনিচ্ছা জানাইতেছে—অনিচ্ছাকৃত কার্য্য কাহারো দ্বারাই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এত গুরু কার্য্যে তাহাকে বলপূর্ব্বক আর বাঁধিয়া রাখা সুবিবেচনার কার্য্য হয় না। বরং চাঁদের ন্যায় বিশ্বাসী ও চতুর সহকারীকে কাংরায় পাইলে অশেষ বিশেষরূপেই উপকারের সম্ভাবনা। তুলীন মনোমধ্যে এই সকল আন্দোলন পূর্ব্বক চাঁদকে নিকট আনাই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। কিন্তু তৎপদে কাহাকে মনোনীত করিবেন—চাঁদ খাঁর ন্যায় বিশ্বাসী, চতুর ও সর্ব্বাংশে সুযোগ্য লোক কাহাকে পাইবেন, এই চিন্তাতেই কয়দিন ধরিয়া তুলীন ব্যাকুল আছেন, এমত কালে একটী অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া উঠাতে সে ভাবনা আর তাঁহাকে ভাবিতে হইল না। সে ব্যাপারটী এই;—

রাজা ধ্যান সিংহ স্বার্থ সাধনার্থ অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ত; ধ্যান সিংহের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য চর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত; তাঁহার ভয় মৈত্রতা ও পুরস্কার শাসন বহু বিস্তীর্ণ; অতএব পঞ্জাবের ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনা কোথায় কখন্ কি ঘটিতেছে—ছোট বড় কে কোথায় কি করিতেছে, তাহা নখ-দর্পণের ন্যায় তাঁহার সুগোচর হইয়া থাকে। চাঁদ খাঁ মনে ভাবিত, তাহার পূর্ব্ব জীবনের কথা ধ্যান সিংহ কিছুই জানেন না; কিন্তু সেটি তাহার ভুল! ধ্যান সিংহ সমস্তই জ্ঞাত ছিলেন। এবং চাঁদ খাঁ তুলীনের উকীলী ভার প্রাপ্ত হইবার পর তাহাকে সেই পূর্ব্ব সূত্র তুলিয়া রসাতলে দিবার মানসও করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখিলেন, এ ব্যক্তি খুব চতুর ও খুব তেজস্বী; ইহাকে হাতে আনিয়া তুলীন সম্বন্ধে স্বীয় দুরভিসন্ধি পূর্ণ করিবার সম্ভাবনা আছে। তজ্জন্যই তখন কিছু বলিলেন না, পরে প্রলোভনের ফাঁদ পাতিয়া তাহাকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

যখন দেখিলেন, কিছুতেই সেই সামান্য-পদস্থ, নিঃসহায় ও নির্ধন মুলতানী ভ্রষ্ট হইবার লোক নয়, তখন তাঁহার বিস্ময় ও রাগের ইয়ত্তা রহিল না—তখন তাহাকে নষ্ট করিবার জন্য কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। দাউদ খাঁ নামক জনৈক

মূলতানী পাঠানকে সেই দুষ্কার্য্যের উপযুক্ত যন্ত্র পাইলেন বা করিয়া লইলেন। দাউদ খাঁ চাঁদের স্বজাতীয় ও সম-দশাপন্ন, কিন্তু চরিত্র বিষয়ে তদপেক্ষা নিতান্তই হীন—দাউদ খাঁ নিষ্ঠুর, নরাধম, বিশ্বাসঘাতক—সামান্য অর্থের জন্য না পারে এমন কাজই নাই।

দাউদ খাঁ, সরল-হৃদয় চাঁদ খার প্রতি অশেষ বিশেষরূপেই প্রণয়ানুরাগ দেখাইতে লাগিল—মুক্ত-প্রাণ চাদ খাঁ, স্বজাতীয় বন্ধুর হৃদয়ে যে কপটতা রূপ কালকূট আছে, তাহা স্বপ্নেও সন্দেহ না করিয়া তাঁহার বাহ্য মধু-মাখা বাক্য ও মৈত্রব্যবহাররূপ মায়া জালে পতিত হইল—প্রিয় সখার কপট প্রেমভাবে গলিয়া সরল প্রেম প্রতিদান করিল!

ধূর্ত্ত দাউদ কথায় কথায় শিখজাতির নিন্দা করিত; স্বজাতীয় রাজার ও আপনাদের দুর্দ্দশার প্রসঙ্গ তুলিত; মূলতানী মাত্রেরই সুযোগমতে প্রতিশোধ লওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া দিত; তত্তৎকালে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-বৎসলতার বেগে সে যেন অধীর হইয়া উঠিত—তাহার বদন আরক্তিম হইত—নয়ন হইতেও যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে এমনি দেখাইত!

পাঠক মহাশয় চাঁদ খাঁর পূর্ব্বকার মনের গতি জানেন। কেবল দুলীনের সদুপদেশ, মহদ্দৃষ্টান্ত ও স্কন্ধে গুরু দায়িত্ব, এই তিন কারণে—বিশেষতঃ প্রভুর প্রতি তাহার আন্তরিক ভক্তি প্রযুক্তই দুর্দ্দম্য চিত্তবেগকে দমনে রাখিয়া সাধু হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অন্তস্তলে প্রবৃত্তি-অনল এককালে নির্ব্বাপিত হয় নাই —অগ্নির শেষটুকু ভস্ম-চাপা ছিল—যদি প্রিয় প্রভুর নিকটে তদবধি থাকিতে পারিত, তবে বোধ হয়, সেটুকুও সম্পূর্ণরূপে নিবিয়া যাইত। এক্ষণে লঘু ইন্ধন ও ফুৎকার পাইতে পাইতে সেই প্রচ্ছন্ন-অগ্নি ক্রমে তেজ করিয়া উঠিল!

তথাপি চাঁদ খাঁ প্রথম প্রথম সতর্কতা বিস্মৃত হয় নাই—দাউদের বচনা-বলীর উত্তরে সাবধান করিয়া দিত; বলিত, "আমি এখন সরকারের চাকর, এখন ভাই এ সকল জল্পনা করা বা কর্ণে তোলাও আমার উচিত নয়!"

দুষ্ট দাউদ কখন বা হাস্য, কখন বা ঘৃণার সহিত ছদ্ম কোপে টিট্‌কারি দিয়া বলিত "ছি চাঁদ, তোমার প্রতি আমার অশ্রদ্ধা জন্মিল—এমন কথা আর বলিও না—পাঠান হইয়া এমন দুরপনেয় কলঙ্কে মজিও না—আমাদের ভাই বন্ধুরা এ কথা শুনিলে কর্ণে হাত দিবে! হায়, ইহারি মধ্যে এত খয়েরখাঁ —এত সাধু হইয়া উঠিলে! বিশ্বাসী উকীল মহাশয় কি ইহারি মধ্যে পূর্ব্ব

কথা সব ভুলিয়া গেলেন? স্বাধীন ভাবে বীর্য্যবান বলপ্রয়োগ-কার্য্যে পর্য্যটন ও পাপিষ্ঠ অপহারকদের অপহরণ করণের সাধ আহ্লাদ কি এই বয়সেই মিটিয়া গেল? এস দেখি কাণে কাণে একটা কথা মনে করিয়া দিই!" এই বলিয়া দুরাত্মা দাউদ, চাঁদ খাঁর কর্ণমূলে আপনার মুখ আনিয়া যাহা বলিল, তাহাতে চাঁদ খাঁ চমকিয়া উঠিল—তখন মনে পড়িল, এই দুর্জ্জনের নাম দাউদ নয়, মেয়াব খাঁ; সে তাহাদের দলের একজন ছিল, কিন্তু তাহার হত্যা-প্রবৃত্তি ও নিষ্ঠুরতার জন্য চাঁদ খাঁর পরামর্শেই তাহাকে দল হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। পরে একটা বিশেষ খুনের জন্য তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে শিখ শান্তি-রক্ষকেরা অনেক চেষ্টা পাইয়াছিল। এক্ষণে ছদ্ম-বেশে ও নাম পরিবর্ত্তন-উপায়ে পুনর্ব্বার সদর হইয়া সহরে বেড়াইতেছে ও রাত্রিকালে অপকর্ম্ম করিতেছে।

চাঁদ খাঁ তাহার হাতে আছে—পূর্ব্ব কীর্ত্তিসমূহের অধিকাংশই সে প্রমাণ করিতে পারে—চাঁদ খাঁর ভয় হইল। সেই সময়েই কাংরায় পলাইয়া যাইবার বাসনা করিয়া দুলীনের নিকট অনুমতি চাহিয়া পাঠায়। দুলীনও তাহার পুনঃ পুনঃ প্রার্থনাতে সম্মত হইয়াছিলেন, আর কিছু দিনেই সে আদেশ আসিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য যাহাকে লক্ষ্য করে, তাহার মতি গতি কিরূপে যে বিকৃত হইয়া পড়ে, কিছুই স্থির করা যায় না! চাঁদ খাঁ ক্রমে কুহক-মন্ত্রে ভুলিল—একটা সাহসের কাজে দাউদ তাহার সাহায্য ভিক্ষা করিল—"কেবল তুমি একবার মাত্র আসিয়া আমাদের মত-ভেদের মিমাংসা করিয়া দিয়া চলিয়া আসিলেও যথেষ্ট হইবে—কার্য্য সমাধা পর্য্যন্ত থাকিতে পার, ভালই; নতুবা যাহা বলিলাম, তাহা করিয়াই ক্ষান্ত হইবে—স্বজাতীয় বন্ধুগণের অনুরোধে ইটা তোমাকে করিতেই হইবে, কিছুতেই ভাই ছাড়াছাড়ি নাই!"

হায়! সয়তানের কুচক্রে পড়িয়া চাঁদ খাঁ সে দিন তাহার সঙ্গে গেল—দলে মিশিয়া পূর্ব্ব প্রবৃত্তি পুনরুদ্দীপ্ত হইল—শুধু সে দিন নয়, আরো গেল—মিশিল—উৎসাহ বাড়িল!

দুশ্চরিত্রতা শোধন পক্ষে সাধুসঙ্গ যেমন শ্রেষ্ঠ উপায়, সংশোধিত চরিত্রের পুনঃপতন পক্ষে কুসঙ্গের উৎসাহ তেমনই সর্ব্বনাশক পথ! আমরা কত বঙ্গীয় যুবককে একদিন দেখিলাম সুরাদি পরিত্যাগে স্থির-সংকল্প,হায়! পরদিন আবার পূর্ব্বসঙ্গী জুটিয়া সেই শুভ-ব্রত-পথে কণ্টক হইয়া কি কুহক মন্ত্রেই সেই কালীয়দহে ডুবায়! দ্বিতীয়বার চৈতন্য লাভ; দ্বিতীয়বার প্রতিজ্ঞা এবং যে

পর্য্যন্ত পূর্ব্ব রঙ্গের রঙ্গী কোন উত্তেজক সঙ্গী আবার ভুলাইতে সুযোগ না পায়, সে পর্য্যন্ত সে প্রতিজ্ঞা কি অটুটই থাকে!

যখন সুশিক্ষিত সুসভ্য বাবুদের দশা এই, তখন ক্ষুদ্র-প্রাণ মূর্খ চাঁদ খাঁর নিকট অধিক আর কি প্রত্যাশা? চাঁদ খাঁ মজিল! কিন্তু মজিবার পূর্ব্বে দাউদ খাঁকে শপথ করাইল যে, হত্যাদি নিষ্ঠুর কাজে লিপ্ত হইবে না, কেবল ঘৃণিত শিখদের অনিষ্ট ও ক্ষতিমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে। কপট দাউদ খাঁ কিছু দিন সে শপথানুসারে কাজ করিয়া মুখপাত দেখাইল; কিন্তু অবিলম্বেই স্বমূর্ত্তি ধরিয়া এমন একটী নৃশংস হত্যা (চাঁদ খাঁর অজ্ঞাতসারে) করিয়া তুলিল এবং তাহাতে এমন একটী কৌশল খাটাইল যে, আত্ম-দোষ অপ্রকাশ রহিল; কিন্তু নির্দ্দোষী চাঁদ খাঁই যেন দোষী, এমনি প্রমাণ করাইয়া দিল!

এদিকে উপযুক্ত উকীল অন্বেষণে বহু দিন গেল। সে সময়ের মধ্যে চাঁদ খাঁর দুই একখান পত্রও ডুলীন পাইলেন। সেই সব পত্র মধ্যে আর সে প্রকার "অনুমতি-ভিক্ষার" নাম গন্ধও নাই! ডুলীন ভাবিলেন, চাঁদ বুঝি তবে লাহোর ত্যাগের অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া স্বীয় কর্ম্মে পূর্ব্বের ন্যায় নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছুক আছে—ভালই হইয়াছে! এইরূপে চাঁদের সন্তোষ কল্পনা করিয়া নিজেও সন্তোষ পাইলেন—নিশ্চিন্ত হইলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বামী-ধর্ম্ম।

প্রভাতে বেলুনারোহণে ডুলীন সঙ্গিগণ-সঙ্গে মনোরঙ্গে পার্ব্বতীয় বাসন্তী সমীরণ সেবন করিতেছেন, এমত সময় সম্মুখে এ কে? "ঐ না চাঁদ খাঁ আসিতেছে?" বন্নু সেলাম করিয়া কহিল "হুজুর! তাই বটে!"

"এ কি? তুমি এখানে কেন? না বলা না কওয়া, আপন কর্ম্ম ফেলিয়া তুমি যে হঠাৎ আইলে?" এরূপ সকোপ প্রশ্নোত্তরে চাঁদ খাঁ কুর্নিস সহকারে সবিনয়ে কহিল "হুজুর! মাপ করিবেন—গোলাম কুচক্রে পড়িয়া বড় ভুলের কাজ করিয়া ফেলিয়াছে! (ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) যিনি সকল প্রভুর প্রভু, তিনি ভ্রান্ত পুত্রগণের দোষ অপরাধ মার্জ্জনা করেন! এ গোলামের বুদ্ধির ভুল হইয়াছে, কিন্তু (বক্ষে চপেটাঘাত) আল্লা জানেন, হৃদয়ের ভুল

হয় নাই—গোলাম বিশ্বাস ভঙ্গ করে নাই—গোলাম যাহা কিছু করিয়াছে, দুষ্টদের ষড়যন্ত্রে পড়িয়াই—সরল প্রাণে না বুঝিতে পারিয়াই করিয়াছে—গোলাম হুজুরের সন্তান, সন্তানকে মাপ করিতে হইবে!”

পাগলের মত এইরূপ বকিতে বকিতে ইঙ্গিতে নির্জ্জনে বলিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তুলীন তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া বিরল গৃহে আসিয়া সমস্ত শুনিলেন। চাঁদ খাঁ আমূল বর্ণন করিয়া শেষ বলিল “হুজুর! দোহাই ধর্ম্মের! দুষ্ট ধ্যান সিংহের ষড়যন্ত্রের প্রধান যন্ত্রী মেয়াব খাঁই হত্যা করিয়াছে, আমি কিছু মাত্র জানি না—আমাকে ফাঁদে ফেলিবে বলিয়া অন্য ছলে লইয়া গিয়া এবং আমাকে একখান পশ্‌মিনা যে দিয়াছিল, তাহা দেখাইয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছে! হুজুর! আমাকে যখন প্রণয়োপহার ছলে পশ্‌মিনা দিয়াছিল, তখন জানিও না যে হত্যা করিয়াছে।

তুলীন। কাহাকে হত্যা করিয়াছে?

চাঁদ খাঁ বলিল, “হুজুর! আপনি নাউরিয়াদের জানেন তো? তাহারা পশ্চিম ভারতের অতি শিষ্ট সদাগর—তাহারা কাহারো কোন অনিষ্ট করে না ও শঠতা প্রবঞ্চনা জানে না—তাহাদের প্রতি কোন মুলতানী কদাপি কোন বিদ্বেষ ভাব রাখে না। পাপিষ্ঠ মেয়াব আপনার ন্যায় সহচরগণ সঙ্গে সেই নিরীহ বণিকদলকে আক্রমণ, তাহাদের দলপতিকে খুন এবং তাহাদের বহু সহস্র মুদ্রার দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে। কিরূপে যে সে ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহার বিশেষ কিছুই জানি না; অথচ প্রকাশ্য দরবারে আমার বিরুদ্ধে হত্যাপরাধের অভিযোগ উপস্থিত হইল। আমি শপথ পূর্ব্বক অস্বীকার করিলাম। কিন্তু মেয়াব খাঁকে মীরগাঁই* রূপে হাজির করা হইল—আমি সর্দ্দার, সে এবং অন্যান্য লোক আমার সহকারী, দুরাত্মা অবলীলাক্রমে এইরূপ সাক্ষ্য দিল! আমি পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া আপন নির্দ্দোষিতা জানাইলাম। কিন্তু সেই পশ্‌মিনা আমার গায় ছিল, দুরাত্মা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে হাসিয়া দেখাইয়া দিল! সেই বস্ত্রে অধিকারীর চিহ্ন ছিল—কয় জন নাউরিয়া ও তাহাদের ভৃত্যগণ চিনিল—অপর প্রমাণের আর আবশ্যক হইল না! তথাপি আমি পশ্‌মিনা প্রাপ্তির বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলাম, কিন্তু সে কথা আর কে শুনে? রাজা ধ্যান সিংহ মেয়াবকে তখনই জমাদারিতে নিয়োগের হুকুম দিয়া আমাকে বলিল

* যাহাকে ইংরাজীতে Queen's evidence বলে।

'এক দিন মেয়াদ দিতেছি,ইহার মধ্যে দোষ স্বীকার করিস ভালই, নচেৎ কল্য তোকে কোতয়ালিতে চেরাকলে আর ঘুগুরা কলে ফেলিয়া দেখা যাইবে তোর নষ্টামি ভাঙে কি না—যতক্ষণ না সত্য বলিবি, ততক্ষণ যন্ত্রণা পাইবি।'

"হুজুর! তখনই আমাকে ধরিয়া বেড়ী পরাইয়া অন্ধ-কূপ-কারাগারে নিক্ষেপ করিল। সেই দিনে ধ্যানসিংহের এক লোক আসিয়া দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করিল 'যদি এখনও রাজা বাহাদুরের কথা রাখ ও সাহেবের পক্ষ ত্যাগ কর, তবে নিষ্কৃতি এবং প্রচুর পুরস্কার পাইয়া আবার যে উকিল সেই উকীলই থাকিতে পাও।' আমি ঘৃণার সহিত সেই বিশ্বাসঘাতিতার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলাম। বলিলাম 'তোদের যা ইচ্ছা কর্, আমি নেমখারাম হইতে পারিব না।'

"পর দিন সেইরূপ প্রশ্নের সেইরূপ উত্তর পাওয়াতে আমাকে নিদারুণ প্রহার করিল। শেষে যখন মৃতবৎ হইয়া পড়িলাম, তখন উপুড় করিয়া ফেলিল; হাত পা ছড়াইয়া দিয়া বাঁধিল; পীঠে ও কোমরে বড় বড় পাথর চাপাইয়া চলিয়া গেল। আমি কতক্ষণ এরূপে ছিলাম, বলিতে পারি না, কারণ প্রহারে আমার জ্ঞান চৈতন্য গিয়াছিল। যখন চৈতন্য হইল, তখন রাত্রি; দেখি কারাধ্যক্ষ রাম সিংহ পাথর তুলিয়া বাঁধন খুলিয়া আমার মুখে বুকে জল দিতেছে। তৃষ্ণায় আমি ব্যাকুল, আমার ইঙ্গিতে জল পান করাইল। রাম-সিংহের সদয় ব্যবহার দেখিয়া ও স্নেহের বাক্য শুনিয়া বিস্ময় মানিলাম। রাম সিংহ বলিল—'কি করি ভাই, দুরাত্মাদের ভয়েই তাহাদের সাক্ষাতে তোমার প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য ও নির্দ্দয় ব্যবহার প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম; তাহাদের কথার ভাবেই তোমাকে নির্দ্দোষী বলিয়া জানিয়াছি। আমি এমন নিদারুণ দুর্জ্জন প্রভুর অধীনে আর থাকিতে চাহি না; তুমি যদি তোমার সাহেবের নিকট আমার পরবস্তি করিয়া দিতে স্বীকার পাও, তবে এখনই তোমাকে মুক্ত করি ও আমিও তোমার সঙ্গী হইয়া এ পাপের কর্ম্মে মুক্তি পাই।

"হুজুর! আমি তখন চিঁ চিঁ করিতেছি, কিন্তু দয়ালু রাম সিংহের প্রস্তাবে তখনই যে সম্মত হইলাম, তাহা আর বলা বাহুল্য। রাম সিংহ বলিল 'কিন্তু এ অবস্থায় তুমি ঘোড়া চড়িয়া যাইতে পারিবে না, তাহা বুঝিতে পারিয়া আমি তোমার চাকরকে ডুলি আনিতে বলিয়াছি; সে আনিয়াছে। আপাততঃ তোমাকে লুকাইয়া রাখিবার স্থানও ঠিক করিয়াছি, চল সেখানে যাই—

বিলম্ব করিলে এমন সুযোগ আর ঘটিবে না—দুরাত্মারা আমাকে বড় বিশ্বাস করে না, ইদানী সর্ব্বদাই সন্দেহ করে।'

"আমার চাকরের সাহায্যে রাম সিংহ আমায় ধরিয়া তুলিয়া ডুলিতে লইয়া গেল। লাহোরের বাহিরে উপনগরে তাহার এক আত্মীয়ের বাটীতে কয় দিন লুকাইয়া রাখিয়া ও স্বয়ং নিকটে থাকিয়া আমার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। যখন কিছু সবল হইলাম, আমার চাকর গোপনে গিয়া আমার ঘোড়া ও আর দুইটী ঘোড়া আনিল। দিবাভাগে লুকাইয়া থাকি, আর রাত্রে রাত্রে চলি, এইরূপে বহু ক্লেশে হুজুরের চরণ সমীপে তিনজনে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। যে বৃদ্ধ শিখকে আমার ও আমার চাকরের সঙ্গে আসিতে দেখিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই রাম সিংহ। যদিও প্রাচীন হইয়াছে, কিন্তু জোয়ানের কাজ করিতে এখনও সম্পূর্ণ সক্ষম, অতএব হুজুরের যেমন দয়া হয়।"

চাঁদ খাঁ সমুদয়ই যে সত্য বর্ণনা করিল, তাহা দুলীন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার জন্য চাঁদ অসম্ভব যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে—মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াও বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা ও স্বামী ধর্ম্ম রাখিয়াছে, এইটী হৃৎ-প্রত্যয় হইবা মাত্র দুলীনের স্নেহশীল অন্তঃকরণ তাহার প্রতি যে প্রকার ভাবে গলিল, সে ভাবের নামকরণ করা দুরূহ! চতুর চাঁদ তাঁহার মুখছাঁদ ও নয়নের ভাব দেখিয়াই কতক তাহা বুঝিয়া লইল।

বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া দুলীন কহিলেন, "চাঁদ! তুমি যেরূপ বিশ্বাস ও নেমকের কাজ করিয়াছ, তাহা আমার ন্যায় অবস্থাপন্ন লোকের মধ্যে আর কেহ পারে কি না সন্দেহ; তজ্জন্য তোমার পুরস্কার, মঙ্গল ও উন্নতির ভার আমার প্রতি গুরুতর রূপে বর্ত্তিল। কিন্তু গুণের কথা যেরূপ বলিলাম, দোষের কথাও সেইরূপ বলা উচিত; তুমি যে অসহ্য কষ্ট পাইয়াছ ও উচ্চ ভদ্র পদ হারাইয়াছ, তাহা আমার জন্যই নয়—তোমার নিজ কুবুদ্ধিরও জন্য। আমার জন্যই তোমার প্রতি ধ্যান সিংহের আক্রোশ বটে; কিন্তু তুমি যদি খাটি থাকিতে—অতি জঘন্য পূর্ব্ব পাপের গহ্বরে ইচ্ছাপূর্ব্বক আঁধারে পা বাড়াইয়া না পড়িতে, তবে ধ্যান সিংহের শত চক্রান্তেও কিছু করিতে পারিত না! তুমি যখন কয়েক বৎসর সল্লোকের ন্যায় উচ্চ ওকালতি কার্য্য সুচারুরূপে করিয়া আসিতেছ, তখন সে তোমার পূর্ব্বজীবনের কুকাহিনী ও কলঙ্ক তুলিয়া কিছুই করিতে পারিত না। দুর্নীতি-কুশল প্রধান মন্ত্রী তাহা বেস জানিত,

তাই মেয়াব খাঁর ন্যায় চণ্ডালকেও সহায় করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তোমাকে নূতন পাপে জড়াইবে বলিয়াই এই ফাঁদ পাতিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কি? তুমি স্বেচ্ছায় সে ফাঁদে পা না দিলে দুরাত্মারা কিছুই করিতে পারিত না। তুমি আমার দৃঢ় আদেশ ও উপদেশ ভুলিলে—আমার নিকট তুমি যে পুনঃ পুনঃ দৃঢ় শপথ ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, সে সব ভুলিয়া সেই ফাঁদে পা দিলে, তাই না তোমার নিজের সর্ব্বনাশ ও আমার বিশেষ অনিষ্ট ঘটাইলে—কিছু-তেই আমার শত্রুর পক্ষে যাইবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াও পাকে প্রকারে আমার শত্রুর মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ করিলে! আমার এই ঘোর বিভ্রাটের সময় দরবারে আমার পক্ষে এক প্রাণীও রহিল না—উকীল রাখা দরবারের নিয়ম ও মহা-রাজার আজ্ঞা, সে উকীল রহিল না! তাহাতে শত্রুর বল বৃদ্ধি হইবে এবং তোমাকে যদি আশ্রয় ও প্রশ্রয় দান করি, তাহাতে শত্রু পক্ষ ছল ধরিবে যে, 'কারাগার হইতে খুনে আসামী ও বিশ্বাসঘাতক কারারক্ষক পলাইল, সাহেব সেই দুইজনকেই আশ্রয় দিয়াছে—সাহেব এমনি খয়ের খাঁ চাকর!"

চাঁদ খাঁ। না, হুজুর! দরবারে আপনার উকীল থাকিবে না, চাঁদ খাঁ এমন কাঁচা কাজ করিবার লোক নয়! যখন মেয়াবের সংশ্রবে পড়িলাম, তখন ভাবিলাম, কি জানি আমার কখন্ কি হয়, এই জন্য হুজুরের সই-মোহর-করা একখানি ওকালত নামা প্রস্তুত করিয়া লালা সুখনলাল নামা একজন সুবুদ্ধি, বিশ্বাসী ও সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানীকে উকীল করিয়া দিয়াছিলাম—সেই এখন কাজ করিতেছে। হুজুরের সই মোহরের নাম শুনিয়া হুজুর চমকিয়া উঠিতেছেন—আশ্চর্য্য হইতেছেন; কিন্তু হুজুর অবশ্যই জানেন, দু এক টাকা দিলেই লাহোরে এমন জালিয়াত অনেক আছে যে, যাহার তাহার স্বাক্ষর অনায়াসে নকল করিয়া দিতে পারে! আর হুজুরের মোহর তো আমার কাছেই ছিল!

জুলীন। যা হউক চাঁদ খাঁ, তোমার জিহ্বা যেমন যাহা মুখে আইসে তাহাই বলে, তোমার স্পর্দ্ধাও তেমনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া ফেলে! কিন্তু এ প্রসঙ্গ এখন আর না—যথেষ্ট হইয়াছে—তুমি যে কাজ করিয়া আসিয়াছ, তোমার সহিত এখন বিরলে অধিক কথাবার্ত্তা কহিলে ভাল দেখায় না। আমি অন্তরের সহিত তোমার দোষ মার্জ্জনা ও গুণ গণনা করিতেছি, কিন্তু আপাততঃ তোমাদের প্রতি যেন অত্যন্ত কুপিত ও প্রতিকূল হইয়াছি, এমন ভাব দেখাইতে এবং দৃশ্যতঃ তোমাকে কিছু দিনের নিমিত্ত কয়েদীর ন্যায়

রাখিতে বাধ্য হইব। ইহাতে বিরূপ ভাবিও না—বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে।

চাঁদ খাঁ। হুজুর! আপনি মা বাপ—যাহা ইচ্ছা করুন, কেবল পাপিষ্ঠ-দের হাতে না পড়ি, এইটী হইলেই চাঁদ খাঁর আর কিছুতেই ভয়, ভাবনা, অসন্তোষ নাই।

দুলীন। সে জন্য চিন্তা করিও না—তোমাকে অন্য কারাগারেও রাখিব না—আলিবর্দ্দির নিকট নজরবন্দি থাকিবে—তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য বলিও না। আর রাম সিংহকে নাম পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক কিছু দিন অপ্রকাশ্য ভাবে থাকিতে বল—তাহার ভার হাকিম সিংহের প্রতি দিব—কোন চিন্তা নাই, সে সুখে থাকিবে ও প্রয়োজনমত কার্য্য করিতে পাইবে।

প্রকাশ্য দরবারে আলিবর্দ্দিকে ডাকাইয়া রুক্ষভাবে ঐরূপ আদেশ দেওয়া হইল। সকলেই, বিশেষতঃ আলি ও অন্যান্য মূলতানীরা চাঁদ খাঁর এই দুর্গতি দেখিয়া অবাক্ ও অসন্তুষ্ট হইল। অধিক কি, চৈতনও চাঁদ খাঁর নিমিত্ত বিনয় সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

অবিলম্বে লাহোর হইতে এক পত্র ও পরওয়ানা আইল। তন্মর্ম্ম এই-রূপ;—"দরবারে আসিতে পূর্ব্বে তোমাকে লেখা হইয়াছে, অদ্যাপি সে হুকুম তামিল না করাতে তোমাকে পুনর্ব্বার লেখা যায়, তুমি পত্র পাঠ আসিবে; তোমার নিকাশিতে অনেক বাকী বকেয়া পড়িতেছে, তাহা পরিষ্কার করা তোমার আশু কর্ত্তব্য; তজ্জন্য ও অন্য বিশেষ কারণে তোমার উপস্থিতি নিতান্ত আবশ্যক, কার্য্য শেষ করিয়া আবার তুমি কাংরায় ফিরিয়া যাইবার অনুমতি পাইবে।"

এই পর্য্যন্ত পড়িয়া দুলীন হাসিয়া স্বগত বলিলেন "রাজাজী! একি আর কোন শাসনকর্ত্তা বা জায়গিরদার পাইয়াছ যে, বাকী টানিবে—তোমার সাধ্য কি, সে ছল ধরিয়া মহারাজার মন গরম করিবে—মহারাজা তাহা বিলক্ষণ জানিতেছেন।"

আবার পড়িতে লাগিলেন—"তোমার উকীল চাঁদ খাঁ অতি দুর্ব্বৃত্ত লোক, সে হত্যা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে; সে তাহার রক্ষক সহিত পলাই-য়াছে; তাহারা দুজনে অবশ্যই কাংরায় গিয়া থাকিবে; তোমাকে লেখা যায়

যে, গত মাত্র তাহাদিগকে লৌহ-শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া এখানে পাঠাইবে। তোমার নূতন উকীল সুখনলাল সুযোগ্য ও উত্তম লোক বটে; তাহাকে দরবারে হাজির থাকিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে; এমন সদ্ব্যক্তিকে ওকালতি দিয়া ভাল করিয়াছ—এরূপ লোক পূর্ব্বেই নিযুক্ত করা উচিত ছিল। যাহা-হউক,এই পরওয়ানার লিখিত হুকুম বড় তাগিদ জানিবা—ক্ষণ বিলম্ব ব্যতীত সে সব তামিল করিবা ইতি।”

সেই দিনের রজনীতে আলিবদ্দির দ্বারা চাঁদ খাঁকে গোপনে আনাইয়া ঢুলীন তাহাকে দরবারের পরওয়ানা শুনাইয়া তৎসম্বন্ধে নিজ দায়িত্বের গুরুত্ব বুঝাইয়া শেষে বলিলেন “আমার স্বাধীন হইবার ইচ্ছাও নাই, শক্তিও নাই; কিরূপে তোমাকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করি ইহাই চিন্তা—ধ্যান সিংহ যে অল্পে ছাড়িবে, এরূপ বোধ হয় না! এখন করি কি?”

চাঁদ খাঁ উত্তর দিল “তলয়ার! কেবল তরবারই এ রোগের ঔষধ। কেবল তলয়ার দ্বারাই দুর্জ্জনদলের জুলুম জালের গ্রন্থি সকল কাটিতে হইবে। আপনার অসাধ্য কি আছে? আপনার সহায় কে না হইবে? যাহাকে এখন সমস্ত রাজ্য মহারাজা বলে,যিনি একাকী রাজ্যকে সাম্রাজ্য করিয়া তুলিয়াছেন, তিনি কি ছিলেন? পৈতৃক এক ঘোড়া আর এক তলয়ার মাত্র ছিল—সে সময় তাহার ক্ষমতা ও অধিকার হুজুরের অপেক্ষাও হীন। সকলেই তাঁহার প্রতিকূল—চতুর্দ্দিকেই শত্রু—বারটা মিশলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণ মিশলের কর্ত্তা—বালক রণজিতের আপন পরিজন রক্ষার নিমিত্ত কাংরার ন্যায় একটু নিরাপদ দুর্গও ছিল না। ভেড়ার গোয়ালের ন্যায় গুজরাওলি দুর্গ তাঁহার মাথা গুঁজিবার স্থান এবং আর সকল ব্যক্তির সম্পত্তিকে নিজের করিয়া লওয়া তাঁহার মনে মনে উদ্দেশ্য, এতাবন্মাত্র ছিল। ইহাতেই বুদ্ধিবলে, সাহসবলে, (বাহুবলেও বটে,কিন্তু তত নয়) এবং অধ্যবসায় বলে,না করিলেন কি? না হইলেন কি? মেষ হইতে সিংহ হইয়া উঠিয়াছেন! হুজুরও মনে করিলে তাহাই হইতে পারেন—হুজুরের যোগ্যতার সীমা নাই,কেবল ইচ্ছা হইলেই হয়! গোলামের কথা শুনুন,পুরাতন সর্দ্দারগণের সহিত যোগ দিউন—তাহারা মনের ঝাল মনে মিটাইতেছে, অত্যাচারে শশব্যস্ত আছে—প্রস্তুত হইয়া আছে। একজন উপযুক্ত পরিচালক পাইলেই কপট অধীনতা ছাড়িয়া নিজ মূর্ত্তি দেখায়—কাংরা হইতে ডেরা ইস্মাইল খাঁ পর্য্যন্ত সমুদয় ,পার্ব্বত্য ও অন্যান্য রাজ্য প্রস্তুত;

কাশ্মীর প্রস্তত; মুলতানও প্রস্তত; ফতে সিংহ আলুয়ালা একপ্রকার প্রকাশ্য বিদ্রোহী; কেবল একজন যোগ্য কর্ত্তা পাইলেই—হুজুরের ন্যায় চালাক ও হুজুরের ইঙ্গিত মাত্র পাইলেই দলে দলে সব ক্ষেপিয়া উঠে—শিখ সর্দ্দারদের সঙ্গে পার্ব্বতীয় ক্ষত্রিয়গণের যোগ হইলে এবং আপনি তাহাদিগকে চালনা করিলে কি আর রক্ষা আছে? খাল্‌সা মাল্‌সা আকালি মাকালি কোথায় উড়িয়া যাইবে!"

তুলীন হাসিয়া বলিলেন "চিরদিনই চাঁদ তোমার সাহসিক বা দুঃসাহসিক মন্ত্রণা! কিন্তু আমি ধর্ম্ম ও বিশ্বাস ভঙ্গ করিব না! যাও, রাত্রি হইয়াছে, শয়ন কর গে—ভাগ্যে যাহা থাকে হইবে!" তথাপি চাঁদ অনেকক্ষণ রহিল।

চাঁদের নিকট ক্রমে কথাপ্রসঙ্গে অসন্তুষ্ট শিখ সর্দ্দার ও পার্ব্বতীয় ক্ষত্রিয় রাজগণের, বিশেষ সুদান রাজ্যের অবস্থাদি জানিয়া লইলেন। চাঁদ চলিয়া গেলে বহুক্ষণ ধরিয়া বহু চিন্তা করিলেন। শেষে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক আপনা আপনি বলিলেন "না, ক্ষণভঙ্গুর দেহ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের নিকট রাজ্য ধন কিছুই নয়—মহারাজার যেরূপ স্নেহ দয়া, দেখিতেছি পৈতৃক রাজ্য উদ্ধারের উপায়াভাব! তবে যদি, সেই স্নেহ দয়া ও আপনার ভক্তিমূলক সদ্ব্যবহারের পুরস্কার স্বরূপ সুদান রাজ্যটী জায়গির বলিয়া পাইতে পারি, তৎপক্ষে যত্ন করায় হানি নাই!"

পুনশ্চ চিন্তার পর যেন কোন অভিনব উপায় মনোমধ্যে সহসা সঞ্চারিত, এইরূপ হর্ষের উৎসাহে স্বগত বলিলেন "ভাল! চাকরী ত্যাগ করিয়া স্বাধীন কেন হই না? তখন তো বিশ্বাসভঙ্গের দোষ থাকিবে না! চাঁদ খাঁ বলিল এবং অপর সূত্রেও ইঙ্গিত পাইয়াছি, পার্ব্বত্য ক্ষত্রিয়গণ (আমারই জ্ঞাতি-কুটুম্ববর্গ) স্বাধীনতার প্রয়াসে কি একটা ষড়যন্ত্র নাকি করিতেছে; আমি যদি লাহোরের অধীনতা পদ বর্জ্জন পূর্ব্বক তাহাদের নেতা হইতে যাই, তাহারা হাত বাড়াইয়া চাঁদ পাইবার ন্যায় পরমোৎসাহে আমাকে মস্তকে রাখিবে! গুলাপীর মুখে আমার তেজস্বী মাতামহবংশের কথাও শুনিয়াছি—সিম্‌লা পর্ব্বতের সান্নিধ্যে তাঁহাদের গিরিময় রাজ্য—তাঁহারা দলে অল্প বটে, কিন্তু ভুজ-বলে সাক্ষাৎ হুতাশন—এ পর্য্যন্ত হিন্দু, যবন, শিখ, কেহই তাঁহাদিগকে অধীনতা শৃঙ্খল পরাইতে পারে নাই! প্রথমে তাঁহাদের নিকট সদলবলে গমন পূর্ব্বক প্রমাণ সহিত পরিচয় দিয়া মাতুল চোহানরাজের আশ্রয়ে থাকিয়া সেই

দুরভিগম্য কুলু * প্রদেশকেই আমার বিশাল কার্য্যানুষ্ঠানের কেন্দ্রস্থল করিয়া তুলি; তথায় সৈন্যসংগ্রহ ও তথা হইতে প্রপীড়িত রাজন্য ও সর্দ্দারবর্গের উৎসাহ ও বল-বর্দ্ধনাদির সমুদয় ব্যবস্থা করিয়া পরে যথাকালে মহা-নদের প্রপাত তুল্য পর্ব্বত চূড়া হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সর্ব্ব উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করিতে পারি!”

কল্পনা-তরী-যোগে এই নব ভাব তটিনীর শাখা প্রশাখা বাহিয়া ডুলীন যতই যাইতে লাগিলেন, ততই স্বার্থ-পুলিনের মনোহারিতা, কুল-গর্ব্ব রূপ বালু-চরের মাধুর্য্য এবং দূরস্থ কীর্ত্তি-শৈলের অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হইতে লাগিলেন! কিন্তু যখন কল্পনা-তরণী হইতে নামিয়া ধর্ম্মনীতির কর্কশ গুহা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমাজের অনাদৃত ফলমূলাহারী (কভু বা বাতাহারী) “ন্যায় বুদ্ধি” নামা কৃশ তপস্বীর সহিত পরামর্শ করিলেন, তখন তাঁহার উপদেশ ও পরামর্শের সহিত স্বীয় যুক্তি মিলাইয়া সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে বুঝিতে পারিলেন যে, “না, তাহা হইতে পারে না—তাহাতেও প্রায় সমান বিশ্বাস-ভঙ্গ—সমান অকৃতজ্ঞতা—সমান অধর্ম্ম! যাঁহার প্রসাদে কাঙ্গাল অবস্থা হইতে এই উচ্চপদ পাইয়াছেন—যাঁহার অভাবনীয় অপার দয়ার প্রভাবেই পৈতৃক রাজ্যোদ্ধারোপযোগী বর্ত্তমান যোগ্যতা ও সুযোগ প্রাপ্ত হইতেছেন—যাঁহার আশাতিরিক্ত অপরিসীম বিশ্বাস-স্থাপন জন্যই ও যাঁহার ধন লইয়াই অধীন সৈন্য-বাহিনী প্রস্তুত বা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারই মস্তকে খড়্গাঘাত করণ জন্য তাঁহার চাকরি ত্যাগ করা ধর্ম্মের কর্ম্ম হইতে পারে না—তাঁহারই কিরণে ক্ষমতাশালী হইয়া এখন সেই ক্ষমতা তাঁহারই বিরুদ্ধে চালনা করা কোন অবস্থাতেই ন্যায়সঙ্গত কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না! অতএব বল-প্রয়োগ দ্বারা বাঞ্ছা পূরণের প্রস্তাব, যাহা স্বপ্নবৎ একবার কল্পনায় উদিত হইল, তাহাই ভাল—আর যেন এমন স্বপ্ন কখনই না দেখিতে হয়, হৃদয় ও মনকে এরূপ সুদৃঢ় করাই উচিত। এবং এ স্বপ্ন দেখিবার পূর্ব্বে

* কুলু নামক ক্ষুদ্র রাজ্যটী অদ্যাপি সিমলা পাহাড়ের নিকট অর্দ্ধ স্বাধীনাবস্থায় আছে; তৎকালে তৎসম্বন্ধে স্যার হেনিরি এইরূপ লিখিয়াছিলেন;—“This is a hill state, situated to the North-West of the British Station of Simlah, and lying along the Sutlej: wild and inaccessible, the pinnacles studded whith forts, and the country inhabited by a bold and active race, little inclined to submit to any yoke.”

যিটী মনে উঠিয়াছিল—স্বামী ধর্ম্ম পালনের পুরস্কার স্বরূপ পৈতৃক রাজ্যোদ্ধা-রের যে সংকল্প হইয়াছিল, তৎপক্ষে যত্ন পাওয়াই কর্ত্তব্য।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

জীবন ব্রত।

রাজ-দূত অপেক্ষা করিতেছে. একখান প্রত্যুত্তর তো লেখা আবশ্যক। চাঁদ খাঁর নিমিত্ত ভাবিয়া সে রজনীতে তুলীনের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিল। তুলী-নের কোন অনুষ্ঠানেই প্রধান মন্ত্রী যথার্থতঃ দোষ দেখাইতে সমর্থ হইবেন না! তবে মিথ্যা দোষারোপ? সে স্বতন্ত্র কথা! তাহাতে আত্মগ্লানি তো হইবে না—নিজে নিষ্পাপ, এ আত্মপ্রসাদ তো রহিবে! সুতরাং তজ্জন্য চিন্তা কি? কিন্তু পাছে চাঁদ-খাঁ-সংক্রান্ত অপরাধ, একটী যথার্থ অপরাধ রূপে নিজ মনেও গণ্য করিতে হয় এবং পাছে এই ছল ধরিয়া বিপক্ষেরা বল করিয়া উঠে,ইহাই চিন্তা।

চৈতন মারামারি কাটাকাটি ভিন্ন আর সকল শাকেই আছেন—কেহ না বলিতে কহিতে আপনিই সর্ব্ব ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব করিয়া বেড়ান—রাজ দূত আইলে তাহাকে যত্ন করা, আহার্য্য ব্যবহার্য্য দেওয়া, কি জন্য আসিয়াছে (দূত যদি জানে) তাহা বাহির করিয়া লওয়া, এ সমস্ত কাজে তিনি বিশেষ ব্যস্ত থাকেন! এবারে দূত কি জন্য আসিয়াছে, তাহা দূত জানে. সুতরাং চৈতনও জানিতে পারিয়াছেন।

প্রাতে দূত চৈতনকে কহিল যে,"বেলা হইতেছে, প্রত্যুত্তর এখনও পাওয়া গেল না, তাহাতে রৌদ্রে বড় কষ্ট হইবে।" চৈতন তৎক্ষণাৎ প্রভুর কার্য্য-মন্দিরে গেলেন। গিয়া দেখেন, তুলীন একবার করিয়া লিখিতেছেন আর ছিঁড়িয়া ফেলিতেছেন। চৈতন বুঝিলেন। চৈতনের একটী গুণ আছে, মনে যাহা উদয় হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ ফুটিয়া বলেন—চৈতন বলিলেন—"হুজুর! কিসের এত ভাবনা? এ রাজ্যে এই রীতি যে, যে সর্দ্দারের যে চাকর বা প্রজা বা অধীন লোক যে কোন দোষ করে, তিনিই তাহার সাজা দিয়া থাকেন। চাঁদ খাঁ আপনার চাকর. লিখিয়া দিউন, আপনিই তাহার বিচার ও দণ্ড করিবেন।"

দুলীন যেন সূতার খেই হারাইয়াছিলেন, চৈতন যেন খেই ধরিয়া দিলেন! দুলীন দৃষ্টি দ্বারা সন্তোষ ও মস্তক চালন দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক খস্ খস্ করিয়া সেই ভাবে উত্তর লিখিয়া দিলেন! অবশেষে লিখিলেন ;—"অতএব চাঁদ খাঁর উচিত দণ্ড যাহা হয়, আমিই দিব—মহারাজকে এই সামান্য বিষয়ের জন্য কষ্ট পাইতে হইবে না—তাহাকে কয়েদে রাখিয়াছি—তাহার বিচারও এক প্রকার করিয়াছি। তাহাতে আমার বোধ হইল, সে হত্যা পাপে লিপ্ত নয়, অন্যবিধ অপরাধে অপরাধী হইতে পারে। যাহাহউক, প্রচলিত প্রথানুসারে আমার চাকরের দণ্ড আমিই যথা-বিহিত-রূপে প্রদান করিব।"

প্রত্যুত্তর চলিয়া গেল। দুলীন আশ্চর্য্য ভাবিলেন, পরওয়ানার মধ্যে সুচেৎ সিংহের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ নাই কেন? অনুমান করিলেন, হয় তো লজ্জার কাহিনী সুচেৎ বা তদগ্রজ গোপন রাখিতে বাধ্য হইতেছে। যাহাহউক, দুলীন মনে জানেন যে, তিনি ক্ষমতা ও কর্ত্তব্যের বহির্ভূত কিছুই করেন নাই—স্বীয় প্রভুর আদেশানুসারেই কার্য্য করিয়াছেন। তজ্জন্য ভয়ের বিষয় কিছুই হইতে পারে না। বিশেষতঃ লেনা সিংহের সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য ও সুচেতের শিবিরাক্রমণ কাজে লেনা সিংহের সহযোগিতা দুলীনের পক্ষে বিশেষ হিতজনক ঘটনা। কারণ লেনা সামান্য ব্যক্তি নহেন, রাজসভায় তাঁহার প্রচুর মান ও প্রভুত্ব। দুলীন আত্মরক্ষা জন্যই সুচেৎকে আক্রমণ করিয়াছেন, লেনা সিংহের পক্ষে সেরূপ কোন কারণ বিদ্যমান ছিল না, সুতরাং তাঁহার সহানুভূতি বরং অধিক দোষের বিষয় হইতে পারে। তথাপি লেনা যখন এ কাজ করিতে সাহসী হইয়াছেন এবং এ পর্য্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে যখন একটা কথাও কেহ তুলে নাই, তখন বোধ হয়, সেই লজ্জাজনক পরাভবের কথা লইয়া বেশী গোলযোগ বাধাইতে "ভ্রাতৃত্রয়ের" বড় একটা ইচ্ছা নয়!

যাহাহউক দুলীন লেনা সিংহের প্রতি অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন—তাঁহাকে সর্ব্বাদাই উপহার, বিশেষতঃ মৃগয়া-লব্ধ ও বনপর্ব্বত-জাত দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি সহিত বাধ্যতা-বোধক পত্রাদি পাঠাইতে লাগিলেন—স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক সমাদরে কাংরায় আনিলেন। উভয়ের মিত্রতা ক্রমশঃ আরো সুদৃঢ় হইয়া উঠিল।

যথাকালে দুলীনের পত্রোত্তরে দরবার হইতে ফকিরজীর স্বাক্ষরিত এক লিপি আইল। সে পত্র অতি রুক্ষ ভাবে লিখিত। চাঁদ খাঁ সম্বন্ধে দুলীন যাহা

লিখিয়াছিলেন, মহারাজা তাহাতে অসম্মত এবং দুলীন যেন পত্রপাঠ দরবারে হাজির হয়েন, না হইলে হাজির করণার্থ সমুচিত উপায় অবলম্বিত হইবে, ইত্যাদি সে লিপির মর্ম্ম। দুলীনকে ফকিরজী যেরূপ আত্মীয়তা ও সৌজন্য সহকারে পত্রাদি লিখিয়া থাকেন, এ পত্রে তাহার বিন্দু বিসর্গও নাই। দুলীন বুঝিলেন, হয় কোন অজ্ঞাত কারণে ফকির যথার্থই প্রতিকূল হইয়াছেন, নয় তো ধ্যান সিংহের ভয়ে প্রতিকূলতার ভাণ মাত্র দেখাইতে বাধ্য হইতেছেন। শেষেরটীর উপরেই তাঁহার হৃদয় অধিক নির্ভর করিল।

সেই বাহক-হস্তেই নূতন উকিল সুখনলালও এক আরজি পাঠাইয়াছে। দুলীনের সহিত পাঠক মহাশয়েরও তাহা পাঠ করা উচিত। তন্মর্ম্ম এই;—

"গ্রহমণ্ডলে যেমন আদিত্য, পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা ও সর্দ্দারমণ্ডলে তেমনি হুজুরের নাম; যশঃ, কীর্ত্তি দীপ্তিমান আছে এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা, আরো হউক! যদিও এ দাস হুজুরের পুরাতন ভৃত্য নহে, কিন্তু শুভাকাঙ্ক্ষীর মধ্যে পুরাতন ও প্রধান, তাহাতে সন্দেহ মাত্র করিবেন না। অধীনের কার্য্যেই তাহা প্রকাশ পাইবে—বাক্যে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

"ধর্ম্মাবতার! সময় বড় কদর্য্য; বড়র দলে প্রায় সকলের মনই সন্দিহান —প্রত্যেকেই স্বীয় প্রতিবাসী বা প্রতিযোগীর উপর প্রহরিতার তীব্র দৃষ্টি রাখিতেছে—কাহাকে বিশ্বাস করা উচিত বা অনুচিত, কেহ স্থির করিতে পারে না—হুজুরের পক্ষে হুজুরের দীন প্রতিনিধিও সেই সংশয় দোলায় দুলিতেছে!

"স্বয়ং মহারাজার মন বিপর্যাস্ত হইয়াছে—তাঁহার স্বাভাবিক স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও ধৈর্য্য, এ তিনটী ভাবের এককালেই ব্যত্যয় ঘটিয়াছে—তাঁহার আকার ইঙ্গিতে দুশ্চিন্তা, অশান্তি ও বৈরক্তি স্পষ্ট বিরাজমান্ দৃষ্ট হইতেছে! হুজুরের বিপক্ষ বর্গদ্বারা মহারাজা অহর্নিশি পরিবৃত; হুজুরের বিরুদ্ধে তাহারা সর্ব্বদাই তাঁহার কর্ণাধিকার, মনোযোগাকর্ষণ ও হৃদয়াক্রমণ করিতেছে; অধিক কি, ভূপতির ভ্রমণ ও বিশ্রাম কালেও তাহারা ক্ষান্ত নয়।

"গত কল্য মহারাজা সালিমার উদ্যানে যাইতেছিলেন, আমরা সভাশুদ্ধ সংহতি ছিলাম; রাস্তার একটা মোড় ফিরিবা মাত্র পার্ব্বতীয় কৃষকের বেশধারী ত্রিশ চল্লিশ জন সহসা পথের পার্শ্ব হইতে মহারাজার অশ্ব সম্মুখে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে ভূতলে অবলুণ্ঠন পূর্ব্বক সকরুণ স্বরে কাংরার শাসনকর্ত্তা সাহেবের অতি নিদারুণ ঘোরতর অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত আর্ত্তনাদ করিল—চীৎকার

পূর্ব্বক শত শত দোহাই দিতে লাগিল! তাহাদের শরীর জীর্ণ, বদন বিশীর্ণ—যেন পেট পূরিয়া খাইতে পায় না! তাহাদের বস্ত্র অতি মলিন, নিতান্ত ছিন্ন—শত-গ্রন্থিময়; যেন অশনই জুটে না, বসন পরিবে কোথা হইতে! তাহারা প্রজা-পীড়ন ও লুণ্ঠনের বর্ণনা পূর্ব্বক হুজুরের নামে যে সব কলঙ্কারোপ আর দোষাদ্‌ঘোষণ করিল, তাহা এ দাস সবিস্তার লিখিতে অক্ষম; যেহেতু সে সব উক্তি অমর্য্যাদা-বাচক! হরকরা ও পাইকেরা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার ভাণ করিতে লাগিল, কিন্তু তাড়াইল না। চতুষ্পার্শ্বস্থ সর্দ্দারগণের অনেকের মুখে 'আহা! আহা! উঃ! প্রজাদের এত কষ্ট দেখা যায় না—এরা তো মানুষ বটে!' ইত্যাকারের দয়া-মায়া-করুণা-প্রকাশক বাক্য-স্রোত বহির্গত হইতে লাগিল! ঐ কৃষকদিগকে যে সাজাইয়া, গোজাইয়া, শিখাইয়া, পড়াইয়া আনা হইয়াছে, তাহা দৃষ্টিমাত্র এ অধীনের বোধ-লব্ধ হইল—অমনি চীৎকার পূর্ব্বক বলিলাম 'কখনই সত্য নয়—ইহারা কখনই কাংরার প্রজা নয়!' কিন্তু দুষ্ট সর্দ্দারগণের অত গোলমালের মধ্যে সে কথা মহারাজার কর্ণগোচর হইল কি না, নিশ্চয় বলিতে পারি না—সর্দ্দারেরা আমাকে ঠেলিয়া পশ্চাতে ফেলিল, আমি সামান্য ব্যক্তি, সাধ্য কি তাহাদের ঠেলিয়া অগ্রসর হই?

"রাজা ধ্যান সিংহ তাহাদিগকে প্রতীকারের আশ্বাস দিয়া বিদায় করিলেন—মহারাজা কিছুই বলিলেন না, কিন্তু অভিনয়টা যেরূপ সুন্দর প্রণালীতে প্রদর্শিত হইল, তাহাতে তাঁহার মন যে কিয়ৎপরিমাণেও বিচলিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, তাহা যাহারা তখন তাঁহার মুখ দেখিয়াছিল, তাহাদের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। বিশেষতঃ মহারাজা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত—উদ্যানে গিয়াও—পূর্ব্ববৎ হাস্য পরিহাস বা কথোপকথন করেন নাই, তাহাতেই চিন্তার লক্ষণ স্পষ্ট অনুভূত হইল। ইহাতে দুইই বুঝায়;—হুজুরের প্রতি সন্দেহ, প্রথম ভাব। মন্ত্রিগণের প্রতি সন্দেহ, দ্বিতীয় ভাব: অর্থাৎ হয় প্রজাপীড়ন সত্য ভাবিয়া দুঃখিত, নয় তো অভিনয়ের মর্ম্ম বুঝিয়া হুজুরের ন্যায় উচ্চতর বিমল-চরিত্র কর্ম্মচারীর প্রতি মন্ত্রিগণকে ষড়যন্ত্র হইতে দেখিয়া বিষাদিত! দুটির শেষটাই যেন ঈশ্বরের কৃপায় সত্য হয়!

"রাজা সুচেৎ সিংহ কাংরা হইতে আসিয়া বিপরীত বর্ণে চিত্র করিয়াছেন। তিনি বহু লোকের মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, তিনি সাহেবের কপট মিত্রতা ও শান্তিপূর্ণ কথায় প্রত্যয় করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে শিবিরে নিদ্রা

যাইতেছিলেন; সাহেব রাত্রিযোগে অসংখ্য সৈন্য লইয়া ছাউনিতে পড়িয়া তাঁহার সৈন্য সংহার করিয়া গেলেন। তিনি তো শত্রুর রাজ্যে যান নাই যে সতর্ক থাকিবেন! সরকারের চাকর দ্বারা সরকারী সৈন্যের উপর আক্রমণ হইবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর। তাঁহার সঙ্গে অতি অল্প সংখ্যক সৈন্য ছিল, বিশেষ নিরাতঙ্কে নিদ্রিত, তাহাতেই সাহেব নিস্তার পাইয়াছেন। যদি শাত্রবতার ভাব পূর্ব্বে জানিতেন ও দিবা বা সন্ধ্যাকাল হইত, তবে সেই অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়াই উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারিতেন—তথাপি তাঁহার অজেয় অল্প সৈনিক পরাজিত হয় নাই, বরং সাহেবের বহু সেনা বিনাশ পূর্ব্বক শেষে তাহাদিগকে হটাইয়া দিয়াছিল।

"জনৈক সভাসদ জিজ্ঞাসিলেন 'সাহেব এত অসংখ্য সৈন্য কোথায় পাইলেন?' সুচেৎ সিংহ উত্তর দিলেন 'কেন? কাংরা ও অন্যান্য পার্ব্বত্য দেশে কি লোক নাই? দেখিয়া ও শুনিয়া আইলাম, সাহেব প্রতিনিয়তই সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন এবং কোন কোন দুষ্ট সর্দ্দার ও ক্ষত্রিয় রাজার সহিত যোগও দিতেছেন! নৈলে কি এত বুকের পাটা হয় যে, সরকারী পরওয়ানা অবহেলা পূর্ব্বক সরকারী সৈন্য আক্রমণ করিতেও ভয় জন্মে না! আমি দরবারে এই গুরুতর সংবাদ দিবার জন্যই ফিরিয়া আইলাম, নতুবা যাহা হয় একটা শাসন না করিয়া ছাড়িতাম না।'

"হুজুর! মহারাজা জ্ঞানী—মহারাজা প্রায় সকলই বুঝিতে পারেন—কিন্তু একাধিপতি নৃপতি মাত্রেরই মন যে স্বভাবতঃ সন্দিগ্ধ, তাহা আর ক্ষুদ্রবুদ্ধি দাস জ্ঞানবান প্রভুকে কি বুঝাইবে। মাহারাজা যত শুনিলেন, ততদূর বিশ্বাস না করিতে পারেন; কিন্তু শুনিয়াছি, সভা ভঙ্গের পর সুচেত সিংহ যে সব সর্দ্দার ও রাজাদের নাম করিয়াছেন, তাহারা মহারাজার বিরুদ্ধাচারী, এজন্য রাজ-হৃদয় চিন্তা-ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে—কয় দিন তাঁহার পূর্ব্বকার মেজাজ দেখা যায় নাই—একদিবস স্বয়ং কাংরাভিমুখে যাত্রার নিমিত্ত উদ্যোগের আদেশও করিয়াছিলেন; জানিনা, কি কারণে তখন তাহা স্থগিত হইল। কিন্তু বহু সৈন্য সমাবেশ হইতেছে এবং তদুপযুক্ত নানা আয়োজন চলিতেছে; মহারাজ শীঘ্রই যে যাত্রা করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। জনরব তোলা হইয়াছে যে, পর্ব্বতাঞ্চলের কুলু ও মান্দি প্রভৃতি অবশিষ্ট স্বাধীন রাজ্য গুলিকে অধীন করণোদ্দেশেই যাওয়া হইবে; কিন্তু সে

কেবল ছল, কাংরাই গম্যস্থল—হয় তো স্বচক্ষে দেখিয়া যাহা হয় করিবেন, ইহাই অভিপ্রায়।

"লেনা সিংহের সহিত যাহাতে হুজুরের সৌহৃদা না থাকিতে পারে,তাহার উপায় চেষ্টা হইতেছে। শুনিতেছি, তাঁহাকে কাংরার শাসন-কর্তৃত্ব পদ প্রদানের প্রস্তাব দ্বারা সে অভিলাষ পূর্ণ করা হইবে—ইহা মহারাজার নিজের কি রাজা ধ্যান সিংহের কৌশল, তাহা সঠিক জানি না; বোধ হয় শেষোক্ত মহাশয়েরই হইবে।

"অতএব নিশ্চিত জানিবেন, শেষকালে প্রধান মন্ত্রী ছলে বলে এমন ব্যবস্থা করিয়া তুলিবেন যে, মহারাজার নিজের গমন রহিত হইয়া এই সমাহৃত বহু-সৈন্যের শিরে হয় গোলাপ সিংহ নয় সুচেৎ সিংহকে অধিস্থাপন পূর্ব্বক বিগত পরাজয়ের প্রতিশোধ ও হুজুরের হস্ত হইতে রাজ্যাধিকার হরণ জন্য তাহারা কংরায় প্রেরিত হইবে।

"হুজুর! রণজিতের বাহিনী পরাভব কাহাকে বলে, বহুকাল জানিত না। কাংরায় সেই পরাভব সংঘটন এবং দরবারের হুকুমনামার অমান্য লইয়া কুচক্রী দল নানা কথা রটাইতেছে। কিন্তু হাটে বাজারে হুজুরের কার্য্যের প্রকৃত অভিপ্রায় ও প্রকৃত ঘটনার বিবরণ অপ্রকাশিত নাই—জনরবের শত সহস্র মুখে হুজুরের প্রশংসাবাদে লাহোর ও সমগ্র পঞ্জাব পরিপূরিত হইয়াছে—শুদ্ধ সুচেতের প্রসঙ্গে নয়, হুজুরের অসাধারণ গুণমালা ও শাসন সংক্রান্ত সর্ব্বাঙ্গীণ যশঃধ্বনির স্রোত প্রতিনিয়তই তরঙ্গায়িত ভাবে প্রবাহিত হইতেছে—সকলেই, বিশেষ ব্যবসায়ীলোকে মুক্ত-কণ্ঠে কেবল গুণানুবাদ করিতেছে, আর বলিতেছে, লাহোর ও অমৃতসর প্রভৃতি প্রত্যেক স্থানে এমন শাসনকর্ত্তা পাইলে রণজিতের প্রজাদের ভাগ্যে রামরাজ্য হইয়া উঠে! তাহা শুনিয়া শুনিয়া শত্রুগণের হিংসা ও দ্বেষ শতগুণে অধিক প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।"

দুলীন এই সকল প্রতিকূল সংবাদ পাঠে শঙ্কাকুল হইলেন না—পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ এবং সর্ব্ব মঙ্গলাকর পরম বিভুর হস্তে আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক স্বীয় কর্ত্তব্য পথে অবিচলিত রহিলেন—অধিকন্তু দ্বিগুণ উৎসাহ, দ্বিগুণ অধ্যবসায়, দ্বিগুণ পরিশ্রম সহিত অতি সতর্কতায় স্বকীয় করণীয় কার্য্য সমূহ সুনির্ব্বাহ এবং যাহাতে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন সহিত প্রজাপুঞ্জের সুখ সমৃদ্ধির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়, তৎপক্ষে প্রাণপণে যত্ন করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন।

ঢুলীন পার্ব্বত্য রাজাগণের ষড়যন্ত্রের আভাস পূর্ব্বেই কিছু পাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তত গুরু ব্যাপার পরিচ্ছেদের অবসানাবস্থায় বলা উচিত নয়; তজ্জন্য "খাভাঙা" পরিচ্ছেদের প্রয়োজন!

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

উদাসীন।

জনরব উঠিল—ঢুলীনের কর্ণেও অধিকার লাভ করিল যে, জয়ন্তী মঠে একজন উদাসীন আসিয়াছেন। তিনি না অবধূত, না পরমহংস, না দণ্ডী—তিনি যে কি, তাহার নাম পাওয়া ভার! তাঁহার দেহ অতি অসঙ্গত দীর্ঘ; তাঁহার তপোবল যেমন হউক, কিন্তু দৈহিক বল অপরিমেয়; অঙ্গে অস্ত্রাঘাত ও কর-তলে জ্যাঘর্ষণের ন্যায় চিহ্ন; সঙ্গে শিষ্যগুলিও প্রায় তদ্রূপ—যেমন গুরু, তেম্‌নি চেলা—কেবল তত দীর্ঘাকার ও তত বলশালী অবশ্যই নহে। শিষ্যগণ সঙ্গে গুরুজী নিশা-শেষে বৃহৎ মুদ্গর সঞ্চালন এবং ব্যায়াম চর্চ্চা করেন, ইহাও নাকি কেহ কেহ দেখিয়াছে।

ঢুলীন শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট ও সন্দিহান হইলেন। একবার স্বচক্ষে দেখা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া অগ্রে বন্নুকে অনুসন্ধান লইতে বলিলেন। কিন্তু চৈতন আসিয়া যাহা নিবেদন করিল, তাহাতে তাঁহার মানস পূর্ণ হইবার সুযোগ ঘটিল—চৈতন নিভৃতে বলিল "উদাসীন বাবাজী বিরলে আপনার সহিত একবার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।" ওদিকে গুলাপী আসিয়াও অতি নির্জ্জনে ঐরূপ প্রার্থনা জানাইল। ঢুলীন বহু চিন্তার পর এবং গুলাপীর বিশেষ অনুরোধে শেষে সম্মত হইলেন। বলিলেন "রাত্রিযোগে উদাসীন যেন একাকী আইসেন।" গুলাপী বলিল "তিনিও তাই চান।"

তাহাই হইল—রাত্রি ছয়দণ্ডের পর গুলাপীর সঙ্গে বাবাজী একাই আইলেন—ঢুলীনের বাসগৃহে সমাদরে গৃহীত হইলেন—তথায় আর কেহই রহিল না—গুলাপীও না। বাবাজীর আকার প্রকার দেখিয়া কনিষ্ঠ ভীম বলিয়া ঢুলীনের ধারণা হইল!

আমরা পূর্ব্বে বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি যে, যে রজনীতে ঢুলীন নিশ্চিতরূপে

জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি সুদান-রাজ-কুমার, তাহার পর দিন হইতে নিজগৃহে যতক্ষণ থাকিতেন, ততক্ষণ তাঁহার আর ইউরোপীয় প্রণালীর বেশ-ভূষা বা ভোজন, শয়ন উপবেশনাদির ভাব কিছুই রহিল না। ডুলীন তদবধি ক্ষত্রিয় কুলানুক্রমিক প্রথা-প্রিয় হইয়া উঠিলেন। সুতরাং বাবাজীকে গালিচায় বসাইয়া আপনিও এতদ্দেশীয় প্রথানুসারে তাকিয়াবলম্বনে বসিয়া আল্‌বোলা যোগে সুগন্ধ তাম্রকুটের ধূম্রপান করিতে লাগিলেন!

বাবাজী কিয়ৎক্ষণ গৃহের চতুর্দ্দিকের সজ্জাদি নিরীক্ষণ করিতে করিতে ডুলীনের মুখপানে বার বার চাহিতে লাগিলেন। শেষে কিসে যেন সন্তোষ লাভ করিয়া হর্ষ-বিকসিত বদনে বলিলেন "সাহেব! দেখিতেছি, আপনি সে সাহেব নহেন—আপনার ধরণ ও আপনার গৃহের সজ্জাদি দেখিয়া মহা সন্তোষ পাইলাম—আপনার মেজাজও বিলাতী রকমের তেড়া বাঁকা নয়—আপনার এই সব মহদ্‌গুণ শুনিয়াই সাক্ষাৎ লাভের প্রার্থনা করিতে সাহসী হইয়াছি।"

ডুলীন দেখিলেন সন্ন্যাসী ঠাকুরের গায়ের যেমন, নয়নের তেম্নি, বাক্যেরও তেম্নি জোর। অথচ বাক্যাবলী কর্কশ বা শ্রুতি-কঠোর নয়—কণ্ঠস্বর তেজস্বী অথচ মিষ্ট—যেন প্রভুত্ব করা তাঁহার অভ্যাস, এম্নি সুসভ্য সুভব্য উচ্চপদের লোক।

বাবাজী পুনশ্চ আরম্ভ করিলেন "আপনি ইউরোপীয়, আপনার সহিত একজন সন্ন্যাসী আসিয়া দেখা করিতে চাহে, ইহা শুনিয়া আপনি অবশ্যই আশ্চর্য্য হইয়াছেন। কিন্তু আমাকে যাহা দেখিতেছেন, আমি তাহা নই—আমি যে কে, তাহা এখন বলিতে পারি না, আমার সমুদয় বক্তব্য শুনিবার পর আপনি যেরূপ ব্যবহার করিবেন, তদনুসারেই আমার পরিচয় দানের ব্যবস্থা হইবে। আপাততঃ এই ভিক্ষাটী চাই, আমি যাহা বলিব, তাহা দীর্ঘ বক্তৃতা হইলেও অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাভিনিবেশে শ্রবণ করেন এবং আমার অভিপ্রায় ও প্রস্তাব আপনার অনভিমত হইলেও গোপন রাখেন ও আমার মনের কথা লইয়া আমাকে মানে মানে যাইতে দেন।"

ডুলীন বলিলেন "এ ভিক্ষা প্রদানের আর কোন আপত্তি দেখি না, কেবল শুনিবার যোগ্য কথা হয় তো, যত দীর্ঘই হউক, অবশ্যই শুনিব এবং গোপন রাখা ও আপনাকে যাইতে দেওয়ার কথা—তাহা স্বীকার্য্য; তবে শেষেরটী, এই দুর্গ হইতে কি এককালে এই রাজ্য হইতে তাহা পরে বিচার্য্য।"

বাবাজী কহিলেন "জ্ঞানীর যোগ্য কথা বটে, কিন্তু না শুনিলেই বা যোগ্যাযোগ্য বুঝিবেন কিসে? মনে করুন, প্রথমে আমি একটী ক্ষুদ্র ইতিহাস বর্ণনা করিব—তাহার প্রত্যেক বর্ণ সত্য—বোধ করি তচ্ছ্রবণে আপনার আপত্তি না হইতে পারে?"

তুলীন। (সহাস্যে) আচ্ছা বলুন—

উদাসীন। এই পঞ্জাব মধ্যে দাসু নামে জাঠজাতীয় এক কৃষক ছিল; তাহার তিনখানি লাঙ্গল ও একটী কূপ। এদেশে প্রায় কূপের জলেই চাষ হয়, সুতরাং কৃষক সমাজে কূপ যে মহা সম্পত্তি, তাহা আপনি অবশ্যই জানেন। একটী কূপ আছে বলাতে, তাহার প্রায় শতাবধি বিঘা চাষ, ইহাই বুঝায়। সুতরাং দাসু একজন সম্ভ্রান্ত কৃষক। দাসুর পুত্র নোধ এক জমীদারের কন্যা বিবাহ করিল। জমীদার নিজে পহল গ্রহণ করিয়া শিখ হইয়াছিল, জামাতাকেও পহল গ্রহণের প্রবৃত্তি দিয়া শিখ করিয়া লইল।

তুলীন। পহল গ্রহণ কিরূপে হয়?

উদাসীন। পথে ঘাটে বাড়ীতে বা ধর্ম্মমন্দিরে যেখানেই হউক, অন্যূন পাঁচজন শিখ যথায় একত্র উপবিষ্ট, তথায় হিন্দু যবন যে হউক, গিয়া যদি বলে "আমি পূর্ব্ব ধর্ম্মমত ছাড়িয়া অন্তরের সহিত পহল লইতে অর্থাৎ শিখ (বা শিষ্য) হইতে চাই," তৎক্ষণাৎ ঐ শিখেরা নিকটস্থ দোকান হইতে কিছু বাতাশা আনায়; ভাল জলে সেই বাতাশার সরবৎ করিয়া সেই সরবৎ পহলগ্রহণার্থীর অঙ্গে ছিটায় ও তাহাতে তাহার চক্ষু ধৌত করে; তাহাদের মধ্যে যে শিখ সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ, সেই সেই সময় তাহাকে শিখ-ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝাইয়া তাহাকে নব-দীক্ষিত ধর্ম্মানুযায়ী আচরণাদি আজীবন করিবার প্রতিজ্ঞা করাইয়া লয়; এই মাত্র দীক্ষার প্রক্রিয়া! পরে সে এক জন গুরু বাছিয়া লয়, সেই গুরু তাহাকে গুরুমুখী ভাষা শিখান ও ধর্ম্মোপদেশ দান করেন। ইহাতেই সে পাকা শিখ হইয়া উঠে।

তুলীন। নোধ সিংহ পহল গ্রহণ করিল, তাহার পর?

উদাসীন। নোধ সিংহ জমীদারের জামাতা হইতে পারিল ও শিখ হইল, কাজেই সে চাষার পদ ত্যাগ করিয়া সামরিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ফৈজুল্লাপুরিয়া নামা মিশলের কর্ত্তা (গুজরাট নিবাসী) কর্পূর সিংহের সৈনিক দলে মিশিল। যথাকালে নোধ সিংহ তিনটী পুত্র রাখিয়া বাঙ্গালা ১১৫৭

সালে * মরিল। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছরত্ (ছত্র) সিংহ স্বীয় অনুজদ্বয় দুল সিংহ ও যোধ সিংহের সাহচর্য্যে প্রথমে কিছুদিন লুঠ-কারী দস্যুবৎ কাল কাটাইয়া শেষে দলপতি বা মিশলপতি রূপে আপনাদের নিশান উড়াইয়া "ডেরা" বা শিবির স্থাপনে সমর্থ হইল। ছত্র সিংহ স্বীয় যোগ্যতাবলে অল্প কালেই প্রবল বল-দর্পিত অন্যান্য পুরাতন মিশল সমূহের সহিত প্রায় সমকক্ষতা দেখাইতে লাগিল।

লাহোরের উত্তরে অনতিদূরে গুজরাওলি নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে ছত্রসিংহ বিবাহ করে। তাহার পত্নীর যত্নে ও শ্বশুর বংশের খাতিরে তথায় আপন পরিজন ও লুণ্ঠিত ধন রক্ষার্থ ছত্রসিং একটী সামান্য মাটির কেল্লা নির্ম্মাণ করিল। লাহোর নগর তখন আফগানস্থানীয় যবনদিগের অধীন; ঐ নূতন কেল্লা লাহোরের যবন শাসনকর্ত্তার চক্ষুঃশূল হওয়াতে সে কতক গুলি বৈতনিক শিখ সৈন্য লইয়া ছত্র সিংহকে আক্রমণ করিল। কিন্তু শিখেরা বিশ্বাস-ঘাতিতা পূর্ব্বক তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাওয়াতে যবনপতি কোনমতে আপন প্রাণ বাঁচাইয়া পলাইয়া আইল।

ইহাতেই আফগানাধিপতি সুপ্রসিদ্ধ আহম্মদ সা আবদালি বাং ১১৬৯ সালে পঞ্জাবে অবতরণ পূর্ব্বক সরহিন্দের যুদ্ধে ভয়ানকরূপে শিখ-শোণিত প্রবাহিত করিয়া যায়—এই জন্যই শিখেরা সে সংগ্রামের "ঘলু-গোরা" অর্থাৎ "রক্ত-ক্ষেত্র" নাম রাখিয়াছিল! কিন্তু পরবৎসরে শিখেরা তাহার প্রতিশোধ লইতে সমর্থ হয় এবং শাসনকর্ত্তা জীন খাঁকে বধ পূর্ব্বক সরহিন্দ নগর ছার খার করে—সরহিন্দ অদ্যাপিও ধ্বংসাবস্থায় আছে।

দুলীন। তখন শিখদের কয়টা মিশল?

উদাসীন। বারটা; সকল মিশল-পতিই নীচ বংশজ—কেহ বা জাঠজাতীয় কৃষক, কেহ বা মেষপাল, কেহ বা সামান্য শিল্পীর পুত্র। কিন্তু প্রত্যেকেই অসাধারণ রণোৎসাহী—প্রত্যেকেই সামান্য অবস্থা হইতে লুণ্ঠনশীল অসংখ্য অশ্বারোহীর সাহায্যে পদস্থ! কোন কোন মিশলে দশ বার হাজার এবং বারটী মিশলের সমষ্টিতে সত্তর হাজার লোক ছিল।

ছত্র সিংহের দল, কি লোক সংখ্যায়, কি অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণ-

* উদাসীন সম্বৎ ধরিয়া বলিয়াছিলেন, পাঠকগণের সুবিধার্থ আমরা তৎপরিবর্ত্তে বাঙ্গালা সাল বসাইলাম—পরবর্ত্তী সর্ব্বস্থানেই এইরূপ জানিব।

তর মিশল ছিল; কিন্তু নিজ বাহুবল ও বুদ্ধিবলে ছত্র সিংহ অচিরে আপন মিশলকে প্রবল প্রতাপান্বিত করিয়া তুলিল। অমৃতসরে বৈশাখ মাসে ও দেওয়ালি সময়ে মহা-সমারোহময় জাতীয় ষান্মাসিক সভায় ছত্র সিংহের ক্ষমতা ও গুরুত্ব ক্রমে শ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত হইতে লাগিল। সেই মহা-সভায় স্বদেশ-রক্ষা প্রভৃতি অতি গুরুতর বিষয়ের পরামর্শ ও বিচার হইত, ইহা বোধ হয় আপনি শুনিয়াছেন?

তুলীন। হাঁ শুনিয়াছি—তাহার পর বলুন?

উদাসীন। জম্বু-রাজপুত্র ব্রজরাজ পিতৃবিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া ছত্র সিংহের দোর্দ্দণ্ড ভুজাশ্রয় গ্রহণ করে। প্রতিপক্ষে পুরাতন ঘনি-মিশলের কর্ত্তা মহা পরাক্রান্ত জয় সিংহ যোগ দেন। তথাপি ছত্র সিংহের প্রভাবে ব্রজরাজের দলই প্রবল হইতেছিল, এমত কালে স্বীয় বন্দুক ফাটিয়া ছত্রের মৃত্যু ঘটিল, সুতরাং ব্রজরাজেরও পিতৃ-দ্রোহিতার চেষ্টা রহিত হইল, যেহেতু ছত্রই তাহার ছত্র স্বরূপ ছিল! ছত্রের বয়ক্রম মৃত্যু-কালে পয়তাল্লিস বৎসর মাত্র। ছত্র সিংহের পুত্র মহা সিংহ (বাং ১১৮১ সালে) পিতৃত্যক্ত বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি এবং পরাক্রান্ত সৈন্যদলের অধিকারী হইল। কিন্তু নিজে নাবালক বিধায় তাহার মাতা তাহার হইয়া সুযোগ্যতার সহিত অধ্যক্ষতা করিতে লাগিল এবং ঘনি-দলপতি জয় সিংহের যোগে বাংঘী মিশলাধিপতি ঝাণ্ডা সিংহের বধসাধন দ্বারা পুত্রের সম্পত্তি ও প্রতিপত্তির বৃদ্ধিসাধন করিল।

দুই বৎসর পরে সিন্ধুরাজ গজপতি সিংহের কন্যার সহিত মহা সিংহের বিবাহ হইল। মহা সিংহ তরুণ বয়সেই অতুল সাহস পরাক্রম প্রকাশ দ্বারা এমন খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিল যে, অন্যান্য মিশল হইতে বহু নিম্ন সর্দ্দার আসিয়া তাহার দলে মিশিল। উষ্ণীষ বদল প্রকরণ দ্বারা মহা সিংহের সহিত উক্ত ব্রজরাজ ধর্ম্ম ভ্রাতা সম্পর্ক পাতাইল। পিতৃবিয়োগে ব্রজরাজ জম্বুর সিংহাসন পাইল। কিন্তু ইন্দ্রিয়-সেবায় অতিশয় আসক্তি ও অন্যান্য কারণে স্ত্রৈণ রাজাদের যে দুর্দ্দশা ঘটে, তাহাকে তদবস্থ হইতে হইল। তাহাকে আত্ম-সমর্থনে অসমর্থ দেখিয়া স্বার্থ-কুশলী মহা সিংহ ধর্ম্ম-সম্পর্ক উপেক্ষা পূর্ব্বক স্বল্প আয়াসেই জম্বু রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া লইল! এই ঘটনাতে মহা সিংহের পদৈশ্বর্য্য প্রচুর পরিমাণে উন্নত হইতে দেখিয়া অনেকে হিংসা করিতে লাগিল। বাংঘী দলের সহিত পূর্ব্বাবধি শাত্রবতা ছিল, মহা সিংহ দ্বারা তাহাদের অনেক

অপচয়ও হইয়াছিল। সুতরাং তাহারা তো শত্রু হইবেই; অধিকন্তু মহা সিংহের পূর্ব্ববন্ধু ঘনিয়া জয়সিংহও হিংসাবশে তাহার বৈরিপক্ষে দাঁড়াইল।

কথিত আছে, উক্ত জয় সিংহকে প্রসন্ন রাখিবার উদ্দেশে মহা সিংহ জন্ম-জয়োৎসব পরিত্যাগ করিয়াও অমৃতসরে ছুটিয়া আইসে। তথায় জয় সিংহের নিকট গিয়া নানা উপহার দিয়া সানুরাগ সম্ভাষণ সহিত পূর্ব্ব স্নেহের দরুণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। জয় সিংহ তখন চৌপায়ার উপরি শয়ান—উঠিয়া অভ্যর্থনাদি কিছুই করিল না—তৎপরিবর্ত্তে ঘৃণার সহিত বলিল "ভাগ্‌তিয়ার (নাচের ছোক্‌রার) মিষ্ট কথা আর শুনিতে চাই না!" এরূপ কদর্য্য উক্তিতে তরুণ মহা সিংহের উষ্ণ শোণিত আরো উষ্ণ—যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, অপমানের প্রতিশোধ ও অহঙ্কারের প্রতিফল দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া মহা সিংহ প্রত্যাগমন করিল। সেই প্রতিজ্ঞা সর্ব্বতোভাবেই সম্পূরিত হইয়াছিল।

বাংঘী ও খনি উভয় মিশলের বিরুদ্ধে একাকী সফল হওয়া দুরূহ বোধে মহা সিংহ অন্য সহায় সংগ্রহ করিল। আপনি এখন যে কাংরার শাসনকর্ত্তা, এই কাংরা রাজ্যের বিখ্যাত রাজা সংসারচাঁদকে দুষ্টেরা তখন নানা ছলে রাজ্য-ভ্রষ্ট করিয়াছিল, মহা সিংহ তাহাকে ও রাম ঘরিয়ার পদচ্যুত যশোধর সিংহকে আহ্বান করাতে তাহারা আহ্লাদ পূর্ব্বক মহা সিংহের সহিত সংযুক্ত হইল-এবং অবিলম্বেই বিপক্ষগণকে যুদ্ধ দান করিল। সেই যুদ্ধে জয় সিংহ স্বীয় সুযোগ্য প্রিয় পুত্র গুরুবক্সকে হারায় এবং এত নির্ম্মমরূপে পরাস্ত ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব সম্পূর্ণ খর্ব্ব হইয়া অপমানজনক সন্ধি ভিক্ষা দ্বারা সে যাত্রা কোনমতে কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ পাইতে বাধ্য হয়।

কালের গতি অতি বিচিত্র—যে সংসারচাঁদকে মহাসিংহ স্বীয় পৈতৃক রাজ্যের ভ্রষ্ট সিংহাসনে বসাইয়া পুণ্য সঞ্চয় করিল, সেই মহাসিংহের পুত্রই সেই সংসার চাঁদের সিংহাসন হরণ রূপ মহা পাপ করিল! সংসারচাঁদের পুত্রবধূ ও পৌত্রী আপনার আশ্রয়ে দীনা-হীনাবৎ কালহরণ করিতেছে, আপনি তাহাদের প্রতি প্রশংসিত দয়া মায়া বিতরণ করিতেছেন, সেই জন্যই সংসারচাঁদের কথাটী এত করিয়া বলিলাম!

তুলীন। আপনার এ সব বর্ণনার অভিপ্রায় কি?

উদাসীন। আর একটু অপেক্ষা করুন—কালের কুটীল কাণ্ড আর একটু শুনুন! ঐ ঘটনা-বাং ১১৮৯ সালে ঘটে; তাহারি তিন বৎসর পরে সেই

পরাজিত জয় সিংহের পৌত্রী, অর্থাৎ মহা সিংহ-কর্ত্তৃক যে গুরুবক্স নিহত, সেই রণশয্যাশায়ী গুরুবক্সের কন্যা মহাতাপকুমারীর সহিত জেতৃ মহা সিংহের পুত্র—আপনাদের যিনি এখন মহারাজা—তাঁহারই বিবাহ ঘটিয়া উঠিল! এমন অসম্ভব ব্যাপার কিসে ঘটিল, তাহা বলি ;—জয় সিংহের পূর্ব্বকার গর্ব্ব কথা তো শুনিলেন। পরে সেই গর্ব্বিত জয় সিংহের এমন দুর্দ্দশা ঘটে যে, তাহার বিধবা পুত্রবধূ সুধা-কুনয়ার (কুমারী) বলে ছলে শ্বশুরের সমস্ত অধিকার হইতে শ্বশুরকে ও শ্বশুরের অপর দুই পুত্র, নিধান ও বাঘ সিংহকে বঞ্চিত করিয়া আপনি সর্ব্বেশ্বরী হইয়া উঠিল! শুদ্ধ সম্পত্তি-হারিণী নয়, মান-ঘাতিনীও হইল! কেননা, স্বীয় স্বামীহন্তা ও শ্বশুরের পরম শত্রু যে মহাসিংহ, তাহারি পুত্র রণজিৎকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিল!

স্বার্থোপাসক ও সর্ব্বগ্রাসক মহাসিংহের শেষ কার্য্যও তাহার নিজের পূর্ব্ব জীবনের ও তাহার বিশ্বাসদ্রোহী বংশের অনুরূপই হইয়াছিল! মহা সিংহের ভগ্নীপতি সাহেব সিংহ, গুজরাটের স্বাধীন সর্দ্দার। এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সত্ত্বেও সাহেব সিংহ স্বীয় পিতৃ-বিয়োগে যেই মাত্র পৈতৃক পদে বসিয়াছে, অমনি মহা সিংহ তাহার নিকট কর চাহিয়া পাঠাইল। সাহেব সিংহ ভৎর্সনা ও ঘৃণার সহিত তাহাতে অসম্মত হইলে মহা সিংহ অনায়াসে তাহার দুর্গ আক্রমণ করিল। কিন্তু সাহেব সিংহ অকুতোভয়ে আত্ম-সমর্থনে সমর্থ হওয়াতে কয়েক মাস ধরিয়া এই লজ্জাস্কর অবরোধ চলিল। এমন সময় তত্রত্য শিবিরেই মহা সিংহ সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইয়া স্বীয় আবাস-দুর্গ গুজ্‌রাওলিতে যাইতে বাধ্য হইল। সেই রোগে, যৌবনাবস্থাতেই, সপ্তবিংশতি বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমে, মহা সিংহের প্রাণবিয়োগ ঘটিল।

মহা সিংহ সপ্তদশ বর্ষ বয়সে পৈতৃক আধিপত্য স্বহস্তে গ্রহণ করে। সেই তরুণ কালেই অতুল সাহস, পরাক্রম, বিষয়বুদ্ধির সুপকতা ও সুদক্ষতা দেখাইয়া স্বীয় অধিকার ও ক্ষমতা বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু যোগ্যতায় কি করে, বহু বহু বিশ্বাসঘাতিতার সঙ্গে মাতৃ-হত্যা রূপ ভয়ানক মহাপাপে লিপ্ত হইতেও কুণ্ঠিত হয় নাই! যদিও তাহার মাতার অপরাধ অসহনীয়—এক ব্রাহ্মণের সহিত ব্যভিচার—তথাপি মাতৃহত্যা! তাহার পুত্র রণজিৎ সিংহও পিতৃ দৃষ্টান্তানুগমনে ঐরূপ অসহনীয় কারণে স্বীয় জননীর হন্তা হইয়াছে!

পিতৃবিয়োগ সময়ে রণজিতের দ্বাদশ বর্ষ মাত্র বয়ক্রম। সেই অপ্রাপ্ত-

ব্যবহারাবস্থায় তাহার শ্বশ্রূ সুধাকুমারী ও তাহার মাতা (স্বীয় উপপতির সাহায্যে) রাজ্য রক্ষা করিয়াছিল। বাঙ্গালা ১২০০ সালে রণজিৎ সপ্তদশ বর্ষ বয়সে স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করে। কিন্তু কয়েক বৎসর চতুরা সুধাকুমারীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারাই রণজিৎ চালিত হইয়াছিল। স্বার্থ-সাধন উদ্দেশে রণজিতের বিশ্বাসঘাতিতা ও ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান-শূন্যতার কথা, আপনি যখন এত বৎসর পঞ্জাবে আছেন, অবশ্যই শুনিয়া থাকিবেন। কেননা, সেই শাশুড়ী সুধাকুমারীর দশা এখন যেরূপ শোচনীয় হইয়াছে এবং মুলতান ও কাশ্মীরাদি রাজ্য রণজিৎ যেরূপে অপহরণ করিয়াছে—বিশেষতঃ এই কাংরা ও অন্যান্য পার্ব্বত্য প্রদেশ সকল যে প্রকার ছলে, বলে, কৌশলে—যে প্রকার অতুলনীয় বিশ্বাসঘাতিতা ও নির্দ্দয়তার সাহচর্য্যে স্বীয় কর-কবলিত করিতে পারিয়াছে, সে সব কথা সর্ব্বত্রই রাষ্ট্র আছে এবং সর্ব্বদা সর্ব্বশ্রেণীর লোকই তাহার জল্পনা করিয়া থাকে ! পঞ্চনদ-ময় পঞ্জাবের দশা যাহাই হউক—তত্রত্য প্রজা ও সর্দ্দারমণ্ডলী সুখে দুঃখে যে অবস্থায় থাকুক—যথার্থ বলিতে গেলে, অত্রত্য অধিকাংশ লোক বরং একপ্রকার সুখ-স্বচ্ছন্দতায় আছে এবং রণজিতের গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেছে ; কিন্তু পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধীন রাজা প্রজারা যেরূপ মর্ম্মভেদী যন্ত্রণায় কালক্ষেপণে বাধ্য হইতেছে, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে বুঝিলেও বুঝাইতে অসমর্থ। কাংরায় আসিয়া আপনি তাহার ভাব কিয়দংশে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ও ক্রমে তাহার অশেষ বিশেষ প্রতীকার করিয়া তুলিতেছেন—তজ্জন্য ভগবান আপনার মঙ্গল করুন ! কিন্তু তথাপি আপনার সে প্রত্যক্ষ কিয়দংশে ! কারণ, অন্যান্য স্থানীয় শাসকের তুলনায় দণ্ডধর সিংহকে তো দয়াল্ ঠাকুর বলিলেও বলা যায় ! সুতরাং অন্যত্র যাহা হইয়া আসিতেছে, কাংরার দশা দর্শনে তাহার আংশিক ভিন্ন কদাচই সর্ব্বাঙ্গীণ মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারেন নাই। কাংরা তো রণজিতের "খাস" অধিকারভুক্ত—তোষামোদকারী পারিষদগণের—বিশেষ প্রধান তিন রাক্ষস ভ্রাতার—বিশেষতঃ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সর্ব্বভুক্ গোলাপ সিংহের জায়গির নহে !

মহা শত্রুর দোষ গুণ বর্ণনাতেও ধর্ম্ম কথা বলা উচিত। অতএব ধর্ম্মতঃ বলিতে গেলে, মহারাজা রণজিতের অন্তঃকরণে বরং দয়া মায়া ও সুপালনের ইচ্ছা বলবতী আছে—রণজিতের অন্তরে রাজ-যোগ্য বহু বহু গুণ দৃষ্ট হয়, কেবল দুই একটা প্রধান দোষেহ পয়ঃপূর্ণ কুম্ভে গোরোচনা পতনবৎ সকল গুণ

নষ্টপ্রায় হইতেছে! তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ দোষ এই যে, মন্ত্রী ও কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন বিষয়ে অপারকতা অথবা তাহাদের ধৃষ্টতা ও অযথা আধিপত্য-দমনে ঔদাসীন্য! রণজিৎ যে লোক চিনিতে পারেন না, তাহাও স্বীকার করা যায় না—নচেৎ আপনাকে অত্যল্প আলাপে এমন পদ প্রদানে কখনই সাহসী হইতেন না! তবেই হইল, সমস্ত জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়াও যখন এমন শাসকগণ দ্বারা রাজ্য শাসন করিতেছেন, তখন এই সব কুশাসন জন্য রণজিৎ আরো অধিক অপরাধী! রাজার শাসন থাকিলে বা প্রশ্রয় না পাইলে কি এত নিদারুণ অত্যাচার করিতে অধীন কর্ম্মচারীরা সাহসী হইতে পারে? যেন-তেন-প্রকারেণ সেই প্রশ্রয় ও অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয় বলিয়াই তো তাহাদের এতদূর বুকের পাটা!

আপনার নিকট কোন কথা কি কাহারো নাম মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতে কোন দোষ নাই—আপনি সাধু, সজ্জন, সদাশয় পুরুষ! ব্যক্ত করিব বলিয়াই আ'জ্ আসিয়াছি। আপনাকে সত্যই কহিতেছি, পার্ব্বত্য অঞ্চল জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর নরাধম গোলাপ সিংহের অত্যাচার নিতান্তই অসহনীয়—বহুকালাবধি তাহার পাপের ভারে বসুমতী অস্থিরা—পর্ব্বতবাসী প্রজা-কুলও নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে—আর তাহাদের সয় না! আমাদের শাস্ত্রে বলে, বরং সূর্য্যের প্রখরতম কিরণও সহ্য হয়, কিন্তু সূর্য্যাতপে উত্তপ্ত যে বালুকা, তাহা নিতান্তই অসহ্য—তাহার উত্তাপে পায়ে ফোস্কা হয়—তাহার উপর দিয়া চলা যায় না—মরুভূমে তাহার জন্যই জীবের জীবন নষ্ট হয়! আমরা পার্ব্বত্য অঞ্চলের লোক সেই মরুভূমে পতিত, তন্মধ্যে আপনিই কেবল উসরভূমি—আপনার করুণাই স্বচ্ছ সরোবর—তৎপ্রতিই লোকের এখন আশা ভরসা সব!

দুলীন। (সবিস্ময়ে) আমার উপর আশা ভরসা? আপনি যাহা যাহা বর্ণনা করিলেন, সকলই সত্য হইতে পারে এবং আমার দ্বারা—আমার দেহ পাত দ্বারাও—স্বধর্ম্ম রক্ষা-পূর্ব্বক আমার কোনরূপ যত্নে বা সাধনে যদি কোন প্রতীকারের সম্ভাবনা থাকে, তবে আমি তদ্দণ্ডেই তৎপক্ষে—অতি দুরূহ হইলেও—প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমার দ্বারা যে কিঞ্চিন্মাত্রও হইতে পারে, এমন তো আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ভাবিয়া পাইতেছে না।

উদাসীন অবনত বদনে বহুক্ষণ চিন্তার পর এবং মুখ তুলিয়া সাগ্রহ দৃষ্টিতে

ডুলীনের প্রশান্ত মূর্ত্তির প্রতি কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণের পর মৃদুস্বরে কহিল "যদি অভয় পাই, বলিতে পারি।"

ডুলীন। কিরূপ অভয়?

উদাসীন। যাহা শুনিবেন, তাহা আপনার মনোমত হউক না হউক, আপনার হৃদয়েই নিহিত রহিবে—ভুলিবার সম্ভাবনা না থাকিলেও সে কথা যেন ভুলিয়া গিয়াছেন বা আপনি শুনেন নাই,এইরূপ ভাব দাঁড়াইবে—এক কথায়, তৎসূত্রে, তৎসম্বন্ধে, তদবলম্বনে বা তদ্বিরুদ্ধে আমার সম্মতি ব্যতীত আপনি কোন কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন না ও কাহাকেও কিছু বলিবেন না,এইটী স্বীকার ও এই অভয় দানটী করুন, তাহা হইলে নিরুদ্বেগে নিবেদন করি!

ডুলীন। (সহাস্তে) এখন যদি সেইরূপ স্বীকার করিয়া কথাটী শুনিয়া শেষে অঙ্গীকার ভঙ্গ করি?

উদাসীন। আমার সে ভয় থাকিলে,অঙ্গীকার চাহিব কেন? আপনাকে আমি জানি, জানি বলিয়াই বিন্দুমাত্রও আমার সে আশঙ্কা নাই!

ডুলীন। তথাপি একজন অল্প-পরিচিত বিদেশীর সত্য-পালন-ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া এত বড় গুরুতর বিষয়ের দায়িত্ব স্কন্ধে লওয়া আপনার উচিত নয়! আপনার উচিত বোধ হইলেও সেরূপ প্রগাঢ় গুহ্য কথা শ্রবণ করা আমারও কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে না। অতএব ক্ষমা করুন, আমি তাহা শুনিতে চাহি না—আমার গৃহে পদার্পণ পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ সদালাপ দ্বারা ধন্য করিলেন, এই পর্য্যন্ত ভাল, আর অধিক আবশ্যক করে না—আপনি আশাতীতরূপে আমার প্রতি অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন রূপ যে অসাধারণ অনুকম্পা প্রকাশোদ্যত, কোন বিশিষ্ট হেতু বশতঃ আমি সে দয়ার অযোগ্য অথবা সে দয়া গ্রহণে অসমর্থ!

উদাসীন আশ্চর্য্য হইয়া বিস্তর অনুরোধ ও অনুনয় করিল—শেষে কোন প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ না করাইয়াও আত্ম গূঢ়-কথা শুনাইবার জন্য অশেষ বিশেষ যত্ন করিল, কিন্তু ধর্ম্মশীল প্রাজ্ঞ ডুলীন কিছুতেই সম্মত হইলেন না—অবশেষে সৌজন্যের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক স্পষ্ট বলিতে বাধ্য হইলেন যে, "আমি কোনমতেই আপনার গূঢ় কথা শুনিব না এবং আপনার যে কোন অভিসন্ধি থাকুক, আমা হইতে তাহার এক কণিকামাত্রও সিদ্ধ হইবে না, বরং বিপরীত ফলের সম্ভাবনা; অতএব গুলাপীকে ডাকি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক যথাস্থানে গমন করুন—

অধিকন্তু ভরসা ও বিনীত প্রার্থনা এই, জয়ন্তী তীর্থে আপনার দীর্ঘ অবস্থান অপেক্ষা অন্য তীর্থে গিয়া স্বীয় মন্ত্র সাধন করুন, তজ্জন্য অদ্য প্রত্যূষেই যাত্রা হইলে ভাল হয়—আপনি সুবিজ্ঞ, আপনাকে অধিক বলা বাহুল্য—সুমেধা বীরের প্রতি ইঙ্গিত মাত্রই যথেষ্ট।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

শুভ সম্মতি।

যখন কোন গোলযোগ বা বিশেষ কিছু ঝঞ্ঝাট না থাকিত, তুলীন অপরাহ্ণিক ভ্রমণের পর পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রতি সন্ধ্যাকালে হৃদয়েশ্বরী লীলাকে সঙ্গে লইয়া যুগল অশ্বারোহণে দুর্গ-বুরুজের উপর চতুর্দ্দিক্ তত্ত্বাবধানে বাহির হইতেন। লীলা যে তাঁহার ভাবী পত্নী, এ কথা সকলেই জানিত। সুতরাং এই সুখময় সান্ধ্য ও নৈশ পর্য্যটন গোপন করিবার প্রয়োজন ছিল না—ইহাতে তাঁহাদের সুখ যেমন অসীম, দর্শক মাত্রেরই সন্তোষ তেমনি গভীর হইত। প্রত্যাগমনান্তে আলোকমালায় খচিত একটী সুবিশাল সুরম্য গৃহে গিয়া তুলীন প্রিয়তমা রাজপুত-কন্যাকে অসিচালনা শিক্ষা দিতেন। ইটী লীলার নিজের ইচ্ছা ও প্রার্থনাতেই আরব্ধ হয়—লীলা বাল্যকালেও অশ্ব-চালনে সম্পূর্ণ ও অসি-চালনে কিয়ৎ পরিমাণে অভ্যস্তা ছিল। সুতরাং অল্প সময় মধ্যেই হৃদয়নাথের অনুপম দীক্ষার ফল ফলিল—লীলা সুশিক্ষিতা বীর-নারী হইয়া উঠিল! ঐ ব্যায়াম চর্চ্চার পর উভয়ে তুলীনের গৃহে আসিয়া, রাণী চন্দ্রকুমারী ও গুলাপীর সহিত মিলিতেন। প্রায় প্রত্যহই এইরূপ হইত—নানা কথোপকথন চলিত।

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদ-বর্ণিত সন্ন্যাসী-সংক্রান্ত ঘটনার পর রজনীতে গুলাপীকে সম্বোধন করিয়া তুলীন কহিলেন "বুড়ী মা! সেই উদাসীন বীর কে? তুমি তাহার পরিচয় অবশ্যই জ্ঞাত আছ—নচেৎ তাহার জন্য অত অনুরোধ করিতে না—সঙ্গে করিয়াও আনিতে না!"

গুলাপী প্রথমে নিরুত্তর রহিল; শেষে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিত হইলে বলিল, "হাঁ বাবা! আমি তাঁহাকে জানি, কিন্তু তিনি যখন তোমার রাজ্য হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তখন আর তাঁহার নাম শুনিয়া ফল কি?"

দুলীন। ফল আছে, বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে তোমার যাহাতে অনিচ্ছা, তাহা জানিতে যত্ন করিতাম না। আমার প্রতি তোমার যথার্থ পুত্রবৎ স্নেহ, তাহা আমি নিশ্চিত জানি ; কিন্তু তুমি স্ত্রীলোক—তুমি যত বুদ্ধিমতীই হও, তথাপি তুমি বুঝিতে পার নাই যে, সেই লোকটীকে আমার কাছে আনাতে আমার কত দূর অমঙ্গল হইয়াছে!

তিন জন শ্রোতাই চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন "অমঙ্গল!"

দুলীন। হাঁ অমঙ্গল! এখনও যদি তাহার পরিচয় পাই, তবে হয় তো প্রতিবিধান করিলেও করিতে পারি।

লীলা। বুড়ী মা! বল? না বলিলে আমি ছাড়িব না—

গুলাপী। বাবা! এ ব্যক্তি আলুওয়ালা মিশলের কর্ত্তা অঙ্গদ সিংহের পুত্র ; ইঁহার নাম প্রচণ্ড সিংহ ; ইঁহারা অন্যান্য সর্দ্দারদের সহিত রণজিতের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিলেন ; শতদ্রু নদীর দক্ষিণে নিশানওয়ালা, সাহিদ ও ফুলকিয়া মিশল তিনটী ইংরাজের শরণাপন্ন হইয়া যার যাহা বিষয় স্বচ্ছন্দে ভোগ করিতে পাইল—ইংরাজের সঙ্গে কিরূপ বন্দোবস্ত হওয়াতে রণজিৎ তাহাদের কিছুই বলিতে পারিল না। সেই দেখা দেখি আলুওয়ালা এবং আর দুই এক সর্দ্দারও বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজের আশ্রয় ভিক্ষা চায়। কিন্তু ঐ বন্দোবস্তের মধ্যে ইংরাজ ও রণজিতের অধিকারের যে সীমা স্থির হইয়াছিল, তাহাতে ইংরাজেরা নাকি ইঁহাদিগকে আশ্রয় দিতে ও রক্ষা করিতে পারেন না। তাহাতেই রণজিৎ ইঁহাদের সমস্ত কাড়িয়া কুড়িয়া লইল। ইঁহারা যদি আর সকলের ন্যায় পদানত হইতেন, তবে হয় তো এক প্রকার সুখে দুঃখে থাকিতে পাইতেন। কিন্তু ইঁহারা বড় তেজস্বী, সে অধীনতা স্বীকার না করিয়া কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন! কতবার কত চেষ্টা করিলেন, কিছুই হয় নাই। ইঁহার পিতা শেষে কাশীধামে বাস করিতেছেন ; ইনি লুধিয়ানা, কর্ণাল ও সিমলা প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী ইংরাজাধিকারের মধ্যে সুযোগ সন্ধানে বেড়াইতেছেন—আমি যখন পলাইয়া লুধিয়ানাতে গিয়াছিলাম, তখনই ইঁহার সহিত আমার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল।

দুলীন। এখন এখানে সন্ন্যাসী বেশে আসিবার অভিপ্রায় কি?

গুলাপী। তাহা জানি না—আমার মত সামান্য লোককে কি তিনি তাহা বলেন? আমি যখন জয়ন্তী মধ্যে তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম—অমন

ভীমকে যে একবার দেখিয়াছে, কে না চিনিতে পারে?—অমন আগুন কি ভস্মে ঢাকা থাকে?—যেই মাত্র তিনিও বুঝিলেন যে, আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম, অমনি আমার বর্ত্তমান অবস্থানের স্থানাদি জিজ্ঞাসার পর কাহাকেও তাঁহার পরিচয় বলিতে নিষেধ পূর্ব্বক আমাকে শপথ করাইলেন যে, তোমার সহিত তাঁহার সাক্ষাতের পূর্ব্বে তোমাকেও তাঁহার নাম পর্য্যন্তও বলিতে পারিব না। সুতরাং এখানে যে কেন আসিয়াছিলেন, তাহা আমার জানিবার সম্ভাবনা কি? তবে অনুমানে বোধ হইতেছে, পাহাড় অঞ্চলের সকল রাজা রাজ্ড়া সর্দ্দার প্রভৃতি একবাক্য হইয়া কি একটা ঘটাইবে বলিয়া যে জনরব শুনা যাইতেছে, তিনি হয় তো তাহাদেরই দলে মিশিয়াছেন ও তাহাদের পরামর্শানুসারেই হউক, বা নিজের বুদ্ধিতেই হউক, তোমাকে সেই পরামর্শে ফেলিতে বা উপরোধ অনুরোধ করিতে আসিয়াছিলেন।

হূলীন। এ যদি ভাবিয়াছিলে, আর এত যদি বুঝিতে পার, তবে কি বলিয়া অগ্রে আমাকে তাহার কিছুমাত্র আভাস না দিয়া ও আমাকে সম্মত না করিয়া একেবারে তাঁহাকে আনিলে? তাহাতে মহারাজার কাছে শত্রুরা আমার নামে যে সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া তুলিবে, সে সহজ কথাটাও কি তুমি বুঝিতে পার নাই?

লীলা কাঁপিতে লাগিল—কাঁদিয়া ফেলিল—লীলা হূলীনের কাছেই বসিয়াছিল, চুপি চুপি বলিল, "এ দেশে আর না—চল আমরা পলাইয়া যাই!"

হূলীন অভয়দানে সান্ত্বনা করিলেন।

গুলাপী বলিল "বাবা! বুঝিব না কেন, তাহার কতক আভাস মনে উদয় হইয়াছিল, কিন্তু অভাগিনী আর একরূপ ভাবিয়াছিল—এখনও তাহাই ভাবিতেছে—যদি এই সুযোগে সুদানের উদ্ধার করিতে পার, তবে কি না হয়—আবার যে রাজপুত্র সেই রাজপুত্রই হও—রাজপুত্রই বা আর বলি কেন? এখন মহারাজা—পিতৃপিতামহের সিংহাসনে আবার বিক্রমজিতের পুত্র মহারাজা হইবে, একি সামান্য আহ্লাদের কথা! (ঊর্দ্ধমুখে) মা ভবানি! এমন দিন কি দিবে মা? হায়, এই পোড়া চক্ষু কি আবার তাহা দেখিতে পাইবে?"

গুলাপীর নয়ন যেন বাতুলের চক্ষুর ন্যায় ঘুরিতে লাগিল—গুলাপীর সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল—গুলাপী যেন বাহ্য জ্ঞান হারায় এমনি বোধ হইল! সে ভাব দেখিয়া রাণী চন্দ্রকুমারী মিষ্ট বচনে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

ফুলীন দেখিলেন, শুদ্ধ মিষ্ট কথার কর্ম্ম নয়. অতএব একটু বৈরক্তি সহিত বিবিধ ভয় প্রদর্শন করিলেন। ভয় ভাবনায় গুলাপী প্রকৃতিস্থা হইয়া কহিল "তবে এখন উপায় কি ?"

ফুলীন বলিলেন "চিন্তা এমন কিছুই না; এখন অবধি সাবধান হও, কদাচ কাহারো কথায় ভুলিও না—মহারাজার বিরুদ্ধে কোন কথায় থাকিও না—তাহার প্রতিকূল কোন ব্যক্তির সহিত আলাপও করিও না। তোমার আমার জন্য তো তত ভাবি না— তুমি প্রাচীনা, তোমাকে কেহই কিছু বলিবে না—"

গুলাপী। বলিলেও আমি গ্রাহ্য করি না—বড় জোর পাপিষ্ঠেরা শূলে দিবে, তাহাতে গুলাপী ভয় পায় না।

ফুলীন। আমার জন্যও ভাবি না—ঘোড়া আর তরবার আর জনকত বিশ্বাসী সহচর লইয়া আসিয়াছি, তাহা লইয়াই চলিয়া যাইব! কিন্তু আমার নিজের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর এই দুইটী অমূল্য জীবন জন্যই চিন্তা—পাছে দুষ্টগণ ছলে বলে আমার এই মর্ম্মস্থানে কোনরূপ আঘাত করিবার সুযোগ পায়, ইহাই আমার এখনকার অপার চিন্তা! অতএব যেমন বলিলাম, বুড়ী মা! তোমাকে নিদান ইঁহাদের নিমিত্তও সাবধানে চলিতে হইবে।

লীলা। হায়! আমার বুড়া মার এত ভুল হইল কেন? তুমি কি জাননা, এ পোড়া দেশের, পুরাতন বংশ মাত্রেরই প্রতি বিধাতা প্রতিকূল? এখন কি আর কাহারো বা হৃদান রাজ্য ফিরিয়া পাইবার তিল মাত্রও সম্ভাবনা আছে? যদ্যাপিও কোনমতে আমার জীবিতেশ্বর তাহার ও আমার পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করেন, তাহাতেই কি আর শান্তি-সুখ হইতে পারিবে? পঞ্জাব-সিংহের এখন অতুল বিভব—সিংহ-প্রতাপ! তিনি কি তাহার সাম্রাজ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হারাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিবেন? তিনি কি এই অপচয় আর এই অপমান জীবন-সত্ত্বে সহ্য করিবেন? তিনি কি তাহার অসংখ্য সৈন্য ও অসীম ক্ষমতার সহায়তায় প্রাণপণে প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা পাইবেন না? পার্ব্বত্য সমস্ত রাজগণ এখন নিতান্ত নিস্তেজ—বিষ হারাইয়া ঢোঁড়া—মনের আক্রোশ ভিন্ন তাহাদের আর অন্য যোগ্যতা এখন কি আছে? আমার ফুলীন কি এতই নির্বোধ যে, সেই অকর্ম্মণ্য সামান্য সাহায্যবল লইয়া অদ্বিতীয় রণজিতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও সমকক্ষতা দেখাইতে যাইবেন? তাঁহাকে কি

এমনি অসার অবোধ বুঝিয়াছ যে, তিনি জানিয়া শুনিয়া অগ্নিতে হাত দিবেন —কালফণির মাথার মণি কাড়িয়া লইতে হাত বাড়াইবেন? অপরিহার্য্য ঘোর দাবানল-বেষ্টনের মধ্যে পড়িয়া চির-দগ্ধ হইতে যাইবেন—ইচ্ছাপূর্ব্বক ঘোর বাত্যা অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও ভেলা অবলম্বনে সমুদ্র পারের চেষ্টা পাইবেন? মনে কর, যদিও তাঁহার অনুপম ইউরোপীয় প্রণালীর শিক্ষাবলে ও অতুলনীয় অধ্যক্ষতা গুণে সেই অসীম বিপদ-সিন্ধু হইতে উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনাও থাকে, তবু কি বুড়ী মা! তুমি আমার তুলীনকে এমনি বিশ্বাসঘাতক অধর্ম্মী দেখিয়াছ যে, তিনি ধার্ম্মিকের অবশ্য-সেবনীয় স্বামীধর্ম্ম ভুলিয়া যাহার বলে বলী, যাঁহার দয়াতেই শাসনকর্ত্তা, যাঁহার ধনেই সৈন্যাধিকারী, তাঁহারই বিরুদ্ধে তাঁহারই সেই সব উপকরণ লইয়া বিদ্রোহী হইবেন? তিনি যদি তাহা করিতে পারেন, তবে তাঁহাকে যাহা ভাবিয়া এই ক্ষুদ্র হৃদয় দান করিয়াছি, তিনি তাহা নহেন বুঝিয়া তখনই শাণিত ছুরিকাঘাতে এই ভ্রান্ত হৃদয়কে বিদীর্ণ করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইব!

চন্দ্রাবতী। ক্ষান্ত হ মা—আর না!

লীলা। বুড়ী মা! তোমার এই পুত্র সেরূপ বিশ্বাস-দ্রোহী, প্রতিপালক-দ্রোহী, প্রভু-দ্রোহী, ক্ষুদ্রাশয় নহেন! বুড়ী মাগো! তোমার এই দীনা ক্ষীণা কন্যা—যাহার মুখে কখনই দশটা কথা একত্রে শুন নাই, আ'জ্ সহস্র শুনিতেছ—সেই জন্ম-দুখিনী কন্যাও এমন লঘু-হৃদয়া ভোগবিলাসিনী নয় যে, পাটরাণী হইবার লোভে—হীরা মণি পরিবার লোভে—ধর্ম্ম ও ন্যায়কে ভুলিয়া তাহার প্রাণের প্রাণ হৃদয়নাথকে পাপপথে—অযথা প্রলোভনের পথে—সুতরাং মরণের পথে, আর ইহ-পরকাল নষ্ট করে এমন দুরাচরণের পথে যাইতে উত্তেজনা করিবে! তুমি কি ভুলিয়া গেলে যে, রাজপুত্নীরা ধর্ম্মের জন্য—কুলের জন্য—স্বামীর জন্য পৃথিবীর সকল অসহনীয় কষ্ট যন্ত্রণাও সহ্য করিতে পারে—প্রয়োজন পড়িলে প্রিয় জনের পার্শ্বে অসি চর্ম্ম বর্ম্ম ধরিয়া যুদ্ধ করিতেও জানে—প্রয়োজন বুঝিলে স্ত্রীলোকের সর্ব্ব প্রধান সুষমার বস্তু যে মস্তকের কেশ, তাহাও কাটিয়া ধনুকের ছিলা করিতে জানে—প্রয়োজন হইলে দলে দলে অগ্নিতেও ঝাঁপ দিতে জানে! কিন্তু যে কাজে অধর্ম্ম—যে কাজে বংশের গৌরবের পরিবর্ত্তে অগৌরব—যে কাজে মহত্ত্বের পরিবর্ত্তে নীচতা, সে কাজে ইন্দ্রাণীর অতুলৈশ্বর্য্যের প্রলোভন থাকিলেও তাহারা ভয়ে ঘৃণায় পশ্চাৎপদ হয়—তাহারা আপ-

নারী অসি ধরা দূরে থাকুক, পুরুষদেরও ধরিতে দেয় না! অতএব এ সব কুমন্ত্রণা হইতে ক্ষান্ত হও—চল (ছুলীনের প্রতি সজল নয়নে) হৃদয়েশ্বর! চল, আমাদের এই তিনটী ভাগ্যচ্যুত প্রাণ লইয়া চল, সেই দেশে যাই, যথায় তোমাকে লইয়া আমরা নিরুদ্বেগে, নিরুপদ্রবে, নির্ম্মল হৃদয়ে, পবিত্র শান্তিসুখ উপভোগ করিতে পারি! আমাদের রাজ্যধনে কাজ নাই, তাহাতে সুখ নাই —যাহাতে সুখ তাহা তোমার মুখে শুনিয়াছি—তাহা আমার হৃদয় বুঝিয়াছে! ফলতঃ তুমি যে এত কাল এত যত্নে আমাকে ইংরাজী বাঙ্গালাতে এত বিদ্যা শিখাইলে—সর্ব্বমঙ্গলাকর সর্ব্বেশ্বরের অপার কারুণ্যময় মহিমার তত্ত্বকথায় মুগ্ধ করিলে—এই পাপ-তাপ-পূরিত মর্ত্ত্য-মণ্ডলে কিসে যথার্থ সুপবিত্র স্বর্গীয় সুখ হইতে পারে, বিশেষরূপে নিত্যই প্রায় বুঝাইলে—চল, গিয়া কার্য্যতঃ দেখাই, তোমার ছাত্রী শুদ্ধ কথার ছাত্রী কি অনুষ্ঠানেরও পাত্রী! অর্থের চিন্তা করিও না—যিনি জীবন দিয়াছেন, তিনি পোষণও করিবেন! তিনি জীবন দিয়া সর্ব্বত্রই জীবনোপায় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন—এ দেশ ভিন্ন অন্য কোথাও তা নাই, এমনটী তো নয়, তবে এত চিন্তাই বা কি? বিশেষ আমার জননীর মণিময় অলঙ্কার প্রভৃতি কিছু গুপ্ত ধনও আছে—তাহাতেই সামান্যভাবে সুখে কাটাইব!

সকলেই অবাক্—সকলেই মন্ত্র-মুগ্ধবৎ লীলার বদনচন্দ্র-নিঃসৃত সুধাধারা পান করিতেছিলেন—সকলেই লীলার সেই অশ্রুতপূর্ব্ব অভাবনীয় নবভাব ও উৎসাহ-মাধুরীর দর্শক হইয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছিলেন।

ছুলীন প্রেমানুরাগের প্রখর বেগে স্থান-কাল-বিস্মৃত হইয়া প্রেয়সীর চিবুক ধরিয়া সাদরে বার বার মুখচুম্বন করিলেন—লীলা মহা লজ্জায় জননীর সান্নিধ্য কথা স্মরণ করাইয়া সরিয়া বসিল!

ছুলীন অল্প কথায় বুঝাইয়া দিলেন "তোমা হেন অপূর্ব্ব স্বর্গীয় নিধি বিধি যখন সদয় হইয়া আমাকে অর্পণ করিয়াছেন, তখন রাজ্যপদ ধন জন কিছুই আর চাহি না—তোমার সুমধুর মোহন মতানুসারে এখনই—আঃ! অদ্য যামিনীতেই তোমাদিগকে লইয়া কোন শান্তি-নিকেতন উদ্দেশে চলিয়া যাইতাম; কিন্তু আপাততঃ তাহা হইবার নহে—সে বাঞ্ছনীয় সুখের পদ এত শীঘ্র পাইবার নহে—অধুনা আমার এই রাজ্যে চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শত্রু, আমি এরূপে চলিয়া গেলে তাহারা ছল পাইয়া বিধিমতে কত কলঙ্ক যে রটাইবে, তাহা

তোমরা লাহোর দরবারের সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও আমার বর্ত্তমান অবস্থা অজ্ঞাত থাকাতে বুঝিতে পারিবে না—হয় তো পশ্চাতে সৈন্য পাঠাইয়া চোর দস্যুর ন্যায় ধরিয়া আনিয়া অবিচারে আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিবে, তখন তোমাদের দশা যে কি হইবে, তাহা ধ্যান করিতেও হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া উঠে! অতএব প্রাণাধিকে! আর কিয়ৎকাল মাত্র অপেক্ষা কর—শুনিতেছি, মহারাজ এতদ্দঞ্চলে শীঘ্রই আসিবেন—তিনি আইলেই তাঁহার হস্তে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া প্রকাশ্যরূপে অনুমতি লইয়া আমার অমূল্য হৃদয়হার প্রাণের লীলাকে কণ্ঠে বাঁধিয়া আর এই দুইটী মস্তক-মণিকে মাথায় লইয়া রাজার মত চলিয়া যাইব—চোরের মত পলাইব কেন?"

সকলেই নিস্তব্ধ। গুলাপী মৃদুস্বরে কহিল "তবে ইতি মধ্যে শুভ বিবাহ নির্ব্বাহ হউক—তাহা হইলে রাণীজীও নিশ্চিন্ত হন, আর তুমি তাঁহাদের রক্ষা করিবার গুরু ভারে সম্পূর্ণরূপেই অধিকারী হও!"

ডুলীনের প্রেমোৎফুল্ল নয়ন লীলার দিকে সানুরাগ দৃষ্টিপাত করিল—লীলা ডুলীনের শয্যা পারিপাট্য কার্য্যে মহা ব্যস্তা হইল—ডুলীন তাহার বাম গণ্ডের কিয়দংশ ব্যতীত বদন-বিধু-মণ্ডলের আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না—তবু সেই গণ্ডদেশ আরক্তিম দেখিলেন! এত আরক্তিম যে, গণ্ডে বুঝি কোন আঘাত লাগিয়াছে বোধে প্রথমে চমকিয়া উঠিলেন! কিন্তু পরক্ষণেই আত্ম-ভ্রান্তি বুঝিয়া মৃদু হাসি হাসিয়া জননীর মুখপানে চাহিলেন! দেখিলেন, রাণী চন্দ্রকুমারীর দীর্ঘায়ত নয়নও যেন তাঁহার উত্তর প্রত্যাশায় চিন্তাদৃপ্ত, সংশয়াবিষ্ট এবং সোৎসুক!

"মা! রাত্রি অনেক হইয়াছে!" বলিয়া লীলা, মাতার হস্ত ধরিয়া তুলিল—তাঁহাদের গমনের পূর্ব্বেই ডুলীন মস্তক ভঙ্গীতে গুলাপীকে শুভ লগ্ন নির্ণয়ের শুভ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন! গুলাপী সে শুভ সংবাদ মাতা ও কন্যাকে জানাইতে বিলম্বও করে নাই!

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ সিদ্ধ।

"লীলা! আ'জ্‌ তোমার নিকট শিবিকারোহণে কে আসিয়াছিল?" এক দিন সন্ধ্যার পর যুগল অশ্বারোহণে উভয়ে যখন ভ্রমণ করেন, সেই কালে ফুলীন সাদরে এই প্রশ্নটী লীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

লীলা মুখ তুলিয়া ফুলীনের প্রেমমাখা স্নিগ্ধ দৃষ্টির উত্তরে অবিকল তদ্রূপ মধুর দৃষ্টি প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক হাসিয়া বলিল "এ শিবিকা কি আর কখনো দেখ নাই?"

ফুলীন। হাঁ হাঁ, আরো দুই একবার দেখিয়াছি বটে—সঙ্গে সেই দাসী আর সেই দ্বারবানইতো বটে—কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই!

লীলা। তবে আ'জ্‌ যে জিজ্ঞাসা করিলে?

ফুলীন। আ'জ্‌ কিছু বিশেষ দেখিলাম—বিশেষ শুনিলাম! অন্য দিন শিবিকাখানি সম্পূর্ণ আচ্ছাদনাবৃত থাকিত, আ'জ্‌ সেই শিবিকা অনাবৃত এবং দ্বারও একটু মুক্ত ছিল—আমি বাহিরের বারাণ্ডায় দণ্ডায়মান ছিলাম, শিবিকা-দ্বারস্থা পরিচারিকা অভ্যন্তরস্থা যুবতীকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে "ঐ যে বারাণ্ডায়" বলিয়া আমার দিকে দেখাইয়া দিল! তরুণী তিলেকের তরে তাঁহার পূর্ণচন্দ্র-নিভ বদনখানি প্রায় বাহিরে আনিয়া আমাকে সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখিলেন—আমার সহিত চক্ষে চক্ষে মিলিত হইবা মাত্র চন্দ্রমণ্ডল জলদান্তরালে গেলে যেমনটী হয়, ঠিক তেমনি ঘটিল! দেখিলাম, এক জনের সহিত তুলনা না তুলিলে তিনি অতুলনীয়া সুন্দরীর শ্রেণীতে গণ্য হইলেও হইতে পারেন!

লীলা। (সহাস্যে) সে দেখা দেখাই নয়—সেই এক জনের প্রতি হয় তো তুমি স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাক, তাহাতেই আমার প্রিয়তমা সখী প্রমীলা দেবীর অতুল সৌন্দর্য্যরাশিকে কল্পনা-তুলে লঘু করিয়া লইতেছ!

ফুলীন। প্রমীলা দেবী কি ব্রাহ্মণী? তিনি কি তবে এই দুর্গবাসী আমার পরম হিতৈষী গুরুদেব শাস্ত্রীর কন্যা?

লীলা। শাস্ত্রী মহাশয়কে আমার পিতামহ ও এ অঞ্চলের অন্যান্য ভূপালগণ গুরুদেবের ন্যায় মান্য করিতেন। দুর্দ্দান্ত শিখেরা পূর্ব্বরাজবংশের অনুগত ব্যক্তিগণকে হিংসা করিত, কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় এমনি নিরীহ ভদ্র

—বিশেষতঃ অসাধারণ শাস্ত্র-জ্ঞান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য তিনি এত বিখ্যাত যে, তাহারা কখনই তাঁহাকে কিছু বলে নাই। বরং কাংরার শাসনকর্ত্তা ও অন্যান্য শিখ মাত্রেই তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য করিত এবং অন্যের বিষয় বিভবে যেমন ঈর্ষান্বিত হইয়া ব্যাঘাত জন্মাইত, তাঁহার প্রতি তদ্রূপ উপদ্রবের পরিবর্ত্তে অশেষ বিশেষরূপে আনুকূল্য করিত। প্রমীলা ভাল ঘরে ও উত্তম বরে অর্পিতা হইয়াছে—প্রমীলার শ্বশুর, লেনা সিংহের সমুদয় ভূসম্পত্তির কার্য্যাধ্যক্ষ—প্রমীলার স্বামী, লেনা সিংহের একজন সৈন্যাধ্যক্ষ। প্রমীলার সহিত বাল্যকালাবধি আমার বড় ভাব—আমরা অভিন্ন-হৃদয়!

ডুলীন। তোমার প্রিয় সখী আমাদের শুভ বিবাহের কথায় কি বলিলেন? সাহেব বর শুনিয়া কোন আপত্তি করিলেন না?

লীলা। যদি তোমাকে সে সাহেব বলিয়াই জানিবে, তবে আর আমার সহিত তাহার অভিন্ন-হৃদয়তা কি?

ডুলীন। প্রকৃত পরিচয় কি তিনি আ'জ্ জানিলেন, না পূর্ব্বাবধি জানিতেন?

লীলা। পূর্ব্বেই জানিয়া গিয়াছেন—স্বামীকেও বলিয়াছেন—তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই—তাঁহার স্বামী রঘুবর দয়াল তজ্জন্য আলাপ করিতে শীঘ্রই আসিবেন।

ডুলীন। বড় ভাগ্য! তবে কি ইহারি মধ্যে বিবাহেরও সংবাদ তথায় গিয়াছে?

লীলা। মা, শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট দিন ও লগ্ন নির্ণয় জন্য গুলাপীকে পাঠাইয়াছিলেন—আমিও সেই উপলক্ষে তাঁহার কন্যাকে আনাইবার প্রার্থনা করিয়া পাঠাইয়াছিলাম—শাস্ত্রী মহাশয় জামাতাকে যে পত্র লিখেন, তাহাতেই বিবাহের কথা লিখিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আর কেহ না শুনিতে পায়, তাহাও সে গোপনীয় পত্রে লেখা ছিল—আমিও সেই সঙ্গে সখীর নামে একখানি লিপি পাঠাইয়াছিলাম।

ডুলীন। ওঃ! ভিতরে ভিতরে এত কাণ্ড চলিতেছে, তাহা জানিতাম না! যাহাহউক, অমন সখী আর অমন সখা পাভে এমন সুখের দিনে আমার সুখার্ণব যে আরো কত উচ্চ ঊর্ম্মিতে উথলিয়া উঠিতেছে, তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না! সেই শুভ দিনে তোমার আর কোন সখীরা কি আসিবেন?

লীলা। আমার সখী আর এক জন—তিনি ক্ষত্রীয় কন্যা—তিনি এই দুর্গেই আছেন, অমৃতসরে তাহার শ্বশুরালয়। তদ্ভিন্ন মা'র নিমন্ত্রণে তাঁহার আর দুটী বিবাহিতা জ্যেষ্ঠা ভগ্নী এবং তাহার পিতা মাতাও আসিবেন। সম্পর্কে তাঁহারা আমাদের দূর কুটুম্ব।

দুলীন। আর কেউ?

লীলা। স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রমীলার মাতা আর তাঁহার পুত্রবধূ এবং পুরুষের মধ্যে শাস্ত্রী মহাশয়েরা পিতা পুত্রে—এ ভিন্ন, মা আর কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিবেন না—তবে যদি—

দুলীন। তবে যদি কি?

লীলা। তবে যদি আর কাহাকে বলিতে তোমার ইচ্ছা হয়—

দুলীন। অমৃতে কাহার অসাধ? আমার প্রাণের লীলার বিবাহে ঘটা করা কি দশজনকে বলা,তদপেক্ষা উচ্চতর সাধ আহ্লাদ আমার জীবনে আর কি হইতে পারে? আমার তো ত্রিকুলে কে আছে,কে না আছে,কিছুই জ্ঞাত নই—স্বদানে পিতৃকুলে দুরাত্মারা কাহাকেই প্রায় রাখে নাই, যদিও কেহ থাকে, সন্ধান পাওয়া ভার—সন্ধান করা কর্ত্তব্যও নয়—তবে শুনিয়াছি, মাতা-মহকুলে সকলেই জাজ্বল্যমান আছেন. কিন্তু বিবিধ প্রকারের বিশিষ্ট হেতুতে তাঁহাদের নিকট এখন আমার পরিচিত হওয়াই উচিত নয়,নিমন্ত্রণ করা তো দূরের কথা! তার পর তোমার পিতৃকুলের কাহিনীও যাহা শুনিয়াছি, তাহা-তেও স্তৈবেচ—যে কয়জনের নাম করিলে,তাঁহারাই এখন তোমাদের অতি নিকট আত্মীয়। যদিও তন্নিম্ন-পদবীর আত্মীয় রূপে গণ্য হইতে পারেন,এমন কেহ কেহ থাকিতে পারেন, কিন্তু আপনাদের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় এই শুভ কাজটী যত সঙ্গোপনে সুনির্ব্বাহ হয়, ততই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ! মা নিজেও তা বলিয়াছেন,আমিও তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছি! বিশেষ আমার লীলা তো তেমন লঘুহৃদয়া অবলা নয় যে,বাহ্যিক আমোদ উৎসবের উপর তাঁহার মনের আমোদ নির্ভর করিবে—

লীলা। যদি জান, তবে কেন সে কথা আর মুখে আন? স্ত্রী পুরুষ যত গুলির নাম করিলাম, এত জনকে বলাও আমার ইচ্ছা ছিল না—শুদ্ধ মার জন্যই তাহা হইতেছে।

দুলীন। এ সব তো তুচ্ছ কথা, মার অনুরোধে অবশ্যই কবিতে হইবে।

কিন্তু আর একটী অত্যন্ত গুরুতর বিষয়ে তাঁহার যে অনুরোধ আছে, তাহাতে কর্ত্তব্যের অন্যথা হইতেছে কি না, জানিনা; কিন্তু স্বীকার করিতে হইয়াছে!

লীলা। আ! পৌত্তলিক মতে বিবাহ—তাই না?

দুলীন। তার চেয়ে গুরুতর কথা আর কি? মনে করিয়া দেখ, আমার লীলার মুখে "আশার ছলনা" বিষয়ক গানটী যে দিন শুনিয়াছি, সে কত কালের কথা! সেই সুদিনে এই শশী-বদনে প্রেমের সুধা পানে আর এই কোমল ভুজমৃণাল দ্বারা কণ্ঠবেষ্টনে যখন ধন্য হইয়াছিলাম এবং হৃদয়ে হৃদয়ে পরস্পরে মাল্যবদল দ্বারা ঈশ্বরের নিকট যখন দাম্পত্যবন্ধনে অনন্তকালের নিমিত্ত দৃঢ় আবদ্ধ হইয়াছিলাম, তাহার ত্রিরাত্রি মধ্যেই কি লৌকিক পাণি-গ্রহণ রূপ শুভ কার্য্যটী সম্পন্ন করিয়া হৃদয়ের নিধিকে অবিচ্ছেদে হৃদয়ে তুলিয়া লওয়া আমার উচিত ছিল না? তজ্জন্য কি তোমার দুলীনের অন্তঃকরণ নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া উঠে নাই? তথাপি তিনটী প্রবল কারণে তখন তাহা করিতে পারি নাই—প্রথমতঃ যদিও বুঝিয়াছিলাম, তোমার পবিত্র প্রণয়-বারিধি অতি গভীর, তাহা কখনই হ্রাস হইবার নয়; তথাপি তুমি তখন বালিকা, তোমাকে ভালরূপে তোমার হৃদয় বুঝিতে সময় দেওয়া আবশ্যক—ইটী আমার পাশ্চাত্য শিক্ষার উপদেশ—

লীলা। ওকথা আর বলিও না—ও কারণটী যে তোমার প্রতিবন্ধক হইয়াছিল, ইহা শুনিয়া এখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে—হায়! তবে তোমার লীলার অন্তস্তলে এই বুঝি তুমি প্রবেশ করিয়াছিলে?

দুলীন। না, সে পক্ষে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না—তবু কিছু অপেক্ষা করা উচিত বোধ হইয়াছিল! বিশেষতঃ আর দুইটী কারণ মিলিয়া সে ভাবের সহকারিতা করিয়াছিল—তাহাও একে একে বলিতেছি শুন। নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানের যে যৎকিঞ্চিৎ আমি জানি এবং যাহাকে সনাতন ধর্ম্ম-বিশ্বাস বলিয়া আমার দৃঢ় ধারণা আছে, আমার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, লেখা পড়া শিখাইবার সঙ্গে তোমাকে সেই বিশুদ্ধ সংস্কারের পথে যত দিন না লইয়া যাইতে পারি, তত দিন ধৈর্য্যাবলম্বন অত্যাবশ্যক!

লীলা। হাঁ, ইটী মহৎ হৃদয়ের যোগ্য মহৎ কারণ বটে! তার পর তৃতীয়টী কি?

দুলীন। তৃতীয় কারণটী তখন উপস্থিত ছিল না—হঠাৎ সিংহের পরা-

জয় ও প্রত্যাবর্ত্তনের পর ঘটিয়াছে। বিশ্বস্ত সূত্রে নিশ্চিত জানিয়াছি, সেই দুরাচার পরাজিত ও তোমাকে অধিকার করিবার আশায় বিফল-মনোরথ হইয়া রাজসভায় গিয়া আমার নামে এই নিদারুণ কলঙ্ক ঘোষণা করিয়াছে যে, 'আমি কলে কৌশলে তোমাদের হস্তগত করিয়াছি ; আমি তোমাদের নামে কাংরা রাজ্যের সমুদয় প্রজাবর্গকে রণজিতের বিরুদ্ধাচারে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছি ; আমি তোমাকে ছলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া অনুহ্লাদ চাঁদের জামাতা বলিয়া কাংরার ভ্রষ্ট-রাজপদে পুনরধিষ্ঠিত হইবার জন্য যারপর নাই চেষ্টা পাই-তেছি এবং তদুদ্দেশে শুদ্ধ কাংরায় অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ নয়, পার্ব্বতীয় অঞ্চ-লের সমগ্র রাজন্য ও সর্দ্দারবর্গের সহিত যোগ দিয়া এক ভয়ানক বিদ্রোহ ব্যাপার বাঁধাইয়া তুলিবার উদ্যোগে আছি! ইত্যাদি।'

লীলা। (ঊর্দ্ধমুখে করযোড়ে) হে নিরাশ্রয়-রক্ষক সর্ব্বপালক পরমে-শ্বর! এমন দুর্জ্জনের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া তোমার ব্রতদাসীর প্রতি কি অসীম করুণাই প্রকাশ করিয়াছ!

জুলীন। প্রথমে এই সংবাদ শ্রবণে স্তম্ভিত হইয়াছিলাম—ভাবিয়াছিলাম, এ অবস্থায় পরিণয়-সুখে সুখী হইতে বিলম্ব করা আবশ্যক। কিন্তু বহু বিবে-চনার পর স্থির করিলাম, শুভ কার্য্যে আর বিলম্ব উচিত নয়—বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া আমার লীলাকে নিতান্তই আমার করিয়া লই—তাহাতে বরং দুরাত্মাদের কোন দুরভিসন্ধি আর খাটিবে না—বিদ্রোহিতার মিথ্যা কলঙ্ক মহারাজ স্বয়ং আসিলেই সব দেখিতে শুনিতে বুঝিতে পারিবেন—সত্য-সূর্য্য আপনা হইতেই মিথ্যাপবাদরূপ জলধরপটল হইতে দ্বিগুণ দীপ্তিতে পুনরু-দ্দীপ্ত হইবে! এই ভাবিয়াই শুভ দিনের জন্য প্রস্তুত ও ব্যগ্র হইলাম। কিন্তু মানস ছিল, কলিকাতায় রাজা রামমোহন রায়, যাঁহার মাহাত্ম্য-কথা তোমাকে কত বার বলিয়াছি, সেই মহাত্মাকে লিখিয়া বহু ব্যয় স্বীকারেও জনৈক ব্রাহ্ম উপাচার্য্য আনাইয়া ব্রাহ্মমতে তোমার পাণিগ্রহণ করিব। কিন্তু মা কিছুতেই তাহা শুনিলেন না—বলিলেন, তিনি বাঁচিয়া থাকিতে তাহা কদাচই হইতে পারিবে না—এমন পর্য্যন্ত ভয় দেখাইলেন যে, ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা শাস্ত্রমত একার্য্য না হইলে, তিনি আত্মঘাতিনী হইবেন! শেষে এই মাত্র অনুমতি দিলেন যে, "এখন আমার মানসপূর্ণ কর, পরে যখন কলিকাতায় যাইবে, তখন না হয় আর একবার তোমাদের উপাচার্য্য দ্বারা যাহা বিহিত হয়,

করিও!" একথা আর কাটি কিসে? ভাবিলাম, মাতৃবক্ষে আঘাত দিয়া কোন কর্ম্মই উচিত নয়—সে কাজ কদাচই ঈশ্বরানুমোদিত হইতে পারে না—বিশেষতঃ যিনি কন্যা সম্প্রদান করিবেন, তাঁহার মতানুযায়ী পদ্ধতিই শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হয়!

লীলা। হৃদয়েশ্বর! কিছু মাত্র ব্যথিত হইও না—মাতৃ আজ্ঞায় একার্য্য করিলে পরমপিতা কখনই আমাদিগকে অপরাধী করিবেন না—তিনি পূর্ণ দয়াময়—পদ্ধতি যাহাই হউক, আমরা মনে মনে তো তাঁহাকে স্মরণ করিব আর তাঁহাকে সাক্ষী রাখিয়া পরস্পরকে পতি পত্নীত্বে বরণ করিয়া লইব—তাহাতেই যথেষ্ট—উপচার্য্যের প্রয়োজন কি? পিতার নিকট সন্তান অঙ্গীকার করিবে তাহাতে উকীলের মধ্যস্থতা আবশ্যক কি?

যখন এই কথা হয়, তখন তাঁহারা অশ্ব ত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরের বাহু-পাশ-বদ্ধ হইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে একটী সুরম্য লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছেন। লীলার মধুর বাক্য শুনিয়া দুলীন অতি-মাত্র-হর্ষে প্রণয়িনীকে পূর্ণ প্রেমভরে হৃদয়ে আকর্ষণ ও বার বার শ্রীমুখ মণ্ডলে পবিত্র চুম্ব দান পূর্ব্বক যেন ইহাই জানাইলেন যে, তাঁহারও মনের কথা ঐ এবং অদ্যই যেন ব্রাহ্ম-মতে শুভ বিবাহ সিদ্ধ হইয়া গেল!

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভীষণ চক্রান্ত।

এই সময় দুলীন এক পরওয়ানা পাইলেন—প্রধান সচিবের স্বাক্ষরিত। তন্মর্ম্ম এই;—"চাঁদ খাঁকে পত্র পাঠ অবশ্য অবশ্য পাঠাইবে—সে যদি মরিয়া থাকে, তথাপি তাহার শবও প্রেরণ করিবে! না পাঠাইলে, এই অবাধ্যতার দায়িত্ব ও প্রতিফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে—অধিক লেখা বাহুল্য!"

দুলীন পাঠ করিয়া স্বগত বলিলেন, "ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু অতি মিষ্ট! দেখিতেছি, ইহারা ক্রমে গুরুতর ও গাঢ়তর করিয়া তুলিতেছ—অন্যথা উক্তিও লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে! ফল কথা, কাংরায় আমাকে আর তিষ্ঠিতে দিবে না—আসিতে যে কেন দিয়াছিল, ইহাই আশ্চর্য্য! যেরূপ শাসন-প্রণালী,

তাহাতে আমার ন্যায় লোককে বিনা প্রহরীতায় একবারে যে একটী প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব-রূপ এত বড় বিশ্বাসের ভার অর্পণ করিয়াছিল, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়! বোধ হয়, তাহাদের সম্পূর্ণ হাত থাকিলে ঘটিত না—মহারাজার গুণেই ঘটিয়াছে! সুতরাং আমার পক্ষে এমন প্রভুর প্রতি প্রকৃত স্বামী-ধর্ম্ম পালন আরো উচিত! ইহারা হয় তো তখন ভাবিয়াছিল, আমাকে লোভ ও ভয় মৈত্রতা দেখাইয়া ক্রমে ক্রীত দাস করিয়া লইবে, সে আশায় নিরাশ হওয়াতে দূরীভূত করাই শ্রেয়ঃকল্প স্থির করিয়াছে! কিন্তু সেই দূরীকরণ সহজে হইবে না—মহারাজকে স্বয়ং আসিয়া তিনবার মাথা গলাইতে হইবে! বস্তুকর্ত্তৃক, তাঁহার শত শত কর্ম্মাধ্যক্ষের মধ্যে অন্ততঃ এক জনও যে যথার্থরূপে তাঁহার আজ্ঞা-পালক ও নেমকের চাকর আছে, ইটা তাঁহাকে না দেখাইয়া যাওয়া হইবে না!"

দুলীন মনে মনে ও গোপনে গোপনে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন—সর্ব্ব বিষয়ে এরূপ প্রস্তুত যে, যদি সহসা এমন অবস্থাই ঘটে যে, দণ্ডেকের মধ্যেই কাংরা ত্যাগ না করিলে নয়, তাহাতেও কোন গোলযোগ, ত্রুটি বা হানি না হয়। কয়েক বৎসরে ন্যায়োপার্জ্জন দ্বারা যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে এইরূপ বিধান করিলেন;—দুলীন-গঞ্জ নামে তিনি যে নগর স্থাপন করিয়াছেন, সেই গঞ্জে যে সকল ধনী সদাগর বা তাহাদের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ ব্যবসায় করিত, তাহাদের কুঠি ভারতবর্ষের নানা স্থানে ছিল। তন্মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত, ধনী ও বিশ্বাসী, তাহার গদিতে বিংশতি সহস্র মুদ্রা জমা দিয়া এক বরাত-চিঠি লইলেন; সেই হুণ্ডি দিল্লী, মথুরা, পাটনা, কলিকাতা প্রভৃতি যে যে স্থলে তাঁহার কুঠি আছে, তাহার যেখানেই হউক ভাঙ্গাইতে পারা যাইবে। এতদ্ভিন্ন কয়েক-শত-সংখ্যক আক্‌বরি মোহর সংগ্রহ করিলেন, এক প্রকার কটিবন্ধ করাইয়া তন্মধ্যে ঐ স্বর্ণ-মুদ্রাগুলি ও কয়েক খণ্ড হীরকাদি নিহিত রাখিয়া স্বীয় বস্ত্রাভ্যন্তরে কটিদেশে সর্ব্বদা পরিধান করিতে লাগিলেন! তদ্বাদে আপনার ও লীলার অঙ্গুলিতেও বহু মূল্যের হীরকাঙ্গুরী কয়টী অবিচ্ছেদে ব্যবহার দ্বারা অর্থ বহনের একটী সুগম উপায় করিয়া লইলেন! সর্ব্ব সমষ্টিতে দ্বাত্রিংশত সহস্র মুদ্রার অধিক সমাবেশ হইল না! বৎসর গণনায় ও পদ বিবেচনায় এ সঞ্চয়কে সামান্যই বলা যায়! যেহেতু দুলীনের বার্ষিক বেতনই তো পঞ্চদশ সহস্র ছিল।

দুলীন মনে জানেন যে, যে ঘটনাই হউক, বন্নু, ধন্নু, চাঁদ খাঁ, আলিবর্দ্দি খাঁ ও তাহাদের অধীন লোকজন ও পেসখেজমৎ প্রভৃতি অতি বিশ্বাসী প্রিয়-পাত্রগণকে সঙ্গের সাথী করিতে স্বেচ্ছায় তো বিমুখ হইবেন না। তথাপি, কি জানি, যদি কোন সূত্রে তাহাদের সকলকে লইয়া যাইতে না পারেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে এক প্রকার নিরাশ্রয় ও নিঃস্বম্বল করিয়া যাওয়া হয়। অতএব সংকল্প করিলেন, এবং নীলাকেও বলিলেন যে, যে শুভক্ষণে তাঁহাদের সুখময় শুভ-পরিণয় সংঘটন হইবে, সেই দিনে তদুপলক্ষ করিয়া ঐ সব অনুগত জনের প্রত্যেককে পারিতোষিক দানচ্ছলে প্রচুর অর্থ বণ্টন করিয়া দিবেন—পরে সঙ্গে যায় ভালই, না যায়, তথাপি তাহাদের মূল ধন সঞ্চিত রহিল!

এই ভাবে কিছু দিন গত। মধ্যে মধ্যে নানা সূত্রে পার্ব্বত্য অঞ্চলের অসন্তোষমূলক বিদ্রোহ-দাবানলের কিছু কিছু আভাস দুলীনের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। শুদ্ধ আভাস কেন? প্রকারান্তরে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনার প্রস্তাবও দুই তিন বার আইল—উদাসীন বিমুখ হইয়া গিয়াও ক্ষান্ত হন নাই—তাঁহার দল হইতে পত্র আসিতে লাগিল! যে দূত সেরূপ বেনামি পত্র দুর্গদ্বারে দিয়া যায়, সে আর প্রত্যুত্তরের নিমিত্ত অপেক্ষা করে না। শেষ বারের পত্রে এরূপ ভয় প্রদর্শনের কথাও ছিল যে, "যদি তুমি সাহায্য না কর, তবে তোমারও ঘোর বিপদ ঘটিবে—ইহা বুঝিয়া এখনও আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হও—জয়ন্তী মঠের নিকট যে মহা অৰ্জ্জুন বৃক্ষটী আছে, তাহার উত্তরের ডাল কাটিবার হুকুম দিলেই বুঝিব যে তুমি সম্মত—তৎক্ষণাৎ গুপ্ত দূত তোমার নিকট গোপনে যাইয়া সকল বন্দোবস্ত ধার্য্য করিয়া আসিবে!" দুলীন সে সব পত্র অগ্নিসাৎ করিয়া সে কথা কাহাকেও বলিতেন না এবং সে বিষয়ের প্রতি বড় আর চিত্তার্পণ করিতেন না—আত্ম নির্দ্দোষিতা ভাবিয়া সম্পূর্ণরূপেই নিশ্চিন্ত থাকিতেন! কিন্তু "নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?" তাহা তিনি ভাবেন নাই!

রাত্রি দেড় প্রহর অতীত—সে রাত্রিতে গুলাপী ছিল না বলিয়া রাণী ও রাজকন্যা দুলীনের ঘর হইতে সকাল সকাল অন্তঃপুরে গিয়াছেন—গুলাপী মাঝে মাঝে চিকিৎসা বা শৈল-কানন-ভ্রমণেচ্ছা বশতঃ এরূপে অনুপস্থিত থাকিত—দুলীনও সকাল সকাল শয়ন করিয়াছেন। বিবাহের আর চারিদিন মাত্র অবশিষ্ট—আশাময়ী যামিনী-চতুষ্টয় গত হইলেই পঞ্চম দিবসে সুপ্রভাত

উরিবে ও সুখযামিনী আসিবে—সে যামিনীতে লীলাকে আর তাঁহার গৃহ হইতে উঠিয়া যাইতে হইবে না, অথবা অন্তঃপুরে গিয়া লীলার সহিত যামিনী যাপনে তাঁহার আর বাধা থাকিবে না! এই সুখের ভাব ভাবিতে ভাবিতে অজ্ঞাতসারে নেত্র-পত্র নিদ্রা-ভারাক্রান্ত হইতেছে মাত্র, এমত কালে গৃহমধ্যে সহসা গুলাপী আসিয়া (কোন সময়েই গুলাপীর যাতায়াতের নিষেধ ছিল না) ব্যগ্রভাবে অনুচ্চস্বরে বলিল "বাবা উঠ—"

এমন সময়ে এরূপ বাক্য শুনিয়া তুলীন চমকিয়া উঠিলেন। গুলাপী কহিল "উতলা হইও না—কিন্তু মনোযোগে শুন—সামান্য হেতুতে তোমার বুড়ী মা এমন সময় আসিয়া তোমার ঘুম ভাঙায় না! প্রকাণ্ড কাণ্ড উপস্থিত—ভগবানের দয়াতেই আমি আ'জ্ পাহাড়ে গাছ্ড়া কুড়াইতে গিয়াছিলাম!"

তুলীন সচকিতে কহিলেন "প্রকাণ্ড কাণ্ড—পাহাড়ে? সে কি?"

গুলাপী। হাঁ পাহাড়ে—পর্ব্বত গহ্বরে—আমি যাহা শুনিয়া আইলাম, তাহা স্মরণে এখনও আমার গায় কাঁটা দিতেছে—তখন তো থর থর কাঁপিয়াছি—পাছে পাষণ্ডেরা আমায় টের পায়, এই ভয়ে কাঁপিয়াছি—টের পাইলেই মারিয়া ফেলিত! ফেলিত ফেলিত, বালাই চুকিত, সে ভয়ে কাঁপি নাই—পাছে তোমায় সংবাদ না দিয়া মরিতে হয়, এই ভয়ে—

তুলীন। কাহারা? কি করিয়াছে? শীঘ্র বল!

গুলাপী। বলি শুন—এই আমি তথা হইতে আসিতেছি—দৌড়িয়া দৌড়িয়া আসিয়াছি—এখনও হাঁপাইতেছি।

এই বলিয়া তুলীনের ইঙ্গিতমতে গুলাপী বসিল ও ক্ষণেক স্থির হইয়া বলিতে লাগিল ;—

"কিছু খাবার লইয়া প্রাতেই বনে গিয়াছিলাম—সারা দিন ঘুরিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিলাম। একটা নিভৃত শীতল গুহায় গিয়া কিছু আহার করিয়া শুইয়া পড়িলাম। একবারে অগাধ ঘুম, উঠিয়া দেখি রাত্রি হইয়াছে। ভাবিলাম আ'জ্ নাই গেলাম। এই মানসে গুহার এক কোণে যাইয়া শয়ন করিয়াছি মাত্র, এমন সময় বাহিরে লতাবল্লরী সরাইয়া কে যেন আসিতেছে, এমনি শব্দ পাইলাম। এক অস্ত্রধারী দীর্ঘাকার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি আইল; গুহা-দ্বারের নিকট বসিল; কিছু পরেই আর দুই মূর্ত্তি আসিয়া যোগ দিল। গুহার মধ্যে পাষাণময় স্বাভাবিক একটা অস্থূল ও অনুচ্চ দেয়াল ছিল, আমি নিঃশব্দে সরিয়া তাহারি

আড়ালে গেলাম—তাহারা সেই দেয়ালের অপর দিকে, সুতরাং তাহাদের কথা বার্ত্তা সমস্তই শুনিতে পাইলাম।”

তুলীন। কি কথা?

গুলাপী। হায়! তোমারি কথা! তোমাকে মারিয়া ফেলিবার কথা—তোমাকে মারিয়া দুর্গটী অধিকার করিবার কথা—রণজিতের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য দুর্গটী তাহাদের বড় দরকার! ও বাবা! এই দেখ, আমার গা এখনও কাঁপিতেছে—পাপিষ্ঠেরা চলিয়া গেল; আর আমি ছুটিয়া আইলাম!”

বহু প্রশ্নের পর গুলাপীর নিকট হইতে ষড়যন্ত্রকারীদের দুরভিসন্ধি ও বন্দোবস্ত বিষয়ে তুলীন যাহা সংগ্রহ করিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত চূর্ণক এই;—

ভণ্ড সন্ন্যাসীর প্রস্তাবে তুলীন সম্মত না হওয়াতে এবং নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে অর্জ্জুন বৃক্ষের শাখাচ্ছেদের আদেশ না দেওয়াতে বিদ্রোহীরা তাঁহার প্রতি অতিশয় রুষ্ট হইয়াছে। সন্ন্যাসীকে দূরীভূত করিবার পরেও তাহাদের যে যৎকিঞ্চিৎ ভরসা ছিল, এখন তাহাতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া এবং সন্ন্যাসী আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া প্রতিফল দিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছে। বিশেষতঃ বিদ্রোহ ব্যাপারের সুসিদ্ধি পক্ষে কাংরার ন্যায় দুর্ভেদ্য দুর্গ একটা নিতান্ত আবশ্যক। অতএব নানা প্রবল হেতুতে তুলীনকে বধপূর্ব্বক দুর্গাধিকার করাই বিদ্রোহের প্রধান ও প্রথম সোপান বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। তদুদ্দেশে বহুতর গুপ্ত চেষ্টা এবং প্রচুর উৎকোচাদি দান দ্বারা দুর্গস্থ কোন কোন আত্মীয়কে ও কোন কোন সৈনিক কর্ম্মচারীকে বশীভূত করিয়া তুলিয়াছে। ইহারা আবার সহচর জুটাইতে সক্ষম হইয়াছে।

অদ্য হইতে চতুর্থ দিবসে কয়েকটী পার্ব্বতীয় প্রদেশের সৈন্য ও সর্দ্দারগণ গুপ্ত বেশে কাংরার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকস্থ গিরি-বন-মধ্যে অল্প অল্প সংখ্যায় আসিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থলে একত্র দলবদ্ধ হইবে। সে দিকে লোকের বসতি অতি বিরল—নাই বলিলেই হয়—কেবলই অরণ্য ও সঙ্কীর্ণ শৈলপথাদিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং উক্তরূপ দুর্গম পথ দিয়া শত্রু আসিবার সম্ভাবনা অল্প বলিয়া সে দিকে সতর্ক প্রহরিতার ব্যবস্থাও ছিল না। পার্ব্বতীয় লোকের পক্ষে সেরূপ পার্ব্বতীয় পথ অন্যের ন্যায় ততটা দুরভিগম্য ও দুরতিক্রম্য নয়। এই জন্য ষড়যন্ত্রীরা ধার্য্য করিয়াছে যে, উক্ত চতুর্থ দিবসীয় জ্যোৎস্নাময়ী নিশাযোগে তাহারা উক্ত পথ দিয়া অতি সঙ্গোপনে নিদ্রিত দুর্গ-সমীপে আসিয়া উপস্থিত

হইবে। দুর্গের কোন কোন স্থলে মৈ লাগাইয়া আক্রমণের ভাণ মাত্র দেখাইবে। দুর্গরক্ষকগণ সেই সেই কপট হল্লার দিকে অবশ্যই ছুটিবে; সেই গোলযোগে তাহাদের উৎকোচ-গ্রাহী দুর্গস্থ বান্ধবদের মধ্যে কেহ কেহ বা ডুলীনকে ও ডুলীনের বিশ্বাসী অধ্যক্ষগণকে বধ করিবে, কেহ কেহ বা তোরণদ্বার খুলিয়া দিবে। তখন বিপক্ষদল দুর্গে প্রবেশ পূর্ব্বক অনায়াসে মস্তকহীন—চালকহীন সামান্য সৈনিকগণকে আয়ত্ত করিতে পারিবে। একা প্রচণ্ড সিংহই সিংহ-বিক্রমে তাহাদিগকে মেষপালরূপে যে পরাস্ত ও নিরস্ত্র করিয়া তুলিবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? পরে তাহাদিগকে কিছু বেশী বেতনের লোভ দেখাইলেই তাহারা অব্যাজে বিদ্রোহী-দলে মিশিবে!

দুষ্টদলের এই দুষ্ট মন্ত্রণা শুনিয়া ডুলীন গুলাপীকে ও ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ দান করিলেন। গুলাপী উৎকোচগ্রাহীদের কাহারো কাহারো নাম শুনিয়াছিল, কিন্তু চিত্তচাঞ্চল্য বশতঃ একজনেরও নাম মনে রাখিতে পারে নাই; তজ্জন্য ডুলীন কিছু ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু কোন্ কোন্ কর্ম্মচারী তাঁহার বিরুদ্ধাচারী, তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে জানিতেন। অতএব গুলাপীকে শয়নে যাইতে বলিয়া হাকিম সিংহ, চাঁদ খাঁ ও আলিবদ্দিকে ডাকাইলেন। গুলাপীর নাম করিলেন না ও সমুদয় কথাও বলিলেন না; কেবল কোন বিশ্বস্তসূত্রে একটা ষড়যন্ত্রের বার্ত্তা পাইয়াছেন, এতাবন্মাত্র শুনাইয়া প্রতিবিধানের পরামর্শ আঁটিলেন। প্রথমতঃ মৃত নন্দ সিংহের সখা সম্‌সিয়ার খাঁ, পল্টন সিংহ ও হরদয়াল সিংহ নামক তিনজন সৈনিক কর্ম্মচারীকে চুপে চুপে গোলযোগ ব্যতীত তৎক্ষণাৎ ধৃত করিতে ও পৃথক্ পৃথক্ কারাগারে লৌহবদ্ধ রাখিতে আদেশ দিলেন। বলিলেন "ঐ তিন জনের গৃহদ্বারে তেহারা চৌহারা পাহারা রাখিবে এবং নিজে তোমরা সমস্ত রাত্রি তত্ত্বাবধান করিবে। তদ্ব্যতীত, সেনা-নিবাসের মধ্যে যাহারা যথায় অবস্থিত আছে, তাহারা যেন তথা হইতে একপাদ ভূমিও অন্যত্র যাইতে না পারে এবং দুর্গের চতুর্দ্দিকে, বিশেষতঃ তোরণদ্বয়ের ভিতর বাহিরে এমন সতর্ক ও বিশ্বাসী প্রহরী-শ্রেণী স্থাপিত কর, যাহাতে দুর্গাভ্যন্তর হইতে এক প্রাণীও বাহিরে যাইতে বা বাহির হইতে আসিতে না পারে—যদি কেহ মানা না মানিয়া যাইবার কি আসিবার উদ্যম করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে গুলি করিয়া মারে। রাত্রির মত এই, প্রাতে উঠিয়া অন্যান্য বন্দোবস্ত করিব।"

এই হুকুম তামিল করিতে বিশ্বাসী প্রিয় কর্ম্মচারীত্রয় চলিয়া গেলে ডুলীন নিদ্রার আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন ; কিন্তু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত দেবীকে প্রসন্না করা ভার হইল, শেষ রাত্রে দেবী সে কৃপাটী করিলেন !

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সান্ত্বনা—যাত্রা।

কাংরা দুর্গ একটী স্বতন্ত্র শৈলোপরি স্থিত। ইহার প্রায় চতুর্দ্দিক্ই কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত মুক্ত। ইহা যে পর্ব্বত-শ্রেণীর প্রত্যঙ্গ, তাহা ইহার দক্ষিণ পশ্চিমে স্থিত। তাহার নাম ভৈরবগিরি। তাহার সহিত ইহার অন্তর্নির্বিষ্ট সংযোগ থাকিতে পারে, কিন্তু বাহ্য-দৃশ্যে তাহা হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সম্মুখ ভাগের অর্থাৎ উত্তর দিকের উভয় পার্শ্বে যে দুইটী উচ্চ ঢিপি আছে, তাহাও ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন—সে দুইটী এবং জয়ন্তীর দুটী বাহু যদি দুর্গ-শৈলের সহিত সংযুক্ত থাকিত, তবে তাহারা যেন তাহার স্কন্ধ ও ভুজরূপে প্রতীয়মান হইত। কিন্তু তাহা না হইয়া ঐ স্কন্ধ যুগল দুর্গ হইতে যেমন, জয়ন্তী হইতেও তেমনি পৃথক্—পরস্পরের মধ্যে অনেকটা মুক্ত স্থল আছে। আবার, স্কন্ধ যুগল যে পরস্পরে সর্ব্বাংশে সমান্তরালবর্ত্তী তাহাও নহে ; তাহাদের মধ্যে বক্র গতিতে দুর্গের পথ—সেই পথ ক্রমে ক্রমে খুব উন্নত হইয়াছে এবং কিয়দ্দূর গিয়া একটা গৈরিক প্রাচীর কর্ত্তৃক দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুর্গের দুই ফটকে গিয়া মিলিয়াছে—ঐ দেয়াল আবার অতিশয় উচ্চ, তাহার পাদদেশ স্থূল, কিন্তু শিরোদেশ ক্রমে ক্রমে এত পাতলা হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে যে, দেখিতে ঠিক ক্ষুরের ন্যায় বোধ হয়—ক্ষুরেরও নিম্নভাগ পুরু, ধারের দিকে পাতলা—এই দেয়ালের পীঠও তেম্নি ধারালো। সেই ধারালো দাড়ার উপরে মানুষ দাঁড়াইতে পারে না। এই গেল উত্তর দিকের বর্ণনা।

পূর্ব্ব ও দক্ষিণে বাণগঙ্গা ও বাণগঙ্গার পারে কতক বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিময় বনভূমি, কতক বা উর্ব্বর শস্যভূমি। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ও পশ্চিম দিকে প্রায় এক ক্রোশ পর্য্যন্ত সমতল ভূমি—তাহাতে মধ্যে মধ্যে বৃহৎ মহীরুহ ও মনোহর দূর্ব্বা ক্ষেত্রাদি বিরাজমান—ডুলীন সর্ব্বদা তথায় বায়ু সেবন করিতেন। সেই ক্ষেত্রাদির পরেই ভৈরব পর্ব্বতমালা।

উক্ত দক্ষিণ-পশ্চিম কোণস্থ পর্ব্বতমালাই বাণগঙ্গার জন্মস্থান এবং উহা ভেদ করিয়া আসিয়াই বাণগঙ্গা সমতল-ক্ষেত্রে পড়িয়াছে। এবং লীলা-ভঙ্গীতে ক্ষেত্র বাহিয়া দুর্গের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব পাদমূল ধৌত করিয়া নিম্ন প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে। অধুনা আমাদের ঐ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের উপত্যকা ও গিরি-পথ লইয়া সম্পর্ক, সুতরাং তাহার বিশেষ বর্ণনারই প্রয়োজন।

দুর্গ হইতে এক ক্রোশ দূরে ঐ কোণে ভৈরব-গর্ভে একটী সঙ্কীর্ণ গিরি-সঙ্কট-পথ আছে, তাহার নাম "যম-ঘুলি!" পাঠক মহাশয় নামেতেই তাহার ভয়ানক ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন! সেই ঘুলি বা উপত্যকার দুই দিকে পর্ব্বত, সেই ঘুলি মধ্য দিয়াই বাণগঙ্গা প্রবাহিত—যেন বাণগঙ্গারই নিমিত্ত প্রকৃতি গিরি-হৃদয় চিরিয়া পথ করিয়া দিয়াছেন! কিন্তু আশ্চর্য্য এই, বাণগঙ্গা যেমন কাংরার দিকে নামিতেছে, পার্শ্বস্থ পথটা তেমন নামিয়া আসিতেছে না—ধাপে ধাপে ক্রমশঃই উঠিতেছে! অর্থাৎ পর্ব্বতের অপর পার হইতে একটু একটু করিয়া প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ উঠিয়া আসিয়াছে। তাহার পর দুই তিনটী লম্ফ দিয়া দুই তিনটী উচ্চ ধাপে উঠিবার পর ছাদের ন্যায় একটী স্থানে উপস্থিত হইতে হয়। সেই ছাদ পার হইয়া আবার অবতরণ করিলে তবে দুর্গ-সন্নিহিত ক্ষেত্রে আসা যায়। যে অর্দ্ধ ক্রোশ বন্ধুর পথটাতে আরোহণ আবশ্যক, তাহারই নাম "যম-ঘুলি!" তাহারই নিম্নে বাণগঙ্গার খরস্রোত—সে প্রবাহ এত নিম্নে যে পথ হইতে হেঁট মুখে দেখিতে ভয় হয়!

এই যম-ঘুলির কোন অংশই শত হস্তাপেক্ষা অধিক পরিসর নয়; এবং কোন কোন স্থল এত সঙ্কীর্ণ যে, উভয় পার্শ্বস্থ শৈল-শিরে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি কথাবার্ত্তা কহাও যায়! কোথাও বা দুইজনের পাশাপাশি-ভাবে গমন করাও দুষ্কর! সেই উভয় পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের গাত্র অধিকাংশ স্থলেই প্রাচীরের ন্যায় ঋজু। পথের মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র বৃহৎ শিলা খণ্ড পতিত—কোথাও বা মস্তকোপরি গিরিগাত্র হইতে প্রায় বহির্গত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাষাণ খণ্ড ভগ্ন-সেতুর অংশবৎ অবস্থিত—ঠিক যেন আকাশে প্রায় নিরবলম্ব ঝুলিতেছে, হয় তো প্রবল বাত্যা উঠিবা মাত্র পতিত হইতে পারে!

এই ভয়ানক "যম-ঘুলি" দিয়া চক্রান্তকারী দুর্গাক্রমক দল আসিবে, গুলাপী এইরূপ শুনিয়া আসিয়াছে। এ দুর্গম পথ অতিক্রম ব্যতীত সঙ্গোপনে আসিবার দ্বিতীয় পন্থা আর নাই। ছিপে মৎস্য ধরিবার জন্য দুলীন সাবকাশ মতে

কত শত দিন সেখানে গিয়াছেন এবং মৎস্য ধরিতে ধরিতে ঘুলির অবস্থা দেখিয়া এমন কল্পনাও করিয়াছেন যে, জনকত বিশ্বাসী ও সাহসী লোক লইয়া সে স্থলে বহু সৈন্যকেও বিমুখ করিতে পারা যায়।

এখন সেই কথা মনে পড়িল—সে কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার দিন আসিয়াছে ভাবিয়া মনে মনে কত উৎসাহই হইল! তবে গোপনে ও নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ করিয়া তুলিতে পারিলে হয়! ঘরে শত্রু আছে বলিয়াই চিন্তা, নচেৎ সুসিদ্ধির অসম্ভাবনা কি?

ক্ষেত্র ও পর্ব্বত-পথের সন্ধি-স্থলের মুখে কয়েকজন মুলতানী সহিত আলি-বদ্দিকে রাখিলেন; পর্ব্বতের ওপারে সেরূপ সন্ধিস্থলে বন্নুকে সদলে রক্ষা করিলেন; উভয় দলই পাহাড়িয়া শ্রমজীবীদিগের বেশ ধরিয়া লুক্কায়িত রহিল—কেবল একজন করিয়া বাহিরে থাকিয়া পাহারা দিত—তাহাও সামান্য পথিকবেশে! তাহাদের প্রতি উপদেশ, জনপ্রাণীকেও এদিকে কি ওদিকে পথ মধ্যে প্রবেশ করিতে দিবে না—প্রস্তর-চাপ পড়িয়া পথ বন্ধ হইয়াছে বলিয়া লোক জনকে ফিরাইবে। নিতান্ত না শুনে, বলপূর্ব্বক কয়েদ করিবে। একে তো সে পথে লোকজনের গতাগতি অতি বিরল, তাহাতে তিন দিন মাত্র; সুতরাং ভুলীন ও চাঁদ খাঁ কতকগুলি বিশ্বাসী অনুচর লইয়া যম-ঘুলিতে যাহা করিতেছিলেন, তাহা প্রকাশ পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব!

যম-ঘুলিতে করিলেন কি? বেশী কিছুই করিতে হইল না—স্বভাব স্বয়ং সে স্থানটাকে যেরূপ ভীষণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে অধিক আয়োজনের প্রয়োজনও নাই। যাহা কিছু প্রয়োজন, অধিক লোক লাগাইলে এক দিনেই হইতে পারিত, কিন্তু অত্যন্ত বিশ্বাসী লোক চাই, বিশেষতঃ বেশী লোক লইয়া গেলে দুর্গমধ্যে ও বাহিরে সন্দেহ উৎপাদন এবং মনোযোগাকর্ষণ হওয়া সম্ভব। এই জন্য অতি অল্প সংখ্যক অতি বিশ্বাসী সহচরই নিযুক্ত করা হইল। তাহারাও সামান্য পাহাড়িয়া মজুরের মত ছদ্মবেশ ধারণ করিল।

যথায় লম্ফ দিয়া ছাদে উঠিতে হয়, তথায় মৃত্তিকা ও পাষাণ দিয়া অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে এমন একটা দেয়ালের বাঁধ বাঁধাইলেন যে, শত্রুরা সহজে তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া উঠিতে না পারে। পথ-পার্শ্বস্থ গিরি-শিরে যেখানে যেখানে আত্ম-রক্ষার উপযুক্ত স্থান পাইলেন—অর্থাৎ নিম্নদেশ হইতে তীর বা গুলি নিক্ষিপ্ত হইলে যে যে স্থলে উপরিস্থ লোকের গায়ে না লাগে, অথচ উপর হইতে তাহা

নিরাপদে হইতে পারে, স্বভাব-দত্ত এরূপ সুবিধার স্থল বুঝিয়াই তাহার আরো পারিপাট্য করিলেন এবং যথায় তদ্রূপ সুবিধা সম্পূর্ণরূপে অপ্রাপ্য, তথায় কৌশলময় কৃত্রিম ভিত্তি প্রভৃতি রচনা করিয়া লইলেন। এ সব ব্যবস্থা ধানুকী ও বন্দুকীদিগের জন্য যেমন হইল, তেমনি "সুইভেল্" নামক ঘূর্ণন-শীল ক্ষুদ্র কামান দুইটা বসাইবার ও তাহাদিগকে যে মুখে ইচ্ছা ছুড়িবার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ম্মিত এবং অন্যান্য কৌশলও রচিত হইল। তদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য পাষাণখণ্ড আনাইয়া উভয়দিকের ধারে ধারে সাজাইয়া রাখা হইল—ইহাতে আবরণও হইবে, আক্রমণও চলিবে!

ডুলীন সর্ব্বদা তথায় থাকিতেন না—প্রাতে ও অপরাহ্নে ভ্রমণের এবং মধ্যাহ্নে মৎস্য শীকারের ছলে যাইতেন। সৌভাগ্যক্রমে সে কয় দিন বেশী লোক জন সে পথে বা পর্ব্বতে যায় নাই—যদিও দুই একজন গিয়াছে, ছদ্ম-বেশী প্রহরীরা পথ বন্ধ ইত্যাদি ছলে ফিরাইয়া দিয়াছে। যে রজনীতে আক্র-মণের প্রত্যাশা, সেই দিনের অপরাহ্ন মধ্যেই অভিপ্রেত কার্য্য সমূহ সম্পূর্ণ করিয়া ডুলীন আলিবর্দ্দিকে সঙ্গে লইয়া দুর্গে আইলেন।

হাকিম সিংহের প্রতি দুর্গের ভারার্পণ ও বিবিধ উপদেশ দান পূর্ব্বক লীলার গৃহে গমন করিলেন। কয়দিনের চাঞ্চল্য ভাব লীলার অলক্ষ্য ছিল না—কল্য শুভোদ্বাহ, তথাপি ডুলীনকে দিবসত্রয় পূর্ব্বে যত উৎফুল্ল দেখিয়াছেন, কোথায় দিন দিন সে আনন্দোৎসাহের বৃদ্ধি দেখিবেন, না, ডুলীন যেন চিন্তা-মগ্ন —ডুলীন যেন অন্য কাজে মহা ব্যস্ত—ডুলীন যেন থাকেন থাকেন কোথায় বিলুপ্ত হন! অতএব একটা অসাধারণ কি যেন ঘটিতেছে এবং একটা অজ্ঞাত বিপৎপাত যেন নিকটবর্ত্তী, এইরূপ ভাব অস্ফুটরূপে লীলার হৃদয়াধিকার করিয়াছে! তজ্জন্য লীলাও অতি বিষণ্ণা, অতি ব্যাকুলা! লীলা স্বীয় হৃদয়ের সেই গুরু ভার ও সেই মন্দের আশঙ্কাকে দূর করিয়া দিতে বিপুল চেষ্টা করি-তেছেন—আত্ম মনকে কতই বুঝাইতেছেন, তথাপি সকলই বিফল হইতেছে! "মন্দই বা কি ঘটিবে? এমন সুখসৌভাগ্যের সময় বৃথা কেন অপ্রত্যাশিত দুর্ভাগ্যের অপ্রার্থনীয় মূর্ত্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আপনা আপনি দুঃখ-ভারাক্রান্ত হই?" ইহা ভাবিয়া সকলের সহিত আমোদ আহ্লাদ ও সদালাপে যতই অন্যমনস্ক হইতে যত্ন করেন—প্রত্যহ প্রায় প্রমীলাকে আনাইয়া যতই সুখের মুখাবলোকন নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বন করেন, হায়! ততই

যেন সেই সুখ দূরে যায়—ততই যেন দুশ্চিন্তারাহু আসিয়া আরো গ্রাসোদ্যত হয়! কেন যে এমন জাজ্বল্যমান সুলক্ষণের দিনে এমন লুক্কায়িত অলক্ষণ অন্তস্তলে লক্ষিত হয়, তাহা কিছু মাত্র বুঝিতে পারেন না!

বেলা অবসান হইয়াছে; প্রমীলা চলিয়া গিয়াছেন; লীলা আপন কক্ষে বসিয়া বাম করতলে বাম গণ্ড স্থাপন পূর্ব্বক ঐরূপ গভীর চিন্তায় মগ্না, এমন সময় বিদায় গ্রহণার্থ ভুলীন তথায় উপস্থিত। লীলার এই ম্রিয়মান ভাব দর্শনে ভুলীন চমকিয়া উঠিলেন—ভুলীনের বক্ষঃস্থল যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল —সত্বরে ও সাদরে প্রেয়সীর বদন-কমল হইতে কোমল করকমল সরাইয়া কারণ জিজ্ঞাসার ইচ্ছায় স্বীয় ওষ্ঠাধর মুক্ত করিতে না করিতে লীলা স্বীয় বাহু-লতায় প্রিয়তমের কণ্ঠ বেষ্টন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন!

"কেন? কেন কি হইয়াছে? কাহার সাধ্য, কে কি বলিয়াছে? কাহার ঘাড়ে দুটা মাথা, কে তোমার অপ্রিয় করিতে সাহসী হইয়াছে?" ইত্যাকারের সকরুণ সানুরাগ প্রলাপের প্রশ্নমালা চলিতে লাগিল!

অশ্রু বিসর্জ্জন উপায়ে হৃদয়ের ভার অনেকটা লাঘব হওয়াতে লীলা কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হইয়া বলিলেন "না হৃদয়নাথ, কেহই আমাকে কিছু বলে নাই—কেহই কিছু করে নাই—সকলেই আমায় আদর আর সমাদর করিতেছে—সকলেই আমার সুখ আর সন্তোষের জন্য ব্যতিব্যস্ত আছে; আমার দুঃখের কারণ বাহিরে নয়, (বক্ষ দেখাইয়া) এই ভিতরে!" এই ভূমিকার পর আত্ম-মনোগত অভাবনীয় ভাব, অকারণ দুশ্চিন্তা এবং অনিমন্ত্রিত আশঙ্কার যতদূর প্রকাশ করা সম্ভব, লীলা তাহা অভিব্যক্ত করিলেন। ভুলীন শুনিয়া মহা ব্যাকুল হইলেন—কি বলিলে কি করিলে প্রিয়তমার এই আকস্মিক চিত্ত-ব্যাধির উপশম হয়, তন্নিরূপণার্থ অধৈর্য্য হইলেন! ভাবিলেন, দুর্ম্মতি বিদ্রোহীদের দুর-ভিসন্ধি ও তিনি তৎপ্রতিবিধানের যে সব মহোদ্যোগ করিয়াছেন, তত্তাবৎ খুলিয়া বলিলেই লীলার অশান্তি দূর হইতে পারিবে। অতএব যাহাতে লীলার মনে অধিক ভয় ভাবনার সঞ্চার না হয়, ভাবী বিপদ-বার্ত্তাকে এইরূপে লঘু করিয়া এবং তাঁহার নিজের আয়োজনকে সুরাগে রঞ্জিত করিয়া সংক্ষেপে সকলই বলিলেন।

লীলা সাভিনিবেশে আকর্ণন পূর্ব্বক উত্তর দিল "এখন আমি তোমার কয় দিনের চাঞ্চল্য ও অন্যমনস্কতার কারণ বুঝিলাম। তাহাতে এ প্রেম দাসীর

হৃদয়-বেগের একাংশ—অতি লঘু অংশ মাত্র হ্রাস হইল, কিন্তু তোমাকে বলিব না তো আর কাহাকে বলিব, ইহাতেও আমার বিপদাশঙ্কা দূরীভূত হইল না! মনে করিও না যে, তুমি যুদ্ধে যাইতেছ বলিয়া এই দুশ্চিন্তা! আমার দেহে ক্ষত্রিয়-শোণিত প্রবাহিত, আমি কি এমনি ভীরু বালা যে, তোমার রণোদ্যমে তত কাতর হইব? যখন বীর কার্য্যে নিযুক্ত আছ, তখন অস্ত্রের ঘাত প্রতিঘাত-সূচক সংবাদে আমার হৃদয় ভয়-বিহ্বল হইবার নয়! বিশেষ নিজেও আমি অস্ত্র-চালনা শিখিয়াছি, সুতরাং সশস্ত্র পুরুষবেশে তোমার সঙ্গে গেলেই সে চিন্তার হাতে ত্রাণ পাইব! কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য কি গূঢ় কারণে আমার অন্তঃকরণ বিলোড়িত, ভয় তাড়িত ও বিপর্য্যস্ত হইতেছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না—যেন কোন অজানিত আশাতিরিক্ত বিপদ আসন্ন, এম্নি একটী অস্ফুট আশঙ্কায় আমার চিত্ত ব্যাকুল!"

তুলীন বিবিধ প্রবোধ-ময় সপ্রণয় বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া শেষে হাসিয়া বলিলেন "তুমি পুরুষ বেশে অদ্য রজনীর ভয়ানক কার্য্যে আমার সঙ্গে যাইবে, ইহা আমার প্রাণ থাকিতে হইবে না! আমার আর বিলম্ব করা উচিত নয়, অতএব প্রসন্ন বদনে বিদায় দাও—সর্ব্ব ভয়-ত্রাতা করুণাসাগর পিতার নিকট প্রার্থনা কর, আমি নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সিদ্ধি করিয়া শেষরাত্রে বা প্রভাতে আসিয়া তোমার আনন্দ বর্দ্ধন ও বিবাহোদ্যোগ করিব—কোন চিন্তা করিও না!"

লীলা সজল নয়নে বার বার সঙ্গিনী হইবার জন্য অশেষ কাকুতি মিনতি করিলেন, তুলীন কিছুতেই সম্মত হইলেন না! কি জন্য কোথায় যাইতেছেন, সে কথা, মা ভিন্ন অন্য কাহাকেও বলিতে নিষেধ পূর্ব্বক লীলার কোমল বাহুপাশ হইতে আপনাকে যেন ছিন্ন করিয়া লইয়া গেলেন! চৈতনকে ডাকাইয়া বলিলেন "মাকে সঙ্গে লইয়া লীলার গৃহে যাও—লীলা কিছু অসুস্থা আছে—আমি কার্য্যান্তরে যাইব—গুলাপীও বুঝি বাড়ীতে নাই!" পরে আকরাম্ খাঁ ও ধন্নুকে সাবধানে পুরী রক্ষার ভার দিয়া সুসজ্জায় বহির্গত হইলেন।

পুনর্ব্বার হাকিম সিংহ প্রভৃতি বিশ্বাসী কর্ম্মচারিগণকে "কেহই যেন অদ্য রাত্রে দুর্গ হইতে বাহিরে যাইতে ও দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে না পায়" ইত্যাদি উপদেশ আদেশ দিয়া বার বার সতর্ক করিয়া গেলেন।

সোহনলাল ও আলিবর্দ্দি সঙ্গে চলিল—চাঁদ খাঁ ও ধন্নু পূর্ব্ব হইতেই পর্ব্বতে আছে। সাত শত অতি বিশ্বাসী বাছা বাছা লোক সন্ধ্যার কিছু পরে

কাংরা দুর্গ হইতে বহিষ্কৃত হইল—অত লোকের রণযাত্রা কি সংগোপনে হইতে পারে? যদিও যাহারা বুরুজে, তোরণে বা অন্যত্র পাহারা দিতেছিল, তাহারা ব্যতীত আর সকলকে প্রদোষকালে রাত্রির মত সেনা-নিবাসে যাইবার ও শয়ন করিবার আজ্ঞা প্রচার হইয়াছিল, তথাপি অনেক চক্ষু—সু, কু, দুইই—ঐ সাত শতের সসজ্জ নিষ্ক্রমণ ব্যাপার দর্শন করিয়াছিল। কিন্তু কি কার্য্যোদ্দেশে এই যাত্রা, তাহা কেহ নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিল না—যে যাহা অনুমান করুক এই মাত্র! সে অনুমান শতদলে শতবিধ হইতেছিল, কিন্তু হাকিম সিংহের কৌশলে এমন একটী গালাগুষা উঠিল যে, সাহেবের দরকারের সময় লেনা সিংহ যেমন সবলে আসিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন, এখন লেনা সিংহের কি একটা বিশেষ বিপদ উপস্থিত হওয়াতে সাহেব তেমনি তাঁহার আনুকূল্যার্থ সসৈন্যে গমন করিলেন। হাকিম সিংহ এই কৌশলে সৈন্য-যাত্রার প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন রাখিতে পারিলেন বটে, কিন্তু হায়! ভবিষ্যতের তত্ত্বানভিজ্ঞ ভ্রান্ত মানব হিতোদ্দেশে যাহার প্রয়াস পায়, ভবিতব্যতা তাহাতে আর একখানা ঘটায়! হিতৈষী পরম বিশ্বাসী হাকিম যদি ভবিষ্য-দর্শী হইত, তবে এ কৌশলের নিকটেও যাইত না—তাহাতে দুর্গস্থ উৎকোচগ্রাহী বিপক্ষ দল সৈন্যকুচের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেও তত অনিষ্ট ঘটিত না! কিন্তু সে কথা এখন না—যথাকালে।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিষে বিষাদ।

দুলীন সকল ব্যবস্থা করিয়া কম্পিত হৃদয়ে শত্রুর অপেক্ষায় রহিলেন—প্রত্যেক বাণুকী, প্রত্যেক বন্দুকী, প্রত্যেক গোলন্দাজ, প্রত্যেক আস-শড়্কী-ধারী এবং প্রত্যেক নায়ক স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত—কেহ উপবিষ্ট, কেহ শয়ান, কেহ দণ্ডায়মান। কিন্তু সকলেই লুক্কায়িত, সকলেই নীরব—প্রত্যেক বিভাগের ও প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক্ কর্ত্তব্য পরিষ্কাররূপে পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত হইয়া আছে—যে যে অবস্থা ঘটিলে যে সম্প্রদায়ের দ্বারা যখন যাহা করণীয়, তাহা সেনাপতির দৃঢ় উপদেশে সকলের হৃদয়েই যেন মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে

—কার্য্যকালে কোন স্থলে যে কোন হুড়াহুড়ি, কোন গোলযোগ, কোনরূপ সিংহনাদ, কোনরূপ বচসা, অসময়ে অস্ত্রপ্রয়োগ ও ব্যর্থ সন্ধান ইত্যাদি ঘটিবে, তাহার সম্ভাবনা মাত্রই নাই—সেনাপতি যখন একটী হাউই ছুড়িবেন, তখনই কার্য্য আরম্ভ হইবে—অধিক দূর হইতে, অনিশ্চিত অবস্থাতে বা অমোঘ প্রয়োগ না বুঝিলে কেহই কিছু করিবে না!

সে নিশাতে নিশাকর যেন অধিকতর নির্ম্মল জ্যোৎস্না বিকীরণ করিতেছেন—রাত নয় যেন দিন, প্রায় এমনি বোধ হইতেছে—শুক্লা ত্রয়োদশী, চারি দণ্ড রাত্রি সত্ত্বে নিশানাথ ঘুমাইতে যাইবেন, সুতরাং তিনি প্রায় সারা নিশিই আনুকূল্য বিতরণে যে কৃপণ হইবেন না, ইহারই সম্ভাবনা।

তুলীন অপেক্ষা করিতেছেন—অধিত্যকা, উপত্যকা, গিরি, কন্দর, বন নিস্তব্ধ—মাঝে মাঝে দুই একটী নিশাচর পশু পক্ষীর কর্কশ ধ্বনি ও তলস্থ ক্ষুদ্র তটিনীর সুমধুর কুলু কুলু রব ব্যতীত আর কিছুই শ্রুত হইতেছে না! প্রকৃতির এই গাম্ভীর্য্যময় মাধুর্য্যের মধ্যে উপস্থিত বক্ষ্যমাণ ব্যাপার কি ভয়ানক—কি শান্তিহর! তুলীনের হৃদয় সেই ভীষণ চিন্তার মধ্যে স্বীয় হৃদয়েশ্বরীর নানা ভাবে পরিপূর্ণ—লীলার হৃদয়-পদ্ম কি অভাবনীয়, অনিশ্চিত হুতাশে আজ মলিন হইল, তাহার কারণানুসন্ধানের নিমিত্ত তদনুশীলনে মাঝে মাঝে ব্যাপৃত।

ত্রিযামার তৃতীয়াংশও আর নাই, এমন সময় পাষাণ-শয্যায় অৰ্দ্ধশায়িত, চিন্তান্দোলিত, অৰ্দ্ধ-সুপ্ত সেনাপতিকে বার্ত্তাবহ ত্রস্ত আসিয়া সংবাদ দিল "বিপক্ষের অগ্রণী-দল দেখা দিয়াছে।"

তুলীন গিয়া দেখিলেন—নিঃসন্দেহে, উৎসাহ ভরে, উল্লাসের কোলাহলে ডাকাতেরা দল-গুলি বা সমপুরীর পথে উঠিতেছে। যদি তাহাদের উপযুক্ত সেনাপতি থাকিত, এমন সঙ্কট স্থলে এমন নিরাতঙ্কে কদাচ আসিত না—অবশ্যই পথের উভয় পার্শ্বের শিখরদেশ অধিকারার্থ, অন্ততঃ অন্বেষণার্থ, অগ্রে লোক পাঠাইত। তাহাকেই বলে "সৈনাপত্য!" তদভাবই "গোয়ার্ত্তুমি!" সেই গোয়ার্ত্তুমি অর্থাৎ উপযুক্ত বুদ্ধিবলের সাহায্য ব্যতীত শুদ্ধ পাশব-বল ও উৎকোচদান রূপ নীচ ধূর্ত্ততা বলের উপর নির্ভর করিয়াই যে বিপক্ষ আসিবে, তাহা তুলীন পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

তাহারা উপর হইতে নীচের কোলাহল ও হাস্য পরিহাস শুনিতে লাগিলেন—শত্রুর অগ্রণী-দল যেমন অগ্রসর হইতে লাগিল, তুলীনও তাহাদের মস্ত-

কোপরিস্থ পথ বাহিয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিলেন—শত্রু এত দূর নিঃসন্দিগ্ধ ও সফলতা পক্ষে এত আশ্বস্ত যে, নিদ্রিত দুর্গকে কিরূপে চম্‌কাইয়া তুলিবে, কিরূপে "দোচ'কো" কাটিবে, ধনাগার ভাঙ্গিবে, লুটিবে, সাহেবের সঞ্চিত অপরিমিত অর্থ রাশি অধিকার করিবে, কোন্ পদস্থ লোক কিরূপ ভাগ পাইবে, কেহ কেহ বা বাজারের বড় বড় মহাজনের গদি লুঠ করিবে ইত্যাদি "কালনিমার লঙ্কাভাগের' আমোদে মহা আমোদা!

যখন অগ্রণী দল পূর্ব্ববর্ণিত তিনটা দুর্লঙ্ঘ্য ধাপের কাছাকাছি গিয়াছে এবং যখন জুলীন সংবাদ পাইলেন যে, পশ্চাদ্বর্ত্তী সমগ্র দল ঘাঁটির মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন অমনি নিস্তব্ধ নৈশ গগন ভেদ করিয়া সোঁ সোঁ শব্দে জ্বলন্ত হাউই ঊর্দ্ধে উঠিল—যেমন হাউই উঠা, অমনি শত শত বজ্রনাদে শত শত বন্দুকের যুগপৎ ভীষণ ধ্বনিতে গভীর গিরি-পথ ও গভীরা রজনী যেন সহসা কম্পিত ও নিনাদিত হইয়া উঠিল—বিশেষতঃ দুই পর্ব্বত মধ্যস্থ অতি সঙ্কীর্ণ পথ, তজ্জন্য প্রতিধ্বনির সাহায্যে শব্দের ভীষণতা সহস্রগুণে বাড়িয়া পৃথিবীর গর্ভপাত হয়, এরূপ একটা ভয়ানক শব্দ উৎপন্ন হইল—যেন সেই পর্ব্বতদ্বয় শত শত অশনিপাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল, এমন ব্যাপার ঘটিল! সেই সঙ্গে নিম্ন দেশ হইতে সহস্র সহস্র মানব-কণ্ঠ-নিঃসৃত ঘোরতর আর্ত্তনাদ, ভয়ানক চীৎকার, অশ্রুতপূর্ব্ব বিকট কোলাহল উত্থিত হইয়া জুলীন-সৈন্যের চতুর্দ্দশ শত কর্ণকে যেন বধির করিয়া তুলিল! হায়, চীৎকারের পর চীৎকার—কি রাক্ষসী চীৎকার—সে চীৎকার তখন মানবের শব্দ বলিয়া বোধ হইল না, যেন যথার্থই দাবানল-বেষ্টিত অসংখ্য প্রকার জানোয়ারের স্বর-বিকার বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল!

ছুট—সম্মুখে ছুট—পশ্চাতে ছুট—যাহারা বাঁচিল—যাহারা আহত না হইল, তাহাদেরই ঐ ছুট! কিন্তু হায়! যে মুখে যাইবে, সেই দিকেই অগ্নিবৃষ্টি, তীরবৃষ্টি, পাষাণ-বৃষ্টি! সবে মাত্র যাইবার পথ দুর্গ-দিকে, সে দিকে দুর্লঙ্ঘ্য ধাপ ও বাঁধ, পশ্চাতে শব ও সঙ্গীর বাধা! তথাপি ছুট—উভয় দিকেই ছুট—পশ্চাদ্ভাগেই বেশী—শবের উপর দিয়া, জীবিতের উপর দিয়াও ছুট! কে কাহার গায়ে পড়ে, কে কাহাকে ঠেলিয়া যায়, কিছুই ঠিক নাই! দুর্ব্বলকে ঠেলিয়া সবল পলায়—দুর্ব্বল পড়িয়া যায়, অন্যে তাহাকে পদতলে মর্দ্দিত করিয়া যায়—তাহাতেও অনেক মরিল—কিন্তু যাহারা ওরূপে পলাইতেছে, তাহারাই

বা কোথা যাইবে? দুই পা যাইতে না যাইতেই তাহাদের আবার পতনের পালা—পলাইবার সাধ্য কি? বড় দুঃসাহসিকেরা হাঁচড় পাঁচড় করিয়া পর্ব্বত গাত্রে উঠিতে যায়, উপর হইতে ছোট বড় প্রস্তর খণ্ড গড়াইয়া আসিয়া তাহাদের লইয়া ভয়নক শব্দে যম-ঘুলির তলায় পড়িয়া যমপুরী পূর্ণ করে!

যাহারা সকলের পশ্চাতে ছিল, তাহাদেরও নিস্তার নাই—যেমন হাউই উঠিল, অমনি বন্নু নিজ লুক্কায়িত দল লইয়া উভয় পার্শ্বস্থ বন হইতে, দ্রুতপদে আসিয়া বহির্গমনের দ্বার রুদ্ধ করিল—তাহাদের অনল-বৃষ্টির প্রতিমুখে কার সাধ্য পশ্চৎপদ হইয়া বাঁচিতে পারে?

যাহারা সম্মুখ ভাগে ছুটিল, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে দিকেও বাধা পাইল! একে তো সহজেই ধাপ কয়টার উল্লংঘন দুঃসাধ্য, তাহাতে সম্মুখে উচ্চ প্রাচীর! আবার প্রাচীরের ছিদ্র মালা হইতে প্রচণ্ড অনল ক্ষেপণ কাণ্ড! অতএব কোন পথে কোন মতেই নিস্তার নাই—অনেকে ক্রোধান্ধ হইয়া পিঞ্জর-বদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয়ানক গর্জ্জন করিতে লাগিল—উর্দ্ধমুখ হইয়া বন্দুক ও তীর ছুড়িতে লাগিল—হায়! তাহাতে কি হইবে? বিফল রাগ—বিফল সন্ধান—আপনাদের তীর ও গুলি গুলি হটিয়া আসিয়া আপনাদেরই গায় পড়িতে লাগিল!

দুলীন দেখিলেন যথেষ্ট হইয়াছে—আর না—ভয় প্রদর্শন যত, সৈন্যক্ষয়ের উদ্দেশ্য তত নয়—বিপক্ষকে নিজ বাহুবল, নিজ বুদ্ধিবল, নিজ অপ্রতিহত সৈনাপত্য-কৌশল দেখাইয়া বিষদন্ত ভঙ্গ করাই প্রধান লক্ষ্য, তাহা সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বতোভাবেই সিদ্ধ হইল—আর কেন?

অতএব পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেতানুসারে পুনর্ব্বার দুইটা হাউই যেমন উৎক্ষিপ্ত হইল, অমনি ভেল্কির ন্যায় সর্ব্বস্থানের অস্ত্রপ্রয়োগ বন্ধ হইল—যেন পর্ব্বতোপরি মানুষ নাই, এমনি নিস্তব্ধ হইয়া উঠিল!

কিন্তু নীচের গোল অতি ভীষণ—নীচের অনাহত যোদ্ধার তর্জ্জন, গর্জ্জন ও বিফল আক্রোশ নিতান্তই অমানুষিক—পৈশাচিক! আবার আহত জন-পুঞ্জের হাহাকারে, চীৎকারে, আর্ত্তনাদে, "জল জল" রবে গিরি-পথ বিকট-রূপে নিনাদিত! দুলীনের দূত বহু কষ্টে বহুবার চেঁচাইয়া নীচের লোকের মনোযোগ আকর্ষণ পূর্ব্বক বলিল "ওহে নির্ব্বোধগণ! শুন শুন—এখন তোমরা স্বচ্ছন্দে ফিরিয়া যাইতে পার. কেবল তোমাদের যিনি প্রধান. তিনি সকলেই হইয়া ধর্ম্মকে সাক্ষী রাখিয়া শপথ করুন যে, এমন কাজ আর করিবেন না—

সাহেব তোমাদের কখনই কোন অনিষ্ট করেন নাই, বরং তোমাদের হিত অভিলাষই করেন—যাঁহার নেমক খান, তাঁহার বিরুদ্ধে নেমখারামি কাজ করিতেই তিনি অসম্মত; নতুবা অন্য যেরূপে বল, সাধ্যমতে বরং তোমাদের উপকার করিতেই প্রস্তুত। তোমাদের পাগলামি দেখিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন—তোমাদের যত কিছু ষড়যন্ত্র, যত কিছু কুমন্ত্রণা, তিনি তাহার সমস্তই জানেন—তা তো স্বচক্ষেই দেখিয়া গেলে—অতএব এমন কাজ আর করিও না, এইটী ধর্ম্মতঃ শপথ করিলেই পথ পাইবে!"

যত মহারাজা, রাজা, সর্দ্দার ও গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত বীরগণ—আহা! যাঁহারা বাঁচিয়াছিলেন—সকলেই এককালে হতদর্প, ঝুড়ি-বদ্ধ সর্পের ন্যায় নতশির—লজ্জায়, দুঃখে, পরিতাপে, অপমানে মৃতবৎ—প্রাণের জ্বালা চাপিয়া অনুতপ্ত হইয়া একজন প্রধানের দ্বারা সম্মতি জানাইলেন। তিনি নম্র-ভাবে ডাকিয়া কহিলেন "আমরা এই অস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম, একবার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ বাসনা করি—আর কিছুর জন্য নয়, তাঁহার ভদ্রতা ও দয়ালুতার নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মানস—এমন যো পাইয়া, যাহারা তাঁহার ধন প্রাণ মান হরণে যাইতেছিল, তাহাদিগের সমূলে সকল সংহার না করিয়া এমন অসীম দয়া প্রকাশ নিতান্তই আশাতিরিক্ত—এমন মন্ত্রপূত কৌশলে সহসা একবারে অর্দ্ধ ক্রোশ পথের অস্ত্রাঘাত বন্ধ, ইহাও সামান্য আশ্চর্য্য নয়—যেন দৈব ব্যাপার—আদ্যন্ত দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি—শত্রুতার কামনা পরিত্যাগ করিয়া অন্তরের সহিত তাঁহার অনুগত আশ্রিত মিত্র হইয়া পড়িয়াছি! সেই কথাটা তাঁহাকে বলিয়া তিনি যে শপথ চাহিতেছেন, তাহাও সর্ব্বান্তঃকরণে করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক চলিয়া যাইব, ইহাই আমাদের এখনকার বাসনা!"

তুলীন তৎক্ষণাৎ দেখা দিলেন—তাঁহারা যথার্থই অকপট সৌজন্য, আন্ত-রিক বাধ্যতা, গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক "এমন কাজ আর করিব না" বলিয়া প্রত্যেকেই শপথ করিয়া চলিয়া গেলেন—আহত বাছিয়া লইবার ও হত ব্যক্তিগণের সংকার করিবারও অনুমতি পাইলেন—তজ্জন্য তাহাদের কতক লোক রহিল, আর সব চলিয়া গেল। অষ্ট সহস্র আসিয়াছিল, দ্বিসহস্র হত, ত্রিসহস্র আহত এবং ত্রিসহস্র মাত্র অনাহত দেহে কিন্তু আহত প্রাণে ফিরিল।

যখন সর্দ্দারগণের সহিত দুলীন দেখা করেন,তখন প্রায় প্রভাত হইয়াছে। ভদ্রতা, শিষ্টালাপ,কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ ও শপথাদির সহিত সন্ধি-বন্ধন-ব্যাপার সিদ্ধ হইতে কিছু বেলা হইয়া পড়িল। সৎকারাদির নিমিত্ত তাঁহাদের কতক লোক যেমন থাকিল, দুলীনও তেমনি তাহাদের সাহায্য ও প্রহরিতার নিমিত্ত সোহন ও বন্নুর দল রাখিয়া অবশিষ্ট সহচর সঙ্গে দুর্গাভিমুখে ফিরিলেন।

লীলাকে দেখিতে, স্বীয় অক্ষত দেহ লীলাকে দেখাইতে এবং সম্পূর্ণ জয়ের সুসংবাদ স্বমুখে লীলাকে শুনাইতে তাঁহার হৃদয় অধৈর্য্য! অতএব চাঁদ ও আলিবর্দ্দি প্রভৃতিকে জয়পতাকা উড়াইয়া ও জয়বাদ্য বাজাইয়া সসৈন্যে আসিতে অনুমতি দিয়া আপনি বেলুনারোহণে কেবল দ্বাদশজন মাত্র অশ্বারোহী সহিত অতি দ্রুত বেগে অগ্রসর হইলেন—সে দিন বেলুন বুঝিল, প্রিয় প্রভুর বাসনা-বেগের সহিত বেগবান হওয়া তাহারও সাধ্য নয়—বেলুন কস্মিন্‌কালে কশাঘাত খায় নাই, আ'জ্ ভাগ্যে তাহাও ঘটিল! সুতরাং উচ্চৈশ্রবাকেও হারাইয়া পবনবেগে ছুটিল—সঙ্গীরা পশ্চাতে কোথায় পড়িয়া রহিল—তাহারা অতি বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাই করিতে লাগিল!

সম্পূর্ণরূপে মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে—এক কার্য্যে ত্রিবিধ মহৎ ফল ফলিয়াছে। প্রথমতঃ—পার্ব্বত্য অঞ্চল নিস্তেজ হইয়াছে; তাঁহার প্রতি তাহাদের এত যে শাসানি,এত যে গর্ব্ব-ভাব ছিল,সে গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া তাহারা জন্মের মত—অন্ততঃ বহুকালের নিমিত্ত শত্রুতার পরিবর্ত্তে মিত্রতা দেখাইবে,তাহাতে সন্দেহ নাই! দ্বিতীয় ফল—এ কাজে তাঁহার নাম যশঃ সর্ব্বত্র এত বিস্তৃতরূপে পরিব্যাপ্ত হইবে যে,সহসা পঞ্জাবের কোন দুষ্ট সর্দ্দার আর তাঁহার বিরোধী হইতে সহসা সাহসী হইবে না! তৃতীয় ফল—সর্ব্বাপেক্ষা শুভকর ও বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ কার্য্যকর, অর্থাৎ কুচক্রী দুষ্ট মন্ত্রীদল তাঁহাকে পার্ব্বতীয় বিদ্রোহীদলের প্রধান রূপে বর্ণনা ও প্রমাণ করিয়া মহারাজার কর্ণ যে ভারি করিতেছিল, এক্ষণে বচনে আর তাহার প্রতিবাদ করিতে হইবে না, অচ্ছেদ্য প্রতিবাদ আপনা হইতেই দেদীপ্যমান হইবে—মহারাজা এত নির্ব্বোধ নন যে, ইহার পরেও আর কোন দুর্জ্জন তাঁহার সমীপে সেরূপ মিথ্যা গ্লানির আভাস মাত্রও দিতে সাহস পাইবে!

অতএব দুলীনের হৃদয় আ'জ্ অতুল আনন্দোৎসাহে পূর্ণ—দুলীন আ'জ্ এই সব সুমহান্ শুভ সংবাদের কথা স্বীয় প্রাণাধিকা প্রিয়তমাকে বুঝাইয়া

দিয়া তাঁহার চিত্তোদ্বেগ শান্ত করিবেন এবং নিরাতঙ্কে আর নির্ম্মল প্রেমানন্দে অদ্য রজনীতে লীলার পবিত্র পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক অভিন্ন-যুগল-হৃদয়কে চিরকালের মত দৃঢ়বদ্ধ করিয়া লইবেন!

এই মনোল্লাসে—এই হৃদয়োচ্ছ্বাসে—জীবনের এই উচ্চতম আশাভরে বায়ুবেগে ছুটিয়া যাইতেছেন! কিন্তু তথাপি—কি জানি কেন—তাঁহার অন্তস্তলের কোণে কি এক প্রকার অনাহূত, অজ্ঞাত, অনির্ব্বচনীয় অমঙ্গলের ভাব অব্যক্তরূপে দেখা দিতেছে—কি যেন একপ্রকার অপরিস্ফুট দুশ্চিন্তা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিতেছে—কি যেন একপ্রকার গুপ্ত বিষাদবহ্নির শিখা ধিকি ধিকি জ্বলিয়া উঠিতেছে—যত তাহাকে যুক্তিজলে নির্ব্বাপিত করিতে চেষ্টা পান, ততই যেন আরো উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে! তাহাতে অন্তরের ব্যগ্রতা সহিত গমনের বেগ আরো বাড়িল!

কাহারো সহিত কোন কথা না, বার্ত্তা না—কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না—একবারে স্বীয় পুরীর দ্বারে উপস্থিত! বেলুন হইতে এক লম্ফে অবতরণ—দুই তিন লম্ফে আরোহণ—স্বগৃহে প্রবেশ নয়,একবারে অন্তঃপুরে গমন—গমন নয় ধাবন—চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ—সব শূন্য! হায় সব শূন্য! কেহই নাই! জনপ্রাণীও নাই! দশ দিক্ শূন্য! হৃদয় শূন্য! মস্তিষ্ক শূন্য! চক্ষে দেখিতে পান না—মস্তক ঘুরিতে লাগিল! বসিয়া পড়িয়া ক্ষণেকের নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্র প্রকৃতিস্থ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে "লীলা! লীলা!" আহ্বান—কোন উত্তর নাই! "মা, মা, রাজ্ঞী চন্দ্রাবতি!"—কোন উত্তর নাই! "বুড়ী মা, বুড়ী মা!"—কোন উত্তর নাই! পরিচারিকাদের নাম ধরিয়া ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন—কাহারো কোনই সাড়া শব্দটী নাই! শেষে "চৈতন, চৈতন!" ডাকিবা মাত্র সজল নয়নে চৈতন উপস্থিত!

ফলতঃ প্রভুর অত উগ্রভাবে আগমন ঈক্ষণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শুধু চৈতন নয়, হাকিম সিংহ প্রভৃতি কেহ কেহ নিঃশব্দে উপরে উঠিয়া অদূরে দাঁড়াইয়াছিল—সম্মুখে যাইতে কেহই সাহস পাইতেছিল না—আহ্বান মাত্র অশ্রু জলাভিষিক্ত চৈতন গিয়া প্রাণাধিক প্রিয় প্রভুর অপার শোক পারাবারের ভয়ঙ্কর উচ্ছ্বাস বেগে যেন আপন বক্ষে পাতিয়া লইতে ইচ্ছুক, এম্নি ভাবে অগ্রসর!

তুলীন নিতান্তই ধৈর্য্যহারা—জ্ঞানহারা বলিলেও বলা যায়—সে গাম্ভীর্য্য,

সে মাধুর্য্য, কিছুই নাই—অভিন্ন উন্মাদবৎ ! তথাপি স্বাভাবিক হৃদয়বলে, লজ্জার অনুরোধে এবং সংবাদ প্রাপ্তির আশায় বহু চেষ্টায় সহিষ্ণুতার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক কিয়দংশে বাহ্যিক ধৈর্য্য ও সুস্থতা প্রদর্শনে সমর্থ হইলেন ! দ্রুত-বেগে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন! করিয়া চৈতনের মুখে যাহা শুনিলেন এবং চৈতনের আহ্বানে "মেনকা" নামা প্রাচীনা পরিচারিকা আসিয়া যাহা কহিল ; এবং হাকিম সিংহ প্রভৃতি যে সব ঘটনা বর্ণনা করিল ; এবং পেস-খেজ্‌মৎ যত টুকু বলিতে পারিল ; সে সমস্ত মিলাইয়া দেখিয়া দুলীন যাহা বুঝিলেন, পাঠকগণের কষ্ট নিবারণ ও বোধ-সৌকর্য্যার্থ নিম্নে তাহা বিবৃত করিতেছি।

লেনা সিংহের সাহায্যার্থ সাহেব গিয়াছেন, এই জনরবটা হাকিমসিংহ এক ভাবিয়া প্রচলিত করিলেন, ফল আর একরূপ দাড়াইল! হাকিম ভাবিয়া ছিলেন, ইহা না রটাইলে দুর্গস্থ কুচক্রীরা কুচের প্রকৃত তত্ত্ব অনুমানে বুঝিয়া পাছে কোন সুযোগে আক্রমণাগত বিপক্ষদলকে সংবাদ পাঠায়, তাহা হইলে যম ঘুলিতে সাহেব যে এত উদ্যোগ করিয়াছেন, সে সব শুধু ব্যর্থ মাত্র হইবে না, অধিকন্তু, সাহেবের বিপদ ঘটিবারও সম্ভাবনা ; যেহেতু তাহারা সাত আট হাজার, সাহেবের সঙ্গে কেবল সাত শত! তদবস্থায় প্রবল বিপক্ষদল অন্য পথ দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া সাহেবকে বেষ্টন ও দুর্গাধিকার, উভয় অমঙ্গলই ঘটাইতে পারে!

এই কৌশলে সাহেব যদিও নিরাপদ হইলেন, কিন্তু দুর্গের বিপদ ঘটিল। দুর্গস্থ ষড়্‌যন্ত্রীরা যখন বুঝিল যে,সাহেব স্বয়ং ও ভাল ভাল কর্ম্মচারী ও বাছাবাছা সাত শত যোদ্ধা তো বহু দূরে চলিয়া গেল—দুর্গের সাহায্যে তাহাদের আসার আর আশা নাই ; তখন দুর্গাধিকার অতি সহজ ব্যাপার হইয়া উঠিল। যদিও তাহাদের প্রধান তিনজনকে দুলীন কারাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, তথাপি নায়কের অভাব ছিল না—গুম্‌রাও সিং নামা একজন সৈনিক কর্ম্মচারী সে ভার লইল। গুম্‌রাও এত কপট ও এমনি ধূর্ত্ত প্রকৃতির লোক যে, সাহেবের প্রতি ভক্তি প্রকাশ দ্বারা স্বীয় দুরভিসন্ধি ও দুরাচরণ সম্পূর্ণরূপে আবরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল—তাহার প্রতি তিলেকের তরেও সন্দেহ হয় নাই—সে সকলের চক্ষেই ধুলা দিয়াছিল!

তাহাদের বহির্বান্ধবগণের সহিত যেসময়টা নিরূপিত ছিল, অর্থাৎ নিশার

শেষ প্রহর। ঠিক সেই ক্ষণে ঐ ধূর্ত্তের অধ্যক্ষতায় বিদ্রোহীদল সহসা ক্ষেপিয়া উঠিল—অস্ত্রে শস্ত্রে সসজ্জ হইয়া বাহির হইল; তাহারা জানে বাহিরের বৈরিপক্ষ এখনি আসিয়া যোগ দিবে; সুতরাং ভিতরের বিদ্রোহীদল সংখ্যায় তত বেশী না হইলেও হানি নাই। তাহারা কতকগুলি মশাল জ্বালিল; ঘোর চীৎকার রবে কতক বা দুইটী তোরণাভিমুখে, কতক বা হাকিম সিংহের গৃহাভিমুখে, কতক বা অস্ত্রাগারাভিমুখে, কতক বা অন্য দুই একজন কর্ম্মচারীর বাসস্থানাভিমুখে ছুটিল!

তোরণের প্রহরিগণকে অনায়াসেই আয়ত্ত করিতে পারিল, যেহেতু তাহাদের অনেকেই নিদ্রিত ছিল। তখন হাকিম সিংহ যদি স্বগৃহে থাকিতেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাকে বধ করিতে পারিত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে হাকিম সিংহ নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া থাকিবার লোক নহেন। হাকিম তখন চতুর্দ্দিক্ তত্ত্বাবধান করিয়া ফটকের উপরিভাগস্থ গোলেন্দাজদিগের নিকট সবে মাত্র আসিয়া দাঁড়াইযাছেন, এমন সময় এই দুর্ঘটনা উপস্থিত। দুর্জ্জনেরা ফটকের প্রহরিগণকে বাঁধিল, হাকিম তাহা উপর হইতে দেখিলেন—তখনও কিছু বলিলেন না। কিন্তু যেইমাত্র বাঁধিয়া পার্শ্বস্থ গৃহমধ্যে পূরিয়া শৃঙ্খল টানিয়া দিল, অমনি গোলেন্দাজগণকে গোলা বর্ষণ করিতে আদেশ দিলেন, এবং বুরুজের অন্যান্য ভাগে তিনচারি স্থলে যে সব সৈনিক ও কর্ম্মচারিগণকে এরূপ দুর্ঘটনার প্রতিবিধানার্থ সুসজ্জ রাখিয়াছিলেন, ভেরিধ্বনি দ্বারা তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন। তাহাদের প্রত্যেক দল যে যে স্থানে নামিয়া যেরূপ অবস্থায় যে যে কার্য্য করিবে, তাহা তাহাদিগকে পূর্ব্বেই উপদেশ দেওয়া ছিল। সুতরাং হাকিম এখন তাহাদের সাহায্যে বিদ্রোহিগণকে উত্তম শিক্ষা দিতে সমর্থ হইলেন! কামানের গোলা বর্ষণে তোরণস্থ বিদ্রোহিগণের অধিকাংশ পড়িল, স্বল্পাংশ মাত্র ফটক খুলিয়া পলাইতে পারিল, তাহাও নির্ব্বিঘ্নে নয়, তজ্জন্যও কামান ও কামানচালক প্রস্তুত ছিল, সুতরাং পলাতকের মধ্যে অনেকেই দুর্গ বাহিরেও শয়ন করিল! ফটক, বিদ্রোহী-শূন্য হইতে না হইতেই হাকিমের প্রেরিত বিশ্বাসী সৈনিকগণ গিয়া শব ঠেলিয়া পুনর্ব্বার দ্বার রুদ্ধ করিল; পার্শ্বের গৃহদ্বায়ের শৃঙ্খল খুলিয়া দিল; পুনর্ব্বার অধিকতর বলে তোরণের রক্ষা ও সতর্ক প্রহরিতা চলিতে লাগিল।

ওদিকে দুর্গাভ্যন্তরে দুই তিন স্থলে অল্পক্ষণ মাত্র যুদ্ধের পরেই বিদ্রোহিগণ

নির্জ্জিত হইয়া পড়িল—কতক বা হতাহত, কতক বা বন্দী হইল। যাহারা অন্ধকারে পলাইয়া বাজারে বা নগরে লুক্কায়িত ছিল, প্রভাতে তাহারা সকলেই ধরা পড়িল। এইরূপে সুযোগ্য হাকিম সিংহের প্রতাপে বিশেষ অনিষ্ট ও অত্যাচার ঘটিতে না ঘটিতেই বিদ্রোহানল প্রশমিত হইয়া দুর্গ নিরাপদ হইল।

কিন্তু হায়, সেই সময় টুকুর মধ্যেই গোলযোগের সীমা পরিসীমা রহিল না—দুর্গ মধ্যে যে ক্ষুদ্র নগর ও বাজার, তদধিবাসীরা মহাতঙ্কে জাগিয়া উঠিয়া ডাকাডাকি, চেঁচামেচি, কোলাহল করিতে লাগিল ও বিশেষ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়াবস্থায় কেবল ছুটাছুটি ও চীৎকার শব্দে তুমুলকাণ্ড বাধাইয়া তুলিল। ইহাতেও তত আইসে যায় নাই; কিন্তু হায়! এই বিষম গোলযোগের আর একটী বিষময় ফল যে উৎপন্ন হইল, তাহাই শেষে মহা শোচনীয় হইয়া উঠিল!

দুরাত্মাদের প্রথম সিংহনাদ হুঙ্কার শব্দ শুনিতে পাইয়া অন্তঃপুরবাসিনীরা মহা শঙ্কাকুল হইয়া উঠিলেন। আকরাম খাঁ ও ধন্নু এক জন অনুচরকে সংবাদ জানিতে পাঠাইল। বিদ্রোহীরা তাহাকে তাড়া করিয়া আইল—সে দৌড়িয়া অন্তঃপুরের দেউড়িতে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল "সর্ব্বনাশ হইয়াছে—দুর্গের সমস্ত সৈনিক ক্ষেপিয়াছে—ফটক খুলিয়াছে; বাহির হইতে হাজার হাজার বিপক্ষ আসিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিয়াছে; হাকিম প্রভৃতিকে মারিয়া ফেলিয়াছে; ঐ শুন কামান ছুড়িতেছে; ধনাগার ও বাজার লুঠিতেছে; এখানেও শত শত জন আসিতেছে!"ইত্যাদি।

এ সংবাদে পলায়ন ভিন্ন অন্য মন্ত্রণা আর কি হইতে পারে? চৈতন তো অগ্রেই পলাইয়া যে গৃহে ইন্ধন কাষ্ঠাদি থাকে, সেই কাষ্ঠগাদায় লুকাইলেন—আহা! সর্ব্বাঙ্গে কি ছড, কি শোণিতপাত!

লীলা তবু পলাইবার কথায় বড় সম্মত হন নাই—বিশেষ বয়ঃস্থা মাতাকে লইয়া কোথায় যাইবেন? কিন্তু সেই মাতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যেই শেষে সম্মত হইতে বাধিত হইলেন। তাড়াতাড়ি একখণ্ড ক্ষুদ্র কাগজে পেন্সিলযোগে দুই ছত্র লিখিয়া মেনকার হাতে দিয়া সুড়ঙ্গ পথে মাতাকে লইয়া চলিয়া গেলেন। সঙ্গে আকরাম খাঁ,ধন্নু ও আর একজন মুলতানী; তদ্ব্যতীত "জানকী" নাম্মী লীলার সমবয়স্কা অতি বিশ্বাসী, অতি সাহসী প্রিয় পরিচারিকা সঙ্গিনী হইল! লীলা মেনকাকে বলিয়া গেলেন "মার জন্যই জানকীকে লইলাম, নচেৎ দঙ্গ

পুরু করিতাম না।” এত সত্বর গমনে বসন ভূষণ দ্রব্যাদি গুছাইয়া লওয়া অসম্ভব; কেবল হাতের মাথায় যে দুই চারি খানি পরিধেয় বস্ত্রাদি ছিল, তাহাই লইতে পারিলেন।

বিশেষ জিজ্ঞাসায় জুলীন জানিতে পারিলেন, লীলা স্ত্রীবেশে যান নাই—পুরুষ পরিচ্ছদে অসি বর্ষাধারী হইয়া গমন করিয়াছেন!

জুলীন অব্যাজে দিক্‌দিগন্তে—বনে, পর্ব্বতে, জনপদে—অনুসন্ধান করিতে ভাল ভাল লোক জন পাঠাইয়া, হাকিমকে দুর্গ ও বিদ্রোহী বন্দী রক্ষার ভারার্পণ পূর্ব্বক চাঁদ খাঁ ও সোহন সমভিব্যাহারে সুড়ঙ্গ প্রবেশ করিলেন। বন-মধ্যে যে ভগ্ন পুরীতে সুড়ঙ্গের অপর প্রান্ত, এবং যথায় মন্দুরা স্থাপনচ্ছলে কতিপয় দ্রুতগামী তেজস্বী অশ্ব ও অশ্বপাল রাখিতেন, তথায় আলিবর্দ্দিকে সশস্ত্র অশ্বারোহিগণ সঙ্গে দুর্গ-বহিঃস্থ পথ দিয়া অতি শীঘ্র যাইতে বলিয়া গেলেন। পাছে কোন বিপক্ষ ইতিপূর্ব্বে সে স্থানে আশ্রয় লইয়া থাকে, সুতরাং তাঁহাদের সুড়ঙ্গ হইতে উঠিবার কালে যদি তাহারা আক্রমণ করে, তৎপ্রতিবিধান উদ্দেশেই এই ব্যবস্থা করিলেন।

হায়! সকলই বিফল হইল! প্রাণাধিকা প্রিয় পলাতিকাগণ সুড়ঙ্গেও নাই! ভগ্ন মন্দুরা-বাটীতেও নাই! চতুর্দ্দিকস্থ গিরি, কানন, গুহা, কন্দর, গ্রাম, নগর, কুত্রাপি নাই—যেন যথার্থই পাতালে প্রবিষ্টা বা আকাশে উড্ডীনা হইয়া গিয়াছেন!

পলাতকগণ সুড়ঙ্গ পার হইয়া মন্দুরায় যে উপনীত হইয়াছিল, এমন প্রমাণ স্পষ্ট রহিয়াছে, যেহেতু মন্দুরা হইতে তাহারা পাঁচটী অশ্ব লইয়া গিয়াছে। অশ্ব-পালকেরা কহিল, শ্রেষ্ঠ অশ্বে লীলা, তাঁহার জননীকে পশ্চাতে বসাইয়া; অপর একটী অশ্বে সাহসী জানকী; অপর তিনটীতে তিন জন পুরুষ; এই ভাবে “তাঁহারা ঐ পথ দিয়া গিয়াছেন” বলিয়া একটী পথ দেখাইয়া দিল।

জুলীনের হৃদয় প্রকৃতপক্ষেই বিদীর্ণ হইতে লাগিল—লোক জন সমক্ষে সে ভাব কথঞ্চিৎ অব্যক্ত রাখিতে পারিলেন, কিন্তু স্বীয় নির্জ্জন গৃহে গিয়া কি যে করিলেন—জন্মাবধি আপন ভাগ্যের খেলা স্মরণ করিয়া আপনাকে সংসারের মধ্যে কিরূপ হতভাগা ও অপদার্থ যে ভাবিলেন—স্ত্রীলোকের ন্যায় কত যে উষ্ণ অশ্রুপাত করিলেন, তাহা আর বর্ণনা করিব না—সহৃদয় পাঠক ধ্যান করিয়া লউন!

কিন্তু পাঠক ! স্ত্রীলোকের ক্রন্দনকে অবজ্ঞা করিও না—সে রোদন-রব, সে অশ্রু বিসর্জ্জন (Safety Valves) দ্বারা হৃদয়ের অসহনীয় তাপোদগম কতকটা বাহির হইয়া না গেলে, সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটিতে কতক্ষণ ? আঁজ-বীর জুলীন তাহাতেই নিস্তার পাইলেন !

চতুর্দ্দিকে—চতুর্দ্দিকে কেন, অষ্টদিকে—অষ্ট কেন, প্রায় দশদিকেই অনুসন্ধান চলিতে লাগিল—নিকটে, দূরে, দেশ-দেশান্তরে, বিশ্বাসী ও নিপুণ দূত ছুটিল ! কত পুরস্কারের অঙ্গীকার—কত গুপ্ত আদেশ, উপদেশ, বিশেষ-বিশেষরূপের দেওয়া হইল—মনুষ্য বুদ্ধিতে যতদূর যাহা হইতে পারে, সকলই হইতে লাগিল !

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

গুলাপীর পরিণাম—দরবারের সংবাদ ।

গুলাপী কোথায় গেল ? পাঠক এ প্রশ্ন করিতে পারেন এবং তদুত্তর দেওয়াও আমাদের উচিত ।

জুলীন যম-ঘুলিতে যে সব মহোদ্যোগ করিয়াছিলেন, গুলাপীই তাহার সূত্র ; সুতরাং গুলাপী সব জানিত এবং সে কয় দিন সর্ব্বদাই তথায় যাতায়াত করিত। যখন যুদ্ধ হয়, তখনও গুলাপী পর্ব্বতে ছিল—কিন্তু বিষাদিতা—কয় দিনই চিন্তাচকিতা—কারণ কেহই বুঝিতে পারিত না ।

বিপক্ষ দল যখন আপনাদের আহতগণকে চিকিৎসার্থ ও শবগুলিকে সৎকারার্থ স্থানান্তর করিবার অনুমতি পাইল, তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই গুলাপী যমঘুলিতে নামিয়া প্রত্যেক হতাহত ব্যক্তির বদন ঈক্ষণে নিযুক্তা হইল। বিশেষতঃ যে যে স্থলে সুদান রাজ্যের সৈনিক পরিচ্ছদধারী দেখিতে পাইল, তথায় ব্যগ্রভাবে ছুটিয়া গিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া প্রত্যেক শব পরীক্ষা করিতে লাগিল। যমঘুলির নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ধাপের দিকে যতই যায়, ততই যেন তাহার পূর্ব্ব বিষণ্ণতা একটু একটু করিয়া হ্রাস হইয়া অন্তরের প্রসন্নতা একটু একটু দেখা দিতে লাগিল। বোধ হইল, কোন প্রিয় জনের মৃত দেহ তথায় পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিল, খুঁজিতে খুঁজিতে যতই

তাহা অপ্রাপ্য হইতে লাগিল, ততই ভরসা হইল, বুঝি সে আসে নাই, আইলেও হয় তো মরে নাই! এই ভাবেই বোধ হয় মুখখানি প্রফুল্ল হইতেছিল! যাহাহউক, এ কাজে গুলাপীর অসামান্য শ্রম হইতেছিল, তথাপি শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত শব না দেখিয়া ক্ষান্ত হইবে না, এমনি বোধ হইতে লাগিল। এ পরিশ্রমের উদ্দেশ্য কেহ জানিতে চাহিলে গুলাপী কোন উত্তর দেয় না; তথাপি গুলাপীকে বাধা দিতে কাহারো সাধ্য বা ইচ্ছা হইল না!

শেষে সেই ধাপ তিনটীর শেষ ধাপে সুদানী-বেশধারী কয়টা শব দূর হইতে দেখিতে পাইয়া প্রকৃত উন্মাদিনীবৎ গুলাপী আপনার পরিণত বয়সকে তুচ্ছ করিয়া যুবতীর ন্যায় অসঙ্গত লম্ফ প্রদানে তদুপরি উঠিল!

দুই একটা দেখিবার পর এক প্রকার ভয়ানক স্বর নিঃসরণ পূর্ব্বক একটী দীর্ঘাকার শবের নিকট বিকট ভঙ্গীতে গমন করিল। সেই দেহটী উপুড় ভাবে পড়িয়াছিল; যাহার শব, তাহার বয়ঃক্রম ষষ্টিবৎসরেরও অধিক হইয়াছিল, তথাপি অতি দৃঢ়-কায় বলিষ্ঠ বীর ছিল বলিয়া বোধ হইল; গুলির আঘাতে সে মরে নাই—সেই বীর তাহার পার্শ্বস্থ সঙ্গিগণ অপেক্ষাও অধিকতর অগ্রসর হইয়া অকুতোভয়ে প্রাচীরের পশ্চাদ্বর্ত্তী দুলীন সৈনিকগণের সহিত অসি বর্ষা দ্বারা হাতাহাতি যুদ্ধও যে করিয়াছিল, গুলাপী তাহাকে উল্টাইয়া ফেলিলে তাহা বুঝা গেল; কেননা, তাহার কপালে বর্ষা-ফলকের আঘাত হা করিয়া রহিয়াছে, সেই ক্ষত হইতে অজস্র শোণিত-স্রোত বহিয়া সমগ্র মুখ মণ্ডলে চাপ বাঁধিয়া রহিয়াছে। তাহার স্কন্ধে, ভুজে, বক্ষেও বিস্তর অস্ত্রচিহ্ন। তাহার পৃষ্ঠভাগে একটীও না! তাহার হস্তও যে অসাধারণ কার্য্য করিয়াছে, তৎপ্রমাণও প্রাচীরের পশ্চাতে তিন চারিটী শব পড়িয়া থাকাতে দেদীপ্যমান আছে—সেই স্থলে ঐ কয়টী ভিন্ন দুলীন-সৈন্য মধ্যে আর কুত্রাপি একটীও শব পতিত নাই! তাহার বেশ ভূষা তাহার স্বদেশীয় সঙ্গিগণের ন্যায়, অধিক কেবল, তাহার শিরোভূষায় একটী পালক ও তাহার অস্ত্র শস্ত্র অন্যাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও অধিকতর মূল্যবান—অসি চর্ম্মাদি ব্যতীত তাহার কটিবন্ধে রৌপ্যমণ্ডিত কোষ মধ্যে দীর্ঘ ছুরিকাবৎ এক প্রকার সুগঠন অস্ত্র—হইতেই বুঝাইল, সে তাহার সঙ্গীদলের পরিচালক বা নায়ক ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গুলাপী সেই দেহটীকে ফিরাইল—গুলাপী প্রাচীনা হইলেও খুব বলিষ্ঠা, এখন যেন আরো বলশালিনী হইয়া উঠিল—তাই অবলীলাক্রমে শব-দেহ ফিরাইয়া আপন

অঞ্চল দ্বারা বহু যত্নে মুখের রক্ত-চাপগুলি পরিষ্কার করিল—অনেকে গুলাপীর এই সব অসামান্য প্রক্রিয়া দেখিতেছিল।

যেই মাত্র এই নিহত বীরের মুখমণ্ডল শোণিত-মুক্ত হইল, অমনি গুলাপীর নয়নদ্বয় একপ্রকার অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ ধারণ করিল—গুলাপীর বদন একপ্রকার অমানুষিক চীৎকার নাদ ছাড়িল —গুলাপী, "ওরে! আপনার ভাইকে আপনি মা'ল্লেম রে!" বলিয়া সেই শবের বক্ষে অজ্ঞানে পড়িল!

দর্শকেরা শোক দুঃখে ক্ষণকাল স্তম্ভিত প্রায়। কিন্তু তখনই গুলাপীকে তুলিয়া তাহার চ'কে মুখে বুকে জল সিঞ্চনাদি শুশ্রূষায় চৈতন্য সম্পাদন করিল। গুলাপী উঠিল; সঙ্কেতে শবটী লইয়া যাইবার সাহায্য প্রার্থনা জানাইল; গুলাপী কাঁদিল না; গুলাপীকে সকলেই ভালবাসিত—বিশেষ, সাহেবের "বুড়ী মা" বলিয়া সকলেই মাতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। অতএব লোকে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে মৃত দেহটা লইয়া চলিল। গুলাপী একটী উন্নত গিরি-শেখরে উঠিল। গুলাপীর মূর্ত্তি তখন অতি বিকট—এলো চুল, সর্ব্বাঙ্গে রক্তমাখা, চক্ষু রক্তবর্ণ, ভঁটার ন্যায় ঘূর্ণায়মান—কখন কখন আকাশের দিকে চাহিতেছে, দন্ত কিড়িমিড়ি করিতেছে! গুলাপী শবটী তথায় রাখিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল! লোকজন তদুপদেশ পালন করিয়া ধীরে ধীরে যখন ফিরিতেছে, তখন গুলাপী কখন উর্দ্ধবাহু হইয়া, কখন শব সম্বোধন করিয়া, কখন বুক চাপড়াইয়া নানা প্রমত্ত ভঙ্গীতে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল;—

"ঠিক হইয়াছে—পাপের জীবনের শেষ কাজ যেমন হইতে হয়, তাহাই হইয়াছে! এই দুর্ব্বহ দেহভার এত দিন কি জন্য বহিয়া বেড়াইতেছিলাম? ওরে ভাই! কেবল তোরে আর একবার দেখ্‌বো ব'লে না? তা বেস দেখিলাম—ভগ্নী হইয়া ভা'য়ের যাহা করিতে হয়, তাহাও বেস করিলাম! (বক্ষে সবলে করাঘাত) আপনার সহোদরকে পাপীয়সী আপনি বধ করিল—রাক্ষসী পিতৃবংশ আপনি লোপ করিল—তা ভালই হইল—পাপিষ্ঠার জন্যে আগে তো সব মরিয়াছিল,শেষ এই এক বংশধর ছিল—রাক্ষসী আ'জ্ তাও গ্রাস করিল! সব খেয়ে ফেলে এখন কি নাচিয়া কুঁদিয়া বেড়াইবার জন্য ওরে নির্ঘৃণ পাষাণ প্রাণ (পুনঃ পুনঃ বক্ষে করাঘাত) এখনও এ পোড়া দেহে রহিয়াছিস? তা তা কখনই হবে না—তুই নির্লজ্জ, তুই আপনি যাবি না—যাইতিস তো

যখনি চিনিয়াছিলি, তখনি যাইতিস্, মরা ভায়ের বুক থেকে আর উঠ্‌তিস না! তাই জেনেছি, তুই আপনি যাইবি না—তোরে বল করিয়া এই পাপ-তাপ-ভরা ধরা হইতে—এই পাপ-দেহ হইতে তাড়াইয়া দিতে হইবে—তবে আর তার দেরি কি? এমন দিন আর কবে পাবি? এমন সাথীই বা আর কোথা পাবি? দাদা যা'চ্ছেন—ঐ যে দাদা চ'ল্লেন—চল্ না—তুইও সঙ্গের সঙ্গী হ না—হা বিধি! তোর মনে যা ছিল, তাই হ'লো—কপালে যা লিখে দিছ্‌লি, তা হ'লো—এখন একটু পদাশ্রয় দে—আর রাখিস্ না!"

গুলাপীর মুখে ফেনা উঠিতেছে—গুলাপী কাঁপিতে কাঁপিতে—ঐ কথা বলিতে বলিতে সহসা অসুর-বলে ভ্রাতার মৃত দেহ সাপ্‌টাইয়া ধরিয়া চক্ষু বুজিয়া দৌড়িল! কোথায়? হায়! শেখরের সীমায়—হায়! সেই সীমা হইতে সহস্র হস্ত নীচে শব সহিত মহা শব্দে মহাখাদে ঝাঁপ খাইয়া পড়িল!

সরল-হৃদয়া নিষ্পাপা গুলাপী, দুরাচার লোকের দুষ্ট চক্রে পড়িয়া সপাপা হইয়া চিরজীবন এত যে যন্ত্রণা ভুগিতেছিল. আ'জ্ সকল জ্বালা জুড়াইল! উচ্চতম বিচারকর্ত্তার বিচারাধীন হইল—তথায় পাপ পুণ্যের বাহ্যিক প্রমাণ আবশ্যক করে না—কেবল মর্ম্ম লইয়া—কেবল প্রাণ লইয়াই কথা—গুলাপীর দেহ অপবিত্র, প্রাণ তো নয়—যিনি দয়ার সিন্ধু অনাথবন্ধু—যিনি অগতির গতি সম্পতি—যিনি সর্ব্ব আত্মার পরমাত্মা, তিনি কি এমন আত্মার অগতি বিধান করিবেন? কদাচ নয়!

হায় বিপদ কখন একা আইসে না! ফুলীন একে লীলা-হারা আর মাতৃ-হারা, তাহাতে বুড়ী মাকেও যে হারাইয়াছেন, এ সংবাদ শীঘ্রই পাইলেন! পাইয়া শোকের উপর কি শোকাকুল—ব্যাকুলতার উপর কি ব্যাকুল—কি ভগ্নহৃদয় নিরাশময় হইয়া উঠিলেন, তাহা সমবেদনশীল পাঠক অবশ্যই অনুভব করিতেছেন! পূর্ব্ব জীবনে আপনার বলিতে যেখানে যে কেহ ছিল, সে সকলে পুনঃ পুনঃ বঞ্চিত হইয়া, শেষে এই স্বদেশে আসিয়া যাহাদিগকে যথার্থই আপনার বলিয়া পাইয়াছিলেন—পাইয়া পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া যাইতে শিখিয়াছিলেন—শিখিয়া সুখের আশায় ভাসিতেছিলেন, এমনি অদৃষ্ট, সে সব কি না কয়েক দণ্ড মধ্যেই, দেখিতে দেখিতে, নিতান্তই অভাবনীয়রূপে, নিতান্তই স্বপ্নাতীতরূপে, অন্তর্হিত হইল! হায়, ফুলীনের তখনকার হৃদয়-ব্যথার পরিমাণ করা যদি মানবহৃদয়ের আয়ত্ত-বিষয় হইত, তবে বোধ হয়, তাঁহার পরম শত্রুও

দয়া না করিয়া থাকিতে পারিত না—তবে বোধ হয়, ধ্যান, গোলাপ ও সুচেৎ সিংহও আর তাঁহার হিংসা করিত না—তবে বোধ হয়, নন্দের ভ্রাতা ভূপ সিংহও আর তাঁহার প্রতি দ্বেষভাব রাখিত না! কেননা, তাঁহার তখনকার অবস্থা কুটীরবাসী দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দীন হীনের দশা অপেক্ষাও ঘোর শোচনীয়! সুতরাং তিনি আর এখন দ্বেষ-হিংসার যোগ্য পাত্রই নন—দয়ারি পাত্র!

ফলতঃ বন্নু, চাঁদ ও আলিবর্দ্দি প্রভৃতি কয়েকজন অতি বিশ্বাসী, অতি প্রিয়, প্রভুভক্ত, সুহৃদ্-ভৃত্য যদি নিকটে না থাকিত এবং দুর্নামের সম্ভাবনার সহিত গুরুতর রাজ্যশাসন-ভার যদি স্কন্ধোপরি না থাকিত, তবে ডুলীন নিশ্চয়ই পাগল বেশে লীলার উদ্দেশে ছুটিয়া বাহির হইতেন!

গুলাপীর মৃত্যুকালে ডুলীন তথায় ছিলেন না, তজ্জন্য তাঁহার আরো ক্ষোভ! ভাবিলেন "হায়! আমি দুর্ভাগা যদি তাড়াতাড়ি চলিয়া না আসি, তবে কদাচই এই দারুণ মর্ম্ম-বিদারক ঘটনা ঘটিত না—আমি নিকটে থাকিলে অবশ্যই শান্ত করিতে পারিতাম! হায়! তাড়াতাড়ি আসিয়াই বা কি হইল—যাহার জন্য ত্বরা, সে হৃদয়নিধিই বা কোথায়? আমার মরণই মঙ্গল!"

পরক্ষণেই শেষের এই মরণেচ্ছারূপ অবৈধ চিত্ত-ভাব জন্য মহা অনুতপ্ত হইয়া হৃদয়নাথ মহেশ্বরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা এবং হৃদয়-বল নিমিত্ত বিনীত প্রার্থনা করিয়া অনেকটা সুস্থ হইলেন!

গুলাপী কেন যে "আপনার ভাইকে আপনি মারিলাম" বলিয়া গিয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য কেবল ডুলীনই বুঝিলেন—অন্য কেহ কিছুই অনুভব করিতে পারিল না—তাহারা ভাবিল, শোকোন্মাদের প্রলাপ মাত্র!

ডুলীনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই আলিবর্দ্দি সেই বিখ্যাত গোড়-গোয়েন্দা * খয়রাতালিকে লীলা প্রভৃতির অশ্ব-পদানুসরণে নিযুক্ত করিয়াছে শুনিয়া, ডুলীন মহা তুষ্ট, কিন্তু আলিবর্দ্দি নিজে সঙ্গে না যাওয়াতে কিছু উদ্বিগ্ন হইলেন। আলিবর্দ্দি জানাইল, "যে চারিজন মূলতানীকে সঙ্গে দিয়াছি, তাহারা আমার অপেক্ষা কোন অংশে কম অধ্যবসায়ী নয়; তথাপি হুজুরের ইচ্ছা হইলে আমিও গিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারি—তাহারা পদচিহ্ন ধরিয়া যাইতেছে, সুতরাং অধিক দূর যাইতে পারে নাই।" কিন্তু সেই চারি জনের

* শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "ভারতী" পত্রিকায় লিখিয়াছেন, সিন্ধু প্রদেশে গ্রামে গ্রামে এইরূপ গোড়গোয়েন্দা চৌকীদার আছে, তাহাদিগকে তদঞ্চলে "পগী" বলে। অন্যান্য লেখকদের লিপি পাঠেও জানা যায় যে; এ সব অঞ্চলে অদ্যাপি পগীরা আছে—অদ্যাপি তাহারা চোর ডাকাইত খুনে প্রভৃতি ধরিয়া দেয়।

নাম ও চাঁদ খাঁর মুখে তাহাদের গুণানুবাদ শুনিয়া ডুলীন আশ্বস্ত ও নিরস্ত হইলেন।

দিনের পর দিন—সপ্তাহের পর সপ্তাহ যাইতে লাগিল, তথাপি কোন সংবাদই নাই। ডুলীন স্বীয় করণীয় সকল কাজই করেন, কিন্তু সে উৎসাহ নাই—সে উল্লাস নাই! চেষ্টা আছে, কিন্তু নিরাগ্ন—শীতল! উদ্যোগ আছে, কিন্তু অভিরুচি-হীন! ডুলীন যেন সকলেতেই উদাস—সর্ব্ব বিষয়েই অনাসক্ত! স্বামী-ধর্ম্মপরায়ণ সমবেদনশীল কর্ম্মচারীবর্গ তাই এখন আরো মনোযোগে, আরো সাবধানে, আরো বিশ্বসনীয়রূপে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতে লাগিল—প্রভু কোন মহা পীড়ায় শয্যাগত থাকিলে, ন্যায়-ধর্ম্ম-শীল বিশ্বাসী ভৃত্যগণ যেরূপ আচরণ করিয়া থাকে, কাংরার সুযোগ্য কর্ম্মচারীরা এখন তাহাই করিতে লাগিল—উপাস্য দেবতার ন্যায় তাহাদের পরম ভক্তিভাজন প্রভুর দৈহিক পীড়া নয় সত্য, কিন্তু মানসিক তো বটে! শুদ্ধ এই কারণেই শাসন-শৃঙ্খলার কোন ব্যত্যয়—কোন অঙ্গহানি ঘটিল না। সদ্‌গুণের ফল এই —"যেমন রোপিবে, তেমনিই ফল পাইবে।" *"As you sow, so you reap."*

ডুলীনের নিদারুণ চিত্ত-বৈকল্য জন্মিলেও চাঁদ খাঁর পরামর্শে যম-যুগলের কাণ্ডের দুইএক দিন পরে দরবারে তাঁহার বিজ্ঞাপন প্রেরিত হইল—চাঁদ খাঁই সে বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি লেখক—চাঁদ খাঁই প্রেরক—কেবল মুন্সিরা নকল করিল, ডুলীন সহি দিলেন, এই পর্য্যন্ত!

সে রজনীতে দুর্গমধ্যে যাহারা বিদ্রোহানল জ্বালিয়াছিল, এবং কাংরা রাজ্য মধ্যে যে সব পাপী ব্যাঙ্কের সেই দলভুক্ত বলিয়া হাকিম সিংহ জানিতে পারিলেন, তাহাদের সকলকেই কারাবদ্ধ রাখা হইল। কিন্তু ডুলীনকে তাহাদের দণ্ডদান বিষয়ে উদাসীন অবলোকন করিয়া চাঁদ খাঁ উক্ত বিজ্ঞাপনী মধ্যে পঞ্জাব রাজ্য হইতে তাহাদিগের নির্ব্বাসন আজ্ঞার নিমিত্ত দরবারে প্রার্থনা জানাইল।

যথাকালে এই আরজীর উত্তর আইল—ফকিরজীর সহি মোহরাঙ্কিত। সেই প্রত্যুত্তর-লিপিতে সাহেবের সাহস, নৈপুণ্য ও স্বামী-ধর্ম্মের প্রচুর প্রশংসাবাদ, দরবারের সন্তোষ এবং রাজানুগ্রহ ও সমুচিত পদোন্নতি প্রভৃতি পুরস্কারের আভাসও ছিল। উপসংহারে লেখা আছে, "রূপাড় নামক স্থানে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের সহিত মহারাজার সাক্ষাৎকালে ডুলীনের এক দল সৈন্যের অভিনয় প্রদর্শন আবশ্যক হইতে

পারিবে, তজ্জন্য সাহেব যেন তাহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষিত, সজ্জিত ও প্রস্তুত করিয়া রাখেন, যথা সময়ে পরওয়ানা যাইবা মাত্র তাহাদিগকে পাঠাইতে, এবং (হয় তো) সাহেবকে নিজেও আসিতে হইবে।"

সেই সঙ্গে ফকিরজীর পূর্ব্ব প্রথামত একখানি স্নেহগর্ভ গোপনীয় লিপিও দৃষ্ট হইল। তাহাতে ঐরূপ বা উহার অধিকও প্রতিষ্ঠাবাদের পর "সাহেবের ভাগ্য-তরুতে এই নব মুকুলোদ্গম দর্শনে সাহেবের পরমহিতৈষী এই ক্ষুদ্র অকপট বন্ধুর হৃদয়-ভ্রমর কি আশান্বিত—কি আনন্দিত হইতেছে!" ইত্যাদি আনন্দ-বিকাশক রূপকও সন্নিবিষ্ট ছিল!

ফুলীন স্পষ্টই বুঝিলেন, ধ্যান সিংহের ভয়ে বা যে কারণেই হউক, ফকিরজী কিছুকাল যেরূপ স্নেহ-হীনতা দেখাইয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে সে ভাব অপগত হইয়াছে!

উকীল সুখনলাল যে দীর্ঘ পত্র পাঠাইয়াছে, তাহার কিয়দংশ পাঠকের পাঠ করা আবশ্যক বোধে নিম্নে মর্ম্মানুবাদ দিতেছি।

"গরীব পরওয়ার! আ'জ্ এই আরজি লিখিতে অধীনের লেখনী ও হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছে! সাহেবের উন্নত শির আরো উন্নত হইয়াছে—নীলগিরি ঘুচিয়া ধবলগিরি হইয়াছে! সাহেবের যশঃ-সূর্য্যের কিরণে অন্যান্য শাসক সেনাপতি প্রভৃতি সকল সর্দ্দারেরই দীপ্তি নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে! সকলেই একবাক্যে ধন্য-ধ্বনি ঘোষণা করিতেছে—শত্রুরাও দ্বিধামত প্রকাশে সাহসী হইতেছে না—পরম হিংসাকারীরাও বুঝিয়াছে, এখন আর বিদ্রোহী-দলভুক্ত বলিয়া হুজুরের গ্লানি করা অসম্ভব, কাজেই স্রোতে গা ঢালিয়াছে!

"মহারাজার মনের কোণেও আর কোন দ্বিধাভাব মাত্রই নাই—তিনি বুঝিয়াছেন এবং স্পষ্টই ফুটিয়া বলিয়াছেন যে, এই লোকের নামে যাহারা তেমন ভয়ানক গুরু গ্লানি তুলিয়াছিল, তাহাদের অকরণীয় কিছুই নাই! (ধ্যান সিংহের প্রতি) কেমন হে, রাজাজি! ফুলীন কি পার্ব্বতীয় বিদ্রোহী-দলের মিত্র না শত্রু? এখন কেমন বোধ হয়? এমন বিশ্বাসী নেমকের চাকরের নামে কুৎসা রটাইয়া তাহার মনে যে ব্যথা দেওয়া হইয়াছে, তাহা কি দূর করিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত নয়?" যথার্থ বলিতে কি, রাজা ধ্যান সিংহের মনে হুজুরের প্রতি পূর্ব্বে যে কোন প্রতিকূল ভাবই থাকুক, এখন তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে—এখন তিনি সাহেবের একজন হিতৈষী মুরুব্বি

হইয়া উঠিয়াছেন—প্রকাশ্য দরবারে যে ভাব ভঙ্গীতে প্রশংসাদি করিলেন, এবং গোপনে এ অধীন দীন ব্যক্তিকে যাহা যাহা বলিলেন, তাহাতে তাঁহার সদয় ভাবের কোন সন্দেহই আর নাই।

"দিবাকর মেঘমুক্ত হইলে যেমন প্রখরতর প্রভা বিকীর্ণ করেন, মহারাজা ও প্রধান মন্ত্রীর হৃদয়াকাশে হুজুরের মাহাত্ম্যরবি সেইরূপে কলঙ্ক-রাহু-মুক্ত হইয়া শতগুণে অধিক সমুজ্জ্বল হইয়াছে! নতুবা হুজুরের এই ক্ষুদ্র গোলামকে খেলাত দিয়া গৌরবান্বিত করা হইবে কেন? হুজুরের আরজি আসিবার পূর্ব্বেই যম-ঘুলির অনুপম কীর্ত্তির কথা লাহোরময় রাষ্ট্র ও দরবার পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। পরে হুজুরের আরজি আসিবা মাত্র হুজুরের প্রতি দরবারের প্রসন্নতা দেখাইবার জন্য হুজুরের এই সামান্য চাকরকে তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব সমক্ষে সপ্তখণ্ডময় খেলাত দানের হুকুম হইল—বোধ হয় রাজা ধ্যান সিংহই ইহার পরামর্শ দিয়া থাকিবেন—ইহাতেও তাঁহার পূর্ব্ব ভাবের পরিবর্ত্তন বুঝা যাইতেছে! তাঁহার ভ্রাতাদ্বয়ও যে বিপক্ষতায় বিরত হইয়াছেন, তাহাও বহু সূত্রে জানিতে পারিয়াছি।

"মহারাজা হুজুরকে উপযুক্ত মানদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন—জনরব, জায়গির সহিত রাজোপাধি প্রদানই মহারাজার অভিপ্রায়—সম্প্রতি রাজ্য পরিদর্শনার্থ মহারাজা ভ্রমণে বহির্গত হইবেন; হয় তো সেই উপলক্ষে তিনি কাংরায় গিয়া স্বয়ং ঐ পুরস্কারের জ্ঞাপক হইবেন! সর্ব্ব-শুভঙ্কর মহেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন! এ গোলাম, প্রভু-কার্য্যে প্রতিনিয়তই যেরূপ সতর্কতার সহিত কায়মনোবাক্যে নিবিষ্ট আছে, তাহা বিশেষরূপে বলিতে গেলে আত্মগরিমা প্রকাশ করা হয়, এই ভয়ে কিমধিক নিবেদনমিতি।"

এই আরজি পাঠে ঢুলীনের মন সুখনলালের ব্যবহারের প্রতি সন্দেহাবিষ্ট হইল—"পুনঃ পুনঃ ভ্রাতৃত্রয়ের চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জন্য এত আগ্রহ কেন? আমাকে নিতান্তই ইচ্ছার দাস করিয়া লইতে না পারিলে, ভ্রাতাত্রয় কখনই সদয় হইবার পাত্র নয়, ইহা আমি বেস জানি—তাহাদের স্বার্থময় পাষাণ-হৃদয় কি এক যম-ধুলির কাণ্ডতেই গলিতে পারে যে গলিবে? কদাচ নয়! ইহাতে বরং আরো গুপ্ত হিংসানলে দগ্ধ হইবে—আরো গোপনে, আরো নৈপুণ্যে, অনিষ্ট চেষ্টা করিবে! অতএব অবশ্যই সুখনলালকে দুষ্ট বিপক্ষেরা হস্তগত করিয়াছে—অবশ্যই তাহাকে যন্ত্র করিয়া কুমন্ত্রী কুযন্ত্রীরা কি

ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টায় আছে! খেলাত দেওয়াতেই তাহা আরো প্রকা পাইতেছে! কিন্তু হয় তো, যন্ত্রী তত পাকা নয়, অথবা যন্ত্রী পাকা হইলে যন্ত্র তেমন নয়—দেখিতেছি, সেই যন্ত্ররূপী সুখনলালের ছদ্মবেশরূপ ছাউনি বড় পাতলা, তাই এক চাটিতেই চটিতেছে—তাই মুখোশের ভিতরে চেহারা খানি স্পষ্টই চেনা যাইতেছে! যাহাই হউক, আর যে কেহ যে ষড়যন্ত্র করুক, আমার আর কিছুতেই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই—এখনই এ বিরক্তিকর পা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতাম, কেবল এ পদে না থাকিলে এ বিপদে ত্রাণ পাওয়া দুষ্কর—শাসকের ক্ষমতা ও প্রভুত্ব ছাড়িলে প্রেয়সীর তত্ত্ব পাওয়া সুদুর্লভ; এই জন্যই আছি! আমার অন্তঃকরণ নিশ্চয় বলিতেছে, এই অভা বনীয় নিরুদ্দেশ বিষয়ে দুর্জন ভ্রাতা এবং, অন্ততঃ সুচেৎ সিংহই চক্রী—সুচেৎই অথবা সুচেতের নিমিত্ত কেহ অবশ্যই লীলাকে হরণ করিয়া লইয়া কোন স্থানে অতি গুপ্ত ভাবে লুক্কায়িত রাখিয়াছে—সঙ্গিগণকে ছাড়িলে স্থানটী প্রকাশ পাইবে বলিয়া তাহাদিগকেও ছাড়িতেছে না! এমন বদ্ধ-বৈরীকেও বিশ্বাস ঘাতক উকীল, মিত্ররূপে চিহ্নিত করিয়াছে!"

জুলীন তখনই চাঁদ খাঁকে ডাকাইয়া সুখনের পত্র শুনাইয়া চাঁদের অভি প্রায় জানিবার নিমিত্ত বাক্যে কিছু না বলিয়া কেবল তাহার মুখপানে চাহি লেন। চাহিবামাত্র চাঁদ খাঁ মহা অপ্রতিভ হইয়া বলিল "হুজুর! পাপিষ্ঠ হিন্দু সন্তান এমন বেইমান হইবে, গোলাম আগে তাহা বুঝিতে পারে নাই—বাছিয়া বাছিয়া বড় ভাল লোক ভাবিয়াই তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। যাহা হউক, ইহার প্রতিফল অবশ্যই দিতে হইবে!"

সুখনলাল যে বিশ্বাসঘাতক হইয়াছে, দয়ালু জুলীন তাহা বুঝিয়াও সম্পূ বিশ্বাস করিতে একটু অনিচ্ছুক ছিলেন, এখন চাঁদের কথায় আর সন্দেহ মা রহিল না! চাঁদকে এ কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ পূর্ব্বক বলিলেন "কিন্ সুখনকে এখন জবাব দিব না; তাহা হইলে দুষ্ট বিপক্ষেরা জানিতে পারিবে যে আমরা সব বুঝিয়াছি! আমাদের কর্ত্তব্য, এখন সুখনের সহিত সাবধানে চলা—বিশেষ কিছু না লিখিয়া কপটতার উত্তরে কপট সৌজন্য ও আগড় বাগড় বলা—দরবারে প্রকৃত ওকালতি আর আমার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই!"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সুফল।

পাঠক! একবার লাহোরে চলুন—উকীল সুখনলালের আরজিতে আর বিশ্বাস নাই—অন্ততঃ ভ্রাতৃত্রয়ের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছে, তাহা নিতান্তই অগ্রাহ্য! ডুলীন আর তাহাকে বিশ্বাস করেন না। সুতরাং অন্যোপায়ে সঠিক সমাচার আনাইতে লাগিলেন। অতএব চলুন, সে সংবাদ আসিবার পূর্ব্বেই আমরা লাহোরে গিয়া সকল জানিয়া আসি!

লাহোরের রাজপুরীর একটী নিভৃত গৃহ—মহারাজ ও ফকির আজিজুদ্দিন উপস্থিত। কাংরা সম্বন্ধে অনেক কথার পর মহারাজ বলিলেন;—

"কি কর্ত্তব্য, ফকিরজি? স্পষ্ট কথা কও—এখানে আর কেহই নাই—তোমার আ'দ্‌গো আ'দ্‌গো শিষ্টাচারের ভাব ছেড়ে দেও!"

সেরূপ স্পষ্টবাদিত্ব ফকিরজীর অভ্যাস নয়; সুতরাং সতর্ক শিষ্ট ভাষায়, অথচ বিলম্ব ব্যতীত আজিজুদ্দিন উত্তর দিলেন "সরকারের শত্রুই এ দীন ফকিরের শত্রু; সরকারের মিত্রই তাহার মিত্র; অতএব ডুলীন সাহেবকে আমি যে মিত্র ভাবি ও প্রাণের সহিত ভালবাসি, তাহা বলা বাহুল্য!"

ফকিরজী এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সশঙ্কভাবে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিলেন—ইটীও মহারাজার অগোচর রহিল না!

মহারাজ! আঃ! কারে এত ভয়?

ফকিরজী। হুজুর! আমি দরিদ্র ফকির; রাজাজী ক্ষমতাবান, ধনবান, যোগ্যতাবান—এ দাস তৃণ; রাজাজী মহাদ্রুম—তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ ক্ষুদ্র প্রাণী কি করিতে পারে?

মহারাজ। ঠিক! আমি যাহা ভাবিয়াছি, দেখিতেছি, প্রকৃতই তাই!—এই রাজ্য, নামে আমার, পাকতঃ দোগ্‌ড়া-রাজার! আমি দ্বিতীয় পদে গণ্য, দোগ্‌ড়া-রাজাই প্রথম ও প্রধান! সে যন্ত্রী, রণজিৎ কেবল তাহার যন্ত্র—সে যেরূপ বাজাইবার ইচ্ছা করিতেছে, যন্ত্রে তাহাই বাজিতেছে! সে যাহাকে প্রতিকূল, রণজিৎ তাহাকে অনুকূল হইলেও তাহার নিস্তার নাই—সে যত ক্ষমতাবান্, রণজিৎ তো তত নয়, সুতরাং তাহার ক্ষমতাকেই ভয় করিতে হয়! ফকিরজী! তোমার ঐ কথার তাৎপর্য্য এই না?

ফকিরজী। (তটস্থ ও ত্রস্তভাবে) হুজুর—

মহারাজ। না, না, মিথ্যা বল নাই—একতিলও অন্যায় ভাব নয়—ভয় পাইতে পার—রাজার পৌত্র, রাজার পুত্র, নিজে মহারাজ—সম্রাট্! তবু তাহার নিজের দরবারে নিজের চাকর (যাহাকে নিজের হাতে কূপ হইতে পর্ব্বতে তোলা হইয়াছে, সেই চাকর) যখন তাহার প্রভুর নিজের দাড়ি ধরিয়াই টানিতে পারে, তখন তেমন অকর্ম্মণ্য প্রভুকে হিত পরামর্শ দিতে ভয় পাইবে, আশ্চর্য্য কি? একথা—আত্মদোষের একথা স্বীকার করি! কিন্তু ফকিরজী, যথার্থ বল, আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা হইতেও তাহার প্রতি ভয় কি তোমার এত?

ফকিরজী। হুজুরের জন্য অধানের তুচ্ছ প্রাণ বলিদানও সামান্য কথা—অনুমতি হইলে, এখনি ও গোলাম কূপমধ্যে পড়িতেও সঙ্কোচ করিবে না! যথার্থ শুনিতে চাহিলেন, শপথপূর্ব্বক যথার্থই বলিতেছি, যিনি আমার প্রাণের প্রভু, তাঁহার নিমিত্তই এ জীবন উৎসর্জ্জিত আছে!

মহারাজ। ফকিরজি, তোমার আন্তরিক আনুরক্তি বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ করি না; কিন্তু তবু যেন রাজাজীর দিকে তোমার টানটা কিছু বেশী—তাহা ভক্তিতেই হউক, আর ভয়েই হউক, ফল একই! তাহাতে আমার কার্য্যের যে কত অসুবিধা ঘটে, তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না!—একটু চুপ কর—জবাব দিও না—শোন আগে—আমি বেস জানি, আমার নিজের প্রদত্ত প্রশ্রয় হইতেই তাহার ক্ষমতা অসীম হইয়া দাড়াইয়াছে, কিন্তু আলস্য প্রযুক্তই হউক, বা কাহারো অপ্রিয় করিতে ও প্রচলিত বন্দোবস্তে গোলযোগ বাধাইতে ভালবাসিনা বলিয়াই হউক, যাহাতে তাহাতে সেই ক্ষমতা অযথারূপে বৰ্দ্ধিত দেখিয়াও বিশেষ বাধা দেওয়া হয় নাই! যদি স্বচ্ছন্দে থাকিতে দেয়, তবে এখনও বাধা দানে ইচ্ছা নাই! কিন্তু তোমাকে নিশ্চিত জানাইতেছি, আমার রাজ্যে আমি কাঠের মুরাদ থাকিব, আর অপরে যাহা ইচ্ছা করিবে, ইহা কদাপি সহ্য হইবে না—পরাগজীর প্রসাদে আমি অবশ্যই স্বীয় সাম্রাজ্যের প্রভু থাকিব এবং আমার বিশ্বাসভাজন স্বামী-ধর্ম্ম-পালন-যোগ্য কর্ম্মচারিগণকে অবশ্যই রক্ষা করিব—কদাচ তাহাদিগকে অন্যায়রূপে পদদলিত করিতে দিব না।—ডুলীন সাহেব ন্যায়বান ও সত্য-পরায়ণ; সর্ব্বাংশে বিশ্বাসভাজন; সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য পাত্র—তাহার প্রতি কোন অত্যায় কখনই সহ্য

করিব না—যাহারা তাহাকে কুচক্র ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা পাইবে, তাহাদের ভাল হইবে না—তাহাদিগকে কদাচই ক্ষমা করিব না—তাহাকে যথোচিত পুরস্কার ও প্রচুর মানদান করিব, কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না! ফকিরজী, বার বার তাহার ভার তোমার প্রতি অর্পণ করিতেছি, দেখিও তাহার একগাছি কেশের অগ্রভাগও যেন কেহ স্পর্শ না করে—যদি করে, তবে তজ্জন্য তোমাকেই দায়ী হইতে হইবে, অধিক কি বলিব, আমি তোমাকে সে ভার দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম।

বলিতে বলিতে মহারাজার স্বাভাবিক প্রশান্ত ভাব তিরোহিত—উগ্রমূর্ত্তি অবলোকিত হইল! তেমন উগ্রতা হৃদয়ের অসামান্য ব্যগ্রতা ও উত্তেজনা ব্যতীত ঘটে না, ফকিরজী ইহা জানিতেন। বিশেষতঃ হুলীনের প্রতি আজি-জুদ্দিনের স্নেহ-প্রবণতা যথার্থ ছিল। অতএব ঐকান্তিকতার সহিতই সে গুরুভার গ্রহণে সম্মত হইলেন!

শেষে বলিলেন "হুলীন যথার্থই এই কৃপার যোগ্য পাত্র। আমি সর্ব্বদাই কাংরার বিশেষ তত্ত্ব রাখি—যাহা শুনিতে পাই, তাহাতে অন্য কোন বিভাগেই এমন সুশাসন—এমন দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ঘটে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তথাপি হিংসাকারীরা তাহার নামে না রটাইয়াছে, এমন গ্লানিই নাই—এখনও যে তাহারা ক্ষান্ত হইবে, এমন সম্ভাবনাও দেখি না—ভুজঙ্গের স্বভাব বিষোদ্গীরণ, খলের স্বভাব ছলান্বেষণ—ছলগ্রহীর নিকট কাহারই নিস্তার নাই—কখন্ কোন্ ছলে মহারাজার কর্ণ ভারি করিয়া তুলিবে, এ দাসের তাহাই চিন্তা—তখন আমার পর্য্যন্ত মন ভার ঘটিবার আশ্চর্য্য কি?"

মহারাজ। যাহাতে সেরূপ না ঘটে, তাহার যে বিধান ভাল হয়, তাহাই কর।

ফকিরজী। (ব্যগ্রভাবে) কেবল এক উপায়ে সেটী নিবারিত হওয়া আপাততঃ সম্ভব—হুলীনের প্রতি হুজুরের যে কৃপা আছে, তাহার আর একটু বিস্তার হইলেই সব গোল মিটিতে পারে!

মহারাজ। কিরূপে?

ফকিরজী। একবার স্বচক্ষে দর্শন—কাংরার অবস্থা আর হুলীনের প্রণালী একবার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আইলেই গ্লানির রসনা তত আর প্রবলা থাকিতে পারে না! বিশেষতঃ তাহাতে তাহারও শতগুণে উৎসাহবৃদ্ধি হয়—একবার

রাজদর্শন পাইলে যথার্থ অনুগত জনের পক্ষে যেরূপ হর্ষ-বিকাশ ঘটে, এমন আর কিছুতেই না!

মহারাজ। এখনি কর্ত্তব্য! আমি অবশ্যই স্বয়ং যাইব—এই যাত্রাতেই রূপাড় যাত্রা—এখন ভাদ্র মাস, অনায়াসে কাংরা অঞ্চল বেড়াইয়া গিয়া দশ-হরার সময় লর্ড বাহাদুরের সঙ্গে "মুলাকাত" হইতে পারিবে। হুকুম দেও—অজিৎ সিং ও আতর সিং চন্দনওয়ালা সসৈন্যে সঙ্গে যাইবে। তদ্বাদে কর্ণেল আদম সিং ও আলিবক্স যেন নিজ নিজ সৈন্য লইয়া হাজির থাকে, আর প্রত্যেক জায়গিরদার যেন আপন আপন লোক জনকে উত্তম পরিচ্ছদে, উত্তম অশ্বে, উত্তম অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া আনে—ইংরাজচক্ষে কোন পক্ষে কাহারও যদি ত্রুটি লক্ষিত হয়, তবে আর রক্ষা রাখিব না!

ফকিরজী উত্তর দিতে না দিতে রাজা ধ্যান সিংহ আসিয়া উপস্থিত। প্রতিদিন প্রধান মন্ত্রীকে উভয়ে যে ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন, এখনও তাহার অণুমাত্র অন্যথা হইল না—সেই স্নেহ, সেই শিষ্টাচার, সেই সমাদর! কিন্তু তথাপি ধ্যান সিংহের সর্ব্ব-প্রবেশক তীব্র দৃষ্টি প্রতারিত হইল না—দৃষ্টি বলিয়া দিল "সব ঠিক নয়, কোন কিছুর অবশ্যই ব্যত্যয় ঘটিয়াছে।" মহারাজার মূর্ত্তি ও ব্যবহার নিতান্তই দুর্ভেদ্য; কিন্তু ফকিরজীর নয়নতারা ও ওষ্ঠাধর ধ্যানের মর্ম্মভেদী দৃষ্টি শরের আঘাতে ঈষৎ কাঁপিয়াছিল; আবার সেইটীর সংশোধনার্থ ফকিরজী সে দিন কিছু বেশী শীলতা দেখাইলেন! এই দুইটী কারণেই ধ্যান আরো প্রকৃত অবস্থা ধ্যান করিয়া লইতে সমর্থ হইলেন! মনে মনে করিলেন, "ধূর্ত্ত ফকির আজি কি একটা খোঁচা লাগাইয়াছে—আচ্ছা বাছা থাক!"

কিন্তু ধ্যান সিংহ সম্পূর্ণ অবিচলিত সহজ ভাবেই গুপ্ত রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা, নিত্য যেমন, অদ্যও অবিকল সেইরূপ করিলেন—যে আয় ব্যয়াদির তালিকা হস্তে লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা শুনাইয়া গ্রাহ্য করাইয়া লইলেন—মহারাজার একবার দরবার-গমনের দরকার, বিজ্ঞাপন করিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

সে দিবস দরবারের বাদানুবাদ ঘোরতর হইল—যখন কাংরার কথা পড়িল, তখন মহারাজার মনের গতি লক্ষ্য করিয়া বহু সর্দ্দার ধ্যান সিংহের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যরূপেই বিদেশী সাহেবের পক্ষাবলম্বন ও তাঁহার যশোগান করিল।

ফলতঃ উটেরা যেমন দূর হইতেই জানিতে পারে, জল কোন্ দিকে; সভাসদ্‌গণ তেমনই রাজানন ঈক্ষণ মাত্রেই বুঝিতে পারে, ভূপতির মনের গতি কোন্ দিকে! অতএব সে দিন কাংরার শাসনকর্ত্তার প্রতিষ্ঠাবাদ ঘোষিত ও প্রধান মন্ত্রীর বিপক্ষেও তাঁহার গুণপক্ষ সমর্থিত হইবে, বিচিত্র কি? অন্য কি, ফকিরজীও সে দিন স্বকীয় স্বাভাবিক সতর্কতা ভুলিয়া সত্যের দিকে—ন্যায়ের পক্ষে অনেক স্পষ্ট কথাও বলিলেন! কিন্তু তজ্জন্য ধ্যান সিংহ তাঁহার প্রতি যে ক্ষণিক তীব্রতম কটাক্ষপাত করিলেন, তাহাতে তিনি কাঁপিলেন—তাহাতে তিনি জানিলেন যে, ভ্রাতাত্রয়ের বৈরনির্য্যাতনের খাতায় তাঁহার নামও লেখা রহিল! কিন্তু খোসাল সিংহ—যাঁহাকে অপদস্থ করিয়া ধ্যান সিংহ পদস্থ—তিনি তেমন ভয় পাইবার—একটুকুও কাঁপিবার লোক নহেন! তিনি ছুলীনের প্রশংসা ও তাঁহার শত্রুগণের নিন্দা অকুতোভয়েই করিলেন! ছুলীন যে সমস্ত সন্নিয়ম, সুপরিবর্ত্তন ও সদনুষ্ঠানাদি করিয়াছেন, শত্রুরাও যে সব প্রতিকূল ব্যবহার ও গ্লানিবাদাদি প্রচার করিয়াছে—সে সব যেরূপ স্পষ্ট স্পষ্ট ব্যক্ত করিলেন, তাহাতে প্রধান মন্ত্রীর দলস্থ সর্দ্দারেরা আর মুখ পাইল না! তাহারা প্রথমে ভাক্ত তর্ক-স্রোতে খোসালকে ডুবাইয়া দিবার জন্য অশেষ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সত্যরূপ শোষক বাণে তখনই সে মায়া-জলরাশি শুকাইল—লাভে হইতে জলারূপ কর্দ্দমে পড়িয়া তাহারা আপনারাই লুটাপুটি খাইতে লাগিল! তদ্দর্শনে মহারাজ মনে মনে মহা তুষ্ট—এত তুষ্ট যে, পূর্ব্বকার চিত্তভার আর রহিল না! কিন্তু হায়! এ পরিতোষের ফল তাঁহার নিজের ও ছুলীনের কল্যাণ পক্ষে শ্রেয়স্কর নয়—সেই পূর্ব্ব চিত্তভার থাকিয়া গেলে প্রতিজ্ঞার ভারও গুরু থাকিত—কৌতুক ও উল্লাসের সঙ্গে, তাহা লঘু হইয়া ভাসিয়া গেল—কুচক্রিগণকে বাক্‌যুদ্ধে পরাস্ত দেখিয়া তাহাদিগকে কার্য্যতঃ নত করিতে তত ইচ্ছা আর রহিল না!

এইরূপ গুরুতর বিষয়ে এইরূপ লঘু-চিত্ততা, এইরূপ আলস্য ও ঔদাস্য জন্যই তাঁহার শাসন আশানুরূপ সুশাসন হইতে পারে নাই—তাঁহার এই চক্ষুর্লজ্জা ও দুষ্ট সচীবগণের দুষ্কৃতি দমনে অনিচ্ছা দোষটী যদি না থাকিত, তবে তাঁহার স্বভাবদত্ত যেরূপ যোগ্যতা ও প্রবৃত্তি ছিল, তাহাতে তাঁহার সাম্রাজ্য দ্বিতীয় রামরাজ্যই হইতে পারিত—অধিকন্তু তাঁহার তিরোভাবের পরেও তাঁহার বংশে তাহা অবশ্যই অটুট থাকিত! কিন্তু যেটী হইবার নয়,

সেটা হইবে কেন? ভারতাকাশে নবোদিত শ্বেতাঙ্গ-জাতির সৌভাগ্য-সূর্য্যকে তেজোদ্দীপ্ত করা ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাহাই হইল!

যখন রণজিৎ দেখিলেন বাদানুবাদ যথেষ্ট হইয়াছে—"তকরার" রূপ উপায়ে যাহা কিছু জানিবার, জানা হইয়াছে, তখন রূপাড় সম্বন্ধীয় আয়োজনের কথা পাড়িলেন। প্রত্যেক সর্দ্দারকে সমুচিত উদ্যোগ করিতে—প্রত্যেককে স্ব স্ব সঙ্গী দলের শিক্ষা ও সজ্জা বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগী হইতে বলিলেন। কতক তাঁহার সমভিব্যাহারে কাংরাভিমুখে যাইবে, কতক বা (বাসস্থানানুসারে) অমৃতসরে গিয়া অপেক্ষা করিবে। গোলন্দাজ শ্রেণীর অধ্যক্ষগণকে তখনই ডাকাইলেন। যাহার যাহা করণীয়, তন্ন তন্ন ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বন্দুক ও কামানের লক্ষ্য যাহাতে নিখুঁত হয়, তদুদ্দেশে পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ভারার্পণ করিলেন। লর্ড বাহাদুরের সমক্ষে সর্ব্ব প্রকার অস্ত্রধারীর মধ্যে যাহারা সন্তোষজনকরূপে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারিবে, তাহাদের পুরস্কার ও পদোন্নতির আশা দিয়া ছোট বড় সকলকেই উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিয়া— ঠিক যেন মাতাইয়া তুলিলেন —লাহোরে ও সমস্ত পঞ্জাবে হুলস্থূল পড়িয়া গেল!

ডুলীন অবিলম্বে এই সব ব্যাপারের সম্পূর্ণ সংবাদই পাইলেন—নিজ উকীলের দ্বারা নয়—অন্যোপায়ে! ফলতঃ অনেক সর্দ্দার এখন তাঁহার সঙ্গে—কেহ বা প্রকাশ্য, কেহ বা অপ্রকাশ্যরূপে যোগ দিতে ইচ্ছুক—তিনি মনে করিলে ভ্রাতাত্রয়ের বিরুদ্ধে এক প্রবল পরাক্রান্ত দল বাঁধিতে ও নির্ব্বিবাদে তাহার মস্তক হইতে পারিতেন! কিন্তু যদিও তাহারা তাঁহার পরম শত্রু—যদিও হৃদয়েশ্বরী-হরণ তাহাদিগের দ্বারাই হইয়াছে বলিয়া তাঁহার হৃদয় জানিয়াছে, তথাপি কোনরূপ ষড়যন্ত্র পাপে লিপ্ত না থাকাই প্রতিজ্ঞা—সুতরাং লিপ্ত হইলেন না! বিশেষ তাঁহার চিত্ত তখন উদাস, কিছুই তাঁর ভাল লাগে না! তিনি কি আর কোন গণ্ডগোলে তখন জড়ীভূত হন? না, লীলার পুনঃ প্রাপ্তির আশা না থাকিলে পঞ্জাবে আর এক তিলও তিষ্ঠেন?

দরবার হইতে বিশেষতঃ ফকিরজীর হস্ত হইতে এই সময়ে তিনি যে সব পরওয়ানা ও পত্রাদি পাইতে লাগিলেন, তাহার প্রতি খণ্ডই তাঁহার প্রতি অনুকূল ভাবার্থক ও অনুগ্রহ-প্রকাশক। তাহাতে তাঁহার হৃদয় আরো গলিল —মহারাজার প্রতি আরো ভক্তিপ্রবণ হইয়া উঠিল! এই ভাবটী তাঁহার তখনকার চিত্তব্যাধির পক্ষে বহুলাংশে শান্তিসাধক হইল! মহারাজ কাংরায়

আসিবেন, তাঁহার চিত্তরঞ্জনোপযোগী নানা আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন,সুতরাং ব্যস্ততা ও ব্যগ্রতা ক্রমে আবার দেখা দিল—ক্রমে রাজকার্য্য ব্যপদেশে পূর্ব্বের মত বা তদপেক্ষাও অধিক অভিনিবেশ ঘটিয়া অন্তর্ব্যাধি বহুলাংশে উপশমিত, কাজেই আশাতিরিক্ত সুফল ফলিত হইল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সংবাদ।

শরৎ আগত, কিন্তু বর্ষার দৌরাত্ম্য সম্পূর্ণ অপগত হয় নাই, এমত সময়। জলাশয় নির্ম্মল, নৈশ গগন ধবল, সেফালিকা প্রফুল্ল, শরতের এসব নিশান উড়িতেছে, অথচ মাঝে মাঝে ধারাপাতের উৎপাতও আছে! যদিও ঘনদলের ঘোর ঘটা তেমন আর নাই—যদিও তাহাদের দৌরাত্ম্যে "চন্দ্র সূর্য্য দু জনার, মুখ দেখা হ'লো ভার, দিন রাত সমান হইল"এই যে ভাব খানি ছিল, তেমনটী আর নাই; তবু বর্ষণ করে, কিন্তু বর্ষণ অপেক্ষা এখন গর্জ্জনই বেশী—দিন দিন ডাক হাঁকের বিফল আড়ম্বরের জাঁক বরং বাড়িতেছে! গিরি-গাত্র-বাহিনী নির্ঝরিণীর কলুষিত খর বেগ এখন মন্দীভূত ও সুপরিষ্কৃত হইতেছে। বাণগঙ্গার প্রাত্যহিক ভীষণ প্লাবন এখন রহিত হইয়াছে—স্বচ্ছ জল টল টল করিতেছে! কাংরা দুর্গের চতুর্দ্দিকে কোথায় বা তরু-লতা-গুল্মদল শরতের প্রভাবে পূর্ণ যৌবনের পরিপুষ্টতা অথবা প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, কোথায় বা ক্ষেত্রজ ধান্যশীর্ষ আপরাহ্নিক বায়ুহিল্লোলে সুচারু জলোর্ম্মিবৎ তরঙ্গায়িত হইতেছে,তাহাদের সেবায়েৎ কৃষকগণের উচ্চ গীতিধ্বনি, নিকটে শ্রুতিকঠোর হইলেও, দূর হইতে দুর্গ-বুরুজের উপরে আসিয়া সুশ্রাব্য হইতেছে—সে সঙ্গে নানা জাতি বন-বিহঙ্গের স্বরবৈচিত্র্য মিলিয়া কি আশ্চর্য্য ঐক্যতান-মাধুর্য্য উৎপন্ন করিতেছে!

দুলীন ধীরে ধীরে দূর্ব্বাদল-মণ্ডিত প্রশস্ত বুরুজবক্ষে পদচারণ করিতেছেন —তাঁহার চিন্তা-কুঞ্চিত ললাটপাট দর্শনে পূর্ব্বের অক্ষুণ্ণ প্রসন্ন বদন স্মরণ হয় —স্মরণ হইয়া সমবেদনশীলের হৃদয় দুঃখের ভারে দ্রবীভূত হইতে থাকে! হায়। প্রণয় এমনি পরিবর্ত্তক—বিচ্ছেদ এমনি শান্তি-হারক!

দুলীন ধীরে ধীরে পাদসঞ্চারে গমন করিতেছেন—পশ্চাতে হাকিম সিংহ

ও চাঁদ খাঁ প্রভৃতি সহকারী সহযোগিগণ—প্রভু নীরব, সকলেই নীরব ; অন্য কি স্বয়ং চাঁদ খাঁও আজি নীরব ! পর্য্যবেক্ষণ ও উপদেশাদেশ অর্পণই সেই ভ্রমণের উদ্দেশ্য কিন্তু চতুর্দ্দিকের শোভা দেখিয়া সহসা চিন্তা আসিয়া তুলীনকে অন্যমনস্ক করিল—এরূপ সময়ে এস্থলে লীলা প্রায় সঙ্গেই থাকিতেন—চারি দিকে ঐ সব পার্ব্বতীয় দৃশ্য সম্বন্ধে ও বাণগঙ্গার উপলক্ষে লীলা যখন যাহা বলিতেন, একে একে তাহাই এখন স্মৃতি-পটে উত্থিত হইতেছে—আনুষঙ্গিক কত কথাই মনে পড়িতেছে—হায় ! সেই শোণিত-শোষক স্মৃতিই এখন আগমনের উদ্দেশ্য আর পূর্ব্ব সংকল্পকে ভুলাইয়া দিতেছে ! সহচরগণ তাঁহার এরূপ অন্যমনস্কতায় অধুনা অভ্যস্ত হইয়াছিল, সুতরাং মর্ম্ম বুঝিল—ব্যথিতহইল—কিয়দ্দূরে পশ্চাতে পিছাইয়া পড়িল—কোন কথা বলিয়া প্রভুর সেই পবিত্র স্মৃতি-ধ্যান ভঙ্গ করিতে সাহসী ও ইচ্ছুক হইল না !

তুলীন এইরূপ প্রিয়া-ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া ধীর পদে গমন করিতেছেন, সহসা সঙ্গীত-শব্দ কর্ণে আসিল। দেখিলেন, নিম্ন প্রাঙ্গনে তিন জন অন্ধ ভিক্ষুক সারঙ্গ, খঞ্জনী ও মন্দিরা বাজাইয়া অতি সুন্দর গান করিতেছে—চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে সৈনিক ও নাগরিকগণ শুনিতেছে। তুলীন স্বভাবতঃ ও শিক্ষা-বশতঃ সঙ্গীত-প্রিয়। বিশেষতঃ অন্ধ গায়কেরা সুমার্জ্জিত মিষ্ট স্বরে বিশুদ্ধ প্রণালীতেই গাহিতেছিল, তথাপি তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াই চলিয়া যাইতেছিলেন ; কিন্তু সহসা সে গান থামিল—মধ্যস্থলেই থামিল—অন্য গান আরম্ভ হইল—এই গান শুনিয়া তুলীন শিহরিয়া উঠিলেন—একি ? এ গান ইহারা কোথায় পাইল ? এ যে প্রিয়তমা লীলারই সেই অতি প্রিয় গান ! গানটী এই—

খাম্বাজ। ঢিমে তেতালা।

(স্পষ্ট হসন্ত চিহ্ন ব্যতীত সমস্তই অজন্ত করিয়া পড়িতে ও গাইতে হইবে)

আশার ছলনা, বিফল কলনা, সকলি বঞ্চনা !

অবোধ ললনা—

বুঝেও বুঝিনা ! জেনেও জানি না !

চিনেও চিনি না ! শিখেও শিখি না !

(১)

(আশা) ছায়া-বাজি হতে মায়াবিনী !

(আশা) মরীচিকা হ'তে কুহকিনী !

ছায়া-বাজী মিছা জানি, ভয় তাতে হয় না!
মরীচিকা বধে বটে, জ্বালা এত দেয় না!
নিশি দিনে, এমন্ ক'রে দহে না!
প্রাণ হরি, জুড়ায় সে যাতনা!
একেবারে, ঘুচায় সব যাতনা!

(২)

(আশা) মিছা কহে, তবু সাঁচা ভাবি!
(আশা) মনে আঁকে, মনোহর ছবি!
গড়ে হৃদি-পদ্ম-রবি—তারে, যারে পাব না!
"দিব দিব দিব" বলে, দেয় দেয় দেয় না!
বুঝি গো তাই, সে জন্ আমার্ হবেনা!
হ'তো যদি, কেনই বা হায় হয় না!

(৩)

(সে যে) গুণমণি, আমি গুণহীনা!
(সে যে) রাজ্যপতি, আমি অতি দীনা।
মহা রত্ন তরে যত্ন, দরিদ্রে সম্ভবে না!
সুধাংশু ধরিতে যথা, শিশু করে কামনা!
শেখর্ যেতে, পঙ্গুর্ যথা বাসনা!
সাগর্ যেতে, নালা যথা পারে না!

(৪)

(সে যে) সহোদর সম যত্ন করে!
(ও তায়) অগ্নিজ্বলে, যেন রে অন্তরে!
সে অনলে পুড়িতে চাই, পাপ আশা ছাড়ে না!
ভাবী প্রিয়তর ভাব এঁকে বলে "পুড়ো না"!
বাসনা তায়, বাড়ে বৈ হায় পড়ে না!
তাইতে ভুলে, পোড়া প্রাণ আর্ পুড়ে না!

কোন ছলে তুলীন দাঁড়াইলেন—যেন আকাশের দিকে—যেন পর্ব্বতের দিকে কি দেখিতেছেন, এম্নিভাবে গানের দিকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইলেন—আন্তস্ত শুনিলেন। "হাঁ! নিশ্চয়ই তাই!—হা! সেই সুধাংশু বদনেরই সুধা বটে! এ সুধা যে পূর্ব্বে কর্ণ দ্বারা পান করিতে পাইতাম—কার্য্য-বশতঃ নিয়মিত

সময়াপেক্ষা যাইতে আমার বিলম্ব হইলেই এ গান প্রায় শুনিতে পাইতাম! এখন মনে হইতেছে, হায়, কেন আমি অন্য কার্য্যকে গুরুতর ভাবিতাম? কেন আমার লীলাকে এমন নিদারুণ বিরহ-ব্যথার গান গাইবার উপলক্ষ দিতাম? হায়, প্রিয়া আমার পলকের বিচ্ছেদে কি প্রলয় জ্ঞানই করিতেন! আমি অতি নিষ্ঠুর, তাই এমন প্রেম-সর্ব্বস্ব হৃদয়েও বিয়োগ-শর হানিতাম!” আবার ভাবিলেন “সে যাহাই হউক, ইহারা এ গান কোথায় পাইল? কাহার কাছে শিখিল? তবে কি ইহারা আমার লীলাকে দেখিয়াছে?” চকিতবৎ মুখ ফিরাইলেন—সাভিনিবেশে গায়কদিগকে দেখিতে লাগিলেন!

দেখিলেন, সারঙ্গ-বাদকের নয়নদ্বয় একবার যেন ক্ষণমাত্রের নিমিত্ত এমন জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিল, তাহাতে তাহাকে আর অন্ধ জ্ঞান করা উচিত হয় না! কিন্তু সে ভাব মুহূর্ত্ত তরে, তখন অমনি পূর্ব্ববৎ জ্যোতিঃহীন হইয়া পড়িল! সন্দেহ হইল! পুনশ্চ ভালরূপে দেখিলেন—এবার যেন চিনিতে পারিলেন—যেন বলি কেন, ঠিকই চিনিতে পারিলেন—সহস্র ছদ্মবেশের মধ্যেও প্রণয়-তাড়িত মন প্রণয়-সংক্রান্ত আপনার জন চিনিতে পারে—তাই দুলীন চিনিলেন! চিনিবা-মাত্র হৃদয় অস্থির হইল—সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত, কম্পিত হইয়া উঠিল!

সে গান বন্ধ করিয়া অন্ধেরা অতি ত্রস্ত অন্য গান গাহিল—এ গানে সন্দেহ নির্ম্মূল হইল—এ গানে সঙ্কেত ছিল! গানটী এই—

পিলু। জং।

(স্পষ্ট হসন্ত চিহ্ন ভিন্ন সব অজন্ত)

সখা! মনে দেখা ক’রো গোপনে!
দূরে থেকে, আগে দেখে, তবে যেয়ো সেখানে!

(১)

কেউ কাছে থাকিলে তথা, তুলো না আমার কথা,
সে কাণ্ বিনা প্রাণের ব্যথা, ঢেলো না অন্য কাণে!
কহিবে বারতা, যেমন্ দেখে গেলে নয়নে!

(২)

না পেরেছ যা দেখিতে, তিনি পারিবেন্ বুঝিতে,
এ হৃদয়ে প্রবেশিতে, তিনি বৈ নাহি ভুবনে!
বেশী ক’রে শুনায়ো না—ব্যথা দিও না সেপ্রাণে!

গান সমাপ্ত হইতে না হইতেই দুলীন গানের সাঙ্কেতিক ভাব বুঝিয়া চলিয়া গেলেন—চাঁদ খাঁকে বিরলে বলিলেন "এই অন্ধ গায়কগণকে গোপনে ডাকাইয়া তোমার গৃহে লইয়া যাও—যত্ন পূর্ব্বক রাখিও !"

চাঁদ উত্তর দিল "হুজুর ! আমিও চিনিয়াছি, কোন চিন্তা নাই !"

দিবার অবশিষ্ট ভাগটুকু সে দিন যেন আর যায় না—দুলীনের এইরূপই বোধ হইতে লাগিল ! "আকরাম খাঁ ও ধন্নু অন্ধ সাজিয়া আইল কেন ? আইল যদি একবারে আমার নিকটে গেল না কেন ? সংবাদ দিতে এত বিলম্ব, এত ভয়ই বা কেন ? হায় ! প্রাণের লীলার কিরূপ সমাচারই বা শুনাইবে ?" এই ভাবিতে ভাবিতে দুলীন নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন—প্রতি মুহূর্ত্ত যেন বৎসর বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল—তিনি যথার্থই ছট্ ফট্ করিয়া সময়টুকু কাটাইতে লাগিলেন—বিশ্বাসী পেস্‌খেজ্‌মৎকে পুনঃ পুনঃ পাঠাইতে লাগিলেন ! অবশেষে তাঁহারই পরামর্শে আকরাম খাঁ সন্ধ্যার পর গর্ব্বিত খাল্‌সা শিখ সাজিয়া একটা পুলিন্দা স্কন্ধে লাহোরের প্রেরিত রাজদূত বেশে শাসনকর্ত্তার বসিবার গৃহে উপস্থিত হইল ! গৃহে তখন যে যে ছিল, দুলীন তাহাদিগকে উঠিয়া যাইতে বলিলেন ।

দুলীনের প্রথম প্রশ্ন—"লীলা কোথায় ?"

আক্। হুজুর, তাঁহারা নিরাপদে আছেন !

দুলীন। যন্ত্রণা দেও কেন ? একবারে কি বলিতে জান না, কোথায় রাখিয়া আইলে ? আর কেনই বা ছাড়িয়া আইলে ? আর কোন্‌মুখেই বা ছাড়িয়া আসিতে সাহসী হইলে ?

আক্। হুজুর গুস্তাকি মাপ করিবেন—আক্‌রাম খাঁ কি হুজুরের নুণ খাইয়া নেমখারামি বা গাফিলি করিবার লোক ? (আপন বুকের বসন খুলিয়া অস্ত্রাঘাতের ভয়ানক এক গভীর ক্ষত—যাহা এখনও সম্পূর্ণ সারে নাই—দেখাইয়া) হুজুরের কাজে—তাঁহাদের রক্ষার নিমিত্তই এই ঘা দেখুন—অঙ্গের আরো অনেক স্থানে এইরূপ চিহ্ন আছে ! এখনও যে আসিয়াছি, তাহাও তাঁহাদের আদেশে—তাঁহাদেরই উদ্ধার উদ্দেশে !

দুলীন। প্রিয় আক্‌রাম খাঁ, কিছু মনে করিও না—আমি অন্তরের অধৈর্য্যবেগে না বুঝিয়া তোমাকে ওরূপ সম্বোধন করিয়াছি ! এখন বল তাঁহারা কোথায় ?

আক্। হুজুর সকল কথাই সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি। আমরা যে কয়টী অশ্বে যে রূপে যে পথে গিয়াছিলাম, তাহা অবশ্যই শুনিয়াছেন। রাত্রে রাত্রে গিরি বন জলা ভূমি অতিক্রম করিয়া যখন আমরা কাংরার সীমা ছাড়াইয়া মুক্ত প্রদেশে সরল পথে যাইতে লাগিলাম—

দুলীন। কোথায়? কোথায় যাওয়া উদ্দেশ্য ছিল?

আক্। লেনা সিংহের অধিকারে আমার আলাপী কিল্লাদার, মাণিক্‌চাঁদের গিরহি কেল্লায়—আমি জানি মাণিক চাঁদ হুজুরের বড় অনুরাগী, তাই একটু ঘুরিয়া তাঁহার আশ্রয়েই যাইতেছিলাম। আমরা পুরুষ কয় জন কেউ বা আগে, কেউ বা পিছে, রাণীজীদের মাঝে রাখিয়া যাইতেছি—তখনও একটু রাত্রি ছিল—পথে দুই এক দল অশ্বারোহীর সঙ্গে দেখা হইল—সাহসে নির্ভর করিয়া শিখের মতন গলার আওয়াজে "ওয়া গুরুজী" বলিয়া অতি দ্রুতবেগে তাহাদের পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেলাম। শেষে ভোর বেলা যখন এক দল শিখ সওয়ারকে ঐ রূপে অতিক্রম করিয়া যাই, তখন তাহাদের প্রধান আমাদের সঙ্গী জেঙ্গিস্ খাঁকে তীব্র দৃষ্টিতে দেখিয়া গর্জ্জন পূর্ব্বক বলিয়া উঠিল "ওরে এরা সিং নয়—দুষ্ট মুসলমান—সঙ্গে মেয়ে মানুষ—মার্ বেটাদের!"

হুজুর! সে লোক অচেনা নয়—সেই দুরাত্মা নন্দ সিংহের ভাই ভূপ সিং! তৎক্ষণাৎ পাপিষ্ঠেরা অশ্ব ঘুরাইল; আমরা তিন জন, তাহারা বার জন, তায় আমাদের সঙ্গে স্ত্রীলোক—স্ত্রীলোক না থাকিলে ঘোড়া ছুটাইয়া পলাইতে কতক্ষণ? আমাদের তেজস্বী ঘোড়ার কাছে তাদের ঘোড়া গুলোতো গাধা! আর যদি না পলাইয়া যুদ্ধেরই আবশ্যক হইত, স্ত্রীলোক না থাকিলে তাহাতেই বা ভয় কি? তাঁহাদের জন্যই ভাবনা; কিন্তু দেখিলাম, রাজকুমারী আর জান্‌কী কিছুমাত্র ভীতা নন—বলিলেন, "তোমরা যত বেগে দৌড়িবে, আমরাও সেইরূপ পারিব!" আমরা খুব বেগে দৌড়িলাম—অল্পক্ষণেই তাহাদের ছাড়াইয়া প্রায় শত হস্ত দূরে গিয়া পড়িলাম—নির্ব্বিঘ্নে পলায়নের সম্পূর্ণ ভরসা করিলাম।

আমিই পশ্চৎ রক্ষার ভার লইলাম। পশ্চাতে চাহিয়া দেখি, শত্রুদের দুই একজন অধিক অগ্রসর হইয়াছে! অমনি সঙ্গিগণেকে বেগে যাইতে বলিয়া আমি থামিলাম—ফিরিলাম—অটল পর্ব্বতবৎ পথমধ্যস্থলে দাঁড়াইলাম! বিপক্ষেরা আমার সাহস দেখিয়া চমকিয়া উঠিল—থামিল। সেই সুযোগে অব্যর্থ

সন্ধানে আমার বন্দুক ছুড়িলাম—অগ্রবর্ত্তী বিপক্ষ ঘোড়া হইতে পড়িল। আমি অমনি ফিরিয়া তীরবেগে সঙ্গিগণের দিকে ছুটিলাম। ছুটিতে ছুটিতে পুনর্ব্বার গুলি পুরিলাম। গুলি পোরা হইলেই সহসা দুরাত্মাদের অভিমুখে কতক দূর ফিরিয়া আসিয়া আর এক গুলিতে আর এক জনকে ভূপাতিত করিলাম। এবারে তাহারাও যুগপৎ কয়টা বন্দুক ছুড়িল, কিন্তু আমার বন্দুকের ধোঁয়ার জন্য লক্ষ্য ঠিক করিতে পারে নাই—গোলেমালে তাড়াতাড়ি ছুড়িয়াছিল—তাহাতেই বাঁচিলাম, কেবল জানুদেশে গুলির একটু ঘেঁস লাগিয়াছিল মাত্র। আর তাহাদেরই বন্দুকের ধূমের আবরণে আমার পলাইবার সুবিধা হইল। আমার ন্যায় ধন্নু ও জেঙ্গিস খাঁও ঐরূপে এক এক শত্রুকে নিপাত করিল। কিন্তু আমার ন্যায় নিরাপদে নয়—উভয়েই গুরু আঘাত পাইল। আমার বিনা আদেশে সেরূপ করাতে আমি তাহাদিগকে তিরস্কার করিলাম।

যদিও পূর্ব্বাপেক্ষা বৈরীদলের সংখ্যা অনেক কমিল, তথাপি এখনও তাহারা আট জন, আমরা তিন জন বৈ নই, তাহাতে দুইজন আহত! ধন্নু ছুটিতে ছুটিতে আপনার পাগড়ীর কাপড়ে পায়ের ক্ষতস্থান বাঁধিয়া রক্তপাত বন্ধ করিল; কিন্তু জেঙ্গিস খাঁ স্কন্ধে আহত হওয়াতে সেরূপ বন্ধনের সুবিধা পাইল না—তাহার শোণিতস্রাব দৃষ্টে ভয় পাইলাম। কিন্তু আমাদের কৌশল-সিদ্ধির জয়োল্লাসে তাহার সাহস বৃদ্ধি হইল। তাহারা আশাতীত-রূপে আপনাদের সঙ্গীবধ ও সংখ্যা-হ্রাস দেখিয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। তথাপি সংখ্যার এত ন্যূনাতিরেক যে, সম্মুখ-রণে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যে জয়ী হইতে পারি, এমন সম্ভাবনা কিছুই নাই। অতএব রাণীজীদের অগ্রবর্ত্তী করিয়া আমরা পলাইতে লাগিলাম—আমি কেবল দৌড়িতে দৌড়িতে মাঝে মাঝে পলকের তরে মুখ ফিরাইয়া দুই একবার বন্দুক ছুড়িলাম, কিন্তু সে বিনা লক্ষ্যে, সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় ফলদায়ক হইল না।

এইরূপে পূরা এক ঘণ্টা ছুটিয়া প্রায় সাত আট ক্রোশ পার হইলাম—দূরে গিরিহি কেল্লার উন্নত শেখর দেখা যাইতেছে, এমন সময়, হায় কি দুঃখ! রাণীজী অশ্বপৃষ্ঠে আর ঠিক হইয়া বসিতে পারগ নন, ইহা স্পষ্ট দৃষ্ট হইল! রাজকুমারী কত সাহস দিতে লাগিলেন; আমরা কত বুঝাইলাম—"ঐ কেল্লা দেখা যাইতেছে, একটু স্থির থাকুন" বলিয়া কত বিনয় করিতে লাগিলাম; কিন্তু তাঁহার শরীর ক্রমেই অবশ হইতে লাগিল—কেবল মনের বলেই তিনি

এতক্ষণ এত বেগ সহ্য করিয়াছিলেন, আর পারেন না! আমার পশ্চাতে বসাইতে চাহিলাম, তাহাতে সম্মত হইলেন না; তাঁহার কন্যাকে একটা পেটী ফেলিয়া দিলাম, সেই অনুপমা বীর-নারী ছুটিতে ছুটিতেই তাহা দিয়া আপনার কোমরের সঙ্গে মাতার দেহ বাঁধিলেন! হায়, তথাপি তিনি টলিয়া টলিয়া পড়িতে লাগিলেন—শেষে একবারেই ঝুলিয়া পড়িতে লাগিলেন! ধন্নু ও জেঙ্গিস্‌কে দুই পার্শ্বে গিয়া ধরিয়া যাইতে বলিলাম, তাহারা তাহাই করিল; কিন্তু এই সব কারণে গমন-বেগ নিতান্তই কমিয়া আসিল—কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইতেও হইয়াছিল। আমার মানস, জানকীর সহিত রাণীজীকে পশ্চাতে রাখিয়া রাজকুমারীকে লইয়া কেল্লায় চলিয়া যাই—দুর্জ্জনেরা প্রাচীনা রাণীকে কখনই কিছু বলিবে না, যত আক্রোশ তাঁহার কন্যার জন্য, ইহা আমরা বুঝিয়াছিলাম। সে ভাবের আভাসও দিলাম; কিন্তু রাজকন্যা তাঁহার মাতাকে রাখিয়া যাইতে কোনমতেই স্বীকার পাইলেন না!

ছুলীন। (স্বগত) হা প্রিয়ে! এ কাজ তোমারই যোগ্য!

আক্। তখন পরিত্রাণের সকল আশাই নির্ম্মূল-প্রায় হইয়া উঠিল! আমাদের ও বিপক্ষদের মধ্যে পূর্ব্বে যে দূরতা ছিল, তাহাতে গুলি ছুড়িলে আমাদের গায় লাগিত না; এখন সেই দূরতা ক্রমেই হ্রাস পাইতে লাগিল—দুরাত্মারা সে সুযোগ পাইবা মাত্র নির্দ্দয়রূপে এক বাড় ঝাড়িল—স্ত্রীহত্যা হইতে পারে, তাহাও ভাবিল না! জেঙ্গিস খাঁ পড়িল। হুজুর! নুণের গুণ যদি স্মরণ না করিতাম, তবে অনায়াসেইতো পলাইতে পারিতাম। কিন্তু হুজুর, মুলতানীদের সে নীচ স্বভাব নয়—তাহারা প্রভুর কাজের সময় স্বার্থ জানে না—প্রাণের মায়াও করে না! ধন্নুকেও ধন্যবাদ দিই! রাণীজীদের রক্ষার্থ উভয়েই প্রাণ দানের সংকল্প করিলাম—যাহাতে তাঁহাদের গায় গুলি না লাগে, সাধ্যমত সেইরূপ আড়াল করিয়া ছুটিতে লাগিলাম। যদিও তাহাতে তাঁহাদের প্রাণ বাঁচিল, কিন্তু বিপদ কাটিল না। দুর্ভাগ্য বশতঃ বিপক্ষের একটী গুলিতে রাণীজীদের ঘোড়াটী মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইল। যেই দেখিলাম, গুলি খাইয়া ঘোড়াটা ঘুরিয়া পড়ে, অমনি একলাফে গিয়া তাঁহাদের দুইজনকেই এক সাপটে ধরিয়া তুলিয়া, ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহাদিগকে সেই পতনশীল অশ্বের দেহ চাপ হইতে বাঁচাইতে পারিলাম। তৎক্ষণাৎ অমনি আমার ঘোড়ায় রাজকন্যাকে উঠাইয়া দিলাম ও জেঙ্গিসের ঘোড়ায় রাণীজীকে লইয়া

আমি উঠিলাম। পাছে গুলি লাগে বলিয়া, তাঁহাকে আমার সম্মুখে বসাইলাম। ততক্ষণে রাজকন্যাকে ছুটিয়া যাইতে বলাতে তিনি তাহা করিলেন। দেখিলাম, বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া গিরিহি কেল্লা হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিতেছে—ভাবিলাম, আর কি, নিষ্কৃতি পাইলাম! কিন্তু তখনও কেল্লার লোক বহু দূরে। তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া বিপক্ষেরা আমাদের প্রতি বাড়ের উপর বাড় ঝাড়িতে লাগিল—ধন্নু ও আমি উভয়েই ভয়ানক রূপে আহত হইয়া অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলাম—দুরাত্মারা ছুটিয়া আসিয়া তরবারের ঘা এই বুকে মারিল—আমাকে ও ধন্নুকে মৃত ভাবিয়া কেল্লার লোক না আসিতে আসিতে রাণীজীদের তিনজনকে লইয়া বেগে পলাইয়া গেল—তবু সৌভাগ্য হুজুর যে, তাঁহাদের কাহারো গায় গুলি লাগে নাই!

জুলীন। কেন, লীলা তো আগে আগে ছুটিয়াছিল, তাহাকে দুরাত্মারা কিরূপে পাইল?

আক্। আমি যেমন পড়িলাম, রাণীজীও পড়িলেন—রাজকন্যা ও জানকী তাই দেখিয়া ফিরিয়া আইলেন।

জুলীন। এখন তাঁহারা কোথায়?

আক্। হুজুর! অপেক্ষা করুন, সব শুনিতে পাইবেন।

জুলীন বুঝিলেন যে, এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যাহারা আদ্যন্ত বর্ণনা ব্যতীত শুদ্ধ মূল কথাটী বলিয়াই সন্তোষ পায় না, আক্রাম খাঁ সেই শ্রেণীর লোক। অতএব নিরাশ হইয়া ধৈর্য্য ধরিলেন ও আক্রামকে তাহার নিজের প্রণালীতেই বলিতে দিলেন।

আক্। আমরা হুজুরের সন্তান—আমাদের দশা কি হইল, তাহা কি হুজুর শুনিতে ইচ্ছা করেন না? পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি, বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া গিরিহির লোক ছুটিয়া আইল—আমরা যে কে, আর আমাদের আক্রমণকারীরাই বা কে, তাহা তখন তাহারা জানে না। তাহারা আসিয়া দেখিল, দুরাত্মারা কয়েকটী স্ত্রীলোক লইয়া দূরে পলায়ন করিতেছে; আর দেখিল, একজন মৃত এবং দুইজন মৃত-প্রায়—জীবন আছে মাত্র, বাঁচিবার আশা নাই—এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া আছে! তাহাদের মধ্যে একজন আমাকে চিনিতে পারিয়া আমাকে আর ধন্নুকে যত্নপূর্ব্বক কেল্লার মধ্যে লইয়া গেল এবং মুসলমান ডাকাইয়া জেঙ্গিস্ খাঁর কবরের ব্যবস্থা করিয়া দিল।

হুজুর! তাহাদের সেবায় এবং আমাদের সুস্থ ও বলিষ্ঠ যৌবনের গুণে আমরা দুইজনেই বাঁচিয়া উঠিলাম—বহু দিনে আরোগ্য লাভ করিলাম! কিন্তু এমনি ভয়ানক আঘাত যে, অদ্যাপি সকল ক্ষত সম্পূর্ণ সারে নাই!

দুলীন। যখন চৈতন্য হইল, আমাকে কেন সংবাদ পাঠাইলে না?

আক্। হুজুর! চৈতন্যের মতন চৈতন্য কুড়ি পঁচিশ দিনের পর হইয়াছিল; কিন্তু যখন মাণিকচাঁদের মুখে শুনিলাম যে, তাঁহার লোকেরা সেই অপহারক দুরাত্মাদের পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়া তাহাদিগকে রাজকোটের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আসিয়াছে, তখন একটা হেস্ত নেস্ত না করিয়া আপনাকে সংবাদ দিতে ভয় পাইলাম।

দুলীন। রাজকোট? জম্বুর উত্তরে যে রাজকোট? রাজা ধ্যান সিংহের দুর্ভেদ্য রাজকোট? (আক্রামের "হাঁ" শুনিয়া) হায়! আবার সেই ভ্রাতৃত্রয়! যে দিকে ফিরি, সেই শত্রু! আমিও অনুমান করিয়াছি, সেই দুর্জ্জনদলের দ্বারাই অবশ্য কিছু ঘটিয়া থাকিবে! যাউক, তাহার পর?

আক্। হুজুর! আমি যখন চলৎশক্তি পাইলাম, ধন্নু তখনও শয্যাগত। কিছু বলাধান হইবা মাত্র, ছদ্ম-বেশী সারঙ্গ-বাদক ও ভিক্ষুক গায়ক সাজিয়া রাজকোটে গেলাম। যদিও সে দুর্গে অপরিচিত কেহই প্রবেশ করিতে পায় না, তথাপি কয়েক দিনের বহু চেষ্টায় ও বহু কৌশলে প্রবেশ করিলাম। যে ব্যক্তিকে আজ আমাদের সঙ্গে মন্দিরা দিতে দেখিয়াছেন, সে একজন দুর্গ-রক্ষী! সে যখন দুর্গ বাহিরে আসিত, আমাদের গীত বাদ্য শুনিয়া মুগ্ধ হইত। ক্রমে তাহাকে সাকরেদ্ করিয়া শেষে প্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া মানস পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম—এমন কি, দুর্গের এক কোণে বাসা পাইতেও পারিয়াছিলাম।

দুলীন। প্রচুর পুরস্কার অবশ্যই দিব—তাহার পর?

আক্। এখানে ওখানে সেখানে সারঙ্গ বাজাইয়া বাজাইয়া ও গীত গাহিয়া গাহিয়া দুর্গের নানা স্থানে সন্ধানে ফিরিতে ফিরিতে যথায় তাঁহারা আটক আছেন, জানিতে পারিলাম। বহু কৌশলে এক দিন সাক্ষাৎও পাইয়াছিলাম—

দুলীন। কি? সাক্ষাৎ! সী—তাঁহারা কি অবস্থায় কেমন আছেন?

আক্। কোন কষ্ট নাই—রাজরাণী আর রাজকন্যাকে যেমন যত্নে—

যেমন মানে—যেমন গৃহে রাখিতে হয়, রাখিয়াছে—তাঁহাদের সেবার নিমিত্ত উপযুক্ত দাস দাসী সব নিযুক্ত আছে—কেবল পুরীর উঠান ও ঘেরা-বাগান ভিন্ন অন্য স্থানে বাহির হইতে দেয় না! রাণীজী বড় ক্লিষ্ট হইয়াছেন; রাজ-কন্যার অবস্থা বুঝিতেই পারিতেছেন—তাঁহার মুখ দেখিলেই চমকিয়া উঠিতে হয়—রাণীজীর ন্যায় শরীর-গতিক তাঁহার কোন অসুখ হয় নাই, কিন্তু তথাপি মনের অসুখে, ভয়ে ও চিন্তায় জর জর! তাঁহারা আমাকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—অধিক কথা কহিবার সুযোগ হইল না—বলিলেন,"পর দিন অবশ্য অবশ্য সাক্ষাৎ করিও—চিঠি দিব।"

তুলীন। কৈ? চিঠি কৈ? এতক্ষণ দেও নাই কেন?

আক্। হুজুর! চিঠি আনিতে কি সাহস করিতে পারি? আমার কাছে সে রূপ চিঠি থাকিলে আমি যে গুপ্ত চর, তাহাই প্রমাণ করা হয়। তাহাতে আমার বিপদ যাহাই হউক, তাঁহাদিগকে অধিক কড়াক্কড়ে রাখিবে ও অধিক যন্ত্রণা দিবে, এই ভয়ে চিঠি লিখিতে মানা করিলাম। (তুলীন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন!) তাই রাজকন্যা তাড়াতাড়ি দুইটী গান লিখিয়া দিলেন—বলিলেন "তবে এই গান শিখিয়া লও, কাংরায় গিয়া তোমার সাহেবকে শুনাইও!"

তুলীন। কৈ? কৈ সে গানের কাগজ কৈ?

আক্। হুজুর! সেই দিনই সে গান মুখস্থ করিয়া সে কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু গানদুটী আপনাকে শুনাইয়াছি!

তুলীন দেখিলেন, স্থল বিশেষে প্রেমান্ধ প্রভুর অপেক্ষা সহজ-বুদ্ধি সামান্য ভৃত্যও অধিক চতুর হইতে পারে! অতএব পুনর্ব্বার নৈরাশ্যের নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে বাধিত হইলেন এবং হস্ত-ভঙ্গী দ্বারা "পরে কি হইল" জানিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন!

আক্। হুজুর! তাঁহাদের ঘরের গবাক্ষের নিকটে একটী গাবের গাছ ছিল, তাহাতে উঠিয়াই ঐ দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারিয়াছিলাম। পর দিন সেই উপায়ে আবার কথোপকথনের চেষ্টায় গাছে উঠিলাম—আমার ঐ সাক্-রেদ্ নিধান সিং তলায় থাকিয়া পূর্ব্ব দিনের ন্যায় প্রহরীতায় নিযুক্ত রহিল। সবে মাত্র রাজকন্যা বাতায়নে আসিয়া গানের কাগজ খানি দিয়া দুই একটী কথা আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় নিধান সিং বিপদের সঙ্কেত করিয়া পলা-

ইল। আমি অমনি রাজকন্যাকে ইঙ্গিত করিবা মাত্র তিনি জানালার কবাট বন্ধ করিলেন। কিন্তু এক জন পুরীরক্ষক বৃক্ষমূলে আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক আমাকে গালি দিতে লাগিল। আমি নামিয়া আইলেই দারগার নিকট ধরিয়া লইয়া গেল। এরূপ অবস্থা ঘটিলে যাহা বলিব কহিব,তাহা পূর্ব্বেই মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম, সুতরাং থতমত খাইলাম না—বলিলাম, গাবের আটায় সারঙ্গের চামড়া যুড়িব বলিয়া গাছে উঠিয়াছিলাম। যদিও তাহাতে সম্পূর্ণরূপে তাহাদের সন্দেহ দূর হইল না, কিন্তু তাহারা আমার বিশ্বাসঘাতিতা না বুঝিয়া নির্ব্বুদ্ধিতাই বুঝিল এবং আমাকে ও নিধান আমাকে আনিয়াছিল বলিয়া তাহাকেও দুর্গ হইতে দূর করিয়া দিল। ফলতঃ কেবল মুখের জোরেই সে দিন বাঁচিয়াছি, নচেৎ উভয়কে সেই গাছেই লট্‌-কাইয়া দিত, তাহাতে সন্দেহ নাই—সে প্রস্তাবও উঠিয়াছিল!

দুলীন। সে তো উত্তম করিয়াছ; কিন্তু এ ছদ্ম-বেশে এখানে কেন? এরূপ সং না সাজিয়া একবারে আসিয়া সংবাদ দিলেই তো হইত?

আক্। হুজুর! রাজা ধ্যান সিংহ ভয়ানক লোক; তাঁহার চরও সর্ব্বত্র; এই দুর্গ মধ্যেও যে তাঁহার চরেরা নাই, একথা বিশ্বাস হয় না! যদি তাহারা জানিতে পারিত যে, আক্‌রাম খাঁ আসিয়া রাজকোটের সমাচার দিয়াছে, তবে আমার ও নিধানের বিপদ তো হইবেই; তদ্বাদে রাণীজীদের স্থানান্তর করিয়া এমন এক স্থানে লইয়া যাইবে যে, আর সন্ধান পাওয়াই যাইবে না! তখন তাঁহাদের উদ্ধারের আর কিছু মাত্র সম্ভাবনা থাকিবে না! এখন এই উপায়ে যে আসিয়াছি, এবং রাণীজীদের সঙ্গি আক্‌রাম ও ধন্নু যে বাঁচিয়া আছে, কি আপনার সহিত দেখা করিয়াছে, তাহা কেহই জানিতে পারিবে না। সুতরাং আবার আমরা অন্য ছদ্ম-বেশে গিয়া কৌশলে তাঁহাদের মুক্ত করিয়া আনিবার চেষ্টা করিতে পারিব। হুজুর! মনেও করিবেন না যে, আপনি তথায় যাইতে অথবা সৈন্য সামন্ত সহিত বল প্রকাশ দ্বারা কার্য্য সফল করিতে পারিবেন। রাজকোটের বর্ণনা অবশ্যই শুনিয়া থাকিবেন—ছল কল ভিন্ন কোন বল যে তথায় খাটিবে না, তাহা গোলাম আর কি বুঝাইয়া দিবে?

দুলীন। রাজকোট কি কাংরার মত দুর্ভেদ্য?

আক্। কাংরার মতন! হুজুর পরিহাস করিতেছেন। রাজকোটের সহিত কাংরার তুলনাই হয় না। যদিও আমি ভিক্ষুকের বেশে যাওয়াতে

রাজকোটের কিছুই প্রায় দেখি নাই—ভিক্ষুক সকল স্থানে যাইতে সাহস পায় না—তথাপি যত দূর দেখিয়াছি, তাহাতে এই বলিতে পারি, স্বভাব আর শিল্প, এই উভয়ে মিলিয়া শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে মনুষ্যের দ্বারা যত দূর যাহা কিছু হইবার, রাজকোটের কেল্লায় তাহা হইয়াছে! কাংরা দুর্গ যেমন পর্ব্বত মালা হইতে বিচ্ছিন্ন একটী স্বতন্ত্র শৈল-শেখরে নির্ম্মিত, রাজকোট তাহার অপেক্ষাও সম্পূর্ণ পৃথক্ পাহাড়ের মাথায় স্থিত—ইহার অপেক্ষাও তাহার গাত্র দুরারোহ। ইহার ফটকের দিকে তো ঢালু আছে; তাহার কোন দিকেই তাহা নাই—এক্‌টুও নাই—চতুর্দ্দিকেই যেন খাড়া দেয়ালের মত—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড (বাক্সের খোলের মত) কাটরা ও ঝুড়ি ভিন্ন উঠিবার অন্য উপায় নাই, ঐ কাটরা ও ঝুড়ি বৃহৎ বৃহৎ কপি কলে উঠানো নামানো হয়! কেল্লার উপর চারিদিকে অসংখ্য কামান সাজানো আছে; ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ও ওলন্দাজী গোলেন্দাজ, ইহারাই তথাকার অধ্যক্ষ ও রক্ষক। আর রাজাজীর বাছা বাছা প্রজা-জোয়ান ও পাহাড়ীয়া যোদ্ধারা তথায় প্রহরী! হুজুর! মহারাজ রণজিৎ সে কেল্লা কখনো চক্ষেও দেখেন নাই এবং বোধ হয় দেখিতে পাইবেনও না! কর্ণে হয় তো শুনিয়া থাকিবেন, কিন্তু রাজাজীর কৌশলে একটা সামান্য ক্ষুদ্র কেল্লা বলিয়াই শুনিয়া থাকিবেন! অধিক কি, অমন দুর্গ মহারাজার নিজের অধীনে একটাও নাই!

তুলীন। (সহাস্য) ভয়ানক স্থান বটে! কিন্তু প্রিয় আক্‌রাম, "শেল্ গোলা" জান তো?

আক্। জানি না, হুজুর, সে কি? কোম্পনির ফৌজ যখন ঐ উপায়ে হাট্‌রার কেল্লা দখল করে এবং বুড়া দয়ারাম যখন দুর্গ রক্ষা অসম্ভব বোধে অতুল পরাক্রমে তরওয়ার হাতে আক্রমণকারী সিপাহীদলের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে কাটিতে কাটিতে চলিয়া যায়, তখন হুজুর, এ গোলামও সেই প্রসিদ্ধ বীর দয়ারামের সঙ্গে ছিল! তাহাতেই হুজুর, শেল্ গোলার মর্ম্মও এ গোলাম ভাল জানে! আপনার এই কাংরাতেও তাহা দেখিয়াছি! কিন্তু হুজুর, রাজকোটে সে গোলাতেও কিছু হইবার নয়!

তুলীন। আচ্ছা দেখা যাইবে—আমি গিয়া স্বচক্ষে একবার অবস্থা দেখিলেই উপায় অবধারিত হইবে।

আক্। হুজুরের যাওয়া নিতান্তই অসম্ভব—নিতান্তই অনুচিত—গোলা-

মের ধৃষ্টতা মাপ করিবেন! একবারে প্রধান মন্ত্রীর কেল্লা আক্রমণ, সেটাও ভাবিবেন! আর যদি গোপনে যান, কাংরায় অপনার অনুপস্থিতি লক্ষিত ও জল্পিত হইবে; যদিও তাহা না হয়, আপনার যে আকৃতি, কোন ছদ্ম-বেশেই তাহা লুকাইবার যো নাই—বিশেষ শুনিতেছি, মহারাজ আগত প্রায়।

ডুলীন অনেকক্ষণ গভীর চিন্তার পর আক্‌রামের সারগর্ভ আপত্তি ও যুক্তি গ্রাহ্য করিলেন। আক্‌রামের প্রতি মহা তুষ্ট হইলেন। এ বিষয়ে আক্‌রাম যেমন যেমন পরামর্শ দিল, তাহাই ধার্য্য করিলেন।

ধার্য্য হইল, তাহারা যে তিন জন অন্ধ সাজে আসিয়াছে, সেই তিন জন সেইরূপ কোন ছদ্ম বেশেই গমন করিবে, চাঁদ, আলিবর্দ্দি ও বন্নু ব্যতীত আর কাহাকেও সে সন্ধান বলিবার আবশ্যকতা নাই, তাহারা পুনর্ব্বার নব সজ্জায় গিয়া রাজকোটের নিকট বাসা করিবে; আক্‌রাম খাঁ রাজকোট দুর্গ মধ্যে নিধান ব্যতীত আরো দুই তিন জন সাহায্যদাতা বন্ধু ঠিক করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের নিমিত্ত প্রতিশ্রুত অর্থ লইয়া যাইবে; তাহাদের সহযোগে মনোরথ সিদ্ধির প্রাণপণে চেষ্টা পাইবে।

ডুলীন তৎক্ষণাৎ আক্‌রামকে দুই, বন্নুকে সার্দ্ধ এক, নিধানকে অর্দ্ধ ও অন্যান্যের নিমিত্ত তিন—সর্ব্ব সাকল্যে সাত সহস্র রৌপ্য মুদ্রা অর্পণ করিয়া বলিলেন "ইহা কেবল বায়না মাত্র, তোমরা তাঁহাদের মুক্তি সাধন পূর্ব্বক যে ক্ষণে আমার নিকট তাঁহাদিগকে আনিয়া উপস্থিত করিবে, তদ্দণ্ডেই ইহার বহুগুণে বেশী পুরস্কার পাইবে। ধ্যান সিংহের ভৃত্যগণকে বিশ্বাসদ্রোহিতা কর্ম্মে উৎসাহ দেওয়া আমার উচিত নয়, কিন্তু ধর্ম্মের নিমিত্ত অধার্ম্মিকের বিরুদ্ধাচরণ করা কাহারো পক্ষে নিন্দনীয় হইতে পারে না। বিশেষ অত সূক্ষ্ম তত্ত্বের সিদ্ধান্ত পক্ষে আমার মস্তিষ্ক এখন ঠিক নাই। তাহারা অত্যাচারী প্রভুর অত্যাচারে আপনারই ক্ষুণ্ণ আছে, কেবল ভয়ে কিছু করিতে পারে না। তাহাদিগকে বলিও, একার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতে পারিলে, আমি তাহাদিগকে আশ্রয় দিব—তাহাদের ভাল করিব—তাহাদের কোন শঙ্কা, কোন চিন্তা নাই!"

আক্‌রাম ও বন্নু মহা সন্তোষে বিদায় হইল। বিদায় কালে ডুলীন বলিয়া দিলেন "রাজকোটের পথে আমার বিশ্বাসী অশ্বারোহীরা সর্ব্বদাই যাতায়াত করিবে—সর্ব্বদাই তোমাদের অপেক্ষায় সতর্ক রহিবে—বন্নু তাহাদের অধ্যক্ষ

থাকিবে। মহারাজ-অবিলম্বে কাংরায় আসিয়া উপস্থিত হইবেন, নচেৎ আমি নিজেই সে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতাম।"

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যোগী।

অঙ্কুরাম, ধন্নু ও নিধান বিদায় হইল। দুলীন কিয়ৎক্ষণ নিজ নির্জ্জন গৃহে, পরে অন্যমনস্কভাবে অন্তঃপুরের সন্নিহিত সুদীর্ঘ বারাণ্ডায় অতি চঞ্চল চরণে এবং তদপেক্ষাও চঞ্চল হৃদয়ে পাদচারণ করিতে করিতে গভীর চিন্তা স্রোতে মগ্ন হইলেন। সহসা চিন্তা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া বেশ-গৃহে গমন ও বেশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক সশস্ত্র নীচে নামিলেন। বন্নু ও সোহনলালকে সঙ্গে লইয়া অশ্বারোহণে দুর্গ হইতে বাহির হইলেন।

শরতের বিমল শশী কি ধবল কিরণ দিতেছে—ধরা যেন নব ধৌত শুক্ল বসন পরিয়াছে! সুধাকর যথার্থই যেন সুধা ঢালিতেছে—দেহ এবং মন স্নিগ্ধ ও মুগ্ধ হইতেছে! দূরস্থ অনাবৃত শৈল চূড়া যেন রৌপ্যপাতে মণ্ডিত রহিয়াছে! তরু-শিরেও যেন পবিত্র রজত-পত্র সুমন্দ বায়ুহিল্লোলে ইতস্ততঃ দুলিতেছে—ঝক্ ঝক্ করিতেছে! সেই বায়ুহিল্লোলে বাণগঙ্গার নির্ম্মল জীবন অনুচ্চ বীচিমালায় অল্প অল্প তরঙ্গায়িত হইতেছে এবং সোণার চাঁদকে যেন খণ্ডে খণ্ডে কাটিয়া শতেশ্বরী হার করিয়া গলায় পরিয়া হৃদয়ে দোলাইতেছে! আ'জ্ চতুর্দ্দিকে নৈসর্গিক নৈশ শোভা অনির্ব্বচনীয়—বিমান ও মর্ত্ত্যধাম, উভয়ই পরম রমণীয়! দুর্গস্থ শুক্ল সৌধমালা ও জয়ন্তীর পাষাণময় ঈশানীর মন্দিরের দৃশ্যও অপূর্ব্ব!

কিন্তু হায়! দুলীনের চক্ষু আজি তাহার কিছুই প্রায় দেখিতেছে না! নয়ন মনের অনুগামী; যে মন স্বভাবতঃ শোভানুভাবকতা শক্তিতে অদ্বিতীয়—যে নয়ন তদনুসরণে স্বভাবের শোভামৃত পানে নিয়ত নিরত—হায়! সেই মন, সেই নয়ন, স্ব স্ব কার্য্যে আ'জ্ নিতান্তই উদাসীন—কেবল অভ্যাস বশে যাহা কিছু দেখিতেছে—মুগ্ধবৎ হইতেছে! ফলতঃ প্রকৃতির পরাক্রম এমনি আশ্চর্য্য যে, সে দিকে আ'জ্ প্রবৃত্তি না থাকিলেও দুলীন এখন যতই যাইতে

লাগিলেন, ততই তাঁহার তাপিত প্রাণ যেন কোন অনিবার্য্য প্রভাবে আপনা হইতেই শীতল হইতে লাগিল!

ছুলীন কতক দূর গিয়া যম-ঘুলির দিকে যে পথ, সেই পথ ধরিলেন। বাণগঙ্গার তীর বাহিয়া কিয়দ্দূর গমনের পর সে পথ ছাড়িয়া বাণগঙ্গার বক্ষে তিনি নিজে যে পাষাণ সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই সেতু যোগে অপর পারে গেলেন।

বন্নু ও সোহন তখন বুঝিল যম-ঘুলির দিকে গমন করা উদ্দেশ্য নয়—কেন না সে দিকে যাইতে হইলে পার হইতে হয় না। সে যাহা হউক, পারে গিয়া কতক দূর ঋজু গমনের পর পথটী ত্রিধা হইয়া তিন দিকে গিয়াছে—বামে লোকালয় গমনোপযুক্ত উত্তম পরিসর রাস্তা; সম্মুখে একটী সামান্য পথ, সে পথে কৃষক, কাঠুরিয়া ও শিকারিগণ শস্য-ক্ষেত্রে ও বনে যায়; দক্ষিণে ক্রমোন্নত শিলাময় বন্ধুর পথ অথবা অপথ। যম-ঘুলির দক্ষিণে নিবিড় কাননময় যে অত্যুচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী আছে, এই পথ-রেখা ধরিয়া গেলে তথায় যাওয়া যায়।

এই কুপথে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই প্রকৃতির ভীষণ ভাব দৃষ্ট হইতে লাগিল—ততই অতি কঠোর গৈরিক প্রদেশ। কখন উঠিতে, কখন নামিতে হইতেছে; কখন বা লম্ফ দিয়া, কখন বা জলে নামিয়া ক্ষুদ্র তটিনী ও নির্ঝরিণী পার হইতে হইতেছে; কোথায় লতা-বল্লরী-কণ্টকাকীর্ণ দুর্ভিগম্য স্থল—তন্মধ্য দিয়াই পথ; কোথায় বা প্রাচীন মহা মহীরুহ-মণ্ডলীর পরিষ্কার তলভূমি দিয়া সুরম্য ও সুগম্য পথ—তথায় নিবিড় পত্র-পল্লব মধ্য দিয়া চন্দ্র-কর-রেখা প্রবেশ করিয়া কি সুন্দর দেখাইতেছে! নানা দিক্ হইতে বিবিধ ওষধি ও বনপুষ্পের সৌরভ আসিয়া প্রাণ পুলকিত করিতেছে! জলপ্রপাতের ভীষণ শব্দ দূরতা প্রযুক্ত মন্দীভূত হইয়া শ্রুতি-মধুর হইতেছে! অদূরবর্ত্তী নির্ঝর সমূহের কুলু কুলু ধ্বনির সহিত তাহা মিলিত হইয়া সেই পার্ব্বতীয় নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে কি এক আশ্চর্য্য স্বরগাম্ভীর্য্য উৎপন্ন করিতেছে—শুনিলে ভয়ও হয়, উল্লাসও জন্মে!

ক্রমে অটবী নিবিড়তর ও পর্ব্বতের ছায়া গাঢ়তর হইতে লাগিল; ক্রমে ঘোর অন্ধকারবৎ অবস্থা দৃষ্ট হইল—সম্মুখের বস্তু আর দেখা ভার—কাজেই পথ চলা কষ্টকর। এত পথ আসিতে আসিতে ছুলীন একটীও কথা কহেন নাই, সুতরাং সঙ্গীরাও নীরব ছিল; এখন ছুলীন কথা কহিলেন—সেই ভয়-

স্বর তমসাচ্ছন্ন নিস্তব্ধতার মধ্যে সহসা সুগম্ভীর মানব-স্বর শ্রবণে অন্যমনস্ক বন্নু ও সোহন চমকিয়া উঠিল—বিশেষ, তখন প্রভুর স্বর যেন বিকৃত! ফলতঃ চিত্ত বিকার ও ক্রমশঃ চিন্তাশীলতার পর প্রথম বাক্যোচ্চারণকালে সকলেরই স্বর-বিকৃতি ঘটে! তাহাতে এখন তো সংযোগস্থল অতি কঠোর—সংযোগ-সময় ভয়ঙ্কর!

সঙ্গীদ্বয়কে সাহস ও উৎসাহদানই দুলীনের সেই বাক্য প্রয়োগের উদ্দেশ্য; বলিলেন—"এ অন্ধকার বেশী ক্ষণ নয়, আর একটু গেলেই আবার আলো পাইব—সাবধানে বেলুনের পশ্চাতে আইস—বেলুন এ পথ ভাল জানে!" ইহা বলিতে বলিতে সস্নেহে বেলুনের মনোহর গ্রীবায় দুই চারিটী আদরের চাপড় পড়িল!

সত্যই বেলুন সে পথ ভাল চিনে—বেলুন সেই গভীর আঁধারে স্বচ্ছন্দে বিনা চালনায় চলিতে লাগিল—প্রভুর সাদর সম্ভাষণ যেন বুঝিতে পারিয়া আরো একটু হন্ হন্ করিয়া কিন্তু সতর্ক হইয়া শনৈঃ শনৈঃ চলিল—বুঝিয়া বুঝিয়া পাদক্ষেপণ করিতে লাগিল! পাষাণখণ্ডময় গৈরিক প্রদেশে দৌড়িবার যো নাই, বেলুনের দোষ কি? যাহাহউক, সহচরদ্বয় বুঝিল, প্রভুর তবে এ ভীষণ স্থলে সর্ব্বদা যাতায়াত আছে—রজনীযোগেও আছে!

অগৌণে সহসা চন্দ্রকিরণ দর্শন হইল; সেই সঙ্গে সহসা অবতরণেরও প্রয়োজন হইল! সে অবরোহণ পাহাড়িয়া ছাগ ও মৃগ ভিন্ন অন্য চতুষ্পদের সাধ্য নয়; বেলুনের সাধ্য হইলেও সঙ্গী অশ্বদ্বয়ের সাধ্যাতীত; সুতরাং সেই স্থলেই ঘোটকত্রয়কে বাঁধিয়া রাখিতে দুলীন আদেশ দিলেন।

তিন জনে অতি কষ্টে অতিশয় সাবধানে পর্ব্বতগাত্র ধরিয়া ধরিয়া অবতরণ করিলেন। নিম্নে এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী। তাহারই তীর দিয়া—তাহারই নিম্নগা গতির অনুসরণ করিয়া কিয়দ্দূর গমনের পর সম্মুখে আশ্চর্য্য দৃশ্য—চতুর্দ্দিকে অত্যুন্নত পর্ব্বতমালা, মধ্যস্থলে জলদর্পণবৎ বিচিত্র এক গোলাকার বিশাল হ্রদ! চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত—চূড়ার পর চূড়া—শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ! চতুর্দ্দিকেই অসীম আকাশ-ভেদী অনন্ত শৈল-রাজির অদ্ভুত অনন্ত দৃশ্য। সেই বেষ্টনকারী পর্ব্বত-শ্রেণীর গাত্র হইতে—পার্শ্বদেশ হইতে—কোথায় বা গিরি-বক্ষ ভেদ করিয়া—কোথায় বা নিম্ন উপত্যকা বাহিয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র, বৃহৎ জলপ্রপাত, পয়স্বিনী ও নির্ঝরিণী নানা প্রকার গতি, রীতি, ধ্বনির সহিত

নানা দিক্ হইতে আসিয়া সেই রমণীয় হ্রদে পতিত বা মিলিত হইতেছে! ফলতঃ তাহারাই হ্রদের জননী বা তাহারাই তাহার পুষ্টিদায়িনী ধাত্রী!

অদূরে একটী খাঁড়িতে একখানি অপূর্ব্ব ক্ষুদ্র নৌকা ঝোপের ভিতর বাঁধা ছিল, হুলীন তাহা আনিতে বলিলেন। কর্ণ, ক্ষেপণী প্রভৃতি সকল সজ্জাই তাহাতে প্রস্তুত ছিল। তদারোহণে তিন জনে সেই হ্রদ-হৃদয় বাহিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম কোণাভিমুখে চলিলেন—বন্নু ও সোহন ক্ষেপণী ক্ষেপণ করিতে লাগিল; হুলীন কর্ণ ধরিলেন। প্রায় এক ক্রোশ বাহিয়া কূল পাইলেন। এত রাত্রে হ্রদ পার হইয়া কোথায় যাওয়া হইবে, দাঁড়ীদ্বয় পরস্পরে মৃদুস্বরে ইহাই আলোচনা করিতেছে, এমন সময় হুলীন কহিলেন "তোমরা নৌকায় নিদ্রা যাও, আমি আসিতেছি—আমার বিলম্ব হইলেও চিন্তিত হইও না।"

"চিন্তিত" হইবে কি, এখনই মহা চিন্তিত হইয়া উভয়েই যুগপৎ বলিয়া উঠিল "চিন্তিত হইব না—নিদ্রা যাইব—আর আপনি এই দুরারোহ পর্ব্বত আরোহণ করিবেন?"

হুলীন হাসিয়া উত্তর করিলেন "পর্ব্বতের উপরে আরোহণ করিব না—অদূরে পর্ব্বত-গহ্বরে যাইব! ঐ সম্মুখে শৈল-পদতলে রম্য উদ্যান তুল্য একটী ফল পুষ্পের উপবন দেখিতেছ না? উহার সম্মুখেও কি দূর্ব্বাদল-শোভিত সুচারু মুক্ত স্থল লক্ষ্য করিতেছ না? উহা কি স্বভাবজাত জঙ্গল ও ক্ষেত্র বলিয়া বোধ হইতেছে? উহার সুশৃঙ্খলা ও পারিপাট্য দেখিয়াও কি মনুষ্য-হস্ত-সৃজিত বলিয়া বুঝিতেছ না? উহারি অন্তরালে একটী পরম সুন্দর গুহা আছে, তাহাতে এক মহাপুরুষ বাস করেন—আ! আমার পরম হিতৈষিণী বুড়ী মা কোথায় গেল! তাঁহা হইতেই এই সাধু-সঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি!"

(ইটি যেন অর্দ্ধোচ্চারিত স্বগত হইল!) "আমি সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি—কোন চিন্তা করিও না—অদ্যও সেই অভিপ্রায়ে আসিয়াছি, এখনই প্রত্যাগমন করিব—বিলম্বও হইতে পারে—তাই বলিতেছিলাম, নিদ্রা যাও।"

সোহন। হুজুর! আমাদের চক্ষু কি এতই পাষণ্ড, আপনি অনিদ্র থাকিবেন—এই ঘোর নিশীথে নির্জ্জনস্থানে একাকী যাইবেন—আর তাহারা নিদ্রা ইচ্ছা করিবে? তেমন চক্ষুকে কি উৎপাটন করিব না?

হুলীন। (সহাস্যে) তবে তোমরা ঐ উদ্যানে বেড়াইয়া অপেক্ষা কর।

তিন জনেই তীরে উঠিয়া দেখেন, সেই মুক্ত স্থলে এক দীর্ঘাকার পুরুষ দণ্ডায়মান! বোধ হয়, তাঁহাদের কলরব শুনিয়া সেই মহাপুরুষ বাহিরে আসিয়াছেন। তাঁহার তেজোদ্দীপ্ত সুন্দর বদনমণ্ডল নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে—তাঁহার বিশাল নয়নের প্রশান্ত দৃষ্টি ভক্তি আকর্ষণ করিতেছে!

তাঁহারা নিকটস্থ হইয়া অভিবাদন করিলেন; মহাপুরুষও প্রত্যভিবাদন ও স্বাগত সম্ভাষণ পূর্ব্বক দুলীনকে সাদরে নিজ গুহায় লইয়া চলিলেন।

সোহন ও বন্নুর বিস্ময়ের ইয়ত্তা রহিল না—তাহারা এমন তেজঃপুঞ্জ দেহ ও এমন সুশ্রী পুরুষ কখনই প্রায় দেখে নাই! প্রশস্ত ললাটপটে কোনরূপ রেখা বা কুঞ্চনের চিহ্ন মাত্রও নাই—কি উজ্জ্বল! কি মসৃণ! যেন পাষাণমূর্ত্তি বা পাপ-তাপ-চিন্তা-শূন্য নব-যুবকের কপাল! দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশজাল এলোকেশী স্ত্রীলোকের ন্যায় পশ্চাতে ও পার্শ্বে প্রলম্বিত রহিয়াছে—সন্ন্যাসীদের শিরে যেমন জটাভার, ইঁহার মস্তকে সেরূপ নয়, কেশ; অথচ রুক্ষ ও অবিন্যস্ত—তৈল ও চিরুণীর সহিত নিতান্ত অপরিচিত! তথাপি দেখিতে সুন্দর! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নয়নের জ্যোতিঃ অতি পবিত্র, অতি প্রশান্ত, অথচ সে তেজোদ্দীপ্ত জ্যোতিতে ব্যাঘ্র ভুজঙ্গাদিও বশীভূত হইতে পারে—পামরের কঠোর হৃদয়ও গলিতে পারে! দশনপংক্তি রক্ত-রেখান্বিত শুভ্র ও সুপ্রকৃতিস্থ! বয়স অনুমান করা দুঃসাধ্য—একবার বা যুবক, একবার বা পরিণত বয়স্ক বলিয়া জ্ঞান হয়! হস্ত পদের গঠন সুবলিত, বলিষ্ঠ বীরের ন্যায় কঠোর কর্ম্মোপযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে; বক্ষ বিশাল ও প্রশস্ত; পরিধানে শার্দ্দূল বা মৃগচর্ম্ম নয়—গেরুয়া বসনও নয়—দিব্য গরদ; স্কন্ধেও গরদের উত্তরীয়—পবিত্র সূত্র নাই! পদতলে খড়ম; কিন্তু (বলিয়া রাখি) গুহা মধ্যে চর্ম্ম-পাদুকাও আছে! কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট—হাস্যও মধুর!

ইনি যে এই গুহায় বাস করেন, কেহ কেহ জানে; কিন্তু কত কাল বাস করিতেছেন এবং ইনি যে কে, তাহা কেহই জানে না। যাহারা ইঁহাকে জানে, তাহারা কেবল যোগী বলিয়াই জানে, ইঁহার আর কিছুই জানে না। ইদানীং গুলাপী সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট আসিত—গুলাপীর অনুরোধে ও গুলাপীর মুখে দুলীনের পরিচয় ও স্বভাব চরিত্র শুনিয়া যোগীবর তাঁহার সহিত আলাপ করিতে সম্মত হন। দুলীনও প্রথমে কেবল কৌতূহলের বশেই আসিয়াছিলেন; কিন্তু আলাপের পর অসাধারণ গুণ মাহাত্ম্য বুঝিয়া সাবকাশ পাই-

সেই আসিতেন এবং প্রতিবারেই অধিকতর চিত্ত-প্রাশস্ত্য ও নির্ম্মলতর জ্ঞান লাভ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেন! অদ্য রজনীতে দুশ্চিন্তার অপার পাথারে পড়িয়া শান্তিরূপ কূল পাইবার মহদাশায় এই যোগীন্দ্রের চরণাশ্রয় লইতে আসিয়াছেন। বিশেষতঃ লীলার উদ্ধার বিষয়ে অদ্য তিনি ইতি-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় —লীলার বিরহে তাঁহার হৃদয় নিতান্তই অধীর, অযথারূপে চঞ্চল, সুতরাং স্বায়ংকালে যে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তত্তাবৎ ধর্ম্মনীতির অনুযায়ী হইয়াছে কি না; যদি হইয়া থাকে,তবে কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে উপযুক্ত হইয়াছে কি না; আর যদি না হইয়া থাকে, তবে কি কর্ত্তব্য; ইত্যাদি গুরুতর বিষয়-বিচারে আজি তাঁহার অস্থির চিত্ত সমর্থ নয়—এমন কোন সুযোগ্য সুহৃদও নিকটে নাই, যাঁহার সৎপরামর্শে সৎসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন, সুতরাং তাঁহার অকূলের পোত স্বরূপ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ সহৃদয় সদয় বন্ধুর নিকট হৃদয়ের কবাট খুলিয়া সদুপদেশ গ্রহণার্থ আসিয়াছেন!

পবিত্র গুহামধ্যে পবিত্র মিত্র সমীপে বসিয়া সেই কবাট সম্পূর্ণরূপেই খুলিয়া দিলেন—আত্ম-সম্বন্ধে, রাজসভা-সম্বন্ধে, লীলা-সম্বন্ধে যত কিছু বলা আবশ্যক, সকলই বলিলেন। বলিয়া বিচারকর্ত্তার মুখ চাহিয়া বিচারার্থী যেমন কম্পিত দেহে অবস্থান করে এবং পাঠ আবৃত্তি করিয়া উপদেশাপেক্ষায় শিষ্য যেমন উৎসুক নয়নে অধ্যাপকের গম্ভীর বদন পানে চাহে এবং দিশাহারা পথিক যেমন পথ প্রদর্শক কোন্ দিকে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করে,তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকে, ভুলীন এখন অভিন্ন সেই ত্রিবিধ লোকের ভাবাপন্ন হইয়া সকাতর দৃষ্টিতে যোগীবরের স্থির গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন!

পাঠক স্মরণে রাখিবেন, ভুলীনের ঐ আদ্যন্ত পরিচয় বক্তৃতাকারে হয় নাই, মধ্যে মধ্যে যোগী-কর্ত্তৃক বহুবিধ প্রশ্ন ও ভুলীন কর্ত্তৃক উত্তরদান, এইরূপে হইয়াছিল। আমরা সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি। সমুদয় জ্ঞাতব্য ঐরূপে জ্ঞাত হইয়া যোগী প্রবর সুমধুর স্বরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন;—

"প্রিয় বৎস! আমি সমস্তই শুনিলাম—এত দিনের পর সমস্তই বুঝিলাম। এক্ষণে আমার যৎসামান্য ক্ষীণ বুদ্ধিতে যাহা তোমার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, তাহা বলি, শ্রবণ কর। তোমার পরিচয় যেমন সরলতাময়, আমার উত্তর এবং উপদেশও সেইরূপ সমবেদনশীল অকপট বান্ধব-হৃদয়-প্রসূত হইবে।

"প্রথমতঃ। আক্রাম ও ধন্নু যে উপায়ে কার্য্য সাধিতে যাইতেছে, তাহা বৈধ নয়—তেমন কাজ তোমার সদৃশ ধার্ম্মিকের উপযুক্ত নয়। তদ্দ্বারা রাজা ধ্যান সিংহের কর্ম্মচারী ভৃত্যগণকে তাহাদের অবশ্য-প্রতিপাল্য স্বামী-ধর্ম্ম-চ্যুত করা হইবে—তাহাদিগকে অতি গর্হিত বিশ্বাসঘাতিতা ও প্রভুদ্রোহিতার পাপ-পথে আনিবার জন্য কুপ্রবৃত্তি ও প্রলোভন দেওয়া হইবে! কাজেই তোমাকে সে পাপের প্রধান অংশী হইতে হইবে! তাহাদের প্রভু অনুহ্লাদের পত্নী ও কন্যা হরণ রূপ পাপাচরণ ও পরপীড়ন করিয়াছে সত্য; কিন্তু তাহার বিচার ভৃত্যগণের অধিকার-বহির্ভূত। তাহারা যদি ধর্ম্ম-বোধে দুরাচার প্রভুর অত্যাচোরে লিপ্ত থাকিতে না চায়, তবে প্রভুকে বুঝাইয়া নিরস্ত করুক। যদি সে সাহস ও সে সাধ্য না থাকে, চাকরি ত্যাগ করুক। কিন্তু প্রকাশ্যে বিশ্বাসরক্ষার ভাণ, অপ্রকাশ্যে বিশ্বাসভঙ্গ, ইহা নিশ্চয়ই অধর্ম্ম! বিশেষ তাহারা পুণ্যপ্রণোদিত নয়, অর্থলোভে প্রভুদ্রোহী, তাহাতে আরো অধিক পাপী হইবে! আরো ভাবিয়া দেখ, পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল কিরূপ দূরব্যাপী—তাহারা আসিয়া তোমার নিকট অবশ্যই কর্ম্ম প্রয়াসী হইবে, তুমি কি আর তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে পার? অর্থলোভে যাহারা এক প্রভুর বিরুদ্ধাচারী হইতে পরিয়াছে, অপর প্রভুর বিরুদ্ধে সেই কারণে সেইরূপ কার্য্য আবার করিবে আশ্চর্য্য কি? যদিও সেই ভয়ে তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ দিয়া বিদায় করিয়া নিজে নিরাপদ হও, তথাপি তাহাদিগকে অন্য প্রভুর সর্ব্বনাশ ঘটাইবার জন্য যে বিদায় দিলে, ইহা ভাবিয়াও কি তোমার আত্মগ্লানি হইবে না? আবার, এই আক্রাম ও ধন্নু যে তোমার এত প্রিয়তম বিশ্বাসী ভৃত্য, তাহাদিগকে বিশ্বাসঘাতিতার ঘটক করিয়া কি বিশ্বাসঘাতিতা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না? পাপ যে ঘোর সংক্রামক ব্যাধি, তাহা অবশ্যই তোমার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির জানা আছে!"

দুলীন বলিলেন "প্রভু, আমার হৃদয় মধ্যেও এইরূপ ভাবাভাস হইয়াছিল, কেবল চিত্তচাঞ্চল্য বশতঃ এবং যাহাদের ভালবাসি, তাহাদের বিয়োগ দুঃখে ও উদ্ধারের আশায় জ্ঞানশূন্য-প্রায় ছিলাম বলিয়াই ইহাকে তখন তত ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখিয়াও যেন দেখি নাই! তথাপি অপরাধ বলিয়া বিলক্ষণ সন্দেহ হইয়াছিল—সেই সন্দেহ ভঞ্জনার্থই শ্রীচরণ দর্শনে আসিয়াছি। আমার ভৃত্যেরা এখনও দুর্গ হইতে যায় নাই, এখনও নিবারণ সম্ভব, এই জন্য রাত্রিতেই আসিয়াছি।"

যোগী। উত্তম করিয়াছ—শোক দুঃখাদি কারণে মহাবুদ্ধিমান ও মহাধর্ম্ম-শীল মানব হৃদয়ও-বিচলিত হয়—তাহার প্রমাণ এই তোমাতেই আজি দীপ্তি-মান! যাহা হউক বৎস, এখনই গিয়া তাহাদিগকে সেই গর্হিত উপায় হইতে নিরস্ত কর।

ফুলীন। করিব—কিন্তু উদ্ধারের উপায়?

যোগী। উপায় অতি সহজ। আমার বিবেচনায় সরল সাধনে সকল কামনাই সিদ্ধ হইতে পারে—দুঃসাধ্যও সুসাধ্য হয়। বৎস! রাজ-ভ্রাতৃত্রয় তোমার মহা শত্রু জানি—শুদ্ধ তোমার নয়, তোমার পিতৃবৈরীও বটে। সজ্জনের শত্রু দুর্জ্জন—সরলের প্রতিদ্বন্দ্বী খল, ইহা স্বাভাবিক। সুতরাং কপটতা, খলতা ও চাতুর্য্য দ্বারা তোমার অনিষ্ট চেষ্টা করিবে, ইহাও স্বাভা-বিক; যেহেতু শৃঙ্গীর শৃঙ্গ, হস্তীর শুণ্ড ও ব্যাঘ্রের নখ দন্তের ন্যায় ঐ সকলই তাহাদের অস্ত্র! কিন্তু খল-চাতুর্য্য তোমার অস্ত্র হওয়া উচিত নয়। তাহা হইলে আর তাহাতে তোমাতে প্রভেদ কি? অতএব, প্রিয় সুহৃদ্, ইউরোপে অবস্থানাবধি পুনঃ পুনঃ তোমার অন্তস্তল-গত যে সংকল্প ও প্রতিজ্ঞার কথা পরিচয় দিলে এবং যে প্রশংসিত প্রতিজ্ঞানুসারে এত কাল কার্য্য করিয়া আসিতেছ, তাহাতে তিলমাত্র বিচলিত হইও না—সহস্র অশনিপাত তুল্য বিপৎপাতেও অণুমাত্র শিথিলতা দেখাইও না—সেই সরল পথ, সেই ধর্ম্মবল, সেই ন্যায়ানুরাগ, সেই সৎকর্ম্মে একাগ্রতা, সেই পরহিতৈষিতা, সেই সর্ব্বাশ্রয়ের পদাশ্রয় ভিন্ন অন্য কোন তন্ত্র, কোন মন্ত্র, কোন যন্ত্র, কোন ছল-কল কৌশল অবলম্বন করিবে না। আমি জানি, রাজকোট সামান্য দুর্গ নয়—ছল কৌশল ভিন্ন শুদ্ধ বল-প্রয়োগে সিদ্ধ হওয়া দুর্ঘট। তাহাতে তোমার আবশ্যকতা কি? তোমার প্রভু তো অবিলম্বে কাংরায় আসিবেন; সেই সঙ্গে যিনি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়—যিনি তাঁহার একমাত্র প্রিয় সুহৃদ্—যিনি তোমারও অপকট মিত্র, সেই আজিজুদ্দিনও আসিতেছেন। তাঁহার দ্বারা মহারাজকে সব শুনাও। সঙ্গে হয় তো তোমার প্রধান শত্রু প্রধান মন্ত্রীও অবশ্য আসিবেন—ভগ-বান তোমাকে সুযোগ করিয়া দিতেছেন—এমন সহজ সুযোগ আর পাইবে না—ফকিরজীকে সমস্ত শুনাইবে, তুমি যে একজন এদেশীয় মহদ্বংশ প্রসূত, তিনি তাহার আভাস মাত্র জানেন—তুমি যে সুদান রাজপুত্র, তাহা তিনি জানেন না। অতএব সমস্ত দুঃখের কথা, সমস্ত অত্যাচারের কথা শুনাইবে,

শুনাইয়া তাঁহারই উপরে একান্ত নির্ভর করিবে ; দেখিবে, এই দীন হীন মিত্রের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয় কি না ? ইহা করিলে, অচিরাৎ স্বীয় হৃদয়রত্ন লীলাকে বিনা ক্লেশে ঘরে বসিয়া পাইবে—অবশ্যই পাইবে ! তোমার ন্যায় কর্ম্মচারী রণজিতের ভাগ্যে আর হয় নাই, হইবেও না—তোমার গুণে তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট—শত ধ্যান সিংহ একত্রিত হইয়া শত সহস্র কৌশল করিলেও তোমার প্রতিকূলাচরণে আর সাহসী হইতে পারিবে না—এ বিষয়ে তো নয়ই !

দ্বিতীয়তঃ। এক্ষণে তোমার পৈতৃক রাজ্য সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা বলিবার পূর্ব্বে আমার একটী প্রশ্ন আছে ;—তুমি সূক্ষানুসূক্ষ্মরূপে তোমার আত্মমন, বাহ্য অবস্থা ও লীলার প্রবৃত্তি মনে মনে অনুশীলন করিয়া বল দেখি, সত্যই কি তোমার অন্তঃকরণ সেই পিতৃরাজ্য সুদানের নিমিত্ত বিশেষ লোলুপ ?

ফুলীন। প্রভো ! যে অনুশীলনের আদেশ করিলেন, তাহা এখন আর নূতন কিছুই করিতে হইবে না—সর্ব্বদাই ঐ কথা, ঐ তত্ত্ব জপমালা আছে ! সুতরাং আপনার প্রশ্নের উত্তর দানে বিলম্ব হইবে না। আমার আত্মমন সত্যই লোলুপ বটে ; কিন্তু বাহ্য অবস্থা এবং লীলার প্রবৃত্তি তৎপক্ষে অনুকূল নহে। সুতরাং আমার সংকল্প ম্লান—আমার হৃদয় সংশয়ে দোলায়মান ! অর্থাৎ তাহার চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য কি না এবং যদিই বা কর্ত্তব্য হয়, তবে তাহার সাধন পক্ষে উপায় কিরূপ হওয়া উচিত, এই দুইটী নিজ বুদ্ধিতে কোনমতেই স্থির নির্ণয় করিতে পারিতেছি না বলিয়াই মহাজ্ঞানীর শরণাপন্ন হইয়াছি !

যোগী। বৎস ! ক্ষাত্র-ধর্ম্মানুসারে চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু বর্ত্তমানের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক অবস্থা বিবেচনায় সেই কর্ত্তব্যের গুরুতা অনেক হ্রাসতা প্রাপ্ত হয়। আবার অবস্থার সঙ্গে যদি উপায়ের কথা চিন্তা করা যায়, তবে তাহা আরো লঘু হইয়া পড়ে। বল-প্রয়োগ উপায়টী আপনিই বলিলে অকর্ত্তব্য। যদিও অনুচিত না হইত, তথাপি তাহার সুপন্থা কি ? মনে কর তুমি কর্ম্ম ছাড়িলে—প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধটী ত্যাগ করিলে—মাতুল বংশের দলে গিয়া মিশিলে। কিন্তু তাহাতেই বা কি ? কুলু রাজ্যবাসী ক্ষত্রিয়গণ সাহস ও বীর্য্যে অসামান্য হইলেও সংখ্যায় লাহোর-সৈন্যের তুলনায় যৎসামান্য ! যেহেতু তাহাদের রাজ্যটী ক্ষুদ্র, তাহাদের সহিত সমুদয় পার্ব্বতীয় অঞ্চলের লোক মিলিয়া দল বাঁধিলেও রণজিতের বর্ত্তমান প্রভাবের নিকট তথাপি ক্ষুদ্র বই

বৃহৎ বল হইবে না। সুতরাং তোমাকে অন্যত্র হইতে সহস্র সহস্র বেতনভুক্ সৈনিক সংগ্রহ করিতে হইবে এবং তদুপযোগী অস্ত্র শস্ত্র, বন্দুক কামান, সাজ সজ্জা, যান বাহনাদি শতবিধ আয়োজন আবশ্যক হইবে। নচেৎ সৈন্য লইয়া কি করিবে? সে সমস্ত ও সৈন্য সংগ্রহই বা কিসে হয়? এত বিপুল অর্থ কোথায় পাইবে? মনে কর, অসম্ভবও সম্ভব হইল—অর্থ-সম্বল জুটিল! মনে কর, অসাধারণ অধিনায়কত্ব গুণে অল্প সৈন্য লইয়াই জয়ী হইলে—পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিলে! কিন্তু ঘোর অত্যাচারী গোলাপ সিং সুদান রাজ্যকে এমন সারহীন, শক্তিহীন ও তেজঃহীন করিয়া তুলিয়াছে যে, সে সুদানের রাজা হইলে কেহই আর পূর্ব্ববৎ বলিয়ান ভূপাল হইতে পারে না! যেমন ভূমিতে রস না থাকিলে মহীরুহ পুষ্ট হয় না, সেইরূপ প্রজা নিঃস্ব হইলে রাজ-কোষ পুষ্ট থাকিতে পারে না। সুতরাং রাজাও দারিদ্র্য-দশায় পড়িয়া স্বীয় পদ, মর্য্যাদা, প্রভাব সমর্থনে সমর্থ হন না। তুমি যেন প্রাণপণে একবার মাত্র যোট পাট করিয়া রাজ্যাধিকার করিলে; কিন্তু রণজিতের কিসের অভাব যে, একবার মাত্র পরাজিত হইলেই শক্তিহীন হইবেন, নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবেন? তিনি কি পুনঃ পুনঃ স্বীয় ক্ষতি ও অপমানের প্রতিশোধার্থ অসামান্য প্রয়াস পাইবেন না? তোমার কি সাধ্য আর তোমার সামান্য সহায় দলেরই বা কি শক্তি যে মহাপ্রতাপশালী পঞ্জাবসিংহের বার বার দুর্দ্দমনীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারিবে? তখন তোমার প্রাণপেক্ষাও রক্ষণীয় সেই পৈতৃকরাজ্য কি বার বার ছার খার হইবে না? তাহাতে শান্তি ও সুখের নিকট বিদায় লইয়া তোমাকে ও তোমার প্রাণাধিকা লীলাকে কি জন্মের মত ঘোর অশান্তি ও অসুখে কালহরণ করিতে হইবে না? অতএব, বৎস! বৃথা এক পৈতৃক ভাবে উন্মত্ত হইয়া প্রভুদ্রোহিতা, বিশ্বাসদ্রোহিতা ও অকৃতজ্ঞতা রূপ মহাপাপ স্বীকারে লাভ কি? ইহকালের সুখের কথা তো বলিলাম, পরকাল নষ্ট করার কষ্ট ও আত্মগ্লানি ভয়ানক হইবে!

দুলীন। পাপ ও অনুতাপ—প্রজানাশ ও বিলাপ! তাতো প্রভু পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি—সেই জন্যই বিদ্রোহী দলে মিশি নাই—সেই জন্যই তাঁহারা আমার অনর্থক বৈরী হইলেন এবং আমাকেও অনর্থক তাঁহাদের বধ-পাপে লিপ্ত করিলেন! অধিক কি আমার মাতুল-বংশও তন্মধ্যে ছিলেন!

যোগী। না, তাহাতে তোমার পাপ হয় নাই—তাহাতে তোমার অণু-মাত্র অপরাধ ছিল না। ইতিপূর্ব্বে কপট চাতুর্য্য-ব্যবহারের নিন্দা করিয়াছি এবং তোমার পক্ষে তাহা উচিত নয়, বলিয়াছি; কিন্তু যম-ঘুলিতে তুমি যে চাতুরী করিয়াছিলে, তাহা সে শ্রেণীর চাতুর্য্য নয়—তাহা কোন মতেই নিন্দনীয় নয়; বরং অবশ্য-করণীয়; যেহেতু চাতুর্য্য পূর্ব্বক তুমি কাহারো হিংসা করিতে যাও নাই—আততায়ীর হস্তে আত্মরক্ষার্থই সেই কৌশল অবলম্বন করিয়া অত্যাচারিগণকে শিক্ষা দিয়াছিলে—সেটা না করিলে তোমার ধ্বংস নিশ্চয় ঘটিত, সুতরাং ক্ষাত্র-ধর্ম্ম-পালনই হইয়াছে!

সে কথা যাউক, এক্ষণে, অন্যোপায়ে অর্থাৎ প্রভুর সম্মতিক্রমে পৈতৃক রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টার বিষয় বিচার্য্য। সে উপায় গর্হিত নয় বটে, কিন্তু বৎস! আমার বিবেচনায়, তাহাতেও তোমার সুখ-স্বচ্ছন্দতা বড় ঘটিবে না—তাহাতে পৈতৃকরাজ্য পাইবে না, একটা জায়গির পাইবে মাত্র! পৈতৃক সিংহাসন পাইবে না, জমীদারের গদি পাইবে মাত্র! তাহাতেও তোমার শত্রুরা নিরস্ত রহিবে না—অনবরত অনিষ্ট চেষ্টা করিবে—কাংরার এই সামান্য চাকরিতেই তাহার প্রমাণ জাজ্বল্যমান। ফল কথা, তুমি যে সুপ্রণালীতে রাজ্য শাসন কর, ইহা তাহাদের অসহনীয়। তোমার সুনামও যা, তাহাদের কলঙ্কও তা—তোমার যশঃ যে পরিমাণে বর্দ্ধনশীল ও স্থায়ী, তাহাদের অখ্যাতিও সেই পরিমাণে বর্দ্ধনশীল ও অনপনেয়। পার্শ্বাপার্শ্বি তাহাদের অধিকারে এত অত্যাচার—এত অবিচার; আর তোমার অধিকারে এত সদাচার—এত সুবিচার! কাজেই তুমি তাহাদের চক্ষুশূল হইবে আশ্চর্য্য কি? বিশেষ তাহাদের প্রজারা সুযোগ পাইলেই তোমার প্রজা হইতে ছুটিয়া আসিবে, সুতরাং যাহাতে তুমি অপদস্থ হও—যাহাতে পঞ্জাব রাজ্য তোমার বাসের পক্ষে অতুষ্ক হইয়া উঠে, তাহা তাহারা বিধিমতে করিবেই করিবে। বিশেষতঃ নানা কারণে তোমার সহিত তাহাদের গভীর মনোবাদ ঘটিয়া উঠিয়াছে। তবে যদি আরো কিছু কাল রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তুমি পুরাতন হইতে পার, তাহা হইলে বহুলাংশে সে বিবাদ মিটিতে পারে। কিন্তু তাহাও এরূপ শাসনকর্ত্তৃত্ব—এরূপ প্রজাপালন কর্ম্মে নয়। এরূপ কার্য্যে থাকিলে দুষ্ট মন্ত্রী ও কুশাসক কর্ম্মচারী মাত্রেরই ঈর্ষানল অতি প্রবল তেজে জ্বলিতে থাকিবে—সে আগুনে তোমাকে অনবরতই দগ্ধ হইতে হইবে—নানা ষড়যন্ত্রজালে বেষ্টিত

রহিয়া, আর কিছু না হউক, শান্তিসুখে নিয়তই বঞ্চিত থাকিতে হইবে এবং তোমার এমন যে সুমহৎ সরল স্বভাব, তাহা নিত্য নূতন প্রতিদ্বন্দ্বীতার প্রয়োজনে সারল্য-বর্জ্জিত, বৈরক্তি-মিশ্রিত ও অতৃপ্তিতে জড়িত হইয়া বিকৃত রূপ ধারণ করিবে। হায় বৎস! মহদন্তঃকরণের পক্ষে তাহা হইতে অধিক ক্ষতি আর কি? অতএব, অন্ততঃ আর কিছুকাল তচ্চেষ্টায় বিরত থাকিলে ভাল হয়। বিশেষতঃ রণজিৎ এখনই তোমার সে আশা পূরণ করেন কি না, তাহাতেও সন্দেহ আছে। যদিও তুমি রাজকার্য্যে বিশিষ্টরূপেই স্বামীধর্ম্ম, কৃতজ্ঞতা ও সুযোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছ, তথাপি আরো কিছু কাল আরো কিছু প্রদীপ্ত ভাবে সেই সব মহদ্‌গুণের স্থায়িত্ব দেখাইতে হইবে। তখন হয় তো বিনা আয়াসে বা অল্পায়াসেই মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারিবে।

তুলীন। প্রভো! আর এক কথা, আমার জন্মবৃত্তান্ত ও বংশ-পরিচয় কি প্রচার করিব? না, যেমন গুপ্ত আছে, এইরূপই থাকিবে?

যোগী। প্রচার করাই সর্ব্বতোভাবে উচিত। তাহাতে তোমার মিত্র মণ্ডলী পরমাহ্লাদিত হইবেন—তোমার জ্ঞাতি,কুটুম্ব, পিতৃ-সুহৃদ্বর্গ হারানিধির পুনঃ-প্রাপ্তিবং অসীম আনন্দ পাইবেন—তোমাকে প্রেমোৎফুল্ল হৃদয়ে স্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ করিবেন! তোমার ছিদ্রান্বেষী শত্রুপক্ষ তোমাকে ম্লেচ্ছজাতীয় বিদেশী বলিয়া আর তোমার উন্নতি পথে তেমন কণ্টক হইতে পারিবে না—বরং বিস্ময়ে অভিভূত ও লোক-নিন্দা-ভয়ে জড়ীভূত হইয়া কিয়দংশে নিরস্ত থাকিতেও বাধ্য হইবে!

তুলীন। কিন্তু মহারাজ পদান দানে কুণ্ঠিত ও ভীত হইতে পারেন।

যোগী। পারেন—এখন পারেন। সেই জন্যই পূর্ব্বে উপদেশ দিয়াছি, সম্প্রতি সে চেষ্টা স্থগিত থাকুক—অধুনা কেবল লীলার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে তাঁহার কার্য্য ও স্বীয় কর্ত্তব্য যেমন করিতেছ, তদ্রূপ করিতে থাক। তিনি সুচতুর, তিনি গুণগ্রাহী—তাঁহার বহু দোষ সত্ত্বেও তিনি মানবহৃদয়জ্ঞ—যৎকালে বুঝিবেন, তুমি পরীক্ষিত সুহৃদ—বিশ্বাসরক্ষাই তোমার ধর্ম্ম, বিশ্বাসভঙ্গ তোমার জীবনের অঙ্গই না, তখন আহ্লাদ পূর্ব্বক তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ এবং তোমাকে তোমার পৈতৃক রাজ্যে জায়গিরদার রূপে অধিষ্ঠাপন দ্বারা পুরস্কৃত করিবেন—হয় তো রাজোপাধি দানেও কৃপণ না হইতে পারেন!

বৎস। লীলার উদ্ধারের পরেই পঞ্জাব ত্যাগ করিয়া আপনার শান্তি-সুখে

সুখী হইতে তোমাকে উপদেশ দিতাম ; কিন্তু জানি, নিষ্কর্ম্মা ও নিশ্চেষ্টরূপে জীবন অতিবাহন তোমার ন্যায় বহুগুণ-সম্পন্ন প্রতিভান্বিত বীর পুরুষের পক্ষে মৃত্যু তুল্য কষ্টকর হইবে।' বিশেষ, কেনই বা এই তেজোদ্দীপ্ত স্বাস্থ্য-পূর্ণ যৌবনে জরাগ্রস্ত স্থবিরের ন্যায় কর্ম্ম-ভূমি পরিত্যাগ করিবে? সংসারে যিনি প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায়ও তো তাহা নয়! মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া সাধ্যানুসারে ভ্রাতৃ-সমাজের কার্য্যভার বহন করাই মনুষ্যত্ব ; তাহা না করিয়া স্বার্থ-সেবায় নিশ্চিন্ত রহিলে ইতর প্রাণীদের সহিত বিভিন্নতা কি? তাহাতে আরামও নাই, বিরামও নাই, সুখও নাই! ভগবান তোমাকে পুরুষার্থ-সাধক বিপুল শক্তি দিয়াছেন, তুমি স্বীয় আয়াসে সেই শক্তিকে যথোচিত-রূপে সুমার্জ্জিত করিয়াছ। মানব-সমাজের—বিশেষতঃ স্বদেশের হিতার্থ সেই শক্তি সঞ্চালনের সুযোগ পাইয়াও যথা-প্রয়োগ না করিলে মহা অপরাধ হইবে! এবং যেখানেই যাইবে—যেখানে গিয়াই সেই শক্তি চালাইয়া কর্ম্মে লিপ্ত থাকিবে, সেই খানেই তো এইরূপ পক্ষাপক্ষ—এইরূপ বিপক্ষতা—এইরূপ প্রতিযোগিতা—এইরূপ ঈর্ষাদি ভোগ করিতে হইবে ; তবে কেন এমন স্নেহ-বান প্রভু ও এমন উচ্চ পদ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র অনিশ্চিত নূতন পথা-বিষ্কারের নিমিত্ত অমূল্য সময়ের বৃথা অপব্যয় করিবে!

দুলীন আন্তরিক কৃতজ্ঞতা—বাক্যে যত না হউক, ভক্তিমাখা দৃষ্টিতে—জ্ঞাপন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন—সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিলেন—প্রত্যাগমন কালে উষার আলোকে তত কষ্ট হইল না!

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কারাগারে রণজিৎ।

দিবসত্রয় পরেই মহারাজ আইলেন—দুর্গ-বাহিরে ভেরী ধ্বনি হইল। দুলীন প্রস্তুতই ছিলেন। কিন্তু কিরূপ প্রস্তুত?

রাজপুরীর সভাগৃহ এবং মহারাজ ও প্রধানবর্গের বাসোপযোগী প্রত্যেক গৃহই সুসজ্জিত হইয়াছে—পুরী প্রভৃতির সংস্কার তো বর্ষে বর্ষে নিয়মিতরূপেই হয় ; এবারে আরো অধিক। বৃহৎ রাজপুরীর সম্মুখস্থ বিশাল প্রাঙ্গণ-ভূমির মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড এক কাঠগড়া, তদুপরি বিস্তীর্ণ সামিয়ানা ; সামিয়ানার

ভিতরের দিকে কিয়দংশে চাঁদোয়া—সে চন্দ্রাতপ বহুমূল্য, বিচিত্র, মণিদামে বিখচিত, মুক্তা-ঝালরে সজ্জিত। তাহারি নিম্নে উপযুক্ত স্থলে সিংহাসন ও তদুভয় পার্শ্বে আশ্চর্য্য কারুকার্য্যময় কাশ্মীরী শাল সদৃশ সুদীর্ঘ গালিচাদি বিস্তারিত। সিংহাসনের সম্মুখ হইতে উভয় পার্শ্বস্থ গালিচার মধ্য দিয়া রক্তবর্ণের সুন্দর মখমল সভার সীমা পর্য্যন্ত পাতা রহিয়াছে—তাহাই সভার মধ্যপথ। তথা হইতে দুর্গদ্বার পর্য্যন্তও রক্তবস্ত্র-মণ্ডিত বর্ম্ম। তদুভয় পার্শ্বে সুচারু পরিচ্ছদধারী হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠকায় পদাতিক ও অশ্বারোহী-শ্রেণী স্তবকে স্তবকে দণ্ডায়মান—তাহাদের সুমার্জ্জিত বন্দুক, কীরিচ, অসি,চর্ম্ম প্রভৃতি বাল-সূর্য্যের কিরণে প্রতিফলিত হইয়া চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ করিতেছে। প্রত্যেকের হস্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতাকা এবং দুর্গ-প্রাচীরের নানা স্থানে ও প্রতি প্রহরী-স্তম্ভের শিরে বৃহৎ বৃহৎ পতাকা পত পত শব্দে উড্ডীয়মান হইয়া কি চমৎকার শোভাই বিস্তার করিতেছে!

ফটকের অভ্যন্তরে প্রধান কর্ম্মচারিগণ সহিত দুর্গাধ্যক্ষ কাংরার শাসনকর্ত্তা কর্ণেল ডুলীন স্বয়ং মুক্ত-অসি-হস্তে দণ্ডায়মান। ফটকের বিশাল কবাটদ্বয় রুদ্ধ; কেবল এক খানির নিম্নদেশে যে একটী উপ-দ্বার আছে—যাহাতে একটী মাত্র মনুষ্য প্রবেশ করিতে পারে—স্থূলোদর হইলে তাহাও দুষ্কর! সেই ক্ষুদ্র কাটাদ্বার মাত্র মুক্ত আছে! ইহার তাৎপর্য্য স্বয়ং ভূপতি, আজিজুদ্দিন ও ডুলীন ভিন্ন অন্য কেহই বুঝিতে না পারিয়া সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইতেছে! এমন কি, যৎকালে মহারাজা জয়ন্তী গিরির পাদদেশে উপস্থিত হইয়া দুর্গের ক্রমোন্নত ঢালু পথে উঠিতেছিলেন, তৎকালে ঐ রুদ্ধ দ্বার লক্ষ্য করিয়া ছলাম্বেষী বৈরীপক্ষ প্রথমে আকার ইঙ্গিতে—ক্রমে অস্পষ্ট গালা ঘুবায়—শেষে স্পষ্ট বাক্যে বিদ্রোহিতার আভাস দিতে লাগিল—যাহাতে রাজকর্ণ-গোচর হয়, এরূপে আন্দোলন করিতেও ত্রুটি করিল না! কেহ কেহ বা আসন্ন বিপদাশঙ্কার ভাণ করিয়া অগ্রে একজন দূত প্রেরণের প্রার্থনা জানাইল!

রণজিৎ পার্শ্বস্থ ফকিরজীর মুখপানে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন—সে হাস্যের প্রকৃতি দেখিয়া প্রার্থনাকারী ভাক্ত হিতৈষী অপ্রস্তুত ভাবে পশ্চাৎপদ হইল! মহারাজ তাহার বাক্যের উত্তরে বরং হর্ষোৎফুল্ল দৃষ্টিতে সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া সানন্দ-স্বরে অপর পার্শ্বস্থ রাজা ধ্যান সিংহকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাঃ! বিবিধ পত্র-পুষ্পমালায় ও বিচিত্র বিচিত্র পতাকাদিতে ফটক দুইটি ও

ফটকের উভয় পার্শ্ব আর বুরুজ-প্রাচীর কি চমৎকার সজ্জিত হইয়াছে—সমস্ত দুর্গটী যেন বৈবাহিক উৎসবের স্থল বলিয়া বোধ হইতেছে !"

একজন নির্ব্বোধ নির্লজ্জ পারিপার্শ্বিক তথাপি টীট্কারির স্বরে বলিল "কিন্তু ফটক বন্ধ রহিয়াছে !"

ভাবুক সেনা সিংহ উত্তর করিলেন "ভয় হয় তো একটু পিছাইয়া আসুন—যে ফুলের কামান, ফুলের বাণ ও পতাকার পাহারা সাজান রহিয়াছে, আপনার ন্যায় বীর যুবা পুরুষের ভয় পাওয়া অস্বাভাবিক নয় !"

অনেকে হাস্য করিল—মহারাজাও মৃদু হাসি হাসিলেন ! এইরূপ রঙ্গরস করিতে করিতে মহারাজ সগণে ক্রমে দ্বার দেশে উপস্থিত। ঘোর রবে ভেরী নিনাদিত হইল—পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিল !

তথাপি দ্বার মুক্ত হইল না !

মহারাজ পুনশ্চ ফকিরজীর মুখ চাহিয়া হাসিলেন ! ফকিরজীও সহাস্যে বিনীত স্বরে কহিলেন "কর্ণেল সাহেব যথার্থই সামরিক নিয়ম আর অলংঘনীয় রাজাদেশ-প্রতিপালক !"

তখন সকলেই বুঝিলেন, রাজ-পথ-রাহিত্যের অবশ্যই নিগূঢ় কারণ আছে !

তখন রণজিৎও বুঝিলেন, পরীক্ষা দেখা যথেষ্ট হইয়াছে—সহস্র ভেরী-ধ্বনিতেও পথ পাইবেন না—ঢুলীন টলিবার লোক নন !

তখন মহারাজ সেই ক্ষুদ্রোপদ্বারের ছিদ্র মধ্যে মাথা গলাইলেন—তাহাতেও দ্বার মুক্ত হইল না—আবার মস্তক বাহির করিয়া আবার গলাইলেন—তাহাতেও হইল না—পুনর্ব্বার তাই করিলেন !

অমনি অভ্যন্তরস্থ সহস্র সহস্র কণ্ঠ-নিঃসৃত গগন-ভেদী মহোচ্চ জয়নাদের সহিত বিরাট কবাটদ্বয় বিকট শব্দে মুহূর্ত্তে মুক্ত হইল—যেন বাজীকরের একটা ভেল্কি খেলা হইয়া গেল !

মহারাজ পথ পাইলেন—প্রসন্ন বদনে প্রবেশ করিলেন ! ঢুলীন নম্র ভাবে কুর্ণিস করিয়া করস্থ মুক্ত অসিখানি প্রভুকে অর্পণ করিলেন—মহারাজের নয়নে আনন্দজ্যোতিঃ বিভাসিত হইল ! সুপ্রসন্নভাবে সেই অসি স্পর্শ পূর্ব্বক বাহু প্রসারণে ঢুলীনকে স্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন—ঢুলীনের বহু-বর্ষব্যাপী স্বামী-ধর্ম্ম-পালন, বিশ্বাস-ধর্ম্ম-পালন, কৃতজ্ঞতা-ধর্ম্ম-পালন সার্থক হইল—কোটি মুদ্রা পাইলেও তাঁহার এত অসীম আনন্দ হইত না !

"জয় মহারাজকি জয়!" "জয় গুরুজীকি জয়!" "জয় ঢুলীন সাহেবকি জয়!" সৈনিক ও দর্শকগণ ইত্যাকারের মহোচ্চ জয়নাদ ছাড়িল!

ঢুলীনকে স্বীয় পার্শ্বে লইয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে করিতে মহারাজ রণজিৎ সভায় গমন পূর্ব্বক চন্দ্রাতপ-তলস্থ সিংহাসনারোহণ করিলেন। ঢুলীন প্রত্যেক প্রধানকে স্বাগত সম্ভাষণাদির সহিত অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে যাঁহার যে যোগ্যস্থলে সকলেই সভাস্থ হইলেন।

তোরণ প্রবেশ মাত্র একবার একাধিক শতসংখ্যক তোপধ্বনি হইয়াছিল, এখন আবার তাহাই হইল!

মহারাজ সিংহাসনোপবিষ্ট হইলে ঢুলীন রৌপ্য-থালে স্বর্ণ মুদ্রাদি নজরানা ধরিলেন। পূর্ব্ব নির্দ্দেশানুসারে ও তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে কাংরা প্রদেশের ভূম্যধিকারিগণ সকলেই নতি পূর্ব্বক তদ্রূপ উপঢৌকন প্রদান করিলেন—ঢুলীন একে একে প্রত্যেককে মহারাজার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। পরে দুর্গস্থ ও ঢুলীনগঞ্জস্থ শ্রেষ্ঠী, ব্যবসায়ী, বণিক মণ্ডলী প্রচুর স্বর্ণ-রজতোপহার উপস্থিত করিলেন—তাঁহারাও ঐরূপে পরিচিত হইলেন! তাঁহাদের অধিকাংশই প্রচুর ধনেশ্বর—তাঁহাদের বাণিজ্য কুঠি ও মহাজনী কাজ ভারতবর্ষময় ব্যাপ্ত—কাহার বা ভিন্ন দেশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ—তাঁহারা ঢুলীনের সুপালনে পরম সুখী ও ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল—তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থ-ভেটের পরিমাণও তাঁহাদের সন্তোষানুয়ায়ী প্রচুর!

রণজিতের স্বীয় সাম্রাজ্য-পর্য্যটন কালে আর কুত্রাপি এরূপ অপরিমেয় নজরানা কখনই সংগৃহীত হয় নাই—এরূপ আত্ম সন্তোষে, আত্ম-ইচ্ছায়, এরূপ ব্যবসায়ী লোক এরূপে সারবান কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ আর কখনই করে নাই—অনিচ্ছাতেই মাশুল ও চুঙ্গী যাহা দিত, এই পর্য্যন্ত! নজরানার স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রা রাশিকৃত হইল—বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরী প্রভৃতি আভরণও তৎসঙ্গে চাকচিক্য প্রকাশ করিতেছে দেখিয়া, ভূপতির দৃষ্টি ও বদনমণ্ডল অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রসন্নতা ও সন্তোষ-দ্যুতি ধারণ করিল! যে রণজিতের মনোগত ভাব, আনন দেখিয়া সহজে কেহ অনুভব করিতে পারিত না, আজি সেই অদ্বিতীয় ভাব-গোপনক্ষম রণজিৎও অন্তরের উল্লাস অপ্রকাশ রাখিতে সমর্থ হইলেন না—বোধ হয়, চেষ্টাও করিলেন না!

কাংরার শাসনকর্ত্তা আর একটী নব প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন—একজন

সুসজ্জিত সুশ্রী মুন্সি-বালকের হস্ত দিয়া একটী রৌপ্যাধারে একখানি স্থূল পত্র রাজসমক্ষে উপস্থিত করাইলেন। রাজেঙ্গিতে ফকিরজী সেই লিপিখণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া বলিলেন "এখানি শাসন-কর্ত্তার বিজ্ঞাপন।"

চতুর মহারাজ বুঝিলেন যে, ইহাতে গোপনীয় কথা অবশ্যই নাই ; অতএব আহ্লাদ পূর্ব্বক সভাস্থলে পাঠের আদেশ দিলেন।

ডুলীন্ সেই বিজ্ঞাপনী মধ্যে আত্ম-শাসন-কালের সমুদয় রাজকীয় ঘটনা ও শাসিত দেশের অবস্থাদি চূর্ণক রূপে, সংক্ষেপে ও পরিষ্কার ভাবে সমুদয়ই বিবৃত করিয়াছেন। অথচ তাহার কোন অংশেই আত্ম-গরিমার লেশ মাত্রও নাই—ইটী তাঁহার পরম শত্রুরাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল!

তদানুষঙ্গিক নানা প্রসঙ্গে ও অন্যান্য বিষয়ে কিয়ৎক্ষণ প্রশ্নোত্তর, কথোপকথন এবং হাস্য পরিহাসাদি চলিয়া সভাভঙ্গ হইল। সকলেই স্ব স্ব বাসস্থানে গমন পূর্ব্বক স্নানাহারে নিযুক্ত হইলেন। ডুলীনের সুব্যবস্থাতে ও শিষ্টাচারে সকলেরই মহা সন্তোষ জন্মিল। বহু সহস্র সংখ্যক রাজানুচর ও সৈনিকগণ,যাহারা দুর্গ বাহিরে ও অভ্যন্তরে ছাউনি করিয়াছিল,তাহাদের প্রতিও সমুচিত আতিথ্য-বিধানে অণুমাত্র ত্রুটি হইল না। আজি চৈতনের ব্যস্ততার সীমা নাই—রজনী ঘোরা না হইলে আর তিনি সে দিন স্নানাহ্নিকের অবসর পান নাই!

অপরাহ্নে মহারাজ স্বীয় সভাসদমণ্ডলী ও ডুলীন সমভিব্যাহারে দুর্গের অভ্যন্তরস্থ নগর ও বুরুজাদি পরিদর্শনে বহির্গত হইলেন। নগরে প্রতি পুর-দ্বারে সপল্লব পূর্ণকুম্ভ ও পুষ্পমালা ; প্রধান বর্ত্মের স্থলে স্থলে ফল-পুষ্প-পত্র-পল্লবাদি-শোভিত বিজয়-তোরণ ও নহবৎ; প্রতি পল্লীতে পুরস্ত্রীবর্গের সাহানা-গীতি ; সুন্দরী কুমারীগণ-কর্ত্তৃক পুষ্পাঞ্জলি ও লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ এবং মধ্যে মধ্যে হুলুধ্বনি ও জয়ধ্বনি ইত্যাদি দর্শন, শ্রবণ ও উপভোগ করিয়া মহারাজা মহা সুখী! পারিষদগণের মুখ চাহিয়া বাক্যেও সে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন!

পর দিন জয়ন্তী ও ডুলীনগঞ্জ প্রভৃতি দর্শন করিলেন। ডুলীনগঞ্জেও সেইরূপ উল্লাস ও জয়তরঙ্গ! যে কয়দিন কাংরায় ছিলেন, প্রত্যহ বৈকালে এইরূপে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেন। সমস্ত পর্য্যবেক্ষণের ফল আশাতিরিক্ত-রূপে সন্তোষজনক হইল। গ্রাম ও নগরের অধিবাসীদের সুখস্বচ্ছন্দতা ; কৃষক বৃন্দের সৌভাগ্য ও সন্তোষ ; ক্ষেত্রে নানাবিধ শস্য ; পতিত ভূমির উদ্ধার ; হট্ট বাজার গঞ্জে ক্রেতা-বিক্রেতাদির জনতা ; পণ্যদ্রব্যের বৈচিত্র্য ও

প্রাচুর্য্য ; বিপণি-শ্রেণী ও পথ ঘাটাদির পারিপাট্য ও শৃঙ্খলাদি এবং প্রজাবৃদ্ধি দর্শনে মহারাজ মহা মহা তুষ্ট !

একদা ছুলীনগঞ্জের প্রধান বর্ত্ম দিয়া—আহার্য্য ব্যবহার্য্য নানা পণ্য ও নানা রত্নরাজি-সম্পন্ন সুবিস্তীর্ণ পণ্য-বীথিকা-শ্রেণীর মধ্য দিয়া—যাইতে যাইতে যখন গঞ্জের তাবল্লোক বর্ত্মের উভয় পার্শ্বে সারি দিয়া দাড়াইয়া অভি-বাদন ও জয়োচ্চারণ করিতে লাগিল, তখন তাহাদের পরিপুষ্ট দেহ, প্রফুল্ল বদন, সুন্দর বেশভূষা ও দোকান-শ্রেণীর ঐশ্বর্য্যাদি দেখিয়া মহারাজ হর্ষোৎ-সাহে রাজা ধ্যান সিংহকে বলিলেন "কেমন রাজাজি, দেখিয়া চক্ষু জুড়ায় না ? এ সব কি অন্যান্য শাসনকর্ত্তার ন্যায় আমার আগমনকালে তাড়াতাড়ি সাজা-ইয়া দেখানো বোধ হয় ? আমার মনে তো তেমন লা'গ্‌ছে না—না, না, এ সব ঝুটা না, এ সব খাটি সাঁচা। হায়, হায়, আর সকল স্থানে যদি এমন দেখিতে পাই—কাশ্মীর যদি এমন হয় !"

রাজা ধ্যান সিংহের মুখভঙ্গী বিকারগ্রস্ত হইবার নয়, তাই হইল না ! কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা খোসাল সিংহ যেন সে কথা শুনিতে পান নাই, এমনি ভাব দেখাইতে চেষ্টা পাইলেন—কিন্তু তাঁহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল !

ফকির আজিজুদ্দিন শান্তি-প্রিয় ; তিনি অকৌশলের প্রসঙ্গ উড়াইয়া দিয়া রঙ্গ রসোৎপাদন মানসে মৃদুহাস্যে বলিলেন "বাদিয়া নগরে মন্দ দেখা যায় নাই !"

মহারাজ হাসিয়া উঠিলেন—সকলেই হাসিলেন—মহারাজ কহিলেন "হাঁ সে এক কাব্য বটে—সন্ধ্যায় পৌঁছিব, প্রত্যূষে চলিয়া যাইব, ইহাই স্থির ছিল। বাদিয়ার শাসনকর্ত্তা তাই ভোজবাজির ন্যায় রাস্তার দুই ধারে রাতারাতি খুব লম্বা মাটির দেয়াল গাঁথাইয়া মধ্যে মধ্যে বিস্তর দরজা জানালা বসাইয়া বিচিত্র চিত্রকরা কাগজ দিয়া সাজাইয়াছে ; দেখিতে ঠিক যেন দীর্ঘ বাজার ও বসতি হইয়াছে ; বিস্তর লোকজন আনাইয়াছে, তাহারা যেন কেনা বেচা করিতেছে ; লতা পাতা ফুলের মালায় সর্ব্বাংশ উত্তমরূপে সাজাইয়া ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—কত নিশানই ফর ফর করিয়া উড়িতেছে—কত বাজনাই বাজি-তেছে—কত সুন্দরীই সুহেলিয়া গাইতেছে ! কিন্তু ঘটনাক্রমে পর দিন আমার থাকা হইল—বাদিয়ার বাজার বাদিয়ার বাজির ন্যায় ভুস করিয়া উড়িয়া গেল ! এ কিন্তু রাজাজি, তা নয় !"

ফলতঃ কাংরায় যে সেরূপ কারসাজির বাজার, বসতি, শ্রীবৃদ্ধি নয়, তাহা

মহারাজও বুঝিলেন—সকলেও বুঝিলেন—বৈরিপক্ষও স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং তজ্জন্য ঈর্ষানলে আরো পুড়িতে লাগিলেন!

* * * * * *

জুলীন গুলাপীর মুখে মহারাজার দূষিত আমোদ আহ্লাদের কথা বিস্তর শুনিয়াছিলেন; কিন্তু যখন তিনি লাহোরে, তখন স্বচক্ষে কিছুই দেখেন নাই, বা দেখিবার সুযোগ পান নাই। এখন নিজে অতিথি-পরিচর্য্যার কাজে নিযুক্ত—এখন সকলই দেখিতে শুনিতে পাইলেন। ফলতঃ নিশাকালে রাজকীয় গাম্ভীর্য্য ও পদগৌরব এককালে বিদূরিত হইত—জঘন্য নাচ তামাসা পরিহাসের তরঙ্গ উঠিত—সুরা-স্রোতের সঙ্গে ভয়ানক বিভৎস-রস প্রবাহিত হইত! মহারাজ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুরা পান করিতেন; অথচ এমনি আশ্চর্য্য ক্ষমতা, সর্ব্বাপেক্ষা স্থির-মস্তিষ্ক থাকিতেন—নিজে কিছুমাত্র উন্মত্ত বা উত্তেজিত হইতেন না—কেবল অপরাপরকে মাতাইয়া রঙ্গ দেখিতেন!

এসব বীভৎস-রসাশ্রিত ঘৃণিত কাণ্ডের ইঙ্গিত ব্যতীত বিস্তারিত বর্ণনা আমার অভিপ্রেত নয়।

* * * * * *

জুলিন নিভৃতে ফকিরজীর নিকট আত্ম-জন্মবৃত্তান্ত, আত্ম-প্রেম-বৃত্তান্ত, আত্ম-মনের অবস্থা ও প্রাণের বাঞ্ছাদি সমুদয়ই মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিলেন। ফকিরজী জুলীনকে যথার্থই ভালবাসিতেন—সাহায্য প্রদানের সম্পূর্ণ আশা দিলেন। তাঁহার চির-অভ্যস্ত রূপকের ভাষায় "ধার্ম্মিকের প্রথম কষ্ট হইলেও শেষ-সুখ ও শেষ-জয় অবশ্যম্ভাবী" ইত্যাদি ধর্ম্মনীতিমূলক তত্ত্ব সমর্থন পূর্ব্বক পরে কাজের কথায় বলিলেন "চিন্তা করিও না; তোমাকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করি এবং তোমাকে কোন গূঢ় কথা বলিলে দ্বিতীয় কর্ণে যাইবে না, তাহা জানি; এই জন্যই খুলিয়া বলিতেছি যে, ধ্যান সিংহ মনে করেন, তিনিই গুপ্তচর দ্বারা সকলের সংবাদ রাখেন, তাঁহার গুহ্য কথা কেহই জানে না; কিন্তু ইটী তাঁহার ভ্রম—তাঁহার অনুচরগণ মধ্যেও আমার গুপ্তচর আছে—রাজকোটের প্রধান কর্ম্মচারী চণ্ডুলাল মুন্সি, সে আমার প্রধান চর—সে আমার বিশেষ অনুগত—আমি তাহার দ্বারাই সব জ্ঞাত আছি—তাহার দ্বারাই তোমার কার্য্য সাধন করিব!"

জুলীনের মুখ শুষ্ক হইল—প্রেমিকের মন—বিরহীর প্রাণ কি অমন ঢালা

কথায় সান্ত্বনা পায়—সন্তৃপ্ত হয়? বিশেষতঃ ধ্যান সিংহের মুন্সিকে বিশ্বাস-দ্রোহ ও প্রভুদ্রোহিতায় নিযুক্ত করা, তাঁহার ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, সুতরাং সে চিন্তায় তিনি মলিন হইলেন! তাহাকে আনন্দ বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বিরত দেখিয়া আজিজুদ্দিন আশ্চর্য্য ভাবিয়া ক্ষুণ্ণ ভাবে বলিলেন "কেন, রাজপুত্র! কোন উত্তর দিলে না যে?"

ফুলীন বিনীত ভাবে আন্তরিক বাধ্যতা স্বীকার ও অতি কুণ্ঠিতের ন্যায় ক্ষমা ভিক্ষার পর ঐরূপ উপায় অবলম্বিত না হয়, ইহারি প্রার্থনা সাগ্রহে জানাইলেন। ফকিরজী আরো আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তথন বিস্তর জিদ ও অনুরোধ করিয়া নিগূঢ় কারণটা না শুনিয়া ছাড়িলেন না। প্রকৃত আপত্তির প্রকৃত হেতুটী জ্ঞাত হইয়া সহর্ষ-বিস্ময়ে কিয়ৎক্ষণ ফুলীনের মুখপানে নিস্তব্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন—ভাবখানি যেন মনে মনে আরো সংস্রগুণে তাঁহার প্রতি ভক্তিমান ও অনুরাগী হইয়া তাঁহার প্রণয়ে নিতান্তই বশীভূত হইয়া পড়িলেন! শেষে সে ভাব বাক্যেও ব্যক্ত করিতে ক্ষান্ত হইলেন না; কিন্তু দৃষ্টিতে যত, কথায় তত পারিলেন না। যাহাকে অবাক্ বলে, তাহাই হইয়াছিলেন! পরে বলিলেন ;—

"প্রিয় সুহৃদ! যাহা বলিলে, ইহাই ঠিক—যাহা ভাবিয়াছ, তাহাই সার—অন্য সকলই অসার! আমরা নিতান্তই ভ্রান্ত, তাই পার্থিব লালসায় স্বর্গীয় পদ হারাই—ধর্ম্মের ভেক লইয়া বেড়াই—ধর্ম্মের ভাণে লোক ঠকাই, কিন্তু ঠকি নিজে! রত্ন ভ্রমে কাচ ধরি, বড়াই করি, হায় হায় স্বেচ্ছায় মরি! হায় বন্ধু, আজ বুঝিলাম, সরল সত্যকে জীবনের আদর্শ আর অকপট ন্যায়াচরণকে জীবনের অটুট নিয়ম করি না বলিয়াই ইহকালে এত কষ্ট পাইতেছি এবং পরকালেরও মাথা খাইতেছি! তুমিই ধন্য, চতুর্দ্দিকে এত শত শত অসাধারণ প্রলোভন, এত কুদৃষ্টান্ত, এত কুসংসর্গ, এত বৈরসাধনের প্রয়োজন, তবু আপন ধর্ম্ম-দুর্গকে অভেদ্য রাখিতেছ! ধন্য ফুলীন, তুমিই ধন্য! তুমিই ধর্ম্ম-গুরু! এমন গুরুতর ও প্রিয়তর স্বার্থ-সাধন কালেও তোমার জীবনের লক্ষ্য অলংঘ্য, তোমার ধর্ম্মানুরাগ অটুট রহিল! ধন্য পুরুষ! দেখিবে, ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা করিবেন—সর্ব্ব শুভদাতা পরম পিতাই তোমার সহায় হইবেন—তিনিই তোমার কার্য্যসাধন করিয়া তুলিবেন—আমি কে? তথাপি যথাসাধ্য উপলক্ষ হইতে চেষ্টা পাইয়া জীবন সার্থক করিব—সুযোগ প্রাপ্তি

মাত্র মহারাজকে নিবেদন করিব—তাঁহার দ্বারাই তোমার লীলার উদ্ধার হইবে—অন্য বক্রপন্থা পন্থাই নয়—আ'জ্ বুঝিলাম, সে সব কিছুই না! (ক্ষণ চিন্তার পর) তবে মুন্সিকে এই ভাবে লিখিব, যেন তোমার লীলা এবং রাণী-জীকে বিশেষ যত্নে রক্ষা করে; সে যেন তাঁহাদের মুক্তির আশা দিয়া তাহাদিগকে সুস্থ রাখিতে চেষ্টা পায়; সে যেন বিশ্বাসঘাতিতা ব্যতীত অন্য কোন সাধনে, যদি মুক্তি সাধন করিতে পারে, তৎপক্ষে ত্রুটি না করে—অন্ততঃ তাহার প্রভু-কর্ত্তৃক মোচনাজ্ঞা হইবা মাত্র যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে ও যত্নে তাঁহারা প্রেরিত হন, তাহার উপায় করে; তদুদ্দেশে তোমার ছদ্মবেশী আক্রাম ও ধন্নুর সহিত বন্দোবস্ত করে। তুমিও তোমার সেই প্রিয় ভৃত্যদ্বয়কে লিখিয়া পাঠাও যে, তাহারা গোপনে মুন্সীজীর সহিত আলাপ করে।"

ডুলীন যেন হাত বাড়াইয়া চাঁদ পাইলেন, ঠিক এমনি ভাবে ব্যগ্রতম ও উগ্রতম উল্লাস, কৃতজ্ঞতা ও বাধ্যতা প্রকাশ করিলেন!

যোগীবরের ন্যায় ফকিরজীও তাঁহার জন্ম-কাহিনী প্রচারার্থ পরামর্শ দিলেন এবং নিজেই অগ্রে মহারাজকে বলিয়া, পরে সকলের নিকট প্রকাশ করিবার ভারগ্রহণ করিলেন। ডুলীন অনেকটা সুস্থ হইলেন।

একদা সভামধ্যে রাজা ধ্যান সিংহকে সম্বোধন পূর্ব্বক মহারাজা মহা বৈরক্তির সহিত সহসা বলিলেন "রাজাজি! এ বড় লজ্জার কথা এবং অত্যাচারীর স্পর্দ্ধাও সামান্য নয় যে, রাজা অনুহাদের স্ত্রী কন্যাকে কাংরা হইতে গোপনে হরণ করিয়া গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া তাহাদিগকে যন্ত্রণা দিতেছে! ইহা কি যেমন তেমন লোকের কাজ? অবশ্যই দরবারের অনুগ্রহের প্রশ্রয় পাইয়া মদগর্ব্বে ফুলিয়া উঠিয়াছে, এইরূপ কোন দুর্দ্দান্ত-দস্যুদলপতি ভিন্ন অন্য কাহার ঘাড়ে দুটা মাথা যে এত দূর অত্যাচার করিয়া বাঁচিতে পারে? বিশেষ কর্ণেল ডুলীন সাহেব—আ! এখন আর সাহেব নয়, এখন সুদান-রাজপুত্র—সরকারের অতি বিশ্বাসী প্রিয়পাত্র; তাহার সহিত যে কন্যার সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, সেই বালিকা ও তাহার মাতাকে চাতুরীতে বা বলপূর্ব্বক স্থানান্তর করা সহজ অপরাধ নয়! এমন দুঃসাহসিক কাজ যে করিতে পারিয়াছে, তাহার অকরণীয় কিছুই নাই! অতএব রাজাজি, আমি তোমার উপর ভার দিতেছি, তুমি যেরূপে পার তাহাদের খুঁজিয়া বাহির কর। আমি এই সর্ব্ব সমক্ষে

প্রতিজ্ঞা করিতেছি, রূপাড়ে দুলীনের যাত্রা করিবার পূর্ব্বে সেই দুই মহিমান্বিতা স্ত্রীলোককে দুলীন যদি না পায়, তবে অপরাধী যে কেউ হউক, তাহার সর্ব্বনাশ নিশ্চিত—আর অধিক বলিতে চাহি না!" রাজাজী নত-শিরে "যে আজ্ঞে" যেন বলিলেন!

সেই দিন মধ্যাহ্নে রাজা ধ্যান সিংহ মহারাজার বিশ্রাম-গৃহে গমন পূর্ব্বক নিজের বিশেষ কার্য্যানুরোধে একবার বাটী যাইবার প্রয়োজন জানাইয়া কয়েক দিবসের নিমিত্ত বিদায় প্রার্থনা করিলেন। রণজিৎ সম্মত হইলেন, কিন্তু কেবল পাঁচ দিনের জন্য—বেশী সময় দিলেন না।

* * * *

ফকিরজী দুলীনের সহিত পুনঃ পুনঃ বিরলে বসিয়া রাজকীয় নানা প্রসঙ্গের মতামত স্থিরীকরণ ও দুলীনের নিজের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত পরামর্শের কথোপকথনে নিযুক্ত রহিতেন। এ সকলের অধিকাংশই যে মহারাজার নিয়োগে বা অভিপ্রায়ানুসারে বিচারিত ও মীমাংসিত হইত, তাহাও দুলীন বুঝিতে পারিতেন। যাহা যাহা স্থিরীকৃত হইল, তত্তাবৎ পরে প্রকাশ্য। আপাততঃ এই বলিলেই যথেষ্ট যে, স্বগণ ও স্বসৈন্য সমভিব্যবহারে দুলীনকে যথা সময়ে রূপাড় যাত্রা করিতেই হইবে; যাত্রার মধ্যে লীলাকে পান ভালই, নচেৎ পথিমধ্যে যাহাতে লীলার সহিত মিলন ঘটে, সেইরূপ ব্যবস্থা করা হইবে।

রূপাড়ে দুলীন-সৈন্য যে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শনে সমর্থ হইবে, ইহা একপ্রকার জানাই ছিল, তথাপি নিঃসন্দেহে তন্নিরূপণার্থ মহারাজা তাহাদের যুদ্ধাভিনয় দেখিতে চাহিলেন। তদুদ্দেশে মহা সমারোহ হইল। মহারাজা পারিষদ্‌বর্গ সহিত অশ্বারোহণে সমর-সজ্জায় স্থিত; তাঁহার সমক্ষে কাংরার সর্ব্বপ্রকার সৈনিক বিভাগের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সামরিক ক্রিয়াভিনয় এত উচ্চ ধরণে প্রদর্শিত হইল যে, রণজিৎ হর্ষোৎসাহ-বেগ-সম্বরণে অসমর্থ হইয়া দুলীনকে সৈন্য-শির হইতে আহ্বান করিয়া গাঢ় স্নেহালিঙ্গনে গৌরবান্বিত করিলেন! পরদিন পুনর্ব্বার মহা সভা করিয়া উচ্চ ধাতুর খেলাত সহিত দুলীনের পদোন্নতি করিয়া দিলেন—দুলীন এখন কর্ণেল ঘুচিয়া "ব্রিগেডিয়ার জেনারেল" অর্থাৎ চমূ-পতি হইলেন! দুলীনের প্রার্থনা মতে তাঁহার প্রিয় সহকারিগণের মধ্যে অনেকেই প্রকাশ্যরূপে নানাবিধ পারিতোষিক, পদোন্নতি ও রাজ-প্রসন্নতা লাভ করিল।

পরদিন মহারাজ সকল লোকের পরিতোষ ও জয়ধ্বনির সহিত সগণে প্রস্থান করিলেন। তুলীন বহুদূর সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। বিদায়কালে তুলীনের নয়ন আনন্দ বাস্প-ভারাক্রান্ত হইল—ফকিরজীর সহিত আলিঙ্গন কালে উভয়েরই সজল নয়ন দৃষ্ট হইল!

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মুক্তি।

শরতের দিবা অবসান-প্রায়,এমত সময়ে এক দল অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য নব-নির্ম্মিত রাজকোট দুর্গাভিমুখে যাইতেছে। তাহাদের নানা বর্ণের মূল্যবান বেশ ভূষা। তাহাদের অসি চর্ম্ম ফলকাদিতে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রক্ত-বর্ণ-রশ্মি প্রতিবিম্বিত হইয়া কি চমৎকার চাকচিক্য-ময় শোভা বিকাশিয়া নয়ন ঝলসিতেছে! তাহারা নানা জাতীয়—হিন্দু, শিখ, মুসলমান, পাহাড়িয়া ও পূরবিয়া। কিন্তু সকলেই যেন সৌভ্রাত্র বন্ধনে বদ্ধ—এমনি মিল! তাহারা সংখ্যায় পাঁচশত হইবে। তাহাদের সঙ্গে ভার-বাহক ও অন্যবিধ নিরস্ত্র ভৃত্যাদিও অনেক। তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি দর্শনে বোধ হইতেছে, তাহারা সামান্য জনের অনুচর নয়—তাহাদের গর্ব্ব-বিস্ফারিত দৃষ্টি ও উদ্ধত ভঙ্গী। তাহাদের প্রধান সর্ব্বাগ্রে গমন করিতেছেন। যাহারা তাঁহার নিতান্ত সন্নিহিত, তাহাদেরই বদনে যাহা কিছু নম্র গাম্ভীর্য্য দেখা যাইতেছে; নতুবা পশ্চাদ্বর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী আর সকলের মুখে উচ্চতর হাস্য পরিহাস। তাহাদের রসরঙ্গের তরঙ্গ দেখিয়া অনায়াসেই বুঝা যায়, তাহারা পুষ্ট বেতন ও উপরিগণ্ডা পাইয়া সর্ব্বদাই হৃষ্ট ও পরিতুষ্ট!

প্রধানের অশ্বটী অতি তেজস্বী ও সর্ব্বাংশে মনোহর—সে অশ্বের সজ্জাও বহুমূল্য। ছত্রধারী তাঁহার শিরে স্বর্ণ-মুক্তা-খচিত একটী বৃহৎ রেশমী ছত্র বক্রভাবে হেলাইয়া ধরিয়া যাইতেছে; তাঁহার উভয়পার্শ্বে ময়ূরপুচ্ছ ও চামরের বীজন চলিতেছে; তাঁহার সুন্দর বদনে মণি-মণ্ডিত প্যাঁচাও নল সংলগ্ন রহিয়াছে—এক কিঙ্কর সোণার আলবোলা,অপর দাস নলটী ধরিয়া যাইতেছে—তিনি এক একবার টানিতেছেন, এক একবার সুচারু সূক্ষ্ম ওষ্ঠদ্বয় মুখ-নল হইতে সরাইয়া পার্শ্বগামী ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছেন—কণ্ঠস্বর কি মিষ্ট!

সেবিত তাম্রকূটের ধূম্ররাশি চতুর্দ্দিকে কি মিষ্ট গন্ধই বিস্তার করিতেছে! তাঁহার বেশ ভূষাতে বিপুল অর্থরাশি ও নানা দেশীয় শিল্পীর হস্ত লক্ষিত হইতেছে—তাঁহার সজ্জা-প্রণালী অর্দ্ধ দেশীয়, অর্দ্ধ ইউরোপীয়! তাঁহার কটিবন্ধ হইতে হীরা-চুণি-মণি-খচিত একখানি অনতিদীর্ঘ হিরণ্য-অসি-কোষ লম্বমান ভাবে অশ্বপৃষ্ঠে নৃত্য করিতেছে! গমন-বেগ প্রখর নয়—বোধ হয় রাজকোটের নিকটে আসিয়া শিথিল করিয়াছেন।

তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল গৌর—সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য বেশ পরিলে ফরাসী বলিয়া বা ইটালীয় বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে! তিনি দীর্ঘাকার নন, খর্ব্বও নন, মধ্যবিধ; তাঁহার প্রত্যঙ্গগুলি ক্ষুদ্র নহে, অথচ সর্ব্বাঙ্গের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য। তাঁহার ভ্রমর-কৃষ্ণ উজ্জ্বল নয়নের দৃষ্টি এত তীব্র যে, সর্ব্বপ্রবেশক বলিলেও বলা যায়; অথচ মাধুর্য্য-মাখা—বিলাসিনী-নেত্রবৎ ঢল ঢল করিতেছে! তাঁহাকে দেখিবা মাত্রই মহদ্বংশীয় বলিয়া বোধ হয়—এক কথায়, তাঁহার মূর্ত্তি যেন রাজ-মূর্ত্তি! কিন্তু জগতে কিছুই নিখুঁত হইবার নয়, সুতরাং তিনি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সুশ্রী পুরুষ হইলেও তাঁহার একটী অঙ্গে বিশেষ হীনতা আছে—অশ্বপৃষ্ঠে তাহা লক্ষিত না হইলেও, জানা আছে, তাঁহার একখানি পা কিছু খোঁড়া—অতি সামান্যরূপেই ঈষৎ খঞ্জ।

এক ব্যক্তি প্রভুর কিঞ্চিৎ পশ্চাতে যাইতেছিল, প্রধান তাঁহাকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে আরো নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক আর সকলকে—সেবকগণকেও পশ্চাতে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। আহূত প্রিয় কর্ম্মচারী প্রভুর পার্শ্বাপার্শ্বি স্বীয় অশ্বকে আনিয়া আদেশ শ্রবণে প্রস্তুত হইল। এ ব্যক্তি যে অসির পরিবর্ত্তে মসির কার্য্যে অভ্যস্ত, তাহা তাহার আকার প্রকার বেশ ভূষায় অনায়াসে উপলব্ধ হয়। তাহার খর্ব্ব দেহ, সুগোল গঠন ও ক্ষুদ্র চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দর্শনে প্রথমেই বোধ জন্মে, লোকটা যেন ভাল নয়—বড় ধূর্ত্ত; কিন্তু পরক্ষণেই তাহার বাক্য-বিন্যাসের সারল্য-ছটায় মনে হয় যে, "না ভুল হইয়াছে!" কিন্তু নিপুণ দেহ-লক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতেরা সে ভুল স্বীকার করেন কি না, বলিতে পারি না! তিনি নিকটস্থ হইলে এবং আর সকলে পশ্চাতে গেলে, তাঁহার প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—

"চণ্ডুলাল! কল্য তিনি কি বলিয়াছিলেন, বলিতেছিলে?" এই প্রশ্নটী যেন অতি সহজ কথা কহিবার ধরণেই বলিলেন, কিন্তু "তিনি" শব্দের উপর

যেরূপ জোর দেওয়া হইল, তাহাতেই ইহার বিশেষ গুরুত্ব যে আছে, এমত বুঝায়।

চণ্ডু। হুজুর! আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, তিনি বলিলেন যে, "মহারাজ রণজিৎ সিংহ কেবল সুযোগের অপেক্ষা করিতেছেন মাত্র—সুযোগ পাইলেই আপনার উচ্ছেদ সাধন করিবেন। তিনি হুজুরের যোগ্যতা, প্রভাব, ঐশ্বর্য্য, বিশেষতঃ সৈন্যের উপর হুজুরের অপ্রতিহত প্রভুত্ব দেখিয়া ভীত হইয়াছেন এবং রাজভ্রাতাত্রয়ের একতা দর্শনে আরো চিন্তিত আছেন।"

প্রভুর সুন্দর ওষ্ঠাধর একটু কাঁপিল—একটু উল্টাইল! সে প্রক্রিয়াটী ভয়ে না—যেন অবজ্ঞায়—যেন দর্পের ভাবে ঘটিল! পরক্ষণে স্বগত চিন্তার অদ্ধোচ্চারিত স্বরে যেন আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন "না, এমন হইবে না—এতদূর সম্ভব নয়! আমাকে তাঁহার নিতান্তই আবশ্যক; তাঁহার আর সব সহচর তো মাতাল আর ভাঁড়ের দল! কাজের যোগ্য কে? চাটুকার ভীরু ফকিরের কর্ম্ম নয়—শুধু লেখা পড়া বিদ্যায় কি রাজ্য চলে? বিশ্বাস-ঘাতক জমাদারেরও সাধ্য নয়! অধিক কি, নূতন প্রিয় ফিরাঙ্গীরও কর্ম্ম নয়—আর সে এখন রাজপুত্র—সুদান-রাজপুত্র—তাহার সত্যবাদিত্ব আর ন্যায়ানুরাগ, এত অসত্য আর অন্যায়-তন্ত্রের মধ্যে কি করিয়া উঠিতে পারে? আমা ভিন্ন কখনই চলিবে না—কেবল তাহাতেই আমি নিরাপদ—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া চৈতন্য হইল—চণ্ডুলাল নিকটে!

কিন্তু চণ্ডুলাল তাঁহার সে ভাব লক্ষ্য না করিয়া সাগ্রহে অথচ বিনম্রভাবে বলিল "নিরাপদ হুজুর! নিরাপদ কি? পদের বিচার করিতে গেলে আপনি ইচ্ছাক্রমেই প্রথম পদে না উঠিয়া দ্বিতীয় পদে রহিয়াছেন। তাই না এখনও আপদ নিরাপদের কথা বলিতেছেন। হুজুরের মর্জ্জি হইবামাত্রই এরূপ ভাবনা আর ভাবিতে হয় না—একেবারেই নিরাপদ হইতে পারেন। বে-আদবি মাপ করিবেন; কিন্তু হাতী যেমন আপনার শরীর দেখিতে পায় না বলিয়াই ক্ষুদ্র প্রাণী ক্ষীণ মানুষের বশে থাকে, হুজুরও তাই করিতেছেন। একবার আপনার অধিকার আর ক্ষমতার সীমা বা অসীমতা সংখ্যা করিয়া দেখুন দেখি—যে পথ বাহিয়া আমরা আইলাম এবং যে পথ দিয়া এখন যাইতেছি, ইহার চতুর্দ্দিক্ দৃষ্টি করিয়া দেখুন দেখি—ঐ যে সম্মুখে দুরারোহ গিরি-বজ্র-দুর্গ, উহার ভয়ঙ্কর আশ্চর্য্য শিল্পচাতুর্য্য, উহার গগনভেদী স্তম্ভমালা, উহার অভ্যন্তরে উপর নীচে

স্তরে স্তরে যন্ত্র ও কামান সজ্জা লক্ষ্য করিয়া দেখুন দেখি এবং আপনার অনুগত, আশ্রিত ও নানা গুণে বশীভূত ছোট বড় লোকের সংখ্যা ভাবিয়া দেখুন দেখি, আপনার অসাধ্য কি আছে?

ধ্যান সিংহ অজ্ঞাতসারে সতাই একবার দুর্গের প্রতি গর্ব্ব-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন এবং অজ্ঞাতসারেই বলিয়া ফেলিলেন "দুর্গ অভেদ্য বটে—হাঁ সকলসত্য বটে!" কিন্তু এইটুকু বলিয়াই আবার চৈতন্য জন্মিল—তখনই প্রকৃতিস্থ হইয়া নিজ অভ্যস্ত ভাব ধারণপূর্ব্বক কহিলেন "ছি, তোমার বিষম ভ্রান্তি! আমি কি আমার অমন প্রভুর বিরুদ্ধাচারী হইতে পারি? আমি কি ছিলাম, কি হইয়াছি! যিনি আমাকে উইঢিবি হইতে পর্ব্বত করিয়া তুলিয়াছেন, যিনি এখনও আমার শত অপরাধ ক্ষমা পূর্ব্বক ক্ষমতাশালী রাখিয়াছেন, তেমন পিতৃবৎ দয়ালু প্রভুর অহিতাচার কল্পনা করিলে নিতান্তই অকৃতজ্ঞ চণ্ডাল হইতে হয়! অতএব চণ্ডুলাল, এমন কথা আর মুখেও আনিও না—এমন ভাব আর স্বপ্নেও ভাবিও না। এ দুর্ভেদ্য দুর্গ সে জন্য নয়--ইহার অন্য গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। তুমি আমার অতি প্রিয় বিশ্বাসী কর্ম্মচারী, কথা পাড়িলে তো তোমার কাছে মনের কথা বলিতে দোষ নাই। ভাবিয়া দেখ, মহারাজার দেহ যেরূপ দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে, তাহাতে শীঘ্রই তাঁহার লোকান্তর সম্ভব। তখন কে এই সামাজ্য পরিচালনা করিবে? ভীরু মাতাল দলের মধ্যে একজনও কি সে গুরু পদের যোগ্য? প্রবল ফিরাঙ্গীদের সহিত মিত্রতা ও সন্ধি সমর্থনে কে সমর্থ? রাজ্যের বিভাগ তো অল্প নয়—প্রজাবর্গ মধ্যে জাতি এবং শ্রেণীও একবিধ নয়—এত বিভিন্ন লোকের উপর পদ-মর্য্যাদা-গৌরবের সহিত প্রভুত্ব রক্ষা করা ইহাদের কাহারো কি সাধ্য আছে? অধিক কি, আমাদের অদম্য সৈন্য আকালী দলকেই বা কে দমনে রাখিতে পারিবে? মহারাজ যে গর্ব্বিত বদমায়েস দলকে জড় করিয়া কটক নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন কাহার সাধ্য তাহাদিকে বশে রাখিতে পারে? তাহাদের বেতন অনেক কালের বাকী; তাহাদের নায়কবর্গের মধ্যে অনেকেই তাহাদের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে—এখনি তাহারা তাহাদিগকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। অতএব রণজিতের মৃত্যু ঘটিবামাত্রই কি তাহারা অদম্য হইয়া সমুদয় বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিবে না? যদি প্রকৃত প্রস্তাবে অরাজকতা না ঘটে, তবু কি ধনাগার ভঙ্গ, বহু রক্তপাত, বহুজন কর্ত্তৃক প্রভুত্বার প্রতি-

দ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি বহুবিধ অপ্রতিহত গোলযোগ বাধিবে না? তখন কাহার ভাগ্যে কি ঘটে, স্থির কি? পূর্ব্বাহ্ণে আপন মস্তক বাঁচাইবার ও আপন ধন জন পরিবার রক্ষা করিবার পন্থা করিয়া না রাখিলে, তখন উপায় কি? রাজ্য-মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পদে যে অধিরূঢ়, হয় তো তাহারই বিপদ সর্ব্বাগ্রেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে! কিন্তু আর না—যাহা কাহারো সাক্ষাতে বলা উচিত নয়, তাহাই আজি, চণ্ডু, তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম! দেখিও, নাসা-কর্ণ-রসনাচ্ছেদের ভয় থাকে তো, যে কর্ণে শুনিলে একথা যেন সেই কর্ণ-মধ্যেই থাকিয়া যায়—যেন কর্ণ পার হইয়া রসনায় খেলা করিতে না আইসে!"

ধ্যান সিংহ "আর না" বলিলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার বলিতে লাগিলেন—হয় তো শুনাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই আপনা আপনি বকিতে লাগিলেন "মহারাজার এক মাত্র পুত্র যে, সে তো নির্ব্বোধ পাগল; সেই পুত্রের যে পুত্র, সে তো বালক; সুতরাং নিশ্চয়ই গোল বাঁধিবে! পঞ্চনদের দেশে বহুকালাবধি অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ চলিয়াছে—পঞ্চনদের স্রোত অনেক নর-শোণিত লইয়া প্রবাহিত হইয়াছে—আবার দেখিতেছি তাহাই হইবে! পঞ্জাবের ভাগ্যে ইহাই লেখা, তাহার সিংহাসনে যে কেহ উঠিবে, তাহাকেই অনেক রক্ত-স্রোতে সাঁতার দিয়া তবে পারে তো পারে উঠিতে হইবে! পূর্ব্বে ইহা বার বার হইয়াছে, পরেও হইবে! তবে যদি শেষে গৃহ-ভেদের সুযোগ পাইয়া ফিরাঙ্গীরা—"যার ধন তার ধন নয়, নেতো মারে দই!" করিয়া তুলে!

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন "সে যাহাহউক, চণ্ডু, সেই অভাগা বুদ্ধিহীনা স্ত্রীলোকেরা কোথায়? তাহাদের এ রাজসংসার ভাল লাগিলা না—কোথাকার একটা কে, তাহার জন্যই মরেন! যাহাহউক, তাহারা কি অবস্থায় আছে?"

চণ্ডু। দুর্গের পশ্চিমাংশের পুরীতে—তাঁহারা হা হুতাশে কাঁদিয়া কাঁদিয়াই জীবন কাটাইতেছেন! কিন্তু বোধ হয়, আর কিছু দিনে এভাব থাকিবে না—হুজুরের ইচ্ছাধীনা হইতে বাধ্যা হইবেন!"

পাঠক! চণ্ডুলালকে অবশ্যই চিনিতে পারিয়াছেন! ইনিই সেই গুণ-পুরুষ "মুন্সিজী," যাঁহার কথা ফকিরজী দুলীনকে বলিয়াছিলেন!

চণ্ডু ভাবিয়াছিল, এই উত্তরে প্রভু সন্তুষ্ট হইবেন; কিন্তু বিপরীত হইল! বিপরীত যে হইবে, তদাভাস ফকিরজীর পত্র পাইয়া পূর্ব্বেই চণ্ডুর মনে উদিত

হইয়াছিল; তথাপি চির-অভ্যাস-বশে প্রভুকে যেরূপ উত্তর দেওয়া সঙ্গত, তাহাই দিল!

ধ্যান সিংহ বৈরক্তির সহিত বলিলেন "না, চণ্ডু, এবিষয়ে তোমার গুণপণা প্রকাশের প্রয়োজন নাই—এবিষয়ে সেই বদ্‌মায়েস ভূপ সিং যাহা করিয়াছে, আর তোমরা যাহা করিতেছ, তাহাতে আমি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছি। তাহারা কি যেমন তেমন ঘরের মেয়ে? তাহারা কি প্রসিদ্ধ রাজবংশীয়া নয়? তাহাদের ধর্ম্ম ও মান নষ্ট করিলে আমার আত্ম-মান ও আত্ম-গৌরবকেই নষ্ট করা হইবে!"

এই কয়েকটা কথা যেরূপ ভঙ্গীতে ও যেরূপ দৃষ্টির সহিত বলা হইল, তাহাতে চণ্ডু বুঝিল "ভাল করি নাই।" অতএব যেন অতি তটস্থ ভাবে উত্তর দিল "আজ্ঞা হাঁ, হুজুর, তাঁহারা যেমন উচ্চবংশীয়া, তাহাদিগকে সেইরূপ মানপূর্ব্বকই রাখা হইয়াছে—তাহারা স্বাধীনতার অভাব জন্যই যাহা কিছু শোকাকুল ও কাতর, নচেৎ তাঁহাদের সেবা কার্য্যে কিছু মাত্র ত্রুটি হয় নাই। তবে কেবল, হুজুরের কি অভিপ্রায় এবং কেনই বা তাঁহারা আনীতা হইয়াছেন, ইটা গোলামের না জানা থাকাতেই তাঁহাদিগকে স্বাধীনতার আশা দিয়া প্রবুদ্ধা ও সন্তুষ্টা রাখিতে পারি নাই।"

ধ্যান। যত্নে রাখিয়াছ, ভালই করিয়াছ। তুমি যে ইঙ্গিত দিলে "কেন আনা হইয়াছে এবং আমার অভিপ্রায় কি" এ কথায় আমি আশ্চর্য্য হইলাম। তুমি কি সেই দুর্ব্বৃত্ত ভূপ সিংহের মুখে শুন নাই যে, পাপিষ্ঠ আমার অজ্ঞাতসারে এ কাজ করিয়াছে? সে মনে করিয়াছিল, ইহাতে আমার বিরুদ্ধাচারী তুলীনকে জব্দ করা হইবে এবং এমন সুন্দরী রাজকন্যা পাইলে আমি মহা তুষ্ট হইব ও তজ্জন্য তাহাকে প্রচুর পুরস্কার দিব। কিন্তু তাহার ভুল হইয়াছে। যদিও লীনা প্রার্থনীয়া বটে, তথাপি তুমি কি জাননা, কাংরার রাজকুল কলঙ্কিত করিয়া আমি আমার নিজের নামে অনপনেয় কলঙ্ক কালিমা জড়াইব, আমি কি সেই লোক? বিশেষ, নির্দ্দোষী অবলার প্রতি অত্যাচার করিয়া প্রবল বিপক্ষের প্রতি বৈর-নির্য্যাতন সাধিব, আমি কি এমনি নীচাশয়? তাহারা যদি নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ জাতিচ্যুত ফিরিঙ্গীর পোষা পুত্রকে বরণ করে, তাহাতে তাহারাই মজিবে, আমার কি? একথা সে দুরাশয় না বুঝুক, তোমার বুঝা উচিত ছিল।"

চণ্ডু বুঝিল "আস্তাবলের আপদ বালাই, বানরের ঘাড় দিয়া চালাই!" এ অভিনয় তাহাই হইতেছে—এখন যত দোষ চণ্ডুর! চণ্ডু তাহাতেই প্রস্তুত এবং তদনুসারেই ক্ষমা প্রার্থনাদি যাহা যাহা আবশ্যক, তৎপক্ষে ত্রুটি করিল না। তাহার প্রভুও আবার প্রসন্ন হইলেন! শেষে "নির্ব্বোধ" অবলাত্রয়কে মুক্তি-দানই ধার্য্য হইল। কিন্তু তাহাদিগকে এরূপ কৌশলে ও সংগোপনে পাঠাইতে হইবে যে, তাহাদিগকে রাজকোটে আনিয়া যে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল, তাহা যেন কোনমতেই প্রকাশ না পায়! "রজনী প্রভাতে তাহাদের নামগন্ধ যেন রাজকোট অঞ্চলে না থাকে, এপ্রকার ব্যবস্থা করিবার দৃঢ় ভার তোমার প্রতি অর্পণ করিলাম—সাবধান! ইহাতে তিলার্দ্ধ যেন ব্যতিক্রম না ঘটে'!"

চতুর চণ্ডুলালের মহৎ হৃদয় যেন মহানন্দে আনন্দিত হইয়া উঠিল, এইরূপ প্রসন্ন বদন, উৎফুল্ল নয়ন ও অন্যান্য চিহ্ন প্রদর্শন পূর্ব্বক অতি বিনম্র ভঙ্গীতে প্রভুর এই অশ্রুতপূর্ব্ব অতুল্য মহত্ত্ব ও দয়ার কার্য্যের নিমিত্ত ভৃত্য-কর্ত্তৃক প্রভুকে যেরূপে যতদূর ধন্যবাদ প্রদান সঙ্গত, তাহাতে চণ্ডুর অণুমাত্র অনি-পুণতা ও ত্রুটি হইল না!

চণ্ডু মনে মনে যথার্থই সুখী হইল—এক কাজে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য উভয় নিয়োগকর্ত্তারই মনোরঞ্জন ঘটিল—ফকিরজীকে এখন জানাইতে পারিবে যে, তিনি যে কৌশলে রাজরাণীদের উদ্ধার বিষয়ে প্রভুর সম্মতি লাভ করিয়াছেন, তাহা অন্যের সাধ্যাতীত!

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সুখমিলন—শুভোদ্বাহ।

বড় সুখের কাল শরৎ—জল, স্থল, শূন্য, সকলই সুবিমল—সকলই সুশী-তল—সকলই সমুজ্জ্বল—সকলই ঢল ঢল! তাহাতে কাংরা দুর্গ আজি যেন আরো শোভাময়, আরো পরিষ্কৃত, আরো সুসজ্জিত, আরো পবিত্র বলিয়া জ্ঞান হইতেছে—আজি কাংরার শাসনকর্ত্তা ও কাংরা-রাজ-তনয়ার শুভোদ্বাহ!

আজি কয় দিবস হইল, ভুলীন স্বীয় হৃদয়েশ্বরী হারানিধি লীলাকে পুন-র্ব্বার লাভ করিয়াছেন! ধ্যান সিংহের অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিতে চতুর

চণ্ডুলালকে কষ্ট পাইতে হয় নাই—নিকটে আক্রাম ও ধন্নু প্রস্তুত ছিল—পূর্ব্বেই ফকিরজীর নিয়োগানুসারে চণ্ডু লাল তাহাদের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদিগকে প্রস্তুত থাকিবার ইঙ্গিত দিয়া রাখিয়াছিল—স্বয়ং চাঁদ খাঁও তাহার বিশ্বাসী মুলতানী ও বন্নুর সহচরগণ সমভিব্যাহারে অদূরে গুপ্তভাবে সর্ব্বদাই সতর্কতায় প্রহরিতা করিতেছিল—ঘোরা রজনীতে সিন্দুকাকার যন্ত্রাধার যোগে দুর্গ হইতে শ্রীমতীদিগকে যেমন নামাইয়া দিল, অমনি শিবিকায় উঠাইয়া তুলীনের প্রিয় কর্ম্মচারীরা যত সত্বর সম্ভব, নির্ব্বিঘ্নে লইয়া গিয়া পরদিন যামিনী যোগে কাংরায় আনিয়া উপস্থিত করিল।

'আনন্দের সীমা নাই—উৎসাহের অবধি নাই—উৎসবেরও শেষ নাই। পুনর্মিলনে যাহা ঘটিল, তাহার বর্ণনা দ্বারা লিপিকরের অনৈপুণ্য দেখাইব না—সহৃদয় ভাবুক সুরসিক পাঠক পাঠিকারা আপনারাই অনুভব করিয়া লউন!

এত অনুপম সুখের মধ্যে কেবল দুঃখের বিষয় এই, লীলার জননীর দৈহিক অবস্থা ভাল নয়। তিনি রাজনন্দিনী, রাজ-বধূ, রাজরাণী—আজন্ম যত্নে পালিতা—চিরদিন আদরে ও গৌরবে রক্ষিতা—নিতান্ত কোমল-হৃদয়া—নিতান্ত অভিমানিনী—পুনঃ পুনঃ এত ভীষণ পীড়নে সে হৃদয় ভগ্ন হইবে আশ্চর্য্য কি? পূর্ব্বে যৎকালে সিংহাসন হইতে তাড়িতা ও স্বামীরত্নে বঞ্চিতা হইয়াছিলেন—যৎকালে পাষণ্ডেরা এক মাত্র প্রবোধের ধন বুকের রতন বালিকা লীলাকে পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছিল, তখনই সেই কুসুম সদৃশ সুকুমার হৃদয়ে যে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, তাহাতেই তাহা বিদীর্ণ হইবার কথা! কেবল প্রাণাধিকা লীলা তখন বালিকা; মাতৃহীনা হইলে তাহার দশা কি হইবে—"আমি মরিলে আমার লীলাকে কে উদ্ধার করিবে? উদ্ধৃতা না হইলে পাছে পাপাত্মারা কন্যাকে কলঙ্কের পথে ডালি দেয়! অতএব উদ্ধার করিতেই হইবে—সুতরাং আমার বাচিবার অত্যন্ত প্রয়োজন!" এই গুরু প্রয়োজন আর এই আশাতেই তখন বুক বাঁধিয়াছিলেন—বক্ষকে বিদীর্ণ হইতে দেন নাই—তজ্জন্যই পথের কাঙ্গালিনী হইয়া ও অপমান সহ্য করিয়াও কথঞ্চিৎরূপে প্রাণ ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন!

পরে সেই জীবন-ব্রত—সেই উদ্ধার-আশা সিদ্ধ হইয়াছিল—গুলাপীর গুণে প্রাণের লীলাকে আবার কোলে পাইয়াছিলেন! তদবধি লীলার লালন পালন কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া এবং লীলার মায়ায় ও গুণে মুগ্ধ থাকিয়া পূর্ব্বকথা বহুলাংশে

ভুলিয়া একপ্রকার দুঃখে সুখে কাল কাটাইতেছিলেন। কিন্তু অন্তরের পূর্ব্ব আঘাত এককালে অন্তর্হিত হয় নাই, অনাবৃত ও গুপ্ত ছিল মাত্র!

শেষে লীলার সঙ্গে আর একটী স্নেহের পাত্র যুটিল—তাঁহার প্রাণাধিকা যৌবন-সখী সুদান-মহিষী নর্ম্মদার পুত্র তাঁহাকে মা বলিল—শুধু মুখে বলিল না, ব্যবহারেও যথার্থ পেটের সন্তানের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিল! আবার তাই কেবল নয়, সে পুত্র সর্ব্বগুণে গুণধর—রূপে গুণে মনোহর! আবার শুদ্ধ তাও নয়, সে তাঁহার প্রাণের লীলাকে আপন প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিল—লীলাও সে প্রেমের অবিকল প্রতিদান করিল—যেন বিধাতা তাহাদের একের জন্যই অন্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এমনি বোধ জন্মিল! ইহাতে সেই নিদারুণ হৃদয়াঘাতের যন্ত্রণা আরো হ্রাস হইল—প্রায় যেন অপসারিত হইয়া ভবিষ্যতের সুখের আশাকে হৃদয় মধ্যে স্থান দিল!

কিন্তু অদৃষ্ট যাহাকে লইয়া খেলা করে, তাহার আশাই বা কি, সুখই বা কি, শান্তিই বা কি! সে সকলকেই সেই অদৃষ্ট দূর করিল! অন্তরে এবার মর্ম্মান্তিক ঘা দিল! হায়! কোথা হইতে ভূপসিং কালান্তক কালরূপে উদিত হইল—অদৃষ্ট-চক্রের নেমী উল্টাইয়া দিল—এবার সেই চক্র ভয়ানকরূপে বক্র হইয়া এককালেই পেষণ করিল—এবারকার অপমান ও মর্ম্ম-বেদনা আর সহ্য হইল না! এবার তো লীলা আর বালিকা নয়, এবার তাঁহার নিজের দেহও যৌবনের সুস্থতায় সবল নয়, এবার তনয়ার কলঙ্ক চিন্তা দূরবর্ত্তী নয়—এবার লীলা যুবতী—এবার আর উদ্ধারের সময় নাই, সুযোগ নাই, আশা নাই—এবার ঘোর নিরাশা—ঘোর তামসময়ী নিশা! কোন অবস্থাতেই মনুষ্যকে হতাশ হইতে নাই, অশিক্ষিতা প্রাচীনা অবলার হৃদয় তাহা আর ধারণা করিতে সমর্থ হইল না! একে রাজকোট দুর্লংঘ্য ভীষণ স্থান; তাহাতে সেটী দুর্দ্দান্ত নর-শার্দ্দূলের বিবর! পঞ্জাবের সর্ব্ব-শক্তিধর ব্যাঘ্রের বিবর! দুলীন যে সন্ধান পাইবেন বা সন্ধান পাইলেও উদ্ধার করিতে পারিবেন, রাণীজীর বোধে এমন সম্ভাবনা মাত্রই রহিল না! এ প্রকার শত চিন্তারূপ শতঘ্নীতে পূর্ব্বাহত স্থান এবার সম্পূর্ণরূপেই বিদারিত হইল—এবার আর উপশমের উপায় রহিল না! যৎকালে তাঁহারা মুক্তি পাইয়া স্বস্থান কাংরায় আনীতা হইলেন, তখন লীলার আশার সঞ্চার ও পবিত্র প্রেমঃপ্রণোদিত হৃদানন্দের পুনর্জীবন ঘটিল; কিন্তু তাঁহার দুঃখিনী জননীর স্বাস্থ্য এখন এককালেই ভগ্ন

হইয়া গিয়াছে—পুনর্ব্বার সে স্বাস্থ্যলাভের আর সম্ভাবনা নাই—রাণী চন্দ্রাবতী দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন!

এখন লীলার সুখের ও সাধের আশ্রয়স্থান চিরদিনের মত নিরূপিত হইল—লীলার জন্য আর চিন্তা নাই—সুতরাং লীলার জননী এখন নিশ্চিন্ত প্রাণে মরিতে প্রস্তুত! তিনি মনে মনে আত্ম দৈহিক অবস্থা সম্পূর্ণই বুঝিতে পারিলেন; পাছে সে কথা ব্যক্ত করিলে শুভ বিবাহের পক্ষে কোন ব্যাঘাত জন্মে—পাছে প্রাণতুল্য প্রিয় দম্পতীর আনন্দে নিরানন্দ, উৎসবে নিরুৎসব ঘটিয়া উঠে, এই ভয়ে যতদূর সাধ্য আত্ম-হৃৎপিণ্ডের পীড়ার কথা গোপন রাখিয়া অন্যান্য কারণ দর্শাইয়া শুভ কর্ম্মের ত্বরা করিতে লাগিলেন!

সেই কারণ সমূহের মধ্যে ওইটী প্রধান ও জাজ্বল্যমান। এক তো একবার লগ্ন স্থির হইয়াও ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল, অতএব আর কালবিলম্ব উচিত নয়—"শুভস্য শীঘ্রং" শাস্ত্রের কথা! দ্বিতীয়তঃ ফুলীনকে অগৌণে রূপাড় যাইতে হইবে, তিনি আর প্রাণের লীলা হইতে তিলার্দ্ধও বিচ্ছিন্ন থাকিতে চাহেন না—এককালে পরিণীতা ভার্য্যা লইয়া গমন করিবেন—মাও সঙ্গে থাকিবেন। অতএব যত নিকটবর্ত্তী দিনে শুভলগ্ন হওয়া সম্ভব, শাস্ত্রী মহাশয় তাহাই স্থির করিয়া দিলেন।

এখন আর গোপনের প্রয়োজন কি? ফুলীন যে সুদান রাজপুত্র, তাহা সকলেই জানিয়াছে—সর্ব্বত্রই রাষ্ট্র হইয়াছে। সুতরাং এবার আর সমারোহের ও ঘটার বাধা কি? বিশেষতঃ শাস্ত্রী মহাশয়, অহল্যা দেবী ও অহল্যাপতি রঘুবর দয়ালের যত্নাতিশয্যে এবং রাণী চন্দ্রাবতীর অনুরোধে বিশেষ জাঁক জমক ঘটা-পটারই আয়োজন হইল—তাহার প্রধান উদ্যোগী রঘুবর ও রঘুবরের শ্যালক! তাঁহারা স্বয়ং গিয়া রঘুবরের প্রভু লেনা সিংহকে কর্ত্তা করিলেন। ফুলীনের কর্ম্মচারীদের মধ্যে চৈতনই সর্ব্বাধ্যক্ষ হইলেন—তন্নিম্নে সোহনলাল, হাকিম সিংহ, বন্নু, ধন্নু, চাঁদ খাঁ, আলিবর্দ্দি খাঁ, আক্রাম খাঁ এবং অন্যান্য (যাহাদের নাম লিপিবাহুল্য ভয়ে এই ইতিহাসে উল্লেখ নাই) অনেকে! তাবৎ অনুচর, সহচর, অধীন জনগণ এবং ভৃত্যবর্গ বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা যথাযোগ্য-রূপে পুরস্কৃত হইল!

নহবৎ বসিল—নানা বাদ্যোদ্যমে কাংরা নিনাদিত হইতে লাগিল। পথে পথে বিজয়-তোরণ; চতুর্দ্দিকে জয় জয় শব্দ ও মাঙ্গলিক হুলুধ্বনি; চতুর্দ্দিকে

পতাকা ও পুষ্পমালা; হাটে বাজারে নগরে গ্রামে প্রতিপুরদ্বারে পল্লব ও কুসুম-হার; লোকে লোকারণ্য! ধনী নির্ধনী ইতর ভদ্র বাল-বৃদ্ধ-যুবা সকলেই যাহার যে শ্রেষ্ঠ বেশ, শ্রেষ্ঠ ভূষা, তাহাতেই ভূষিত। সৈনিকগণ মহাসমারোহে যোগ্য বেশে সুসজ্জিত; তোপের মুখে ঘন ঘন জয়বার্ত্তা ঘোষিত! সে সঙ্গে আতস বাজির অপূর্ব্ব ক্রীড়ায় সকলেই মহামোদী!

নিমন্ত্রিতগণ দলে দলে আসিতে লাগিলেন—কারাং ও স্বদান রাজবংশের সম্পর্কে যিনি যেখানে ছিলেন এবং কুলু-রাজকুলের সকলেই মহোল্লাসে আগমন করিলেন। যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে স্বজাতি-রূপে তুলীনের সহিত আহার ব্যবহারে তাহারা সম্মত ছিলেন না, তথাপি শোণিত সম্বন্ধের স্নেহানুগতা কোথায় যায়? মাতুলগণ ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ আসিয়া সজল নয়নে তুলীনকে প্রেমালিঙ্গন দান পূর্ব্বক শুভ কর্ম্মে যথোচিত উৎসাহী ও সংলিপ্ত হইলেন। স্বদানের রাজকুলে সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন মহোদার্য্য-পূর্ণ মহিমান্বিত এমন বংশধর লাভে সকলেই গর্ব্বিত ও কৃত-কৃতার্থ হইলেন!

পর্ব্বত-গুহা-বাসী স্বীয় শিক্ষা-গুরু মহাজ্ঞানী যোগী-প্রবরকেও আপন শুভোদ্বাহ বার্ত্তা জানাইতে তুলীন ভুলেন নাই। শতবিধ ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁহাকে বলিতে ও আহ্বান করিতে তুলীন স্বয়ং গিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি আনন্দ প্রকাশ ও আশীষ দান পূর্ব্বক সস্নেহে বলিয়াছিলেন, "বৎস! এরূপ উৎসব ও মায়ার অনুষ্ঠান হইতে আমি বহুকাল বিচ্ছিন্ন, আর আমাকে কেন তাহাতে জড়ীভূত করিতে চাও? বিশেষ আমার ন্যায় সংসার সুখ-বর্জ্জিত ও সমাজ-বহির্ভূত ব্যক্তির এমন সুখের শুভ কার্য্যে যোগ দেওয়া কি ভাল দেখাইবে?"

কিন্তু তুলীন তাঁহাকে সুচারুরূপেই চিনিয়াছিলেন—তিনি যে সামাজিকের শিরোমণি, তাঁহার সাংসারিক ও রাজকীয় অভিজ্ঞতা-মূলক কথোপকথন ও উপদেশাবলীতে তাহা সম্যক্ প্রকাশ পাইয়াছিল। অতএব তুলীন তাঁহাকে সম্মত না করিয়া ছাড়িলেন না!

তুলীনের বিদায় কালে যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন "সম্প্রদান করিবে কে?" তুলীন উত্তর দিলেন "আপনি যেমন আজ্ঞা করেন।"

ক্ষণচিন্তার পর যোগী সহাস্যে কহিলেন "তবে রাণী চন্দ্রাবতীকে বলিও, সম্প্রদানের কষ্ট তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে না—বলিও তাঁহার শ্বশুরের (সংসার

চাঁদের) নিরুদ্দেশ ভ্রাতা সুসারচাঁদের উদ্দেশ পাওয়া গিয়াছে, তিনিই যথাকালে উপস্থিত হইয়া সম্প্রদান করিবেন!”

ডুলীন বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে কিয়ৎক্ষণ যোগীর যোগবলোদ্দীপ্ত তেজস্কর সহাস্য সুন্দর আস্য পানে নিরীক্ষণ করিয়া সহসা তাঁহার পদযুগল ধারণ পূর্ব্বক গদ্গদস্বরে সকাতরে বলিলেন “ঠাকুরদাদা মহাশয়! তবে কেন এ দাসকে এত দিন এ সুখে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন? শুনিয়াছি, মহারাজ সংসারচাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অদ্বিতীয় বোদ্ধা, অদ্বিতীয় যোদ্ধা ছিলেন; শুনিয়াছি, আমার পিতার পরমা রূপ-গুণবতী পিতৃস্বসা স্বয়ম্বরা হইয়া তাঁহাকেই বরণ করিয়াছিলেন; শুনিয়াছি, উভয়ের মিলন, মর্ত্ত্যভুবনে যেন লক্ষ্মী নারায়ণের মিলন এবং উভয়ের পবিত্র প্রণয়, হর-গৌরীর একাঙ্গ ও অভেদাত্মা-প্রণালীর অনুরাগ সদৃশ ঘটিয়াছিল; শুনিয়াছি, কাংরারাজ্যের বিপৎপাতের বহু পূর্ব্বেই সেই পতিপ্রাণা পত্নীর বিয়োগ বশতঃ সুসারচাঁদ গৃহত্যাগী বিবাগী হইয়া হিমাচলের প্রান্ত-সীমাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন—জনরব, রাজা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সেই পুণ্যাত্মা সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছেন! তবে কি আমার পিতামহের স্বসৃপতি—আমার লীলার পিতামহের ভ্রাতা সেই দেবোপম সুসারচাঁদ আজো ইহলোকে আছেন? তবে কি পিতামহ ভীষ্মের ন্যায় সেই জিতেন্দ্রিয় ও যোগীন্দ্র পিতামহকে আ'জ্ আমি চর্ম্মচক্ষে চাক্ষুস করিয়া ধন্য হইলাম?”

যোগীবর সস্নেহে গাঢ় আলিঙ্গন দান পূর্ব্বক বিস্তর আলাপ পরিচয় ও আত্মজীবনের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বর্ণনান্তে শুভ পরিণয় কার্য্য স্বয়ং গিয়া সুসম্পন্ন করিবেন, এমন প্রতিশ্রুত হইয়া ডুলীনকে প্রবুদ্ধ করিয়া বিদায় দিলেন। তাঁহার সেই পবিত্র জীবন-ইতিহাসের মধ্যে আর্য্য-যোগ-ধর্ম্মের অদ্ভূত তত্ত্ব সকলের যৎকিঞ্চিৎ স্থূল আভাস হৃদ্গত করিয়া ডুলীন অবাক্ হইলেন! কেবল বাহুল্য ভয়ে এস্থলে সে সমস্ত লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না।

সে যাহাহউক, রাণী চন্দ্রাবতী ও লীলা এ সুসংবাদ শ্রবণে যে কি পরিমাণে সুখী হইলেন, তাহা নিতান্ত বর্ণনাতীত—এমন দিনে বংশে অভিভাবক কেহই নাই, এই দুঃখার্ণবের মধ্যে এরূপ পরম জ্ঞানী পরমাত্মীয়-রূপ-পোত বিধি অনুকূল হইয়া মিলাইয়া দিলেন—সে সুখের কি শেষ আছে!

যথাকালে সেই পরমাত্মীয় কাংরা দুর্গে উদিত হইলেন—যথাকালে স্বয়ং সম্প্রদান করিলেন! পুরাতন লোক যাঁহারা, তাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে পারি-

লেন—বিশেষ শাস্ত্রী মহাশয়। অন্যান্য বিশেষ আত্মীয়জন, সম্প্রদানকর্ত্তা যে কে, তাহা যখন শুনিলেন, তখন তাঁহাদের আনন্দের ইয়ত্তা রহিল না! যদিও তিনি আর সংসারী হইবেন না; তথাপি এই শুভকার্য্যে তিনি যে আপন সংসারে আসিয়া মিশিলেন এবং কাংরার পর্ব্বতগুহায় তাঁহার দর্শন-লাভ কখন কখন ঘটিতে পারিবে, ইহাতে সেই মহোল্লাস তরঙ্গ আরো উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল!

শুভ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল! গগন ভেদ করিয়া মঙ্গলধ্বনি ও জয়-শব্দ উঠিল—সঙ্গে তোপধ্বনিত হইল—পুনঃ পুনঃ সমস্ত রজনীই হইতে লাগিল! সমস্ত রজনী, নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত—যাচক, অযাচক, উপযাচক, সর্ব্বপ্রকার লোকেই চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, এই চতুর্ব্বিধ সুসেব্য দ্রব্য ভোগে পরিতোষ প্রাপ্ত হইল!

আর কি? বাসর ঘর? তাহাও হইল! লীলার সখীমণ্ডলী ও স্বসম্পর্কীয়া তরুণীগণ বিবাহের সেই প্রধান অঙ্গ কি ছাড়েন? তবে তথায় হাস্য পরিহাস রঙ্গরস কিরূপ কতদূর হইয়াছিল, বলিতে পারি না! কেননা, কুলীন স্বীয় দৈনিক পুস্তকে তাহা লিখিয়া রাখেন নাই—এই ইতিহাস-লেখকও বঙ্গবাসী—বঙ্গ-রঙ্গই জানেন—এ বিষয়ে পঞ্জাব-রীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ—কল্পনার সাহায্য লইতে গেলেও বঙ্গ-বাসরই আসিয়া পড়িবে! তাহা কোন্ পাঠক পাঠিকাই বা না জানেন? বিশেষ বঙ্গ-বাসর-বর্ণনায় লেখনী লজ্জায় বিমুখ হইল—কালী তুলিতে চাহিল না, পাছে মুখে কালী পড়ে! অতএব পাঠিকা মহাশয়ারা সে আশা ত্যাগ পূর্ব্বক শুভকর্ম্ম-সমাপ্তি-সূচক হুলুধ্বনি সহিত এ শুভ পরিচ্ছেদ-পাঠ সমাপ্ত করুন!

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মাতৃ-বিয়োগ—রূপাড়-যাত্রা।

যৌতুক দানের সময় উপস্থিত। সে পর্য্যন্ত আপনার শোচনীয় দৈহিক অবস্থা প্রচ্ছন্ন রাখিতে, অথবা মনের উৎসাহে স্থাণুর ন্যায় দণ্ডায়মানা থাকিতে, লীলার মাতা পারিয়াছিলেন।

সেই যা। সেই শুভ আশীর্ব্বাদ-দান-রূপ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হইয়া গেল, অমনি প্রিয় পরিচারিকাকে কাণে কাণে বলিলেন "জান্কি! আমার গা কেমন করিতেছে : আমার মাথা ঘুরিতেছে . আমায় ধরিয়া লইয়া চল্; কিন্তু আমার মাথা খা'স গোল করিস্ না!"

জান্কী তাঁহাকে তাঁহার শয়নগৃহে লইয়া গেল; শোয়াইল; দেখিল, পীড়া সহজ নয় : কিন্তু তাঁহার পুনঃ-পুনঃ কাতরোক্তির অনুরোধে অনিচ্ছাতেও সে কথা সে রাত্রি তাঁহার কন্যা কি জামাতাকে জানাইতে পারিল না! পাছে তাঁহার দীর্ঘস্থায়ী অনুপস্থিতিতে লীলা সন্দিহান হন, এ নিমিত্ত আপনিও সর্ব্ব-ক্ষণ নিকটে থাকিতে সমর্থ হইল না—অপর দুই জন পরিচারিকাকে প্রহরিতা ও সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া যাইতে বাধ্য হইল—কেবল মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিল।

প্রভাতে নব-দম্পতী এই নব পরীক্ষার তথ্য জানিতে পারিয়া সকল ছাড়িয়া সেই রুগ্ন শয্যার পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইল, লীলার হৃদয় বিদীর্ণ হইল! কাছারায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল! ভুলীন এক এক বার বাহিরে গিয়া নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ের ভারার্পণ ও ব্যবস্থাদি করিয়া আসিতে এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেককেই অকালে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন! সুচিকিৎসক আনাইয়া বিস্তর চিকিৎসা হইল—এ সময় গুলা-পীর গুণ স্মরণে লীলা কাঁদিতে লাগিলেন, ভুলীনও পুনঃ পুনঃ অন্তর্ভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন! তথাপি সুচিকিৎসা, শুশ্রূষা ও যত্নের কিছু মাত্র ত্রুটি হইল না; কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল লাভ ঘটিল না—তৃতীয় রজনীতে রাজা অনুহ্লাদের মহারাজ্ঞী পাপ-তাপ-অত্যাচার-পূর্ণ পৃথিবীর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক যোগ্যধমে স্বীয় পতি-সকাশে গমন করিলেন! লীলার মর্ম্মভেদী শোকা-বর্ত্তের কথা আর কি বলিব! ভুলীনের হরিষে বিষাদের কথাই বা কি বর্ণনা করিব—তিনি যেন যথার্থই দশ দিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন—বিশেষ লীলার জন্য আরো দগ্ধ হইতে লাগিলেন! কিন্তু লীলার জন্যই তাঁহাকে ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইল! তিনি ধৈর্য্য না ধরিলে লীলার হৃদয়ে শান্তি-বারি কে সিঞ্চন করে? সর্ব্বশান্তিময়ের লীলা-মাধুরী শুনাইয়া শুনাইয়া সেই শান্তিবারি সিঞ্চনে অহর্নিশি নিযুক্ত রহিলেন—কথঞ্চিৎ সিদ্ধও হইলেন—তাঁহার অসাধারণ প্রগাঢ় ঈশ্বর-প্রেম ও লীলার প্রতি অসীম প্রেমানুরাগই মহৌষধের কার্য্য করিল!

এ দিকে রূপাড় যাত্রার সময় উপস্থিত—আর বিলম্ব উচিত নয়। কাংরার পূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা দণ্ডবর সিংহ সগণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনিই যেন পুনর্ব্বার তৎপদে অভিষিক্ত হন, এজন্য ডুলীন ফকিরজীকে বিস্তর অনুরোধ করিয়াছিলেন। কাংরার প্রকৃতিবর্গের প্রতি ডুলীনের যথার্থই সন্তান-বাৎসল্য জন্মিয়াছিল! তিনি কি সাধ্যসত্ত্বে তাহাদিগকে নির্দ্দয় হস্তে পতন-নিবারণের চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারেন? পাছে নিরবচ্ছিন্ন দণ্ডবরের হাতেও তাঁহার রাম-রাজ্য শিথিল-পালন-দোষে নিতান্ত হতশ্রী ও প্রজাবর্গ সুপ্রণালীর সুখে এককালেই বঞ্চিত হয়, তাহার আংশিক প্রতিবিধানার্থ তাঁহার সুযোগ্য সহকারী হাকিম সিংহকে পূর্ব্ব পদেই রাখাইলেন। দণ্ডবরও আহ্লাদ পূর্ব্বক এ ব্যবস্থাতে সম্মত হইলেন। তিনি সরল-হৃদয় সুজন বীর, এবং সেকেলে শাদা মাটা সোজা-বুদ্ধির লোক। তাঁহার অন্তরের ত্রিসীমায় অসূয়া ও ঈর্ষা স্থান পায় না। তাঁহার অখল মন যাহাকে ভাল দেখে, তাঁহার বদনও তাহাকে ভাল বলে! তিনি ডুলীনের শাসন প্রণালী ও নিয়মাবলীর উৎকৃষ্ট ফল দেখিয়াছেন, উৎকৃষ্ট বলিয়াই প্রশংসা এবং তত্তাবতের কিছুমাত্র অন্যথা করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। কার্য্যতঃও করিয়াছিলেন তাই। তিনি হাকিম সিংহের প্রতিই সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও অধিকাংশ কার্য্যভার অর্পণ করিতেন। হাকিমের সহিত পরামর্শ না করিয়া ও হাকিমের মত না লইয়া কোন বিশেষ প্রথার প্রবর্ত্তন বা কোন বিশেষ কার্য্য সাধন করিতেন না; মত-ভেদ হইলে তৎক্ষণাৎ ডুলীনের নিকট লিখিয়া পাঠাইতেন, ডুলীন যে মীমাংসা করিয়া দিতেন তাহাই শিরোধার্য্য করিতেন। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ধ্যান সিংহ বা তাঁহার ভ্রাতাদ্বয়ের সহিত কোন সংশ্রব আর রাখিবেন না! এ প্রতিজ্ঞাও কখন ভুলেন নাই!

যদিও এই বন্দোবস্ত নিমিত্ত ডুলীনের মন অনেক সুস্থ হইল, তথাপি কাংরা তাঁহার অতি প্রিয় স্থান—কাংরার প্রজামণ্ডলী তাঁহার প্রিয় পুত্রাধিক স্নেহের পাত্র—তিনি কি কিছুতেই সম্পূর্ণ সুস্থ হৃদয়ে কাংরা ত্যাগ করিতে পারেন? না, কাংরাবাসী জনগণ তাঁহার বিচ্ছেদ সুস্থ অন্তঃকরণে সহ্য করিতে পারে? যাত্রার সময় যত নিকট হইতে লাগিল, ডুলীনের প্রাণ ততই ব্যাকুল, ততই শোকময় হইয়া উঠিল—ততই যেন নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির স্বদেশ ও স্বজন-বিয়োগ-হুতাশে যেমনটী হয়, তেমনটী হইতে লাগিল! ওপক্ষে আবার,

দণ্ডবর সিংহ পুনর্ব্বার কাংরায় কেন আইলেন, মুখে মুখে এই জিজ্ঞাস্যের উত্তরে প্রকৃত তথ্য যতই প্রস্ফুটিত ও প্রচারিত হইতে লাগিল, ততই কাংরা রাজ্যময় যেন কোন মহা-বিপ্লব-ঘটিত হাহাকার রব উঠিল—দলে দলে লোক ছুটিল—তুলীনের পুরদ্বারে ছুটিল—মহা ক্রন্দন-রোল উঠিল! কিন্তু হায় নিতান্তই নিরুপায়!

দণ্ডবর দেখিয়া অবাক্! দণ্ডবর স্বয়ং তাহাদিগকে এই বলিয়া বুঝাইলেন যে, "হয় তো আবার তোমাদের প্রিয় প্রভু শীঘ্রই এখানে আসিবেন—আমিও এবার তাঁহারই রীত্যনুসরণে শাসন করিব!" কিন্তু সে কথা কে শুনে!

তুলীন মহা বিপদে পড়িলেন, একে নিজ মনের দারুণ দাহ, তদুপরি ইহা-দের অপার দুঃখ দেখিয়া তাঁহার দয়ার্দ্র প্রাণ আরো ব্যথা পাইল! তিনি অনেক বুঝাইলেন,—অনেক সান্ত্বনা করিলেন। তাহারা বুঝে না—সান্ত্বনা মানে না! কেবল কাঁদে—তুলীনও থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন! তাহারা কেবল বলে "আমাদের গতি কি করিলেন?" তুলীন হাকিম সিংহকেই গতি-রূপে দেখাইলেন! তাহারা সে গতিতে সন্তুষ্ট নয়—তাঁহাকেই চায়! শেষে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন, পুনর্ব্বার আবার আসিবেন!

পাঠক! লর্ড রীপণের গমনে আপনারা যাহা দেখিয়াছিলেন ও যাহা করিয়া-ছিলেন, তাহা কাংরার শতাংশের একাংশও নয়— ইহাতেই কিঞ্চিৎ আভাস পাইবেন, অধিক বলিতে পারি না—"পুথি বেড়ে যায়!"

* * * * * *

তুলীন ও লীলা গমন করিলেন। সঙ্গে তুলীনের নিজের প্রস্তুতীকৃত সর্ব্বপ্রকার সৈন্য ও হাকিম সিংহ ব্যতীত আর সকল বিশ্বাসী প্রিয় কর্ম্মচারী ও অনুচর সহচর মাত্রেই চলিল। হাকিম সিংহ মহা শোকাকুল হইলেন, কিন্তু গত্যন্তর নাই। চৈতন যে দেওয়ান ছিলেন, সেই দেওয়ান পদে রহি-য়াই সঙ্গের সঙ্গী হইলেন। সৈন্য শিরে সেনাপতি ও সেনাপতির নব পত্নী যুগলমূর্ত্তিতে যুগল হয়বর আরোহণে কি অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতে করি-তেই চলিতে লাগিলেন—তুলীনের বেলুন তো পাঠকের চির-পরিচিত—লীলা-রও বাহিকা সামান্য অশ্বিনী নয়, সে উৎকৃষ্ট আরব জাতীয়া, মহা তেজস্বিনী, অথচ কুক্কুরীবৎ স্বামিনীর বশবর্ত্তিনী—গুলাপীর স্মরণার্থ তাহার নাম "কাঞ্চনী" রাখা হইয়াছে! সঙ্গে শিবিকা ছিল, কিন্তু লীলা প্রায়ই তাহাতে উঠিতেন না

—জান্‌কীর কপাল প্রসন্ন—সে সেই শিবিকাতে প্রায়ই আরূঢ়া থাকিত! অন্যান্য পরিচারিকারা বয়েল গাড়িতে চড়িয়া চলিল।

শতদ্রু নদীর তীর পর্য্যন্ত এইরূপে গমন হইল। তথায় পূর্ব্বে ধন্নু আসিয়া অতি উৎকৃষ্ট তরী একখানি ও সামান্য নৌকা আর দুই চারি খানি ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। প্রধান নৌকায় নব দম্পতি—সঙ্গে পেস্‌খেজমৎ ও পরিচারিকাগণ এবং অপর সকল নৌকায় এক খানিতে বন্নু-ধন্নু-প্রমুখ দুলীনের আদ্য-সহচরগণ ও অন্য কয়খানিতে চাঁদ ও আলিবর্দ্দি-প্রমুখমুলতানী দল প্রভৃতি প্রভুর দেহরক্ষক রূপে জলপথে চলিল। অবশিষ্ট সমুদয় পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ সৈনিক ও কামানাদি সোহনলালের অধ্যক্ষতায় নদীর পুলিনস্থ পথ বহিয়া, যতদূর সম্ভব, নৌকার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। শেষে কিন্তু সঙ্গ ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিল।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—৪—

নানা কথা।

আমাদের ইতিহাস শেষ হইয়া আসিল। যদিও দুলীনের পরবর্ত্তী জীবনে ঘটনা এখনও অসংখ্য, কিন্তু পুস্তক বৃহৎ হইয়া উঠিল, কাজেই সমাপ্তির প্রয়োজন। ইচ্ছা ছিল, এই আখ্যায়িকাকে চারি কাণ্ডে বিভক্ত করিব;—প্রথম ইউরোপ-কাণ্ড; দ্বিতীয়, লাহোর-কাণ্ড; তৃতীয়, কাংরা-কাণ্ড; চতুর্থ, দুলীনের আশ্চর্য্য জীবনের পরবর্ত্তী কাণ্ড। কিন্তু এখনই ইতিহাস প্রকাণ্ড হওয়াতে চতুর্থ কাণ্ড আর লিখিত হইল না—তদ্বর্ণনীয় বিষয়ের সারাংশ মাত্র অতি সংক্ষেপে সমাবেশিত হইতেছে। বিশেষতঃ এই আখ্যায়িকার মূল উদ্দেশ্য ঐ তিন কাণ্ডেই বহুলাংশে সিদ্ধ হইয়াছে। মূল উদ্দেশ্যটী কি?

মূল উদ্দেশ্য এই;—যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের স্বদেশীয় শেষ স্বাধীন ভূপতি—ইংরাজাধিপত্যের অনিবার্য্য মহা-স্রোতে পড়িয়া মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি সকল সাম্রাজ্য ও সকল রাজ্য ভাসিয়া যাইবার পরেও যিনি আর্য্যাবর্ত্তের এক বিশাল অংশে সাম্রাজ্য স্থাপন পূর্ব্বক যথার্থ সিংহ-বিক্রমে বহুকাল আধিপত্য

করিয়া গিয়াছেন, সেই মহা-প্রভাব রণজিৎ সিংহের অসাধারণ প্রতিভাময়ী কীর্ত্তি, শাসন-প্রণালী এবং রাজকীয় ও সামাজিক রীতিনীতি প্রদর্শনই মূল অভিপ্রায়—তৎসঙ্গে কেন সে সাম্রাজ্য স্থায়ী হইল না—কেন তাঁহার অবসানেই অবসান প্রাপ্ত হইল—প্রণালী-মূলে কি দোষ ছিল, তাহাও এই চিত্র মধ্যে কথঞ্চিৎ প্রতিফলিত হইয়াছে! এ চিত্রে প্রতিষ্ঠা-যোগ্য অন্য কোন গুণ থাকুক বা নাই থাকুক, কিন্তু রাজচরিত্র, রাজ-সভার চিত্র এবং শাসনের রীতি, গতি, প্রথা প্রভৃতি যাহা কিছু প্রদর্শিত হইয়াছে, সে সমস্তই সত্য—গুণ-পক্ষপাতে অন্ধ হইয়া দোষ কীর্ত্তনেও ত্রুটি হয় নাই। তত্তৎসম্বন্ধে এমন চিত্রও অনেক আছে, সে সব তথ্য পঞ্জাবের সচরাচর প্রচলিত ইতিহাসে দৃষ্ট হয় না।

দ্বিতীয়তঃ উপাখ্যানের নায়ক নায়িকার জীবন বিবরণ যতদূর বিবৃত হইয়াছে, তাহাই তাঁহাদের জীবনের প্রধান ঘটনা এবং তাহাতেই তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি ও চরিত্রের বিকাশ ও পরিচয় যথেষ্ট হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের পরবর্ত্তী জীবন-বৃত্তের বৃত্তান্ত-রেখা-গুলি বিশেষরূপে অঙ্কিত আর না করিয়া স্থূলতঃ উল্লেখমাত্রই যথেষ্ট হইতে পারিবে। অতএব তাহাই করিতেছি।

* * * * * *

তরণী-যোগে তরুণী-প্রণয়িনী সহিত তুলীন কি সুখে চলিলেন, তাহা পবিত্র প্রেমের প্রেমিক ও প্রেমিকাগণ আপনারাই ধ্যান করিয়া লউন, গ্রন্থকারের তদ্বর্ণনার কষ্টবহন বৃথা! বিশেষ নানা উপসর্গময় অবিশ্রান্ত শ্রম, চিন্তা, ক্লেশের পর এই সুখ-যাত্রা যেন সশরীরে স্বর্গ-প্রয়াণবৎ অনুপম শান্তিসাধক হইল! লীলাবতীর কৌমার্য্য-মাধুর্য্য যেমন সুবিমল ও সুকোমল ছিল—শুদ্ধ বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের কথা বলিতেছি না, আন্তরিক ও ব্যবহারিক সৌন্দর্য্যের কথাই অধিক লক্ষ্য—এখন তাঁহার নব-বধূ-জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন মাধুর্য্য আরো আশ্চর্য্যরূপে দিন দিন বিকাশ পাইতে লাগিল! নির্ম্মল পতি-প্রেমানুরাগ, অনলস পতি-সুশ্রূষা, সুমধুর অধীন জন-বাৎসল্য, সর্ব্বদিকে সমান দৃষ্টি, অথচ বালিকার ন্যায় সুমিষ্ট সরল স্বভাব তুলীন যতই দেখেন, ততই মুগ্ধ—ততই জীবনকে ধন্য জ্ঞানে সর্ব্বসুখ-প্রেরয়িতা পরম পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা-রসে দ্রবীভূত হন!

যথাকালে তাঁহারা রূপাড় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের নিমিত্ত যে স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাঁহারা সসৈন্য তথায়ই শিবির স্থাপন করিলেন। তাঁহার সৈন্য তাঁহাদের অগ্রেই আসিয়া অদূরে অপেক্ষা করিতেছিল। এখন মিলিত হইল।

অন্যান্য সর্দারের অপেক্ষা ভুলীনের স্কন্ধাবার আরো সুন্দর, আরো সুনিয়ন্ত্রিত, আরো শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ ধারণ করিল! মহারাজ দেখিয়া সুখী হইলেন—মহারাজ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন; যখন তখন ডাকাইতেন; দরবারে আপনার সিংহাসনের নিকটে বসাইতেন; লর্ড বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ-কালে সঙ্গে লইয়া যাইতেন! ওপক্ষে ডুলীনও এই আশাতিরিক্ত স্নেহ, অনুকম্পা ও বিশ্বাসের অনুরূপ ভক্তি, তৎপরতা, যোগ্যতা, সরলতা, সদ্বুদ্ধি, সদ্গুণ ও সদ্ব্যবহার প্রদর্শনে অনুমাত্র ত্রুটি করিতেন না!

রূপাড়ে পঞ্জাব-সিংহের সহিত ব্রিটিস-সিংহের রাজ-প্রতিনিধি মহানুভব লর্ড বেণ্টিঙ্ক, খৃঃ ১৮৩১অব্দের শরৎ কালে সাক্ষাৎ ও সন্ধি বন্ধন করিতে আসাতে উভয় পক্ষে যে মহা সমরোহ ব্যাপার ঘটিয়াছিল এবং কয় দিবস ধরিয়া সেই ঐশ্বর্য্যের মহা মেলায় যে মহোৎসাহময় মহোৎসব ও মহা প্রদর্শন চলিয়াছিল, তাহা ইতিহাসের পত্রাবলী মধ্যে উজ্জ্বলরূপেই বিবৃত আছে; সুতরাং এরূপ উপন্যাসে তদ্বিশেষ বর্ণনা দ্বারা লিপি-প্রাচুর্য্য অনাবশ্যক। সংক্ষেপতঃ এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যেমন কবির লড়াইতে কে কত গলাবাজিতে ও সঙ্গীত-রচনার নৈপুণ্যে অপর পক্ষকে হারাইতে পারে, প্রাণপণে তাহারি চেষ্টা হয়; এই রাজকীয় মহামেলাতেও অবিকল তাহাই প্রায় ঘটিয়াছিল—কাহার কেমন প্রবল সামরিক বল, কাহার কেমন যুদ্ধোপকরণ সাজ-সজ্জা, কোন্ পক্ষের কিরূপ প্রকরণের যোদ্ধ্‌দল, কাহার কিরূপ ঐশ্বর্য্য, কাহার কেমন কূটমন্ত্রণাময় রাজ-চাতুর্য্য, উভয় পক্ষ কেবল তদভিনয় প্রদর্শনেই পরোমৎসাহী হইয়াছিলেন!

পাঠক মহাশয়েরা সম্প্রতি ঐরূপ এক ব্যাপার দেখিয়াছেন। বেশী দিন নয়, খৃঃ ১৮৮৫ সালের এপ্রেল মাসে কাবুলাধিপতি আমির আবদুর্ রহমন্‌কে লইয়া রাউলপিণ্ডিতে আমাদের গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর যে মহা সমারোহ ব্যাপার করেন—যেরূপে দীন দুঃখী ভারত-প্রজার অর্থ-শ্রাদ্ধের অদ্ভুত কাণ্ড দেখান, তাহা পাঠক মণ্ডলীর প্রত্যক্ষীভূত বা প্রত্যক্ষবৎ শ্রুত বিষয়! তদ্ধেতু ও রূপাড়ের রঙ্গভূমির বিস্তারিত বর্ণনা অনাবশ্যক!

সে যাহা হউক, সেই রূপাড়ের রঙ্গভূমিতে আমাদের ডুলীন একজন সামান্য অভিনেতার কাজ করেন নাই—সৈনিক মহাভিনয় কালে তাঁহার পরিচালিত সৈন্যগণই দৃশ্যতঃ ও কার্য্যতঃ পঞ্জাব বাহিনীর মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান-রূপে প্রতিষ্ঠা-লাভে সমর্থ হইয়াছিল।

মহারাজ মহা সন্তুষ্ট। রূপাড়-ব্যাপার সমাপ্ত হইয়া গেলেই তিনি মহাত্মা দুলীনের প্রতি যে কার্য্যভার অর্পণ করিলেন, তাহাতেই তাঁহার প্রসন্নতার পরিমাণ বুঝা গেল।

সে কার্য্যভার এই ;—রণজিৎ সিংহের সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের মধ্যে আফ্‌গান-স্থানের দিকে সুবিশাল প্রান্তসীমায় যত প্রদেশ ; অর্থাৎ পেসোয়ার এবং অটক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বক্র সরল সীমা-রেখা ধরিয়া গিয়া পঞ্জাবের পূর্ব্ব-ভাগস্থ পার্ব্বত্য অঞ্চলের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ; এই সুদীর্ঘ প্রান্ত-রেখার মধ্যে যত জনপদ, যত দুর্গ, যত সৈনিক চৌকী, যত রাজকীয় বিভাগ ছিল, তত্তাবৎকেই মহারাজা দুলীনের কর্তৃত্বাধীন করিয়া দিলেন। সে সমস্ত বিভাগে যত কেল্লাদার, যত জমীদার, যত জায়গিরদার, যত শাসনকর্ত্তা, যত সৈন্যাধ্যক্ষ, তাঁহাদের সকলের উপরে সকল বিষয়ে, বিশেষতঃ শান্তি ও সৈন্য সম্বন্ধীয় তাবদ্বিষয়ে দুলীন "সর্ব্বাধ্যক্ষ" নামা নবসৃজিত উচ্চ পদ পাইলেন।

তাঁহার কার্য্য কি ? তিনি যে শুদ্ধ তত্ত্বাবধান করিয়াই বেড়াইবেন, তাহা নয় ; যেখানে যখন যে প্রকারের যত সৈন্য রক্ষা বা পরিচালনা তাঁহার বিবেচনায় আবশ্যক হইবে ; যে প্রণালীতে, যে রীতিতে, যে প্রকরণের শিক্ষা ও বশ্যতা-নিয়ম তিনি নির্দ্ধারণ করিবেন ; সৈনিক ও শান্তি-বিভাগে যে শ্রেণীতে, যে পদে, যে সব কর্ম্মচারী প্রভৃতি তিনি নিযুক্ত বা পদচ্যুত করিবেন ; শাসন-সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত নিয়মাদি ও আজ্ঞা প্রচার করিবেন ; তাহাই হইবে।

এতদূর বিশ্বাসের কাজে এবং এত উচ্চপদে রণজিৎ আর কাহাকে কখনই নিযুক্ত করেন নাই! একথাটা ফকিরজী দুলীনের সন্তোষোৎপাদন উদ্দেশে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। ফলতঃ এই নিয়োগে ফকিরজীর হস্ত স্পষ্ট দৃষ্ট হইল—দুলীনের অবিচলিত স্বামীধর্ম্ম, দুলীনের অসাধারণ ধর্ম্মানুরাগ, দুলীনের অলোক-সাধারণ মহত্ত্বভাব, দুলীনের তৎপরতা ও যোগ্যতা, গুণবোদ্ধা ও জ্ঞানবৃদ্ধ আজিজুদ্দিন সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গুণগ্রাহী প্রভুর হৃদগত করিয়া দিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। রণজিৎ নিজেও বিখ্যাত নর-বণিক, তিনিও দুলীনকে চিনিয়াছিলেন! তদুপরি প্রিয়তম মন্ত্রীর সহিত মতৈকতা। সুতরাং আত্ম-হিত এবং এমন সুযোগ্য হিতৈষী ভৃত্যের গুণানুযায়ী উন্নতি সাধনার্থ এই অভিনব উন্নত পদের সৃষ্টি করিলেন।

দুলীন স্বীয় প্রিয়তমার সহিত পরম সুখে এই নূতন কর্ত্তব্যে ব্রতী হইলেন।

আপন অধীনস্থ সৈনিক বর্গ ও প্রিয় কর্ম্মচারিগণকে নিকটে রাখিতে ও তাহাদের দল বৃদ্ধি করিতে অনুমতি পাইলেন। তাহাতে অধিক তৃপ্তি ও অধিকতর উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। তাঁহার অধিকার-রেখার প্রায় মধ্যস্থলে "মুক্তি" নামক একটী পরম রমণীয় গিরি-দুর্গ মধ্যে তাঁহার প্রধান বাসস্থান নিরূপণ করিলেন। নদী,নির্ঝর,গিরি,বন,উপবন,গ্রাম,উপনগর,সবই তথায় বিদ্যমান। লীলাকে তথায় লইয়া গিয়া যখন জিজ্ঞাসা করেন "কেমন লীলা, এস্থান তোমার মনোমত তো?" লীলা সহাস্যে উত্তর দেন "লীলার মনোমত পতি যেখানে, সেই স্থানই লীলার মনোমত! বিশেষ আমি বুঝিয়াছি, কাংরার প্রতিকৃতি দেখিয়াই এই স্থানটা যখন লীলার বাসের জন্য মনোনীত হইয়াছে, তখন আর লীলার মনোমত হওনের অপেক্ষা কি?"

ডুলীন মাঝে মাঝে যখন তত্ত্বাবধান-ভ্রমণে যাইতেন, তখন লীলাকে মুক্তিতেই রাখিয়া যাইতেন। কিন্তু কাংরা দর্শনে লীলার মনোগত বাসনা জানিয়া এবং লীলার বয়স্যাগণের নিকট এবং তত্রত্য প্রজাবর্গের নিকট লীলার ও তাঁহার নিজের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া, একদা চাঁদ খাঁ প্রভৃতি সহচর ও জানকী প্রভৃতি সহচরী সঙ্গে পরিদর্শনে যাত্রা করিলেন। অন্যান্য স্থানের তত্ত্বাবধানের পর কাংরায় উপস্থিত হইলেন। তথায় যেরূপ অভ্যর্থনা হইল, তাহা আর বলিব না—সে অভ্যর্থনা নয়, পূজা! হাকিম সিংহের আনন্দের ইয়ত্তা নাই—দণ্ডবর স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষায় অণুমাত্র যে বিচলিত হয়েন নাই, তাহা দণ্ডবর নিজ মুখে বলিতে চাহিলেন না—হাকিমের মুখে আর প্রজার মুখেই সপ্রমাণ হইল!

তাঁহারা যথাকালে মুক্তিতে ফিরিয়া আইলেন। ডুলীন স্বীয় কর্ত্তব্য সুন্দররূপে এবং মহারাজার সম্পূর্ণ সন্তোষজনকরূপে যে সুনির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, তাহা ডুলীনের পূর্ব্ব জীবনজ্ঞ পাঠককে খুলিয়া বলা বাহুল্য।

তৎকালে তাঁহার আর্থিক অবস্থা এইরূপ—নিজের মাসিক বেতন ত্রিসহস্র এবং পর্য্যটনব্যয় অর্দ্ধ সহস্র নিরূপিত ছিল—এত অধিক বেতন আর কোন ইউরোপীয় কর্ম্মচারীকেও রণজিৎ কখনো দেন নাই! শুদ্ধ তাহাই নহে, লীলার পৈতৃক রাজ্য তিনি হরণ করিয়াছেন—সে রাজ্যের সুশাসন ও রাজস্ব তাঁহার পতির গুণেই এখন বহুগুণে অধিক হইয়াছে; বিশেষ লীলাকে কি তাঁহার মাতাকে কখনই তিনি কিছু প্রত্যর্পণ করেন নাই; অধুনা তাহার

অনুতাপ ছল করিয়া লীলার নামে কাংরার রাজস্ব হইতে মাসিক অর্দ্ধসহস্র মুদ্রা প্রদানে আজ্ঞা দিলেন। তদ্ব্যতীত ডুলীনের নিজ বাহিনীর ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসিক পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা নির্দ্ধারিত হইল। কিন্তু রাজকোষ হইতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে এক কপর্দ্দকও আসিত না, ডুলীনের অধীন প্রত্যেক প্রদেশের শিরে এই সমস্ত ব্যয়-বন্টনের ব্যবস্থা হইল।

প্রভু-কার্য্যের প্রতি ডুলীনের আন্তরিক যত্নানুরাগের আধিক্য পক্ষে এ সকল বন্দোবস্ত সামান্য উত্তেজক হয় নাই। কিন্তু এ সমস্ত অপেক্ষাও আর একটী বিষয় গুরুতর উত্তেজক হইয়াছিল। সেটা অন্য কিছু নয়, স্বীয় পৈতৃক রাজ্যোদ্ধারের বাসনা! অর্থাৎ স্বীয় সুকঠিন কর্ত্তব্য সমূহ সুচারুরূপে সাধিয়া তুলিতে পারিলে মহারাজ আরো সন্তুষ্ট হইবেন; তখন ফকিরজীর আনুকূল্যে সুদান রাজ্যটী অধীন অধিকার রূপে লাভ করিবার পক্ষে সুবিধা হইলেও হইতে পারে। এই মহদুদ্দেশ্য সিদ্ধ্যর্থ প্রভুকার্য্যে অহর্নিশি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অসামান্য অধ্যবসায় প্রয়োগ করিতে লাগিলেন—আপনার বুদ্ধি, সাধ্য, প্রতিভা (সে সকলও সাধারণ নয়) এবং অভিনিবেশ-শক্তি সম্পূর্ণরূপে খাটাইয়া অল্পকালেই যে প্রকার ফলোৎপাদনে সমর্থ হইলেন, তাহা নিতান্তই আশাতিরিক্ত। এক এক সময়ে এক এক বিষয়ে, অসাধ্যকেও সাধ্য করিয়া তুলিলেন। চতুর্দ্দিকে ধন্য রব উঠিল—বিপক্ষ সর্দ্দারগণ অবাক্ হইল—নির্ব্বাক্ ভাবে রহিল! মিত্রমণ্ডলী আরো পুলকিত—আরো অনুরাগী হইল—দিন দিন বান্ধব ও অনুরক্ত দলের সংখ্যা বিস্তর বাড়িতে লাগিল—শত্রুদল হীনবল হইয়া পড়িল। ফকিরজীর আনন্দের ইয়ত্তা রহিল না—মহারাজ যথার্থই অপরিমিতরূপে সন্তুষ্ট, আকৃষ্ট, স্নেহপূর্ণ ও সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রয়ত্ন ও পুরস্কার।

দুই বৎসরাধিক কাল এইরূপ চলিতেছে, এমন সময় আফ্গান জাতি পেসোয়ার পুনঃপ্রাপ্তি মানসে বার বার নৈরাশ্যের পর এইবার একবার শেষ চেষ্টা করিতে উদ্যোগী হইল। এবার সকল বারের অপেক্ষা অত্যন্ত বেশী

আয়োজনে প্রবলতর বাহিনী লইয়া পর্ব্বত হইতে নামিয়া ভয়ানকরূপে আক্রমণ করিল।

ঢুলীনের ব্যবস্থা-মালা অতি আশ্চর্য্য—পরাক্রান্ত শক্রর নিমিত্ত যেন নিয়তই প্রস্তুত! সুতরাং অতর্কিত, নিশ্চিন্ত, নিদ্রিত বৈরীর উপর জলপ্রপাতের ন্যায় সহসা পড়িবে, আর মারিবে, আফগানদিগের এই যে প্রত্যাশা ছিল, তাহা স্বপ্ন-দর্শনসম দুরাশা মাত্র হইল! অন্ততঃ দুর্গাবরোধরূপ অপমানে ও ঘোর বিপদে ফেলিবে বলিয়া মনে মনে যে বড় সাধ ছিল, ঢুলীনের প্রতিভা ও পরাক্রমে সে সাধও পূরিল না!

ঢুলীন সে সেনাপতি নন যে, কেবল আক্রমণ নিবারণের ব্যবস্থা মাত্রেই তাঁহার কার্য্যের সমাপ্তি, তাঁহার গুপ্তচরগণ কর্তৃক সংবাদ-সংগ্রহ-প্রণালীও চমৎকার! আফগানেরা ভাবিয়াছিল, অতর্কিত বিপক্ষকে আক্রমণ করিবে; কিন্তু তাহাদের অবতরণের কয় দিন পূর্ব্বে ঢুলীন সে সংবাদ পাইয়া গোপনে সম্পূর্ণরূপেই প্রস্তুত হইয়াছেন এবং লাহোরেও গোপনে সংবাদ পাঠাইয়াছেন!

অতএব অসংখ্য বিপক্ষদল রণজিৎ সিংহের অধিকার মধ্যে আসিবামাত্রই প্রতিরোধের লক্ষণ ঈক্ষণ করিয়া তাহারা চমকিয়া উঠিল! তাহারা রন্ধ্র-গিরিপথের সন্ধান জানে,এই ভরসায় রাত্রেই দৌড়কুচে আসিতেছিল—ভাবিয়াছিল, প্রভাতের পূর্ব্বেই পেসোয়ারে আসিয়া পড়িবে। কিন্তু সহসা অধিক রাত্রে সে নগরের অনেক দূরে এক প্রকারের একটী বংশীধ্বনি শুনিল—যেমন বাঁশী বাজিল, অমনি সহস্র অসি দ্বারা তাহাদের অগ্রণী-দল আক্রান্ত, বিপর্য্যস্ত,পরাস্ত ও হতাহত হইল! অধিকাংশ লড়িতে লড়িতে পড়িল—অল্পাংশই কেবল পলাইতে পারিয়া পশ্চাতে ছুটিয়া গিয়া মূল চমূতে সংবাদ দিল! মূল চমূ আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না—তাড়াতাড়ি সম্মুখে ও দুই পার্শ্বের কিয়দ্দূর খাদ খনন পূর্ব্বক আত্ম রক্ষার উপায় চেষ্টায় নিযুক্ত রহিয়া সেইখানেই স্থিতি করিল! প্রভাতে ভীষণ সম্মুখ-রণ বাধিল। আফগানেরা কিরূপ অপ্রতিহত বীর্য্যবান বীর, তাহা পাঠকবৃন্দের অগোচর নাই—তাহাদের আক্রমণ-বেগ নিতান্তই দুর্দ্ধর্ষ; কিন্তু তাহাদের দুর্ভাগ্যক্রমে যেমন তেমন সেনাপতি ও সেনা তাহাদের প্রতিরোধক নয়, ঢুলীনের শিক্ষিত ও নিজের চালিত সৈন্য যেন বজ্র-প্রাচীরের ন্যায় সেই অমানুষিক বেগ সহ্য করিল; সেই বীর্য্যময় ধৈর্য্যের ফলে এবং সেনাপতির ব্যূহ-নির্ম্মাণ-কৌশলে অল্পক্ষণেই মুসলমান চমূ সাহসশূন্য,

ছিন্ন ভিন্ন, পরাজিত, পলায়িত ও কচুবনের বা কুযুক্তির ন্যায় ছেদিত হইল! সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প হইয়াও দুলীন-সৈন্যের সম্পূর্ণ জয়-লাভ ঘটিল! পশ্চাতে মারিতে মারিতে তাড়াইতে তাড়াইতে দুর্দ্দান্ত আফগানগণের অবশিষ্টকে তাহারা তাহাদের নিবাস-পর্ব্বতে উঠাইয়া দিয়া আইল!

অন্য সেনাপতি হইলে শত্রুসংখ্যা এত অধিক দেখিয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইয়া উপযুক্ত সাহায্য প্রার্থনায় প্রভুর নিকট দূত পাঠাইত। তাহাতে শত্রুদল প্রবল হইয়া নগর গ্রাম ক্ষেত্রাদি ছারখার করিত এবং দুর্গাবরোধের বিপদ ও অপমান রণজিৎকে সহ্য করিতে হইত। কিন্তু প্রতিভাশালী অতুল যোদ্ধা দুলীনের কার্য্যরীতি সামান্য সেনানীর ন্যায় সামান্য সঙ্কেতানুগত নয়—তাঁহার বুদ্ধি সর্ব্বপ্রকার কঠিন অবস্থা অতিক্রমে সমর্থ, সুতরাং এমন ঘোর প্রতিকূল অবস্থাতেও জয়লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি অনুকূল হইবেন আশ্চর্য্য কি? যখন লাহোরে এই আশাতিরিক্ত অসম্ভব জয়ের সংবাদ গেল, তখন মহারাজ অতি-মাত্র আহ্লাদে সভামধ্যে মুক্ত-কণ্ঠে স্বয়ং ঐরূপ প্রতিষ্ঠাবাদ ব্যক্ত করিলেন এবং দুলীনের সাহায্যার্থ যাহাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাদিগকে ফিরাইলেন!

আবার যখন নিভৃতে ফকিরজীর সহিত "এমন কার্য্যের কি পুরস্কার যোগ্য?" এই পরামর্শ করেন, তখন ফকিরজী দুলীনের চির-বাঞ্ছা পূরণের সুযোগ পাইলেন। দুলীনের মনোগত কথা ফকিরজী বিশেষরূপেই জানিতেন; তৎসাফল্যের সুযোগ সন্ধানে ছিলেন—দুলীনকে আশ্বাস দিয়াও রাখিয়া-ছিলেন—অদ্য সেই সুযোগ উপস্থিত! ফকিরজীর প্রার্থনানুসারে কৃতজ্ঞ রণজিৎ রাজোপাধি সহিত সুদান রাজ্য দুলীনকে জায়গিররূপে দান করিলেন! দুলীন এখন "রাজা দুলীন সিংহ" হইলেন!

রাজা দুলীন সিংহ যে, সুদান-রাজপুত্র এ সংবাদ বহু পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বত্র—বিশেষতঃ সুদানে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এখন প্রজারা আপনাদের সেই পূর্ব্ব প্রভুপুত্রকে রাজা রূপে পাইয়া অপার সুখার্ণবে ভাসিল—দুলীন পৈতৃক রাজ-সিংহাসন না হউক, রাজ-গদি লাভে কৃতার্থ হইলেন! দুলীন জায়গির পাই-লেন বলিয়া পূর্ব্ব কর্ত্তব্যের ব্যতিক্রম ঘটিল না, তবে পূর্ব্বে তাঁহার অবস্থান-মন্দির অন্যত্র ছিল, এখন সুদানে নিরূপিত হইল! দুলীন সেই সীমান্ত প্রদে-শের সর্ব্বাধ্যক্ষতা পদেও প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। তাঁহার অধিকার ও ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি হইল। বিশেষতঃ অন্যান্য স্থানাপেক্ষা কাংরার উপরে তাঁহার

কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব অধিক হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে শুদ্ধ শান্তি ও সামরিক বিষয়ে দণ্ডবর সিংহ তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিলেন, এখন ফকিরজীর অনুগ্রহে যে নূতন বন্দোবস্ত হইল, তাহাতে রাজস্ব ও বিচার প্রভৃতি অন্যান্য তাবদ্বিষয়েই দণ্ডবর তাঁহার সম্পূর্ণ অধীন হইলেন। সরল দণ্ডবর তুলীনের গুণে এতদূর চমৎকৃত ও বিমোহিত যে, সে অধীনতায় কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না। সুতরাং কাংরা রাজ্যেও প্রায় তুলীনই রাজা ও লীলাই রাণী হইলেন! তুলীন বলিতেন, "রাজ্ঞী লীলা-দেবীর পৈতৃক রাজ্যে তিনি কেবল রাণীজীরই আজ্ঞাপালক অধীন কার্য্যাধ্যক্ষ মাত্র! ফলতঃ উভয়েরই পৈতৃক রাজ্যের রাজত্ব লাভ—নামে সম্পূর্ণ না হউক—কার্য্যতঃ সম্পূর্ণরূপেই ঘটিল—প্রজা-পালন ও প্রজাগণকে সুখে রাখিবার সামর্থ্য লাভ হওয়াতেই তুলীনের যেন জন্ম সার্থক বোধ হইতে লাগিল!

কিন্তু তুলীনকে এই সুদান জায়গির দান কালে মহারাজাকে সামান্য জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই—গোলাপ সিংহ কি সহজে ছাড়িবার পাত্র? না, ধ্যান সিংহের মন্ত্রণাজাল এমনি ক্ষীণ যে, তাহা ছিন্ন করিয়া বাহির হইতে স্বয়ং রণজিৎকেও কষ্ট পাইতে না হয়? যাহা হউক, ধ্যানের কৌশলে সুদানের পরিবর্ত্তে আর একখানি উচ্চতর মূল্যের জায়গির পাইয়া তবে তাঁহার অগ্রজ মহাশয় এখানি ছাড়িয়া দিলেন! কিন্তু তথাপি মনে মনে আক্রোশানলের অবশেষ ভস্মাচ্ছাদনে রহিয়া গেল!

যে শুভ দিনে রাজা তুলীন সিংহ ও রাণী লীলাবতী সুদানের রাজপুরীতে প্রবেশ করেন, সে দিন শুদ্ধ তাঁহারাই নন, তাঁহাদের সঙ্গে পূর্ণ চন্দ্রোপম একটী নবকুমারও লীলার ক্রোড় শোভা করিতেছিল! পুরী-প্রবেশের অনতিবিলম্বেই সেই কুমারের শুভান্নপ্রাশনে মহা ঘটা পটা হইল! কুমারের নাম পিতামহের নামানুসারে বিক্রমজিৎ রাখিলেন! কয়েক বৎসরে আর দুইটী নন্দন ও একটী নন্দিনী জন্ম গ্রহণ করিল। তনয় দুইটীর নাম সংসারচাঁদ ও সুসারচাঁদ এবং কন্যাটীর নাম চন্দ্রাবতী হইল!

তুলীনের সুপালনে শ্রীভ্রষ্ট সুদান অল্পকালেই সর্ব্বাঙ্গীণ সৌষ্ঠব-সম্পন্ন হইয়া উঠিল—প্রজারা বহুকালের পর আবার সর্ব্ব সুখে সুখী হইয়া দেবতার দ্বারে তাঁহার শুভকামনা করিতে লাগিল! রাজ্যে দিন দিন প্রজা বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া তুলীন ও লীলার হর্ষের সীমা রহিল না! তুলীন স্বীয় প্রিয়তমা ও পুত্র কন্যাদির

সহিত এইরূপে খৃঃ ১৮৩৯ অব্দ পর্য্যন্ত পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। হায়! সেই বৎসরেই পঞ্জাবাদিত্য মহারাজ রণজিৎ ইহলোক হইতে অস্তমিত হইলেন! সেই অপার শোকের সঙ্গে, দুলীনের অন্যান্য দুঃখও উপস্থিত হইল। রণজিতের পরলোক গমনে রাজ্য মধ্যে যে সব বিপ্লব, গোলযোগ, দলাদলি ও মারামারি কাটাকাটি চলিয়াছিল, তাহা ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই জ্ঞাত আছেন: সুতরাং সেই উচ্ছৃঙ্খলার মধ্যে দুলীন যে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবেন, তাহা অসম্ভব। অধিকন্তু ক্ষুদ্রাশয় প্রধান বিপক্ষ গোলাপ সিংহও সুযোগ সন্ধানে বৈরসাধনে ত্রুটি করেন নাই—কখনো বা দরবারে গ্লানি ও কুমন্ত্রণার পরিচালক হইয়া অনিষ্টের বিশেষ চেষ্টা পাইলেন; কখনো বা সৈন্য সমাবেশ পূর্ব্বক আক্রমণও করিয়াছিলেন। কিন্তু দুলীনের গুণে পঞ্জাবের অধিকাংশই তাঁহার পক্ষ ও বশীভূত; এবং প্রভুপরায়ণ সুশিক্ষিত সাহসী অনুচরব্যূহে তিনি সর্ব্বদা বেষ্টিত; সুতরাং তাঁহার ন্যায় মহা-প্রভাবশালী বীর পুরুষের পক্ষে গোলাপের সেই সব দুশ্চেষ্টা ব্যর্থ করা তখন কতক্ষণের কাজ? শেষ গোলাপ সিংহ এমন শিক্ষা পাইলেন যে, তিনি কিম্বা অন্য কেহই আর দুলীনের বিরুদ্ধে কোন বিশেষ শত্রুতা-চেষ্টায় বড় একটা সাহস পাইতেন না!

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—৪—

উপসংহার।

পঞ্জাবাদিত্য রণজিৎ অস্তগত, আমাদের আখ্যায়িকার উপসংহারও আবশ্যক। কয় বৎসর পরে ইংরাজের সহিত পঞ্জাবের যুদ্ধ বাধিল। দরবার হইতে যুদ্ধ সাহায্যার্থ জায়গিরদাররূপে দুলীন আহূত হইলেন। দুলীন নিজে গেলেন না, সোহনলালের অধীনে কিছু সৈন্য পাঠাইলেন। ইংরাজ তাঁহার প্রতি অমানুষিক, অভদ্র ও নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছে, তথাপি তাহাদের নুন খাইয়াছিলেন এবং তাহাদের দেশে মানুষ হইয়াছিলেন বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। সোহনলাল যাহাতে আভ্যন্তরিক দুর্গরক্ষা কার্য্যেই নিযুক্ত থাকে, দরবারের সাহায্যে এমন ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরে লর্ড হার্ডিঞ্জের সহিত সন্ধি হইল, গোল চুকিল। কয় বৎসর রাজ্যে দুলীন সুখে দুঃখে কাটাইলেন। সুখ—আপনার প্রিয় পরিজন ও অনুগত

প্রজাগণ লইয়া! দুঃখ—রাজ্যের নেতৃ-দল লইয়া! তাঁহারা একটা না একটা উৎপাত বাঁধাইতেন, সুখে থাকিতে দিতেন না!

কিন্তু হায়, সুখে দুঃখে জড়িত এ অবস্থাও দীর্ঘস্থায়ী হইল না। কতিপয় বৎসরের পর যখন ব্রিটিস সিংহ-কর্ত্তৃক পঞ্জাবের সিংহাসন অধিকৃত হইল,ডুলীনের চিরশত্রু গোলাপ সিংহ বৈরনির্য্যাতনের পুনর্ব্বার উত্তম সুযোগ পাইলেন। গোলাপ সিংহ স্বদেশের ও স্বীয় প্রতিপালক প্রভুবংশের যেরূপ হিতৈষী, যেরূপ বিশ্বাসী, যেরূপ কৃতজ্ঞ ভৃত্য, তাহা বোধ করি ইতিহাসের সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞ পাঠক মহাশয়ের অগোচর নাই! হায়, প্রধানতঃ তাঁহার গুণেই কি তাঁহার জন্মভূমি স্বাধীনতা-রত্নহারা পরকিঙ্করী হইয়া উঠে নাই? তাঁহার তত গুণ না থাকিলে কি তাঁহার দেশাপহারক প্রবল ধবল জাতি তাঁহার প্রতি, এত প্রসন্ন হন যে, সেই গুণের পুরস্কার স্বরূপ সোণার কাশ্মীর রাজ্য তাঁহাকে অর্পণ করেন? তাও বণিক-ইংরাজ-জাতি অমনি করেন নাই, প্রচুর অর্থ মূল্য রূপে লইয়া তবে করিয়াছেন! ফলতঃ তাঁহার যে গুণ, সে গুণমালায়, করুণাময় বিভু যেন ভূমণ্ডলের কোন দেশে কোন জাতি মধ্যে কোন মানব-নাম-ধারীকে—নিষাদ, পিশাচ, চণ্ডালকেও—ভূষিত (বা কলুষিত) আর না করেন!

সে যাহাই হউক, সেই সব্বনেশে গুণে শ্বেত রাজপুরুষগণকে বশীভূত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা ডুলীনের অনিষ্ট চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু তথাপি স্বীয় ইচ্ছার পরিমাণানুযায়ী অনিষ্ট ঘটাইতে পারিলেন না; যেহেতু ইংরাজ রাজপুরুষেরা হাজার তাঁহার বশীভূত হউন, তথাপি তাঁহারা ইংরাজ—বিনাপরাধে কাহারো প্রতি এককালে ততদূর নিষ্ঠুর অবিচার বা অত্যাচারে সম্মত হওয়া তাঁহাদের জাতীয় ধর্ম্ম নয়—বিশেষ ডুলীনের ন্যায় সর্ব্বগুণ-মণ্ডিত, সম্ভ্রান্ত, স্বামীধর্ম্ম-পরায়ণ, রণজিতের অতি বিশ্বাসী সুপ্রসিদ্ধ কর্ম্মচারীর প্রতি সেরূপ করিতে সম্মত হইলেন না। তবে তাঁহারা গোলাপ সিংহের প্ররোচনা ও উত্তেজনায় এবং আপনাদের গূঢ়াভিসন্ধিসাধক কৌশলবশেও সুদান রাজ্যকে পূর্ব্ববৎ প্রধান শ্রেণীর জায়গির পদে না রাখিয়া অপরিমিত বার্ষিক রাজস্ব নিরূপণ পূর্ব্বক সেটাকে একটী সামান্য ধাতুর জমিদারী মাত্র করিয়া তুলিলেন। ডুলীন আর তত সৈন্য ও সেরূপ সম্ভ্রম-সূচক নিদর্শনাদি রাখিতে পারিবেন না এবং অধীন প্রজাবর্গের বিচারভার তাঁহার হস্তে আর থাকিবে না! ফলতঃ রণজিতের সময়ে ও তৎপরেও তিনি নামে মাত্র অধীন জায়গিরদার ছিলেন

—কার্য্যতঃ স্বাধীন রাজার ন্যায় ক্ষমতা ও মান সম্ভ্রমের ভোগাধিকারী থাকিয়া পরমসুখে পৈতৃক রাজ্য পালন করিতেছিলেন। এখন সে সব ক্ষমতা ও মর্য্যাদার চিহ্ন মাত্রও রহিবে না। অধিক আর কি বলিব, সংক্ষেপে বলিতে গেলে, অধুনা বঙ্গদেশের বহু বহু প্রাচীন রাজবংশের এ দশা আমরা প্রতি দিন প্রত্যক্ষ করিতেছি, দুলীনের অবস্থা তখন তদপেক্ষাও হীন হইয়া পড়িল!

তেজীয়ানের পক্ষে প্রবাদই আছে "যাউক প্রাণ, থাকুক মান!" সুতরাং মহা তেজস্বী রাজা দুলীন সিংহ এরূপ হীন-পদস্থ হইয়া কি সুদানে আর থাকিতে পারেন? অর্থাগম বা অন্যান্য বিষয়ে যাহাই হউক, তাহা বরং সহনীয়. কিন্তু তাঁহার অধিকার মধ্যে সামান্য একজন ডেপুটী কমিশ্যনার বা নিম্ন শ্রেণীর বিচারক আসিয়া তাঁহার পুত্রবৎ প্রাণাধিক প্রজাকুলের মধ্যে বহু মূলে বিচার বিতরণ (যথার্থ কহিলে, বিতরণ নয়, বিক্রয়!) করিবে—তিনি কেহই নন—তাঁহার কোন ক্ষমতাই রহিবে না—তিনি কেবল সাক্ষীগোপাল হইয়া বসিয়া বসিয়া দেখিবেন—এমন কি, দুষ্ট লোকে ইচ্ছা করিলে তাঁহারও নামে মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া তাঁহাকে পর্য্যন্ত চোরের কাটরায় দাঁড় করাইতে পারিবে—হয় তো মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা তাঁহাকে পর্য্যন্ত কোম্পানির শ্রীঘরে পূরিয়া পায় বেড়ি হাতে হাতকড়ি পরাইয়া খুনে তস্করের সঙ্গে পেয়াদার বেত্রাঘাতের অধীনে খাটাইতে পারিবে! হায়! ইহাও কি ক্ষত্রকুলাবতংশ রাজপুত্র ও রাজার প্রাণে সহ্য হইতে পারে? যদিও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে বলিয়া কহিয়া সেই ভীষণ দুরবস্থার হাতে কিয়দংশে (সম্পূর্ণ কদাচই নয়—ইংরাজ-শাসনে মুড়ি মিছরির একই দর—মানীর মান নাই!) অব্যাহতি পাইতে পারেন, তথাপি সেই অনুগ্রহটুকুর নিমিত্ত কত দরখাস্ত—কতই সুপারিস—কতই তোষামোদ—কতই নীচতার প্রয়োজন! ভাবিলে হৃৎকম্প ধরে!

সুতরাং সাধের সুদানকে—প্রাণের জন্মভূমিকে জন্মের মত পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য বোধ করিলেন। তদুদ্দেশে প্রথমে কাংরার পর্ব্বত-গুহাবাসী যোগীন্দ্র সুসারচাঁদের সকাশে গমন পূর্ব্বক পরামর্শ স্থির করিলেন। তাঁহার অন্তঃসারময় উপদেশ আর স্বীয় হৃদয়ের সংকল্প একই হইল—সুতরাং দ্বিধা মাত্র আর রহিল না—প্রয়াণই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। তবে অগ্রে ভাবিয়াছিলেন, দারা, পুত্র, অমাত্য, ভৃত্য, অনুচরগণ সহ সদলে পারস্যাভিমুখে যাইবেন; এক্ষণে সে অভিপ্রায়ের রূপান্তর ঘটিল।

এখন ধার্য্য হইল, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সুদানের গদিতে অধিষ্ঠাপন ও অমাত্য ভৃত্যানুচরের অধিকাংশকে অর্থাৎ যত কর্ম্মচারী ও যত গুলি সৈনিক, বর্ত্তমান অবস্থায় রাখা সম্ভব, তত সংখ্যক লোক জনকে পুত্রের অধীনে রাখিয়া লীলা ও অপত্যগণ সহিত তিনি কলিকাতায় গমন করিবেন। কলিকাতায় কুমারদ্বয় ও কুমারীর শিক্ষোন্নতির যেমন সম্ভাবনা, এমন আর তৎকালে এতদ্দেশে কুত্রাপি সিদ্ধ হইবার সুযোগ ছিল না। হয় তো, তথায় গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের সহিত আলাপ পরিচয়ের পর তাঁহার নিজের না হউক, তাঁহার জ্যেষ্ঠ নন্দনের পক্ষে কোন অনুকূল বিশেষ বিধান হইলেও হইতে পারে এবং কিছু কালান্তে মধ্যম পুত্রের প্রতি কাংরার শাসন সম্বন্ধীয় ভরার্পণ ঘটিলেও ঘটিতে পারে; যেহেতু কাংরা তাহার মাতামহের সম্পত্তি এবং কাংরায় তাহার পিতা সুবর্ণ ফলাইয়াছেন—এই দুই প্রবল কারণে দাবিটী যৌক্তিক বলিয়া গ্রাহ্য হইলেও হইতে পারে।

অবিলম্বে এই সব প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল। যখন প্রাণাধিক পুত্র বিক্রমজিতের নিকট তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী বিদায় গ্রহণ করেন, তখনকার শোচনীয় ব্যাপার নিতান্তই বর্ণনাতীত! যৎকালে জন্মভূমি, পিতৃ-প্রজা, আত্মীয় স্বজন ও স্বীয় পালিত জনগণ হইতে রাজা ফুলীন ও রাণী লীলা বিচ্ছিন্ন হইয়া যান, তখনকার হাহাকার রব সুগভীর সিন্ধুকল্লোলকেও পরাজিত করিল! কোন্ প্রাণে কিরূপে যে তাঁহারা বাহির হইলেন, তাহা পরে তাঁহারা আপনারাই স্মরণ ও নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই, অন্যে কি বর্ণনা করিবে! কেবল পুত্র, মিত্র, প্রজামণ্ডলীকে "পুনর্ব্বার আসিবার চেষ্টা পাইব" বলিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত ও প্রবুদ্ধ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ কালে ও অন্যান্য সময়ে বার বার সে সংকল্প সিদ্ধও করিয়াছিলেন!

চাঁদ খাঁ, আলিবদ্দি খাঁ, বন্নু, ধন্নু প্রভৃতি যাহারা পশ্চাতে রহিতে কিছু-তেই সম্মত হইল না, তাহারা প্রভুর সঙ্গে কলিকাতায় গমন করিল—কালে তথায় তাঁহারা সকলেই দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক পরম পরিতোষে প্রিয় প্রভুর সকাশে কাল ক্ষেপণ করিতে লাগিল।

আমাদের চৈতন নিতান্তই চৈতন্যশূন্যবৎ বহুকালের বাসস্থান পঞ্জাব ত্যাগ করিলেন। তিনি তখন বয়সে স্থবির হইয়া উঠিয়াছেন—বহু দিন হইতে কোন বিশেষ কার্য্যে রত ছিলেন না—কেবল প্রভুর শিশু পুত্রকন্যাগণের

অসীম কৌতুকোৎপাদক ক্রীড়ক ও ক্রীড়ার সঙ্গী হইয়া পরমানন্দে কাল কাটাইতেছিলেন—হায়! বৃদ্ধ দশায় সে সুখের খেলাও ভাঙ্গিল! তিনি বলিলেন "যখন রাজার রাজত্ব গেল, আমার মন্ত্রিত্ব গেল, তখন কলিকাতাতেও আর যাইব না—কলিকাতায় গিয়া কলির রাজার নিকট আমার রাজা রাণীর নিষ্প্রভতা দেখিতে পারিব না! এই শেষাবস্থায় আমার কাশীবাসই শ্রেয়ঃ!" এই সংকল্পে রাজা রাণীর সঙ্গে যাত্রা করিলেন। তিনি পঞ্জাব হইতে নিক্রমণক্ষণ হইতেই কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। বৃন্দাবন, মথুরা ও প্রয়াগে তীর্থ কার্য্য করিয়া বারাণসীর পথে যাইতে যাইতে সেই রোদন ক্রমে ভীষণতর বাড়িতে ও শব্দায়মান হইতে লাগিল—বারাণসীধামে শেষ বিদায় কালে বোধ হইল যেন তাঁহার হৃদয়স্থানটী যথার্থই বিদীর্ণ হইয়া গেল! ঢুলীন কাশীস্থ একটী সুশীল ব্রাহ্মণকে প্রচুর অর্থ দিয়া তাঁহারই হাতে হাতে চৈতনকে সপিয়া দিলেন এবং যখন যাহা কিছুর প্রয়োজন হইবে, লিখিলে কলিকাতা হইতে মাসহারা ব্যতীত তৎক্ষণাৎ তাহা আসিবে, এমন অঙ্গীকার করিলেন! প্রতিজ্ঞানুসারে সর্ব্বদা পত্রাদি লিখিতেন; চৈতনও যত দিন লেখনী ধারণে সমর্থ ছিলেন, তত দিন দীর্ঘ দীর্ঘ পত্রী লিখিয়া পাঠাইতেন—তাহা প্রায় নিত্য এবং তাহা ইংরাজীতে! ঢুলীন ও লীলা যৎকালে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহোপলক্ষে পুনর্ব্বার পঞ্জাবে যান, তখন চৈতনকে সঙ্গে লইয়া যাইতে ভুলেন নাই, —চৈতন সেই বিবাহে বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক নর্ত্তকীদের সঙ্গে নাচিয়াছিলেন! নাচিয়া গাইয়া আনন্দাশ্রু ফেলিয়া শুভ কার্য্যামোদ শত গুণে বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন! আবার প্রভুর সঙ্গে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরের আনন্দ-কাননে পূর্ব্ববৎ বিশ্রাম লাভ পূর্ব্বক কবে ইহ পার্থিব দেহ ত্যাগে শিবত্ব প্রাপ্তি হইবেন, এই আশায় সেই সদ্য-মুক্তি-দিবসের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন!

* * * * * *

কলিকাতার গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর ও তাঁহার সমিতির সভাসদ্‌গণ, খ্যাতনামা স্যার হেনেরি লরেন্স মহোদয়ের মুখে ঢুলীনের চরিত্র ও ধর্ম্মনীতিমূলক অসাধারণ গুণাবলীর আদ্যন্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া এবং আলাপের পর যত ঘনিষ্ঠতা করেন, ততই তাহার সত্যতার চাক্ষুস প্রমাণ পাইয়া তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন। অর্থাৎ সুদানের রাজস্ব-হ্রাস করিয়া রাজোপাধি দানপূর্ব্বক বিক্রমজিতের যথোচিত মান বাড়াইলেন—এবং বিচারঘরে উপস্থিতি

বিষয়ে অর্ধ ।কালে মধ্যম পুত্র সংসারচাঁদকে কাংরার সর্দ্দার এবং কনিষ্ঠ পুত্র সম্পত্তির অধিকারী করিয়া তুলিলেন। ফলতঃ ডুলীনের ন্যায় এমন মেধাবী পরম ধার্ম্মিক কর্ম্মচারীর প্রতি পূর্ব্বে ইংরাজ-কর্তৃক যে অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা জ্ঞাত হইয়া সুজন গবর্ণর জেনারেল লজ্জিত হইলেন। যেন তাহারি সংশোধন ও ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এই সব অনুগ্রহ বিতরণ দ্বারা মহাত্মা ডুলীনের প্রৌঢ়াবস্থায় যাহাতে সুখ, স্বস্তি, শান্তিলাভ ঘটে, তাহারি ব্যবস্থা করিলেন!

একদা এড্‌ভোকেট জেনারেল সাহেব ডুলীন-ভবনে আসিয়া হাস্যমুখে তাঁহার হস্তে এক খানি বৃহৎ মোড়ক দিলেন। পাঠ করিয়া ডুলীনের নয়ন জল-ভারাক্রান্ত হইল! বলিলেন "দয়াময় ঈশ্বর ইলাইজাকে দয়া করুন, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিতেছি!" সাহেব বলিলেন,"ইলাইজার উকীল লণ্ডন হইতে এই সব দলিল আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, যেহেতু তিনি আপনার ঠিকানা জানেন না।" ডুলীন বাধ্যতা প্রকাশ করিলে অন্যান্য কথোপকথনের পর সাহেব চলিয়া গেলেন।

ডুলীন ঐ মোড়ক হস্তে ম্লানমুখে লীলার নিকট গিয়া এ সম্বন্ধে যাহা ব্যক্ত করিলেন, আমাদের নিজ ভাষায় তাহার মর্ম্ম এই—কর্ণেল দোলীনের ভ্রাতু-কন্যা সেই পাপীয়সী ইলাইজা যাঁহাকে বিবাহ করে, সে বঞ্চক কেবল বিষয়ের লোভেই কপট প্রেম দেখায়। বিবাহের পরেই নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া সর্ব্বদা নির্দ্দয়া-চরণ ও অপব্যয় করে। ইলাইজার বিপুল ধন ক্রমে উড়িতে লাগিল—উভয়ের মধ্যে যার পর নাই মনান্তর ও বিবাদ চলিল, দুষ্ট যুবক তাহারি অর্থে তাহারি চক্ষের উপর উপপত্নী লইয়া নানা ভ্রষ্টাচার করিতে লাগিল। কেবল টাকা লইতেই বাটী আসিত; না পাইলে অপমান—প্রহার পর্য্যন্ত করিত; অবশেষে হয় দেরাজ ভাঙ্গিয়া টাকা লইত, নয় খুনের ভয় দেখাইয়া চেক লইয়া চলিয়া যাইত! ইলাইজা অগত্যা আদালতের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। পতির ব্যভি-চার ও নিষ্ঠুরাচার প্রমাণ করিয়া বিবাহ-বন্ধনে মুক্তি লাভ করিল। তাই তবু ভূসম্পত্তি বাঁচিল। কিন্তু তাহাতেও বিপদ কাটিল না। পাপিষ্ঠ যুবক দারিদ্র্য-দশায় পড়িয়া মরিয়া হইয়া উঠিল। এক গভীর নিশিতে ইলাইজা যখন এক নাচের মজ্‌লিস হইতে গাড়ী করিয়া বাড়ী আসিতেছিল, (সেই দিন আহা অন্য নায়কের সহিত দ্বিতীয় শুভ বিবাহের কথা স্থির হইয়াছিল!) তখন

সহসা এক প্রকার দ্রাবক, পিচকারি যোগে খুব জোরে ... সুন্দর বদন-
মণ্ডলে আসিয়া পড়িল! যুবক দেশ ছাড়িয়া পলাইল। ... র করিতে
করিতে বাটী আইল। বহু চিকিৎসাতে প্রাণ বাঁচিল, ... নয়ন-
যুগল জন্মের মত অন্ধ এবং চন্দ্র-বদন জন্মের মতন পুড়িয়া ... হইল!

রূপ গেল—নায়ক গেল—সমাজ গেল—আমোদ গেল—ঐশ্বর্য্য-ভোগ কেবল কর্ম্মভোগই হইল! কিন্তু তুলীনের প্রতি পূর্ব্বে যে অধর্ম্ম করিয়াছিল, তখনও তাহার শোধন করিল না! শেষে করিল বটে, কিন্তু বহু পরে—মৃত্যু-শয্যায়! সমাজ-ত্যক্তা হইয়া লজ্জায় বাহির হইতে না পারিয়া মনের ঘৃণা ভুগিয়া ভুগিয়া অবশেষে যখন পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়িনী হইল, তখন অনুতাপ ধরিল! যখন ডাক্তারেরা বলিল বাঁচিবার আশা মাত্র নাই, তখনি উকীল আনাইয়া উইল করিল। সেই উইল মধ্যে যেরূপে পূর্ব্ব পতির মন্ত্রণায় পিতৃব্যের উইল লুকাইয়া তুলীনকে বঞ্চিত করিয়া ঘোর পাপ করিয়াছিল, তাহার আদ্যন্ত ইতিহাস লেখাইল এবং সেই নিদারুণ পশ্চাত্তাপের ফল স্বরূপ সমস্ত সম্পত্তি তুলীনকে অর্পণ করিয়া গেল! সেই সঙ্গে সেই লুক্কায়িত খুল্ল-তাতের উইল পত্রাদিও উকীলকে দিয়া গেল। এবং ক্ষমা প্রার্থনাসূচক এক পত্র তুলীনকে লিখিয়া ইহ-লীলা-ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া, পাপার্জ্জিত বিষয়, সুখের হইবার নয়, জগৎকে ইহাই যেন দেখাইয়া যেখানে সে যাইবার যোগ্য, সেই-খানেই গেল! লণ্ডনের উকীল ইলাইজা-ত্যক্ত সমুদয় স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি তুলীনকে দিতে এবং তুলীনের কার্য্যনির্ব্বাহক হইতে প্রস্তুত, বিনয় পূর্ব্বক তুলীনকে এই ভাবে পত্র লিখিয়াছেন।

তুলীন প্রথমে সেই ত্যক্ত বিষয় লইতে চাহেন নাই, শেষে গবর্ণর জেনারেল প্রভৃতি বড় বড় লোক যখন বুঝাইলেন, "তোমারি যথার্থ প্রাপ্য বিষয়, তুমি লইবে না কেন?" তখন গ্রহণে সম্মত হইলেন। কিন্তু ইলাইজার পিতার সম্পত্তি তত্রত্য দরিদ্র-নিবাস উদ্দেশে দান করিয়া আপনার ...
বিষয় মাত্র লইলেন। তজ্জন্য এবং লীলাকে ইউরোপ ...
তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ইংলণ্ড গেলেন। বিষয় বিভবের ...
ইউরোপের নানা প্রধান স্থান ভ্রমণান্তে পুনর্ব্বার কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। কলিকাতায় অনেক বাঙ্গালী বন্ধুর সহিত তাঁহাদের পরম হৃদ্যতা জন্মে, বিশেষতঃ মধ্য...র সভ্যগণ তাঁহাদের দুজনকে দেব-দেবী-রূপে পূজা

করিলে... ...কে তাঁহাদের সভাপতি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রেমাস্পদ... ...র কলিকাতা ভিন্ন অন্য স্থান তাঁহাদের ভাল লাগিত না। তাঁহারা... ...য় আসি... সুখী হইলেন ও বন্ধুগণকে সুখী করিলেন।

এইরূপ... ...ছেন, একদা কাশীর সেই ব্রাহ্মণ-প্রেরিত এক খণ্ড পত্রে বিদিত হই, "... আর স্বয়ং লিখিতে অক্ষম—চৈতন্যের জ্ঞান আছে, কিন্তু কর্ম্মেন্দ্রিয় ... হইতেছে, আর অধিক অপেক্ষা নাই!" অমনি লীলা ও চন্দ্রাবতীকে সঙ্গে লইয়া ভুলীন কাশী যাত্রা করিলেন। সৌভাগ্যের বিষয়, গিয়া তাঁহারা দেখিলেন—চৈতন্য ... নয়নে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ বিশ্বাসানুসারে শিব-পদে শিবত্ব লাভ করিলেন!

যদিও এই ঘটনায় তাঁহারা মহা দুঃখিত, কিন্তু এই যাত্রায় একটী পরম সুখাবহ শুভঘটনাও ঘটিল—ননীর পুতুলী প্রাণতুল্যা চন্দ্রাবতী তাঁহার মনোমত পতি লাভ করিল! ভুলীন ও লীলার মনে মনে যেরূপ একেশ্বরবাদী সচ্চরিত্র যুবাকে কন্যাদানের ইচ্ছা চিরদিন বলবতী ছিল, করুণাময় প্রজাপতি অভাবনীয়রূপে তাহাই নির্ব্বন্ধ করিয়া দিলেন। লিপি-বাহুল্য ভয়ে কাশীতে এবং কনিষ্ঠ কুমারের পত্নীলাভ ... দি লিখিতে পারিলাম না। প্রিয়তমা অনুজার শুভোদ্বাহে ... (সঙ্গে ... জ্যেষ্ঠ সঙ্গীক) আসিয়াছিলেন। ... পৌত্র পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রী ... অন্নপ্রাশন ও অন্যান্য শুভ কর্ম্মোপলক্ষে ... বাটীতে বহু বহুবার উভয় পক্ষীয়দের যাইতে হইয়াছিল।

ভুলীন ও লীলা দেবী যেরূপে কলিকাতায় তাঁহাদের পবিত্র জীবন যাপন ও সম্পদের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তাহা আর বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইল না। এ স্থলে কেবল সংক্ষেপতঃ এই মাত্র উল্লেখিতব্য যে, নিরন্নকে অন্নদান; বিপন্নকে পরিত্রাণ; রুগ্নশয্যার পার্শ্বে ঔষধ পথ্যাদি দান; দেশহিতকর অনুষ্ঠান মাত্রেই অনুরাগ ও আনুকূল্য দান; ইত্যাদি আপনাদের সংসারোচিত কর্ত্তব্য পালনই তাঁহাদের সুদীর্ঘ জীবনের মহাব্রত হইল। আপনারা পান দোষে কখনই লিপ্ত নহেন, অন্যকেও সুরা সর্ব্বনাশীর হাত হইতে মুক্ত রাখিতে কতই যত্ন করিতেন—আশ্চর্য্য দয়া-মাধুর্য্য ও বাক্‌সৌন্দর্য্য গুণে কত শত যুবককে সেই রাক্ষসীর সর্ব্বগ্রাস হইতে বাঁচাইতেন!

যখন এই উপন্যাস লেখা হয়, (বা ...) তখন "রাজা ভুলীনের

বয়ক্রম প্রায় অষ্টাশীতি বৎসর। তথাপি আশ্চর্য্য ও সুখের বিষয়, জরা তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারে নাই! তেজস্বী ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম; শৈশব হইতে যৌবন পর্য্যন্ত বল-বিধায়ক শীতল দেশে বাস; উৎকৃষ্টরূপে স্বাস্থ্য-নিয়মানুযায়ী অবস্থান—নিজেও দৈহিক নিয়ম পালনে অন্যের দৃষ্টান্ত স্থল; ঈশ্বরপ্রেম ও ধর্মানুরাগজনিত আত্মপ্রসাদ ও সন্তোষ, এই সব মিলিত কারণে এ বয়সেও তাঁহাকে বার্দ্ধক্যে ধরে নাই! পাপেই লোকে চিত্তমালিন্য, চাঞ্চল্য, ভয়, সুতরাং রোগ, দৌর্ব্বল্য, মনস্তাপাদি ভুগিয়া ভুগিয়া—অপরাধে দগ্ধ হইয়া আয়ুক্ষয় ও অকাল-ধ্বংস মৃত্যুর অধীন হয়। ঈশ্বর পরায়ণ নিষ্পাপ জীবনে সে সব অসম্ভব! তাই তিনি প্রায় নবতি বৎসর বয়সেও বলবান, ধীমান ও প্রৌঢ়বৎ দৃঢ় জীবনী-শক্তিবান থাকিয়া অসংখ্য নিজ মণ্ডলীকে সুখী, সমাজকে উপকৃত করিতেছেন! তাঁহার দ্বিতীয় প্রাণসমা সাধ্বী লীলা দেবীও এত অধিক বয়সে যেন যৌবনের পরিণতি সোপানে উঠিয়াছেন—ধন জ্যেষ্ঠে আরোহণ করেন নাই! উভয়েরই দন্ত আছে! ফুলীন তবু পক্ককেশ হইয়াছেন—লীলা দেবী তাহাও না!"

(হায়! আজ বাং ১২৯৮ সালে সে কথা আর বলিবার জো নাই—উভয়েই স্বর্গগত—পতিব্রতা সাধ্বী লীলাদেবী অগ্রে, মহাত্মা ফুলীন পরে—উভয়েই এক বৎসরে (বাং ১২৯৩ সালে) পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন!

পুত্র, পুত্রী, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, প্রদৌহিত্র, প্রদৌহিত্রীগণ এখন শাখা পল্লবে সুখে শোভা বিস্তার করিতেছেন!

যে মহাতরুর ফল, তাহাতে সকলেই যে সুমিষ্ট অমৃত ফল হইবে, আশ্চর্য্য কি? তাহাই হইয়াছে—যশে, ধর্ম্মে, গুণে, সর্ব্বাংশেই সকলে মিলিয়া একটী রম্যোদ্যান রূপে বিরাজ করিতেছেন—ঈশ্বর তাঁহাদের সুমতির সহিত কল্যাণ বর্দ্ধন করুন। অলমতি বিস্তরেণ!

সমাপ্ত।